খাটুরা ব্রহ্মমন্দির।

ষষ্ঠ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২১ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষে

সম্মুখে নববর্ষ। আজ সেই কথাই মনে হ'চ্চে। বন্ধু একদিন লিখেছিলেন,—"বৎসরের নয় মাসের নয় সংখ্যা কাগজ তো বাহির হইল, এখন আর তিন সংখ্যা মাত্র বাকি। আশা করি সেই সর্ব্বসঙ্কটহারী দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় আগামী তিন সংখ্যাও নিয়মিতরূপে বাহির হইবে। তারপর নূতন বৎসরের জন্য এবার সম্পূর্ণ নূতনভাবে আয়োজন করিতে হইবে।" পরিশ্রান্ত দেহে যখন অবসন্ন হ'য়ে পড়ি, তখন বুঝি ভগবানের এইরূপ ব্যবস্থা। প্রভু পরমেশ্বর! বন্ধুর উৎসাহ-বাক্যের ভিতর দিয়ে তুমি যে আমাকে আজ আবার সজীব উৎফুল্ল করে তুল্‌লে—আর তো পড়ে থাকৃতে পারি নে। ধন্য দয়াল, তোমার করুণার কথা যেন কোনো দিননা ভুলি। প্রভু, আজ বৎসরের প্রথম দিনে তোমার চরণে আমার সেই প্রার্থনাই আবার বিশেষ করে জানাচ্ছি। এই কার্য্যের ভিতর দিয়ে আমার দেশের যেন কল্যাণ হয়। আমার আমিত্ব অভিমান অহঙ্কার প্রকাশিত হ'য়ে, তোমার কার্য্যের এবং তোমার সন্তান-সন্ততিগণের যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটায়। আর এক নিবেদন—প্রভু, আবার যদি এক বৎসরের জন্য সেবাব্রত পালনে ও সত্যের বন্ধনে বাঁধলে, তবে সকল ত্রুটী সকল অভাব অনাটনের মধ্যে, তুমি সর্ব্বসঙ্কটহারী লজ্জানিবারণ প্রভু দাসের লজ্জানিবারণ করিয়ো। প্রভু, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

প্রাণের কথা

আজ আমার স্বদেশবাসী শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন আত্মীয় বন্ধু এবং প্রিয়জন-বর্গের নিকট একটি প্রাণের কথা বলে' রাখি। কি জানি দিনে দিনে সংসারের দিন আমার যে ফুরিয়ে আসচে।

কথাটা খুব নূতন নয়, অনেক দিন ধরে' যা' বল্‌চি, তাই আজ আবার একটু পরিষ্কার করে' বোল্‌বো।

প্রথম কথা, এই "কুশদহ" পত্র প্রচারদ্বারা আমার যে উদ্দেশ্য সাধনের কামনা ছিল, তা আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদে কিয়ৎ-পরিমাণে সফল হয়েছে। "কুশদহ" প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকলের মনে একটা সদ্ভাবের সঞ্চার করা; দেখ্‌চি ভগবান তা করেছেন। তারপর দেশের স্বাস্থ্য, অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সে সকল বিষয়েও "কুশদহ" দ্বারা কিছু সাহায্য হয় হউক, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনের স্বাস্থ্য-উন্নতি-সাধনে যদি কিছু সহায় হ'য়ে থাকে, সেইটিই বেশী অহ্লাদের কথা।

তারপর ধর্ম্ম সম্বন্ধে;—প্রথম কথা, যিনি যে পথে চলেছেন, যদি কিছু রস পেয়ে থাকেন, আরো চলুন,—আরো অগ্রসর হউন, তাতে কোনো আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা সকলে একসঙ্গে মিলে মূল রস যেন আস্বাদন করি। দ্বিতীয় কথা, পথ অনেক রকম আছে কিন্তু সকল পথ সমান নয়; সুগম, সরস, নিষ্কণ্টকও নয়, একথা সত্য। কোথাও যদি এমন হয়, কোনো ভাই, কোনো বন্ধু পথ পেয়েছেন বটে, কিন্তু পথটি তেমন পরিষ্কার নয়, সেখানে তিনি উৎকৃষ্ট পথ দেখে নিয়ে মূল উদ্দেশ্য-সাধন-পথে চলুন। তারপর শেষ কথা,—আমরা যে পথ সর্ব্বাপেক্ষা ভালো বলে' জেনেছি, জীবনে মিলিয়ে পেয়েছি, আধ্যাত্মিক এবং সপরিবারে সাংসারিক ধর্ম্মের মিলন-সাধন—সংসারে প্রেম পরিবার গঠন। যোগ এবং কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি, ত্যাগ এবং কর্ত্তব্যপালন বা সেবার মিলন, একেশ্বরবাদ এবং সাধু ভক্তির সামঞ্জস্য, ভিতর এবং বাহির একযোগে পরিষ্কার করা, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পথের পথিক আরো দশজনে হউন ইহাই প্রাণের কথা।

যত রকমে মানুষের সাহায্য করা আবশ্যক হয়, সম্ভব হয়, শক্তিতে কুলায়, সকলই সেবার কার্য্য, সকলই কর্ত্তব্য, কিন্তু মানুষের প্রাণের অভাব— আত্যন্তিক দুঃখমোচন হয় যাহার দ্বারা, তাহার সহায় হইতে পারিলেই যে প্রাণটা সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য হয়, কৃতার্থ বোধ করে, তা'তে কি আর সন্দেহ আছে? তাই বলি আমার দেশবাসী ভাই বন্ধুগণ, শ্রদ্ধেয় পলিতকেশ গলিতদন্ত যিনি যেখানে আছেন, আপনাদের দাস জেনে এই দাসের প্রাণের কথায় কর্ণপাত করুন। আমি এখনো অপেক্ষা করচি। যে কয় দিন দেহে প্রাণ আছে, তার মধ্যে যদি আর দশ জনকে ভগবানের পথের পথিক হ'তে দেখতে পাই, তা' হ'লে ধন্য হ'ব, আরো কৃতার্থ হব। ভগবানের নাম ধন্য হউক, তাঁহার প্রেমরাজ্য ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হউক, মানব-হৃদয়ে তাঁহারই মহিমা জয়যুক্ত হউক। সংসারে অধর্ম্মের ক্ষয় ধর্ম্মের জয় হউক। মানব-হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হউক।

প্রার্থনা সঙ্গীত

(আলেয়া—একতালা)

পিতা এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন।
যার তরে, আশা করে' আমরা করি এত আয়োজন।
দেখে যার পূর্ব্বাভাস,　　মনেতে বাড়ে উল্লাস,
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ বিচিত্র শোভন!
নরনারী সবে মিলে　　ভাসে প্রেম অশ্রুজলে
ডাকে তোমায় পিতা বলে' আনন্দে হ'য়ে মগন।
তব পুত্র কন্যাগণে,　　পবিত্র ভাবে যেখানে
প্রেম-পরিবারের সুখ করে আস্বাদন;
সেই তো স্বর্গের শোভা　　ভক্তজন মনোলোভা
ভূমণ্ডল-মাঝে যাহা দেখে নাই কখন।

(গল্প)
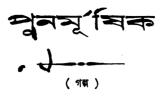
সুবলচন্দ্র যখন মাষ্টারি ছাড়িয়া মোক্তারি করিতে প্রথম নামিয়াছিল, তখন এক আশু মোক্তারের সৌভাগ্যের কথাই তাহার মনে জাগিতেছিল! কিন্তু পাড়ার হরিধন মোক্তার যে, আজ ছয় বৎসর ধরিয়া মোক্তারিতে উপবাস করিয়া আসিতেছে; এ কথা সুবলচন্দ্র একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। সে কেবলই নিজেকে এই বলিয়া আশ্বাস দিত,—আশুর মতন অমন নিরেট বোকারও যদি এত শীঘ্র এমন পসার হইতে পারে তবে আমার তো হইবেই! কিন্তু সুবলচন্দ্রের অদৃষ্টে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথাটা মোটেই খাটিল না!

সুবলচন্দ্র যখন নিজের বৈঠকখানায় মক্কেলের শুভাগমন-প্রতীক্ষায় তীর্থের কাকের মতন বসিয়া থাকিত এবং দেখিত যে সাধের মক্কেলকুল তাহারই বাড়ির সুমুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, অথচ ভুলিয়াও কেহ তাহার বাটীতে প্রবেশ করিতেছে না, তখন সুবলচন্দ্র তাহাদের উপর মনে মনে ভারী বিরক্ত হইত! ভাবিত,—মক্কেলগুলা কি আহাম্মুখ!—হাতের কাছে এল্-এ ফেল্ এমন টাট্‌কা মোক্তার থাকিতে গর্দ্দভগুলা কিনা অন্যত্র গিয়া মরিতেছে! চাউলের মতন মোক্তারও যে পুরাতন হইলেই দরে বাড়ে একথা সুবলচন্দ্র স্বীকার করিতে চাহিত না!—তাহা হইলে ছয় বৎসরের পুরাতন মোক্তার হরিধন কেন প্রাইভেট ট্যুইশানি করিয়া দিন গুজরান করিতেছে!

নিজের মনে মনে 'বিপথগামী' মক্কেলদের গালি দিয়া এবং কল্পিত মক্কেলের আশায় আশায় থাকিয়া সুবলচন্দ্র প্রায় বছরখানেক কাটাইয়া দিল। এখন তাহার বৈঠকে মধ্যে মধ্যে দু পাঁচ জনের আগমন হয় বটে, কিন্তু মোলায়েম মক্কেলভাবে নহে,—পাওনাদারের দুষমন মূর্ত্তিতে!—কেহ কাপড়ের টাকা পাইবে, কাহারো চাউলের টাকা পাওনা, কেহ তিনমাস হাঁটাহাঁটি করিতেছে তবু সে তার বাকী কয়টা টাকা কিছুতেই আদায় করিতে পারিতেছে না, কাহারো আজই কলিকাতা যাইতে হইবে কিছু না দিলে নয়—ইত্যাকার!

সুবলচন্দ্রের মোক্তারী-ভাগ্য-গগনে যখন এইরূপ নিরাশার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং তাহার মধ্য হইতে ঘন ঘন অন্নচিন্তার চিকুর হানিতেছিল, তখন একদিন দীনু সাউ সুবলচন্দ্রের নিকটে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল!—দীনু সুবলের প্রতিবেশী—নিরক্ষর কৃষাণ।

২

দীনুর অভিযোগ,—তাহার ছোট ভাই ঝাটু, তাহার সীমার আনারস গাছ উপড়াইয়া দিয়াছে, এবং সে বাধা দিতে যাওয়ায় তাহাকে প্রহার করিয়াছে; আবার তাহার উপর 'শালা' বলিয়া গালি দিয়াছে! দীনু বলে—তার ভাই সীমানার গাছ উপড়াইয়াছে,—উপড়াক; মারিয়াছে,—মারুক;—ছোট ভাই না বুঝিয়া না হয় একটা দোষ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সে বড় ভাই—ঝাটু তাকে 'শালা' বলিয়া গালি দিবে?...এইটাতেই দীনু ভারী চটিয়াছে...সে অনেক বরদাস্ত করিয়া আসিয়াছে কিন্তু এবারে সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না, যা হয় একটা বিহিত করিবেই, এবং সেই জন্যই সে ভদ্রলোকের শরণাগত হইয়াছে!

মোক্তারী-জীবনে এই প্রথম একটি মক্কেলের গন্ধ পাইয়া সুবলচন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইল। ভাবিল এত দিন পরে তা'র সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল! তখন সে গম্ভীরভাবে দীনুর অভিযোগ শুনিয়া পিনাল-কোর্ডখানা লইয়া বারকতক নাড়াচাড়া করিয়া মুরুব্বির চালে বলিল, "মকর্দ্দামা বেশ চল্‌বে!"

দীনু আশা করিয়াছিল—সুবলচন্দ্র ও আর দু'চারজন ভদ্রলোক মিলিয়া ঝাটুকে ডাকাইয়া ধম্‌কাইয়া দিবে,—তাহাতেই ঝাটু ঢিট্ হইয়া যাইবে, কিন্তু মকর্দ্দামার কথা শুনিয়া সে বেচারা একটু ভড়কাইয়া গেল;—বলিল, "কেন আপনারা পাঁচ জন ভদ্রলোক আছ, তাকে ডেকে ধম্‌কে দিলেই—"

"আরে আহাম্মক!—হাকিমের ধম্‌কানি না হ'লে তোর ও ভাই জব্দ হবে না—বুঝেচিস্?...আর এতে তোর খরচপত্রও তেমন কিছু কর্‌তে হবে না...আমি না হয় অমনিই তোর কাজ করে দেব—তুই গরীব বেচারী!"

মাকড়সার ফাঁদে মাছি পড়িলে, আর তাহার নিস্তার আছে?—বুভুক্ষু মোক্তারের ফাঁদে পড়িয়া দীনু নিস্তার পাইবে কেমন করিয়া?—অনেক ইতস্তত করিবার পর দীনু বেশ বুঝিয়া গেল,—ভাইয়ের নামে নালিশ রুজু করা তাহার একান্ত কর্ত্তব্য।

৩

মোক্তার বাবুর পরামর্শে যথারীতি সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া এবং প্রহারের চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট ও দ্বিগুণ করিয়া দীনু যথাসময়ে ভাইয়ের নামে নালিশ রুজু করিল। নালিশের কথা শুনিয়া ঝাটুর স্ত্রী ভাবিয়া আকুল!—সে কত করিয়া স্বামীকে বুঝাইতে লাগিল—"ওগো ছোট ভাই দোষ করেছ, বড় ভাইয়ের কাছে মাপ চাইলে দোষ নেই—লজ্জা নেই—যাও, যাও—ওগো শুন্‌চো?" কিন্তু ঝাটু তেমন লক্ষ্মণ ভাই নয়—সে স্ত্রীকে ধম্‌কাইয়া উঠিল,—"হাঁ, হাঁ যেতে হয়—তুই যা!—আমার কি দায় পড়েচে?"

অগত্যা ঝাটুর স্ত্রী বড় জার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল—"দিদি রক্ষে কর—"

ঝাটু দীনুকে প্রহার করায় দীনুর স্ত্রী দেবরের উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়াছিল, কিন্তু ছোট বউএর চোখে জল দেখিয়া দীনুর স্ত্রীরও চোখে জল আসিল। সে তখন দেবরের হইয়া স্বামীর কাছে সুপারিশ করিতে চলিল।

স্ত্রীকে দেবরের হইয়া সুপারিশ করিতে আসিতে দেখিয়া দীনু প্রথমটা ভারী খাপ্পা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্তরালে রোরুদ্যমানা ভ্রাতৃবধূ আসিয়াছে শুনিয়া নরম হইয়া গেল। স্ত্রীকে কোনো কথা না বলিয়া দীনু মোক্তার বাবুর বাসার দিকে চলিল।

সুবলচন্দ্র তখন এক পাওনাদারকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া সবে বিদায় দিয়াছে, এমন সময় দীনু আসিয়া উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়া সুবলচন্দ্রের প্রাণটা একটু শীতল হইল!—ভাবিল, আদালতের খরচার ছলে দীনুর নিকট হইতে আরো কিছু আদায় করিয়া লইতে হইবে। তখন সে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল,—"এই যে, দীনু এসেছ!—ভালো হয়েছে, তোমরি কথা ভাবছিলুম!"

সে কথায় তেমন কান না দিয়া দীনু একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে আবার এক কাণ্ড—"

সুবলচন্দ্র ভাবিল—ঝাটু বুঝি আবার কোনো হাঙ্গাম বাধাইয়াছে সুতরাং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—"কি, আবার কোনো গোল বাধিয়েচে বুঝি?—

"আজ্ঞে হাঁ—আমার ভাই-বউটি বড় কান্নাকাটি আরম্ভ করেচে!—"

সুবলচন্দ্রের বুকটা ধ্বড়াস করিয়া উঠিল—সে একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল,—"তাতে আর কি হয়েচে?"

"আজ্ঞে; মনে করচি—মকদ্দমাটা—"

সুবলচন্দ্র ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—“কি ? তুলে নেবে ?”

“আজ্ঞে হাঁ, তাই আপনার পরামর্শ নিতে এসেচি।—”

“নিজে কয়েদ যেতে স্বীকার থাক তো তুলে নিতে পার—আমার কোনো আপত্তি নেই !”

কয়েদের কথা শুনিয়া দীনুর মুখ শুকাইয়া গেল ! সেই সঙ্গে সুবলচন্দ্রের প্রাণেও একটু ভরসা আসিল—তখন সে নিজের পৈত্রিক বুদ্ধির সঙ্গে তার মোক্তারী বুদ্ধি যতটুকু ছিল, মিশাইয়া দীনুকে বেশ বুঝাইয়া দিল যে,—এখন মকর্দ্দামা তুলিয়া লইলে ঝাটুর নামে সে মিথ্যা নালিস করিয়াছে বলিয়া ঝাটু ভবিষ্যতে তাহার নামে পাল্টা নালিশ করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিবেই ফেলিবে—আইনে একথা স্পষ্ট লেখা আছে !

দীনু ভাবিল,—‘ওঃ ! উকীল মোক্তার নহিলে এত বুদ্ধি আর কার হইতে পারে !’…সেই সঙ্গে ভা’য়ের উপরেও দীনুর রাগ হইতে লাগিল—‘এ্যা, তার মনে মনে এত কুমতলব !’ আবার ভাবিল, ‘না, এ তার বুদ্ধি নয়—এ তার মোক্তারের বুদ্ধি—কিন্তু আমার মোক্তারের কাছে সে বুদ্ধি টিকিল না !’—হঠাৎ দীনু সুবলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—“বিচারে ঝাটুর কি কয়েদ হ’তে পারে ?”

দীনুর মুখের ভাবে সুবলচন্দ্র বুঝিল,—এখনো ভাইএর প্রতি দীনুর টান আছে. সুতরাং বলিল,—“না, কয়েদ হ’তে যাবে কেন,—দু’দশ টাকা জরিমানা হ’তে পারে, কিম্বা, মুচ্‌লেকা লিখিয়ে নিতেও পারে—এই যা !”

দীনু নিতান্ত আগ্রহভরে সুবলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—“বাবু, বেত্ সাজাটা হয় না ?”

৪

আজ দীনুর মকর্দ্দামার বিচার শেষ হইবে। সুবলচন্দ্রের মনটা তত প্রফুল্ল নহে ! কারণ, দীনুর মত সোনার চাঁদ মক্কেল কবে আবার জুটিবে তার স্থিরতা নাই ! দীনু—আহা, কি সরল বেচারা…গলায় ছুরি দিলেও ‘উ-হু’ করিতে জানে না !—অমন না হইলে মক্কেল !

আদালতের সম্মুখে একটা গাছতলায় পাণের দোকানে কেরোসিনের বাক্সে বসিয়া সুবলচন্দ্র একমনে এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল, দীনু বিষণ্ণমুখে কাঁদো-কাঁদো হইয়া সেই দিকে আসিতেছে !—দেখিয়া সুবলচন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল,—সে ভাবিল, দীনু দেখিতেছি হারিয়াছে—সর্ব্বনাশ !—পয়লা থেকেই যদি নাম খারাপ হইতে চলিল, তবে তো আর আশা-ভরসা

নেই! পাছে দীনু পাঁচজনের সাম্‌নেই তাহার ব্যর্থতার কথা রটাইয়া ফেলে এই ভাবিয়া সুবলচন্দ্র সেখান হইতে উঠিয়া দীনুর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"কি দীনু,—কি হ'ল বল দেখি?"—

"বাবু গো—আর কি হবে—" বলিয়া দীনু কাঁদিয়া উঠিল! সুবলচন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ভাব্‌না কিসের?—আমরা আপীল কোর্‌বো! আমাদের বেশ জোর আছে!"

দীনু খানিকটা শ্লেষ্মা নাসিকা হইতে ফেলিয়া দিয়া, চাদরে মুখ মুছিয়া বলিল,—"না বাবু,...আপনি যা ভাব্‌চো তা নয়—ঝাটুরই কয়েদ হয়ে গেছে!"—দীনু আবার ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এতক্ষণে দীনুর কান্নার মর্ম্ম বুঝিয়া সুবলচন্দ্র একটু নিশ্চিন্ত হইল—বলিল,—"তাই কাঁদ্‌চ?—হরেকেষ্ট—আমি ভাব্‌লুম্ তুমি হেরে গেছ—"

দীনু বলিয়া উঠিল,—"সে বরং ছিল ভালো! এমন হ'বে জান্‌লে কক্‌খনো মকদ্দামা করতুম না!"

৫

ঝাটুর কয়েদ হইয়াছে শুনিয়া দীনুর স্ত্রী শিহরিয়া উঠিল! স্বামীকে বলিল,—"এ্যঁা!—এ কল্লে কি?—ভাইকে জেলে দিয়ে এলে?"

দীনু সাশ্রুলোচনে বলিল,—"কে জান্‌ত, এমন হবে!"—দীনুর স্ত্রী গম্ভীর ভাবে বলিল,—"তা কি হবে এখন?—ছোট বউ তা হ'লে বাঁচবে না!" দীনু শুষ্কমুখে বলিল,—"মোক্তারে বলে, বারিষ্টর দিলে আপীলে খালাস হ'তে পারে!—কিন্তু সে ঢের টাকার খরচ—পাব কোথায়?"

এবার দীনুর স্ত্রীর কেমন রাগ হইল—সে অভিমানভরে বলিয়া ফেলিল,—"ভাইকে জেলে দেবার সময় বিনা পয়সায় মোক্তার পেয়েছিলে, আর, ভাইকে খালাস করবার সময় বিনা পয়সায় বারিষ্টর পাবে না?—না পাও বাড়ি বন্ধক দাও—ধান বেচো—জমী বিক্রী করো!"

অগত্যা, দীনু গত বৎসর যে কয় মণ ধান পাইয়াছিল তাহা বেচিয়া এবং মুখুয্যেদের দরুণ জমিটা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া ভা'য়ের উদ্ধারের নিমিত্ত জেলায় যাত্রা করিল।

ঝাটুর স্ত্রী যখন এ খবর পাইল তখন সে একটু আশ্বস্ত হইল। এ কয়-দিন যে কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে সে তাহা কিছুই জানে না! জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ, দিদি, আজ ক'দিন হ'ল?"

"পাঁচদিন্ বোন !"

"বড় ঠাকুর কবে গেছেন ?"

"আজ সকালে !"

"আজ সকালে !—দেরী করলেন কেন ?"

দীনুর স্ত্রী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বোন্ ! টাকাকড়ি যোগাড় কর্‌তে হ'বে তো ! তাই দেরী হ'ল।" ঝাটুর স্ত্রী খানিকক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এতক্ষণে কি বড়ঠাকুর পৌঁছেচেন ?" দীনুর স্ত্রী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—"জেলা কি বোন্ এখানে, যে আজই পৌঁছবেন ?"

জেলা অনেক দুর শুনিয়া ঝাটুর স্ত্রীর ম্লান মুখখানি আরো ম্লান হইয়া গেল ! সে বলিল,—"কত দিনে তবে পৌঁছবেন ?"

"কাল বিকেলে।"

ক্ষণকাল নীরব রহিয়া ছোট বউ জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, খালাস হবেন তো ?"

"খালাস হবে বৈ কি, বারিষ্টর দেওয়া হবে—আর খালাস হবে না ?"

"বারিষ্টর বল্লেই খালাস করে দেবে ?"

"ওমা ! বারিষ্টর কি কম লোক ! তাঁর কথা আবার হাকিম শুন্‌বেন না !"

ছোট বউ তন্ময় হইয়া জার কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, —"দিদি, জেলে যদি অসুখ-বিসুখ হয় তবে কি হ'বে ?"

"বালাই !—অসুখ হ'তে যাবে কেন ?"

স্বামীর অশুভ চিন্তায় ছোট বউএর চোখে জল আসিল। দীনুর স্ত্রী বলিল,—"ছিঃ কাঁদা অমঙ্গল—কেঁদো না।"

৬

রামদেও জেল-ওয়ার্ডারের মাতৃহীন সন্তান—বাপের সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশ করিয়া বেড়ায়। ঝাটুর গাছের পেয়ারা চর্ব্বণ-সূত্রে রামদেওর সহিত ঝাটুর মেজো ছেলে নারাণের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। ঝাটুর স্ত্রী রামদেওর দ্বারা স্বামীর খবর পাইবার আশায় প্রত্যহ তাহাকে ফলমূলের নিমন্ত্রণ করিত। বলা বাহুল্য নিমন্ত্রণ-রক্ষায় রামদেওর কোনো দিন ভুল হইত না !

একদিন রামদেও পেয়ারা চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিয়া ফেলিল —"নারাণ কা বাপকো কলেরা হুয়া !" ছোট বউ দাঁড়াইয়াছিল, ধপ্ করিয়া বসিয়া

পড়িল ও সেই সঙ্গে ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল! দীনুর স্ত্রীও এই সংবাদে কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল! কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। দীনু তখনো জেলা হইতে ফিরিয়া আসে নাই, কেবল খবর পাঠাইয়াছে—'ভগবানের ইচ্ছায় ঝাটু বোধ হয় খালাস হইবে, রায় জানিতে পারিলেই রওনা হইব।'

দীনুর স্ত্রীর একবার মনে হইয়াছিল, গ্রামের কাহারো দ্বারা একটা খবর আনাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু সেই সময়ে বৈশাখের আকাশ হঠাৎ এমন ঘনঘটা করিয়া আসিল যে, সে দুর্য্যোগে গ্রামের লোকের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। অগত্যা, বড় বউ নিরুপায় হইয়া ছোট জা'কে কেবল মুখের আশ্বাস দিতে লাগিল। কিন্তু বড়বউ একটা বিষয়ে বড় আশ্চর্য্য বোধ করিল —ছোট বউ প্রথমটা যেমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, পরক্ষণে কৈ তার ততটা ব্যাকুলতা দেখা গেল না, বরং তার সেই অশ্রুসিক্ত মুখের উপর যে করুণ বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেটা যেন ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল এবং তৎপরিবর্ত্তে কি যেন এক স্থির সংকল্পের কঠিন আভাস জাগিয়া উঠিতে লাগিল!

সে রাত্রে দুর্য্যোগ আর থামিল না।—বাহিরে জমাট অন্ধকার! সেই অন্ধকারে বায়ুর হুঙ্কার আর বিদ্যুতের চীৎকার দুইয়ে মিলিয়া যেন মহা-প্রলয়ের দামামা বাজাইতেছিল! দীনুর স্ত্রী ভাবিয়াছিল, ছোট বউকে আজ খাওয়ানো ভার হইবে, কিন্তু কৈ ছোট বউ আহারের সময় কোনো আপত্তি করিল না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বড় বউএর মনে একবার যেন একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সে সন্দেহটা এত ভীষণ যে বড় বউ সেটাকে লইয়া বেশীক্ষণ মনের মধ্যে আলোচনা করিতে পারিল না, বরং সেটাকে অমূলক বলিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

সেই ভীষণ গভীর রাত্রে বাড়ির আর সকলে যখন গাঢ় নিদ্রিত, ঝাটুর স্ত্রী তখনো জাগিয়া!—সে ভাবিতেছিল,—এতক্ষণে কে জানে তার অদৃষ্টে কি ঘটিয়া গেল! সে মনে মনে নিজেকে কেবল এই প্রশ্ন করিতেছিল—'সে এখনো সধবা, না বিধবা?' মনের ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল—'যদি বিধবাই হইয়া থাকে—কি করিবে?' আর একজন যেন কে উত্তর করিল—'কি করিব?—কেন আত্মহত্যা!'

ছোট বউএর মনে হইতে লাগিল—ভগবান তাহাকে পথ দেখাইয়া গেলেন! বাস্তবিক কেন সে এত ভাবিয়া মরিতেছে?—যা হইবার তা তো হইয়াছে, এখন তাহাকে নিজের পথ করিয়া লইতে হইবে!—আত্মহত্যা! —দুঃখময় জীবনের কি শান্তিভরা সান্ত্বনা! ভাবনা কিসের? ছোট বউ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—আবার যেন নব বল ফিরিয়া পাইল!

এখন, সে আত্মহত্যার কোন্ মূর্ত্তির সাধনা করিবে ইহাই বিবেচ্য! তিনটি প্রকরণ ছোট বউএর জানা ছিল—উদ্বন্ধন, নিমজ্জন, আর বিষভক্ষণ। এখন ইহাদের মধ্যে কোন্ পথে গেলে সে শীঘ্র স্বামীর নিকট গিয়া পৌঁছিতে পারিবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সেই দুর্য্যোগে বিষ সংগ্রহ করা অসম্ভব! উদ্বন্ধন প্রক্রিয়াটাও তাহার নিকট তেমন সুনিশ্চিত এবং সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইল না! সুতরাং জলপথটাই তাহার নিকট সুগম ঠেকিল। সেই সময় দ্বারের ছিদ্র দিয়া বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া উঠিল, ছোট বউএর দৃঢ় ধারণা হইল,—তাহার অসহায় স্বামী মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ করিতেছে—সেই শব্দ সে শুনিতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল এখনো তাহার স্বামী জীবিত!—কিন্তু আর বিলম্ব করিলে সে স্বামীর আগে যাইতে পারিবে না! এই চিন্তা মাত্র সে ঝড়ের মত উতলা হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ একখানা বস্ত্র লইয়া মিত্রদের ঘাটের উদ্দেশে সেই দুর্য্যোগে বাহির হইয়া ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া গেল!

* * *

তখন আকাশে বিদ্যুৎ ঘন-ঘন শিহরিয়া উঠিতেছিল। বৃষ্টির ধারা একটু শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বাতাস তেমনি শোকার্ত্ত রমণীর চুলের মত এলো-মেলো হইয়া সবেগে বহিতেছিল—আর ঘাটে বসিয়া ছোট বউ নিজের দু'পায়ে কষিয়া কষিয়া কাপড় জড়াইতেছিল! তারপর যখন আকাশটা চ্—চড়্—চড়্—চড়াৎ করিয়া উঠিল তখন ঘাটে কেহ নাই!

৮

ঝাটুর কলেরা হইয়াছিল সত্য কিন্তু সে সারিয়া উঠিয়াছে। সে যখন হাঁসপাতাল হইতে বাড়ি আসিয়া শুনিল, দীনু ধান বিক্রয় করিয়া ও জমী বন্ধক দিয়া তাহাকে আপীলে খালাস করিয়া আনিয়াছে, তখন আত্ম-গ্লানিতে তাহার মনের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল। তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল! অনেকক্ষণ পরে ডাকিল,—"দাদা!"

দীনু সস্নেহে ঝাটুর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"ছি ভাই কাঁদিস্ নি!"

এই মধুর মিলন-দৃশ্যে বড় বউ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ছোট বউকে উদ্দেশ করিয়া ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই আর্ত্তস্বরে ঝাটু বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষণকাল নির্ব্বাক নিশ্চল থাকিয়া বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিল,—"এ্যাঁ ছোট বউ নেই!"

এই নিদারুণ শোক রুগ্ন শরীরে সহ্য হইল না—ঝাটু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছা ভাঙিবার পর সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"দাদা, তুমি ক্ষমা করলে, কিন্তু ভগবান্ করলেন না!"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে সুবলচন্দ্র 'কর্ম্মখালি'র স্তম্ভে মাথা কুটিয়া কুটিয়া অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গের একটা ইস্কুলে কুড়ি টাকার মাষ্টারি পাইয়া মোক্তারের ধড়াচূড়া ত্যাগ করিলেন!

বন্ধুবান্ধবে সুবলচন্দ্রের এই 'পুনর্ম্মূষিকোভব'র কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুবলচন্দ্র বলিত,—"মোক্তারী লাইনে বেশ দু'পয়সা থাকলে কি হয়, মানুষকে পাথর হয়ে যেতে হয়—তাই ছেড়ে দিলুম!"

বলা বাহুল্য সুবলচন্দ্রের বন্ধুবর্গ সে কৈফিয়তে মনে মনে হাসিত মাত্র।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বর্ণচ্ছত্র

[SPECTRUM)

সূর্য্যালোককে যন্ত্রযোগে বিশ্লেষণ করিলে রামধনুর ন্যায় যে সাত প্রকারের বর্ণবিন্যাস দৃষ্ট হয়, সেগুলিকে একত্রিত করিলে আবার শুভ্র আলোকের উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং যে সূর্য্যালোককে আমরা শুভ্র বলিয়া থাকি তাহা যে সাত রকম রঙের দ্বারা গঠিত তাহা ভুলিয়া যাই। সূর্য্যের এই বর্ণচ্ছত্র দেখিতে হইলে বীক্ষণাগারে (Laboratory) Spectroscope অথবা আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ফাঁকের মধ্য দিয়া কয়েকটা সূর্য্যের রশ্মিকে এই যন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করাইয়া তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিবার পর, যন্ত্রসংযুক্ত দূরবীক্ষণ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে পূর্ব্বকথিত সঙ্কীর্ণ ফাঁকের মাপ-অনুযায়ী পরস্পর সজ্জিত সপ্তবর্ণের Spectrum

বা বর্ণচ্ছত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণচ্ছত্র বৈজ্ঞানিকগণকে সূর্য্যের নাড়ীনক্ষত্রের কথা বলিয়া দিতে পারে। আজ পর্য্যন্ত বর্ণচ্ছত্রের দ্বারা সূর্য্য-সম্বন্ধে যেরূপ নব নব তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে অপর কিছু দ্বারাই সেরূপ সম্ভব হয় নাই। এই Spectrum বলিতে সাধারণত সূর্য্যেরই Spectrum বুঝা যায়; এতদ্ব্যতীত জ্বলন্ত যে কোনো জিনিষের বর্ণচ্ছত্রকে ঐ নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। কেবল সূর্য্যের নয়, বৈজ্ঞানিকগণ নক্ষত্র, নীহারিকা এবং জ্বলন্ত বাষ্পসমূহের এক একটি বর্ণচ্ছত্র দেখিতে পাইয়াছেন। অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ এবং আর্গন্ নামক বায়বীয় পদার্থের বর্ণচ্ছত্র লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে কেবল পোড়াইয়া, যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত যে কোনো একটি গ্যাস্‌কে একটি কাঁচের নলের ভিতর পূরিয়া তাহার দুইমুখ বন্ধ করিয়া দাও, তাহার পর নলের দুই প্রান্ত ব্যাটারি অথবা তড়িৎকোষের দুই তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত করিলে, অন্তর্ব্বর্ত্তী গ্যাস্ জ্বলিতে থাকে; এই জ্বলন্ত গ্যাসের আলোক বিশ্লেষণ করিবার বিশেষ উপযোগী। এইরূপ নানা-উপায়ে গ্যাসের আলোককে বর্ণচ্ছত্র-গ্রহণোপযোগী করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সূর্য্যালোককে বিশ্লেষণ করিলে যেমন পর পর সজ্জিত একটি সুদীর্ঘ সাতরঙা ছবি পাওয়া যায়, গ্যাস্ বা অপরাপর দ্রব্যের দহনজাত বর্ণচ্ছত্র কদাপি ঐরূপ দীর্ঘ ও বহুবর্ণবিশিষ্ট হয় না। যেমন সোডিয়ম্ নামক মূল পদার্থকে দহন করিলে কেবলমাত্র স্বর্ণহরিতাভ একটি উজ্জ্বল রেখা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই একমাত্র উজ্জ্বল সরল রেখাই সোডিয়াম্ ধাতুর বর্ণচ্ছত্র। কিন্তু নক্ষত্র ও নীহারিকাগণের বর্ণচ্ছত্রে বহু বর্ণের উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রের ভিতর অনেকগুলি কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের রেখামালার মাঝে মাঝে এই এক্ একটি কৃষ্ণরেখা থাকিবার কারণ কি জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণা এবং পরীক্ষা করিয়া যে অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সর্ব্বাগ্রে এই কৃষ্ণরেখাবলী উল্‌ষ্টোন্ (wollaston) নামক এক বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক ১৮৫২ সালে আবিষ্কৃত হয়। তাহার পর ফ্রান্‌হোফার নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ঐ কৃষ্ণরেখাগুলির কারণ অনুসন্ধান করেন এবং তাহাদিগের স্থান সৌরবর্ণচ্ছত্রে চিরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অতঃপর ঐ কালো

রেখাসকল "ফ্রান্‌হোফার রেখা" (Franhofer lines) নামে পরিচিত ; ঐ কৃষ্ণরেখার সমষ্টি মোটের উপর ৫৭৬ হইবে, উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে পরীক্ষা করিলে উক্ত সংখ্যার শতাধিক রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সৌরবর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণ অংশগুলি সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট আছে, কদাচ সেগুলি স্থান-পরিবর্ত্তন করে না। ধাতুপদার্থ দহন করিলে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, সে বর্ণচ্ছত্র একটি উজ্জ্বল রেখা হইলেও তাহার স্থান চিরনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সৌরবর্ণচ্ছত্র এবং অপরাপর ধাতুপদার্থের বর্ণচ্ছত্র পর পর সজ্জিত করিয়া যাইলে দেখা যায়, সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রের যে অংশ কৃষ্ণরেখাযুক্ত অপর একটি ধাতুপদার্থ, তাহার বর্ণচ্ছত্রের ঠিক্ ঐ অংশে একটা উজ্জ্বল রেখাপাৎ করিয়াছে। সুতরাং সৌরবর্ণচ্ছত্রের যে স্থান শূন্য রহিয়াছে, পৃথিবীর নানা জিনিষের বর্ণচ্ছত্রে সেই শূন্য স্থানের বর্ণপাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ এই কৃষ্ণরেখার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন দেখা যাউক্। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সূর্য্যদেহ সতত দাহ্যমান্ বহু ধাতুপদার্থের সমষ্টিমাত্র। এই জলন্ত অগ্নিগোলককে আমাদের ধরিত্রী প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিয়া বারো ঘণ্টা দিন ও বারো ঘণ্টা রাত্রির সৃষ্টি করিতেছে। যেমন কোনো ধাতুপদার্থকে দহন করিলে তাহার বিশেষ একটি বর্ণচ্ছত্র লাভ করা যায়! সূর্য্যদেহে নানা ধাতুপদার্থ নিত্য দগ্ধ হইতেছে বলিয়া তাহারো নানাবর্ণের সুদীর্ঘ বর্ণচ্ছত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল বা সূর্য্যদেহের উপরিভাগে কয়েকটা গ্যাস্ অনবরত প্রবলবেগে দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, একটি দাহ্যমান্ পদার্থের যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহার সম্মুখে অল্প উত্তাপশালী দাহ্যমান অপর কোনো পদার্থ রাখিলে ঐ পূর্ব্বদৃষ্ট উজ্জ্বল বর্ণচ্ছত্রের মাঝে হঠাৎ একটি কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া গেল, তাহাতে কোনো কৃষ্ণরেখা দেখা গেল না, কিন্তু ঐ দাহ্যমান্ পদার্থের সম্মুখে স্বল্প উত্তাপশালী অপর একটি পদার্থ দগ্ধ করিলেই এই কৃষ্ণরেখার উৎপত্তি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, প্রথম বস্তুটির দহনজাত আলোক হইতে দ্বিতীয় বস্তুটি তাহার নিজের আলোকের অনুরূপ আলোক শোষণ করিয়া লয়। সেই জন্য প্রথম বস্তুটির সুদীর্ঘ বর্ণচ্ছত্র হইতে কয়েকটা বর্ণরেখা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তজ্জন্যই সেইস্থান বর্ণশূন্য থাকে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শোষিত আলোকরেখার অনুযায়ী রেখা উভয়

বর্ণচ্ছত্রেই বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। কেবলমাত্র প্রভেদ হইতেছে এই যে, শোষণকারী দ্রব্যটি প্রথম দ্রব্যটি হইতে অল্প উত্তাপে দগ্ধ হইবে। যেমন মনে করা যাউক যে সোডিয়াম্ ধাতু দগ্ধকালে একটা বর্ণচ্ছত্র লওয়া গেল, তাহার পর ঐ আলোকের সম্মুখে অল্প উত্তাপে দাহ্যমান ঐ একই সোডিয়াম্ ধাতু স্থাপিত করিলে পূর্ব্বদৃষ্ট বর্ণচ্ছত্রে কৃষ্ণরেখা দেখা যাইবে।

সূর্য্যদেহে ও সূর্য্যদেহের চতুষ্পার্শ্বে তদ্রূপ নানা দ্রব্য ও বায়বীয় পদার্থসকল নিয়ত দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যদেহের উত্তাপ ও সূর্য্যমণ্ডলের উত্তাপ সমান নহে; সেইজন্য সূর্য্যদেহ যে বর্ণচ্ছত্র দান করে তাহা কৃষ্ণরেখ-বর্জ্জিত কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলসমন্বিত সূর্য্যদেহের বর্ণচ্ছত্র বহু কৃষ্ণরেখাবলী দ্বারা খণ্ডিত। এস্থানেও পূর্ব্বলিখিত কারণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রবল উত্তাপশালী সূর্য্যদেহে যে সকল পদার্থ দগ্ধ হইতেছে, তাহার মণ্ডলেও ঐ ঐ পদার্থ সকল স্বল্প উত্তাপে দগ্ধ হইতেছে, কাজেই সূর্য্যমণ্ডলের দহনজাত বায়বীয় পদার্থসকল সূর্য্যদেহের অনেকগুলি আলোক-রশ্মিকে শোষণ করিয়া রাখিয়া দেয়; কাজেকাজেই সৌরদেহের সুদীর্ঘ বর্ণচ্ছত্র কতকগুলি কৃষ্ণরেখা দ্বারা খণ্ডিত হইতে দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোনো উপায়েই কি সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র কৃষ্ণরেখাশূন্য দেখা যায় না? উত্তরে বলিতে হয়, যদি কোনোরকমে সূর্য্যমণ্ডলের বাষ্পরাশি বাদ দিয়া বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায় তবেই ঐরূপ সম্ভব। সূর্য্য-গ্রহণের সময় কতকটা এইরূপ অবস্থা হয়। চন্দ্র যখন সূর্য্যদেহের উপর দিয়া চলিয়া যায় তখন সূর্য্যদেহের বাহিরের বায়বীয় আবরণটা কতক পরিমাণে চন্দ্রদেহদ্বারা আবৃত হইয়া পড়ে, সেই সময় বর্ণচ্ছত্র লইলে দেখা যায়, কৃষ্ণরেখাগুলি উজ্জ্বলরেখা রূপে পরিণত হইয়াছে কিন্তু তাহা ক্ষণিক। পৃথিবীতে নানা ধাতুপদার্থ দগ্ধ করিলে ঐ ধাতুপদার্থের বর্ণচ্ছত্রের বিশেষ অংশে (যেস্থানে সৌরবর্ণচ্ছত্র কৃষ্ণরেখাযুক্ত) একটি উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহা হইতে বুঝা যায়, সূর্য্যমণ্ডল যে সকল পদার্থের বর্ণচ্ছত্র শোষণ করিয়া রাখে, পৃথিবীতেও সেই সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ইহা হইতে বলিয়া দিতে পারা যায়, সূর্য্যমণ্ডলে কি কি দ্রব্য বায়বীয় অবস্থায় দগ্ধ হইতেছে। পৃথিবীতে নানা ধাতুপদার্থের বর্ণচ্ছত্র, সৌরবর্ণচ্ছত্রের সহিত পর পর সজ্জিত করিয়া, সৌরবর্ণচ্ছত্রের প্রায় সমস্ত কৃষ্ণরেখার স্থানে অপরাপর ধাতুপদার্থজাত বর্ণচ্ছত্রের উজ্জ্বলরেখা

পাওয়া গিয়াছে। বর্ণচ্ছত্রের এই আবিষ্কারদ্বারা বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনীত হইয়াছে।

সৌরবর্ণচ্ছত্রে কেবল সাতটি আলোকরেখা দেখা যায় মাত্র। পণ্ডিতগণ বলেন, এই সাতটি রেখার দুই ধারে অসংখ্য আলোকরেখা রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের চক্ষু ঈথর-সমুদ্রের কয়েকটি কল্পনাকে গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া কেবলমাত্র ঐ বিশেষ সাতটি বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। এই সাতটি রং অসংখ্য রঙের মধ্যাংশ। আমাদের কর্ণ যেমন বিশেষভাবে উচ্চারিত উচ্চ শব্দকে গ্রহণ করিতে পারে, এই নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণের সীমা অতিক্রম করিলে অথবা তাহার নিম্নতর সীমার উচ্চারণ করিলে যেমন আমাদের কান সে শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না, আমাদের চক্ষুও তদ্রূপ ঈথর-সাগরে কল্পিত সীমাবদ্ধ কয়েকটি আলোক-কল্পনকে গ্রহণ করিতে পারে। এই সীমা একদিকে লাল বর্ণের এবং অপরদিকে বেগুনে বর্ণের। বেগুনে বর্ণের সীমা চরমে এবং লাল বর্ণের সীমা নিম্নতমে। অর্থাৎ লালবর্ণ যতগুলি ঈথর-তরঙ্গ-মালায় উৎপন্ন, সেগুলি আরো কম হইলে আমাদের চক্ষু আর গ্রহণ করিতে পারে না, এবং বেগুনে বর্ণের তরঙ্গমালার সংখ্যা অতিক্রম করিলে অপর কোনো আলোক তরঙ্গকেই আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা আমাদের চক্ষুর ধর্ম্ম। আমাদের চক্ষু যে বিধাতাকর্ত্তৃক এইরূপভাবেই সংগঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মানিতেই হইবে যে, আলোক কেবলমাত্র ঐ সপ্তবর্ণে সমাপ্ত নহে; ইহার দুই নির্দ্দিষ্ট প্রান্তে আরো বহু বহু বর্ণের রেখা আমাদের চক্ষে অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। সেগুলিকে দেখিতে হইলে অপর জিনিষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যেমন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপর বেগুনে বর্ণের পরের অন্ধকার আলোকের (Dark ray, ulta violet) কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সেস্থানে অন্ধকার হইলেও তথায় আলোকের কার্য্য দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ রক্তবর্ণের পরবর্ত্তী বর্ণরেখা (Infra Red) গুলিকে তাপমান্ যন্ত্র-যোগে পরীক্ষা করিলে তথাকার আলোক ধরা পড়িয়া যায়। কেমন করিয়া নানা উপায়ে এই অদৃশ্য (Dark rays) বা কৃষ্ণ আলোকরশ্মিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পর প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

দাসের আত্ম-কথা

দেওঘর

২৯শে পৌষ সুরেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। তার পর আরো একমাস বলরামদের ষ্ট্রীটে বাসা রাখা হইল। ফাল্গুন মাসের প্রথমে উপেন্দ্র-সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, এখন রোগ আরোগ্য হইয়াছে, এই সময় বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে ভালো হয়। তাহাতে আমার মনে হইল যখন এত দূর করা হইয়াছে, তখন এটুকুও করা আবশ্যক।

বন্ধু হরিবিহারী সেন যখন "সেন এণ্ড ফ্রেণ্ডেস" নামে টেলার সপ্ খোলেন, তাহার কিছুদিন পরে আমি এই ফারমে বন্ধুবর কালীনাথ রক্ষিতের কথায় বন্ধুদিগের সাহায্যার্থে একহাজার টাকা জমা রাখি। উপেন্দ্রের চিকিৎসার খরচ সেই টাকা হইতে করা হইতেছিল। যখন বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা হইল তখনো কিছু টাকা জমা আছে, সুতরাং সে বিষয়ে আর অধিক ভাবিবার রহিল না, শীঘ্রই দেওঘর যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম।

দেওঘর যাইবার পূর্ব্বে হরিবিহারী ভায়া তথাকার ইস্কুলের হেডমাষ্টার বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ, মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়া আমাদের জন্য একটি ছোট বাসা-বাড়ি স্থির করিয়া দিলেন। সকল বিষয়ে যোগীন্দ্রবাবু ও পাণ্ডা শ্রেণীর একটি যুবক আছে, তাহার নাম নির্ভয়াচরণ, সে ঠিক পাণ্ডার মত নহে, অনেকটা শিক্ষিত ঘ্যাঁসা, নিজে কিছু লেখাপড়াও জানে, হেডমাষ্টার বাবুর ছাত্র, তাহার সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া দিলেন।

আমরা ফাল্গুন মাসের প্রথমেই যাত্রা করিলাম। গেলাম আমরা তিন-জন। আমি, উপেন্দ্র, আর সঙ্গে লওয়া হইল আমাদের প্রতিবাসী শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে—আমরা তাঁহাকে শিবুদাদা বলিতাম। তাঁহারও শরীর একটু খারাপ ছিল এবং আমাদের কিছু সাহায্য করিবেন,—উপেন্দ্রের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিবেন।

আমরা দেওঘরে গিয়া ১২৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি ছোট বাড়ি পাইলাম। বাড়িটি ইস্কুলের খুব কাছে। একেবারে মাঠের মধ্যে না হইলেও বস্তির বাহিরে অনেকটা ফাঁকা মাঠের দিকে সদর রাস্তার উপর। তখন

দেওঘরে এত অধিক বাড়ি-ঘর হয় নাই ; সে ১২৯৩ সালের কথা। ২।৪ দিনে আমাদের অন্যান্য বিষয়েরও বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। আমরা সচ্ছন্দেই সেখানে রহিলাম।

শিবুদাদার উপর বাসার ভার দিয়া আমি অধিকাংশ সময় ইস্কুল বাড়িতেই কাটাইতে লাগিলাম। এই দেওঘর অবস্থান আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, তাহা ক্রমে বলিব। প্রথম দেওঘর ইস্কুলের হেডমাষ্টার যোগীন্দ্রবাবু, যাঁহার নিকট আমরা প্রথমে গিয়া উপস্থিত হই, তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যেন আপনার জন বলিয়া বেশ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলাম। ক্রমে জানিলাম দক্ষিণ রাজপুর-সন্নিকট ন্যাতড়ায় তাঁহার বাড়ি। ডাক্তার নিলরতন সরকার মহাশয়দিগের সহিত কিছু সম্পর্ক আছে। যোগীন্দ্রবাবু নিজেও ব্রাহ্মভাবাপন্ন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি। তার মধ্যে আমি তাঁহার আর একটি ভাব লক্ষ্য করিলাম, তিনি স্বভাবত অত্যন্ত বিনয়ী এবং আত্মগোপনশীল।*

আমি প্রায় দিন রাত ইস্কুলবাড়িতে ও যোগীন্দ্রবাবুর বাসায় কাটাইতে লাগিলাম। ইস্কুলবাড়ি থাকিবার আর একটি কারণ হইল, বাবু চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নামক একটি যুবককে পাইলাম। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের, এখানে তিনি ইস্কুলে থার্ড মাষ্টার। বড় দুঃখের বিষয় যে, সেই দেওঘর ছাড়ার পর, জীবনে আর কখনো তাঁহার দেখা পাইলাম না। তাঁহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাব হইয়া গেল ; কেবল তাহা নহে—সে সময় তিনি যেন আমার জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত দূত-স্বরূপ হইয়া দেওঘরে আমাকে সঙ্গদান করিলেন। অল্পদিন বাদে তিনি প্রত্যহ আমাকে ম্যাট্‌সিনির জীবনী পড়িয়া তাহার অর্থ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া শুনিতে শুনিতে যেখানে শুনিলাম তরুণ যুবক ম্যাট্‌সিনি আপন স্বদেশ ইয়ংইটালীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কালো পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন তাঁহার সহপাঠিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাট্‌সিনি, তুমি এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান কর কেন!" তিনি বলিলেন—"আমার দেশ

* বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসুর বর্ত্তমান অবস্থার কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি এখন স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর-ষ্টেটের একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ঈশ্বর-কৃপায় ধনে মানে বিদ্যায় দশের এবং দেশের মধ্যে এখন তিনি খ্যাতনামা। (দাস)

এখন পরাধীন, আমি যতদিন ইটালীর স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে না পারিব তত দিন আমি এই মৃতাশৌচ-চিহ্ন ধারণ করিব।"

আমি এই বাণীর মধ্যে কি শুনিলাম,—কি বুঝিলাম—তাহা এখন কোন্ ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করিব? বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার যেন আশা পাইলাম? কোন্ নিদ্রিত ভাব জাগ্রত হইল? কিন্তু এখন বৃথা বিনয় প্রকাশ করিয়া কি সত্য গোপন করিব? বিধাতা স্বয়ং যাহা শুনাইয়াছিলেন তাহা কিরূপে অস্বীকার করিব? তাহা গোপন করিলে যদি বিনয় প্রকাশ পায় তাহা আমি জানি না, কিন্তু সেই স্বর্গীয় ভাব যে আমার নিজস্ব সম্পত্তি নয়, সে ধন যাঁহার দেওয়া, তিনি যদি সেই সমাচার আরো দশজনকে ডাকিয়া শুনাইতে বলেন, তবে আমি কি করিব? ম্যাট্‌সিনির সেই কালো পরিচ্ছদ ধারণ-বাক্যে, আমার প্রাণ যে গুরু গম্ভীর গাঢ়-অন্ধকারের মেঘাবরণে ঢাকিয়াছিল, তাহা সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া পড়িল। আমি বুঝিলাম, গভীর বিষয়ের জন্য—মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইরূপে চিরব্রতধারী হইতে হইবে। সে অন্ধকারের কী গাম্ভীর্য্য—অন্ধকারের মধ্যে আবার এত সৌন্দর্য্য? তাহা কাহাকে—কিরূপে বুঝাইব? ভাবের ভাবুক না হইলে যে, সে ভাব কাহাকে বুঝানো যায় না। এই দিনে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইল—আহত হইলাম। দেশের জন্য—স্বজাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে—চিরবৈরাগ্য-ব্রত ধারণ করিতে ভাব ফুটিয়া উঠিল। এই অন্ধকারেই বুঝি বিলাসের হাসি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল!

যোগীন্দ্রবাবুর বাসায় প্রতিদিন প্রার্থনা হইত। তারমধ্যে তিনি দু'একটি সঙ্গীত করিতেন। বিশেষত সঙ্গীত-রচনায় এই সময় যেন তাঁহার শক্তির বিকাশ হইতেছিল। আর তাঁহার যে কবিত্ব শক্তি—যাহার ফল "মাইকেল মধুসুদনের জীবনী" বা মেঘনাদবধকাব্য সমালোচনা তাহাও যেন এই সময় সূচনা হইতেছিল। অমিত্রাক্ষরছন্দে "একাদশ অবতার" একখানি ব্যঙ্গ-কাব্য তাঁহার রচনা এই সময় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আর আমাদের প্রার্থনার মধ্যে সঙ্গীত করিতেন, নীলরতন বাবুর একটি ভগিনী—কুমারী নীরোদা, তিনি তখন তথায় ছিলেন। আমাদের তখনকার সেই সকল প্রার্থনা—প্রাণের সেই অনাবিল স্রোত, সঙ্গীত-তরঙ্গের মধুর প্রবাহে প্রবাহিত হইত। সে সুন্দর স্মৃতি, কিরূপ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তাহা এখন বর্ণনা করা যেন সাধ্যাতীত বোধ হয়।

যোগীন্দ্রবাবুর সঙ্গে গিয়া মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দর্শন করিলাম। তাঁহার পরিচয় আমি আর কি দিব, তাঁহার কথাবার্ত্তা আমি চুপ করিয়া শুনিতাম, আর তাঁহার সেই অপূর্ব্ব 'হাসি' দেখিতাম, তেমন গালভরা কৌমুদী-সিক্ত মধুর হাস্য বুঝি আর কখনো কোথাও দেখি নাই।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু

তারপর তাঁহার পুত্র যোগীন্দ্রবাবুকেও দেখিলাম; আমাদের হেড মাষ্টার বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু, তিনিও যোগীন্দ্রনাথ বসু,—এ কী অপূর্ব্ব সংযোগ, মনোহর মিলন! কিন্তু আজ একজন ইহলোকে আর একজন পরলোকে।

এই মিলনের একটি চিহ্ন এ সংসারে আছে। "ফাদার দামিয়েনের জীবন-চরিত" বাংলায় অনুবাদ করিয়া উভয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রবাবু চিরকুমার ছিলেন ; তিনিও পিতার ন্যায় শান্ত-মধুর প্রকৃতি পাইয়াছিলেন। এমন সুন্দর-শুভ্র-নবীন-কুসুম অসময়ে ঝরিয়া পড়িল! ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে আমি যখন হিমালয়-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম, পথে গিরিডি ষ্টেশনে মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পাইলাম। তিনি দেওঘর যাইতেছিলেন, আমিও যাইতেছি। শুনিলাম, তিনি দেওঘরে যোগীন্দ্র-বাবুর শ্রাদ্ধোপাসনা সারিয়া চুনার যাইবেন,—যোগীন্দ্রবাবুর শ্রাদ্ধোপাসনা! আহা! সেই যোগীন্দ্রবাবু আজ আর ইহলোকে নাই? বহুদিনের স্মৃতি আবার আজ প্রাণে জাগিল ; আমিও উমেশবাবুর সঙ্গে সে উপাসনায় যোগ দিয়া ঋষি যোগীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব চরিত মাধুরী আস্বাদন করিয়া সে দিন নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।

অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত

চৈত্রমাসে গোবরডাঙ্গার বাড়ি হইতে এক পত্র পাইলাম। পত্রখানি আমার তৃতীয় সহোদর শশীন্দ্র লিখিতেছে, "দাদা এইবার আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, সম্প্রতি এখানে কারখানা-পটীতে আগুন লাগিয়া ১৮।১৯টা চিনির কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে। তারমধ্যে আমাদের কারখানা-বাড়ি সমস্ত পুড়িয়া গিয়াছে। নিজেদের সমস্ত গিয়াছে তাতে যতদুর ভাবনা হইতেছে না, যদি অপরের দেনা হইতে হয়, সেইটিই বড় ভাবনার কথা।"

এই সময় ঈশ্বর কৃপা বায়ু-বুঝি এমনই বহিতেছিল। এই ভীষণ সংবাদে আমার মনে তেমন কোনো বিচলিত ভাব আসিল না। ক্ষণকালের জন্য একবার মনে হইল, তবে কি আবার অর্থ-চিন্তা করিতে হইবে! পরক্ষণে মনে হইল, না! তাহা আর সম্ভব নহে। যদি দেনাই কিছু দাঁড়ায়, বরাহ-নগরের বাড়িখানা আছে তো, তাহাই বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। সে বাড়ি না থাকিলে সংসারের বিশেষ এমন কী ক্ষতি হইবে! বরং ভালোই হইবে! ছোট ভায়া যতীন্দ্র ঐ বাড়িতে থাকিয়া একটি স্বতন্ত্র সংসারের সূচনা করিতেছে, সে পথ বন্ধ হওয়াই ভালো। তারপর সংসার আছে- তিন ভাই সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে, যাহা হয় হইবেই। তবে উপস্থিত এক ভাবনা, এত করিয়া উপেন্দ্রকে আরোগ্য করা গেল, এখন হঠাৎ এই সংবাদে যদি তাহার

মনটা ভাঙিয়া পড়ে? এই ভাবিয়া সেই দিন সহসা তাহাকে এ সংবাদ শোনানো হইল না। উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইলাম। এ কথা সে কথার পর প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহাকে এমন কথা বলিলাম, উপস্থিত আমাদের যে বিষয় আশয় আছে, তাহা যদি দৈব ক্রমে নষ্ট হইয়া যায় তবে কি করা যাইবে? তাহাতে উপেন্দ্র উত্তর করিল, কেন যাইবে? আর যদিই যায় তাতে আর ভাবনা কি? আপনি তো আমাদিগকে এখন মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, ভগবান্ যা করেন তাই হইবে।

তারপর দিন কিম্বা আরো একদিন বাদে উপেন্দ্র বলিল,—"দাদা, আমরা যে সর্ব্বস্বান্ত হইব তাহা কি আপনি জানিতে পারিয়াছিলেন? এই দেখুন আমাকে সুরনাথ ভট্টাচার্য্য পত্র লিখিয়াছে, গোবরডাঙ্গার কারখানাপটী পুড়িয়া—আমাদেরও কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম, "হাঁ, আগেই পত্র পাইয়াছিলাম, তাই তোমার মন প্রস্তুতের জন্য ঐরূপ বলিয়া ছিলাম।" ইহার পর দণ্ডীদাদার এক পত্র পাই, তিনি লিখিতেছেন "সমস্তই গিয়াছে, তবে কারখানায় স্থানাভাবে ঘটনার পূর্ব্ব দিন দলুয়া চিনির একশত চুপ্ড়ি বাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আর পোড়ার মধ্যে কতকটা পাওয়া যাইবে, যাহাহউক তুমি শীঘ্র বাড়ি আসিতে চেষ্টা করিবে।"

উপেন্দ্র একপ্রকার সুস্থ হইয়াছে। এখন এখানে গরম পড়িতে আরম্ভ হইল, তা'ছাড়া এই ঘটনা উপস্থিত, সুতরাং আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয় মনে হইল। কিন্তু সহসা একেবারে বাসা তোলা হইল না। শিবুদাদা ইতিপূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কয়েকদিনের জন্য যোগীন্দ্রবাবুর বাসায় উপেন্দ্রকে রাখিয়া আমি একবার বাড়ি আসিলাম।

বাড়ি আসিয়া দেখিলাম, পোড়ার অবশিষ্ট মাল পরিষ্কার করিয়া কলিকাতায় পাঠানো এবং কারখানার কাজ যত শীঘ্র শেষ হয় তাহার চেষ্টা দণ্ডীদাদা করিতেছেন। আমি বাড়ির সকলকে আশ্বাস দিয়া শান্ত করিলাম। প্রতিবাসিগণ যাঁহারা কারখানায় টাকা জমা রাখিয়া ছিলেন, তাঁহারা টাকা পাইবেন বলিয়াদিলাম। অধিকন্তু মাসীমাতাঠাকুরাণীর শরীর অত্যন্ত খারাপ দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কয়েকদিন বাদে পুনরায় দেওঘরে আসিলাম। কিন্তু নানা কারণে আর আমাদের এখানে অধিক দিন থাকা হইল না। বৈশাখ মাসেই আমরা বাড়ি আসিলাম।

শোভা

বরষায় ভরা গঙ্গা কূলে কূলে কূলে,—
পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না-রাশি সৌন্দর্য্য উথলে।
একদিন তরী বাহি' তীর হ'তে তীরে,
ভ্রমিতেছি ভগ্নপ্রাণে উদাস-অন্তরে।
শোভার সৌন্দর্য্য মরি প্রকৃতিতে হাসে,
রজত জ্যোৎস্নায় শোভা দিকে দিকে ভাসে।
সহসা পরাণ কাঁদে সে প্রিয়ের তরে,
প্রিয় হ'তে প্রিয় যিনি ব্যাপ্ত চরাচরে।
অন্তরে-বাহিরে তারে হেরি চারিধার,
সৃষ্টিতে স্রষ্টার শোভা একি চমৎকার!
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাঝে সে রহস্য গাঁথা,
প্রকৃতি-গ্রন্থেতে ওগো অনন্ত বারতা।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

খাঁটুরা ব্রহ্ম-মন্দির

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন (১২৮৫ সাল, ৬ই আষাঢ়) দিবসে এই ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা ধ্যান ধারণা সাধন ভজন হইয়া থাকে। এই উপাসনায় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের অধিকার আছে। খাঁটুরা-নিবাসী পরলোকগত কালীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র, পরলোকগত বৈদ্যনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত, স্বীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং শুভ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, স্বদেশ এবং স্বজাতির মধ্যে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা প্রচারোদ্দেশ্যে ঐকান্তিক যত্ন এবং অর্থব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কতিপয় প্রচারক বন্ধুসহ খাঁটুরায়

আগমন করিয়া স্বয়ং এই মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই দিনে তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এইরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল,—"এই ক্ষুদ্র গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটি সুন্দর সুগঠিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। লোক নাই অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহা স্থাপন করিলেন। এখানে তাঁহার কথামৃত পান করিয়া যদি দুইটি তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা শান্ত হয়, তবে লোক সেই রস আস্বাদ করিবার জন্য আসিবে, প্রভু দয়াময়ের নামে গ্রামের সমুদায় দুঃখ-শোক চলিয়া যাইবে।"

এই মন্দির এক খণ্ড নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমির উপর ফল-পুষ্প-বৃক্ষ-লতা পরিশোভিত উদ্যান-মধ্যে স্থিত। এখানে ৩টি সমাধি আছে। একটি ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ আশের, ইনি তেজস্বী স্বাধীন প্রকৃতির ব্রাহ্ম যুবক, মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্র বাবুর ভাগিনেয় ছিলেন। ১২৯৩ সালের ২৭শে পৌষ তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় শান্তসাধক নববিধান-প্রচারক সাধু কেদারনাথ দের। ইঁহার নিবাস ছিল হরিনাভি গ্রামে। কেদার বাবু যৌবনকালে বিষয়-কর্ম্ম করিতে করিতে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হন। ইনি লাহোরে ভালো চাকরী করিতেন। কিছুদিন বাদে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গী প্রেরিত প্রচারক মণ্ডলী-মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ধর্ম্ম-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত জীবনব্রত পালন করিয়াছিলেন। অন্তিম সময়ে মাসাধিককাল পূর্ব্বে স্ব-ইচ্ছায় মঙ্গলালয়ে আসিয়া তথায় তনুত্যাগ করেন। 'তাঁহার দেহাবশেষ-ভস্ম' যেন এই পবিত্র ব্রহ্ম-মন্দির-ভূমির এককোণে স্থান দান করা হয়, এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া যান। এখানে এমন সাধুর সমাধি স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার যোগপ্রধান ভক্তির জীবন দ্বারা এই স্থানের মহাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

মন্দিরেরসম্মুখে পূর্ব্বাংশে রেলওয়ে লাইন, এবং গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন। পূর্ব্ব-উত্তরাংশে খাঁটুরা, পশ্চিমে গৈপুর এবং দক্ষিণে গোবরডাঙ্গা গ্রাম অবস্থিত। ইহার তিন দিকে মুক্ত প্রান্তর থাকায় স্থানটি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর এবং প্রশান্তভাব-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত। নির্জ্জন সাধন ভজন তপস্যারও বিশেষ অনুকূল।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতে হিন্দু জাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়-কল্পে যে ব্রহ্মোপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান; যাহার মূলে সাধন-ভজন-রস সঞ্চার করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে ব্রাহ্ম-

সমাজকে অধিকাংশের দৃষ্টিগোচর করেন, তৎপরে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন যাহার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া, উদার সার্ব্বভৌমিক ভাবে দেশ-বিদেশে প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভক্ত বিশ্বাসীগণের অভ্যুদয়ে ব্রহ্মোপাসনা-মন্দির বা ব্রাহ্মসমাজসকল প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন সেই ব্রাহ্মসমাজের ভাব, সমগ্র সমাজ এবং সহিত্যে কিপ্রকার অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন।

বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত, ইনি মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সমসাময়িক সহসাধক অনুগত বিশ্বাসী ব্যক্তি। শুনা যায় তাঁহার পূর্ব্বে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গ্রামের কৃষ্ণসখা আশ নামক একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ক্ষেত্র বাবুর পর তাঁহার আত্মীয় আর যে কয়েকটি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া এই ব্রহ্ম-মন্দিরের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার ভাগিনেয় পরলোকগত লক্ষ্মণচন্দ্র আশ মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু বলেন, পিতা বর্ত্তমানে বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকায় মন্দিরের কার্য্যে কোনোরূপে অর্থব্যয় করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দেন।

ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় ৯বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৯৪ সালে গোবরডাঙ্গা-নিবাসী পরলোকগত হারাণচন্দ্র কুণ্ডুর পৌত্র, পরলোকগত গিরিশচন্দ্র কুণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দেশের এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া প্রায় ৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই নির্জ্জন-বাসে সাধন-ভজন করেন। তাঁহার অবস্থানকালে এই মন্দিরের সংলগ্ন স্বতন্ত্র আর একখণ্ড নাখেরাজ ভূমির উপর বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশের ব্যয়ে তাঁহার পিতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে এবং এই দেশের হিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে "মঙ্গলালয়" গৃহ নির্ম্মিত হয়। তৎপরে পরলোকগত ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত, মন্দিরের উত্তরে আর একখণ্ড জমিতে বাসগৃহ প্রস্তুত করেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণান্তর কয়েক বৎসর সপরিবারে এখানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর তাঁহার পরিবারবর্গ এক্ষণে গিরিডি অবস্থিতি করিতেছেন।

খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের সহিত এ পর্য্যন্ত যতগুলি নরনারী সংযুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের কতক পরলোকে, কতক অবস্থান্তরে স্থানান্তরে, আর কেহ বা ভগ্ন শরীরে অপটু অবস্থায় সহরে অবস্থিতি করিতেছেন। এখন

এই মুক্ত প্রান্তরস্থ এই নির্জ্জন স্থান এবং ব্রহ্ম-মন্দিরের উন্নত চূড়া এখানে সেই "শান্তম্ শিবম্ অদ্বিতীয়ং" এর নাম প্রচার করিতেছে। সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার শুভ ইচ্ছা এবং মহাপুরুষের বাণী সফল হইবে, আমরা এখনো এ আশা-বিশ্বাস অন্তরে পোষুন করিতেছি।

সরমা

•০৫০•⁂•০৫০•

(পূর্ব্বপ্রকাশিতাংশের সংক্ষিপ্তসার)

রাজকৃষ্ণ বাবু পেন্‌শন্‌ভোগী ভদ্রলোক, অর্থাভাবজনিত নানা দুশ্চিন্তায় ভগ্নস্বাস্থ্য ও শয্যাগত। পুত্র হরিপদ মূর্খ নহে, এফ-এ পাস, কিন্তু অর্থাভাবে এহেন পুত্রকে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে, কন্যা মেনকা বিবাহ-যোগ্যা হইয়া উঠিতেছে। পেন্‌শনের আয়ে সংসার চলে না। সঞ্চিত অর্থ ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতেছে, ইহার উপর নিজের রোগের খরচ আছে, দুশ্চিন্তার আর বাকি কি? উদ্বেগও কমে না, রোগও সারে না; বিছানায় পড়িয়া তিনি এখন শুধু মরণ-প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কমলা হরিপদর কিশোরী পত্নী, পতিপরায়ণা ও গৃহকর্ম্মরতা। পতি চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান, পত্নী শাশুড়ীর নির্দ্দেশে সকাল সকাল উঠিয়া বেলা নয়টার মধ্যে পতির জন্য চারিটি ভাত রাঁধিয়া দেন, পতির চেষ্টা সফল করিবার জন্য ঠাকুর-দেবতার কাছে মানসিক করেন। চাকরির চেষ্টা সফল হইলে শাশুড়ী যেখানে সওয়া পাঁচ আনার পূজাই যথেষ্ট মনে করেন, অল্প বয়স ও আবেগভরা হৃদয়-বলে বধূ সে-ক্ষেত্রে আগে হইতেই পাঁচসিকার পূজা মানিয়া বসিয়াছেন, শেষে টাকা কোথা হইতে আসিবে, ভাবিয়া মনে মনে বলিতেছেন,—'কেন কানের মাকড়িগুলো তো আছে?' পতির তুলনায় তাহার নিকট অলঙ্কার অতি তুচ্ছ। হরিপদর একটু সোহাগেই কমলা গলিয়া যায় ও মনে করে এ পৃথিবীতে তাহার চেয়ে আর সুখী কে?

হরিপদর চাকরির চেষ্টা একদিন সফল হইল। প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টেলিগ্রাফ আপিসে একটা চাকরি জুটাইয়া হরিপদ বাটীতে যখন সে শুভ সংবাদ লইয়া আসিল, তখন গৃহে একটা আনন্দ ও উৎসাহের সুবাতাস বহিল। কে তখন জানিত এ প্রসাদী ফুলের ভিতরও কাল কীট লুকানো আছে! কেরাণী-জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা হাড়ে-হাড়ে ভুগিয়াও সরকারি আপিস ও পেন্‌শন আছে শুনিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু সুখী হইলেন। কৈলিসী ঝি "মিটুই" খাবার আব্‌দার ধরিল, ভগিনী মেনকা তাহার আদরের বিড়াল ছেনুর জন্য ঘুঙুর কিনিয়া দিতে বলিল, জননীর চিন্তা, 'বাছা কোন সকালে, সেই খেয়ে বেরিয়েছিল সমস্ত দিনটা প্রায় গায়ের উপর দিয়ে গেছে'; হরিপদর চিন্তা, পিতাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করার একবার চেষ্টা করা যায় না কি? হরিপদর সহাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধু প্রফুল্ল একার্য্যে হরিপদর প্রধান সহায়।

প্রফুল্ল ও হরিপদ উভয়ে হরিহরাত্মা। বন্ধুত্বের আকর্ষণ ব্যতীত কৃতজ্ঞতাপাশে উভয়ে উভয়ের নিকট দৃঢ় বদ্ধ। প্রফুল্ল ধনীর সন্তান, অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, বেশভূষায় অনুরাগী, গৌরবর্ণ ও অত্যন্ত সুপুরুষ; সম্প্রতি বি-এ পাশ করিয়া উকিল হইবার জন্য সচেষ্ট। হরিপদর সম্বলের মধ্যে ব্যায়ামপটু সুস্থ ও সবল দেহ। কিন্তু এই একগুণেই একবার যখন নদী পার হইবার সময়

নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল, তখন হরিপদ প্রফুল্লর জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। তদবধি প্রফুল্ল হরিপদর সংসারে ঘরের ছেলের মতো সর্ব্বদাই খোঁজ-খবর লওয়া ও আসা-যাওয়া আছে। দ্বারিক কবিরাজের যোলো টাকা ভিজিট শুনিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু যখন অমন ব্যয়সাধ্য সুচিকিৎসায় রাজি হইলেন না এবং হরিপদও ইতস্তত করিতেছিল, প্রফুল্লই তখন নিজ হইতে হরিপদর মনের ক্ষোভ মিটাইতে অগ্রসর হইল। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে নির্ব্বাক্ হরিপদ ভাবিতে লাগিল, প্রফুল্লর ন্যায় বন্ধু জগতে আর কয় জনের আছে?

যমের সঙ্গে যুদ্ধ সফল হইল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মারা গেলেন। সন্তান জন্মের পূর্ব্বেই জননীর স্তন্যসঞ্চারের ন্যায়, অনুপায়ের উপায় শ্রীহরি, ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই হরিপদর একটি চাকরি জুটাইয়া দিয়াছিলেন তাই রক্ষা। যাহাহউক সংসারে আবার দৈন্যদশা বাড়িল, এই-রূপই প্রায় ঘটিয়া থাকে। জীবনে সুখের ক্ষণপ্রভার পরেই দুঃখের অন্ধকারটা যেন ঘোরতর হইয়া প্রকাশ পায়। ইহারই ভিতর কোনোরূপে ভগ্নী মেনকার বিবাহ হইয়া গেল। এ দুঃখ-দুর্দ্দিশারদিনে হরিপদর সংসার-তরণীতে প্রফুল্লই একমাত্র কাণ্ডারী।

সংসারে সুখ দুঃখ কিছুই স্থায়ী নহে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; অনেক দেখিয়া শুনিয়া দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে ঘটিলও তাহাই। একদিন এক অচিন্ত্য উপায়ে হরিপদর চাকরিতে অভাবনীয় উন্নতি হইল। একদিন এক ঘোড়া ক্ষেপিয়া গিয়া কলিকাতার জনাকীর্ণ রাজপথে গাড়ি লইয়া বেগে দৌড়াইতেছিল, কিন্তু হরিপদর বলবীর্য্যে আরোহীদের জীবন রক্ষা হইল! গাড়ির ভিতরে বড়দরের সাহেব মেম ছিলেন, ইঁহাদের প্রসাদে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হইয়া, হরিপদ বড় সাহেবের সুনজরে পড়িল এবং অল্পদিন মধ্যেই তিন বৎ-সরের এগ্রিমেণ্টে রেঙ্গুনে দেড়শো টাকা বেতনের একটি চাকরি পাইল। ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীর ৫০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ এবং দুদিন যাইতে না যাইতেই দেড়শো টাকার চাকরি! হইলই বা বিদেশ, ইহাকেই বলে সৌভাগ্য ও পদবৃদ্ধি।

প্রেয়সীকে কাঁদাইয়া, জননী ও ভগিনীর চোখের জল না মানিয়া বন্ধু প্রফুল্লর উৎসাহ ও আশ্বাস-বাণীতে বুক বাঁধিয়া, করুণ বিদায়-দৃশ্যের মাঝে হরিপদ বিদেশে চলিয়া গেল।

উকীল প্রফুল্লরও এখন খুব নামডাক ও আর্থিক উন্নতি। হরিপদর সংসারে প্রফুল্লই এখন একমাত্র অভিভাবকস্বরূপ; এ কার্য্যটা সে ভালোরূপেই আরম্ভ করিয়াছিল। সে কোনো দিনই ব্যয়ে কাতর নহে, নিজের খরচের টাকা হইতে খরচ পত্র করিয়া জানায়, হরিপদর প্রেরিত টাকা হইতেই সব হইতেছে। গৃহাদির জীর্ণসংস্কারসাধন, মেনকাকে লইয়া চিড়িয়াখানা, যাদুঘর প্রভৃতি মাঝে মাঝে দেখাইয়া আনা, এমন কি মেনু ও কমলার জন্য চুড়ি আংটি প্রভৃতি মূল্যবান্ অলঙ্কার অবধি ক্রয়, এইভাবে ঘনিষ্ঠতা দ্রুত বাড়িয়া চলিল। মাঝে মাঝে সে ঐখানেই আহার করিত; এবং দু' একটা বর্ষার রজনীতে রাত্রিবাস জন্যও হরিপদর জননী-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে সে তাহা হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিত। উহার শুইবার মতো ভালো ঘরটি কিন্তু কমলারই শয়নকক্ষ সংলগ্ন, তবে মাঝের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলে দুটা সম্পূর্ণ পৃথক কক্ষই হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্বাসী হৃদয়ে সন্দেহের স্থান নাই। অসতর্কা জননীর কথামতো রাত্রিবাসে সম্মত হইলে জননী ও বধূ উভয়ের মাঝখানের এই ভালো ঘরটিতেই প্রফুল্ল শুইতে পাইত।

এই অতি বিশ্বাসের পরিণাম হরিপদর সর্ব্বনাশ ও প্রফুল্লর পতন। কমলার রূপ-বহ্নিতে প্রফুল্ল-পতঙ্গ আকৃষ্ট হইল এবং নানা ঘটনায় ও চেষ্টায় শেষে হরিপদর হৃদয়মণি একদিন পাপিষ্ঠের হস্তগত হইল। কমলা প্রথমে একদিন জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, কিন্তু মরণের কষ্ট দেখিয়া সে-সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। তার পর আর একদিন থিয়েটার দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে পিপাসার্ত্ত হইলে, সোডা লেমনেড ভাবিয়া অজ্ঞাতসারে প্রফুল্ল-প্রদত্ত সুরা পান করিয়া উন্মত্ত হয় এবং সেই কালনিশিতেই প্রফুল্ল কমলার দেহ এবং হৃদয়েরও প্রভু হইয়া দাঁড়াইল। কমলা দেখিল এখন প্রফুল্ল বই তাহার আর গতি নাই। তাই একরূপ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখন হইতে হরিপদর কমলা, সর্ব্বতোভাবে প্রফুল্লরই হইয়া দাঁড়াইল!

এদিকে বর্ম্মা হইতে হরিপদ তাহার উপন্যাস-তুল্য মনোরম বিচিত্র প্রবাসকাহিনী অন্তরের বন্ধু ভাবিয়া প্রফুল্লকে উপহার দিতেছে। জরিপের কাজে ও টেলিগ্রাম লাইন বসাইবার জন্য হরিপদকে সাহেবের সঙ্গে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। পত্রে কত শীকারের কথা, বিপদে পড়িবার কথা এবং বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের কথা। পড়িতে অন্যের আনন্দ হইতে পারে কিন্তু জননী ও সহধর্ম্মিণী প্রভৃতির ভাবনা বাড়িবে মাত্র। তাই হরিপদ বাড়িতে সে পত্র শুনাইতে নিষেধ করিল; সাধ করিয়া নিজের লোকের মন হইতে আপনাকে দূরে রাখিল। পত্র লিখিতেও নিষেধ করিয়াছে, কারণ সে-জঙ্গলের মধ্যেও নিত্য-নূতন ঠিকানায় পত্র বিলির সম্ভাবনা নাই, তবে টেলিগ্রাম লাইন খাটানো হইতেছে সুতরাং 'তার' করিলে তাহা পাইবে।

হরিপদর অসুবিধায় আজকাল প্রফুল্লর সুবিধা। কিছুদিন বাদে মেনকা শ্বশুরবাড়ি গেলে মেনকার মাতা, হরিপদ ও মেনকা উভয়েরই অদর্শনে ভাবিয়া ভাবিয়া পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। শুশ্রূষা ব্যপদেশে প্রফুল্লর নিত্য রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত প্রায় পাকা হইয়া গেল, এবং কমলাই এখন এ কার্য্যে প্রধান সহায় ও উদ্যোগী। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, শ্বশুরবাটীতে বিসূচিকা-রোগে মেনকার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। মেনকার মাতা আরো বুকভাঙা হইয়া পড়িলেন। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাইল, তিনি এখন অন্যের বাড়িতেই অনেক সময় কাটান। ইহাতেও প্রফুল্ল ও কমলার পতনেরই সুবিধা হইল। হরিপদকে 'তার' করাতে উত্তর আসিল, সে এখন ছুটি পাইতেছে না, কিছুতেই আসিতে পারিবে না। প্রফুল্লকে আরো বেশী করিয়া বাড়ির তত্ত্ব লইতে অনুনয় বিনয় করিয়াছে। হায়! পাপের পথে সুবিধা করিয়া দিয়া ভগবান্ কি ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষারই সৃষ্টি করেন!

ক্রমে পাপবৃক্ষে ফল ধরিল,--কমলা অন্তর্ব্বত্নী হইল। গঙ্গার ঘাটে, মেয়েদের কমিটিতে এ বিষয়ের খুব জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। সরকার গিন্নি অর্থাৎ হরিপদর জননী স্নান করিতে আসিয়া সে সব শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন ও প্রমাদ গণিলেন। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে একটা সোজা উপায় মনে পড়ায় বলিলেন,—"তার আর হয়েছে কি? হরিপদ যে মাঝে বাড়িতে এসেছিল।" অনুগতা ও নানা ভাবে উপকৃতা ফুলীর মা ইহাতে সাক্ষ্য দিয়া সকলের মুখে একরকমে চাপা দিল। রামীর মা কতকটা শ্লেষপূর্ণভাবে, 'ছেলে হ'লে খুব ঘটা করিয়া সামাজিক বিতরণে'র পরামর্শ দিয়া উদ্ধারের আর একটা উপায় দেখাইয়া দিল ও সে মেনকার মার দলে ভিড়িতে সম্মত আছে ইঙ্গিতে জানাইল। কমিটির হাত হইতে কোনোরূপে উদ্ধার পাইয়া তিনি যখন বধূকে তিরস্কার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সমস্তই স্বীকার করিল ও বেদনা-কাতরস্বরে বলিল,—"মা আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি, না হয় আফিং খেয়ে মরূচি, একবার জলে ডুবে মরতে গেছলুম, মরণ হয় নি।" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মেনকার মা প্রথমে কিছুক্ষণ "আমার মেনুরে" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলেন, তারপর কোনোরূপে পাপকাজটি চাপিয়া যাওয়াই এখন সব দিকে শ্রেয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন! কমলাকে কিছু করিতে নিষেধ করিলেন ও মনে মনে বলিলেন, "হরিপদকে কোনোরূপে বোকা বুঝাইয়া এখন ভালোয় ভালোয় বউমাকে হরিপদর হাতে দিয়া কাশী যাইতে পারিলে প্রাণটা জুড়ায়—এ পাপের সংসারে আর না—বাবা বিশ্বেশ্বরের পায়ে মাথা রাখিয়া জীবনের শেষ দিন ক'টা কাটিয়ে দিতে পারিলেই বাঁচি।" যথাকালে কমলার একটি পুত্র সন্তান হইল এবং মেনকার মা'র আদর-যত্ন লাভেও সে বঞ্চিত হইল না। সমাজও অনুকূলভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিল!

লোক জানাজানির ভয় করিতে গেলে, প্রফুল্লর সহিত স্পষ্ট বিবাদ করা চলে না। মেনকার মা অতঃপর যেন কিছু দেখিয়াও দেখেন না, প্রফুল্লর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন, তাহাকে দেখিলে শিহরিয়া উঠিতেন ও ঘৃণায় সরিয়া যাইতেন। পাপ-স্রোত অবাধ-

গতিতে চলিতে লাগিল। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি এবং প্রায়শ্চিত্তই বা কি, ইহাই হইতেছে ঘোরতর সামাজিক সমস্যা।

সরমা প্রফুল্লর সহধর্ম্মিণী, আদর্শ সতী লক্ষ্মী। নিজেকে যেন বিলুপ্ত করিয়া দিয়া—অথচ সংসারের সারভূত ও প্রাণস্বরূপ হইয়া বিরাজ করেন। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা অননুভবের মতো সুখের দিনে এরকম সতীর সমাদর সকলে বুঝে না, প্রফুল্লও বুঝে নাই। পাপিষ্ঠ প্রফুল্ল এখন পাপের মাদকতায় উন্মত্তবৎ। উপেক্ষিত সরমার নীরব মর্ম্মবেদনা তাহাকে বিচলিত করে না। শ্যালিকার বিবাহ-উপলক্ষ্যে, নিমন্ত্রণ খাইতে যাইয়া একবার মাত্র শ্বশুরমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই কমলার ধ্যানে বিভোর হইয়া প্রফুল্ল চলিয়া আসিল। সে আজকাল মদ ধরিয়াছে, কমলাকেও একটু আধটু শিখাইয়াছে! পাপ-স্রোতে গা ভাসাইয়া ক্রমে সে স্বাস্থ্য হারাইতেছে, ওকালতিতে ভালো করিয়া মন দেয় না। তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার পিতা, শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন তাহার উপর ক্রমশ বীতরাগ হইয়া পড়িতেছেন। সে এ সব গ্রাহ্যও করে না। পতির এ ভাবান্তর সতীর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, কিন্তু প্রফুল্লর কথামত তিনি উহাকে প্রথমে শারীরিক পীড়া বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন এবং ঔষধ সেবনেও অমন দশা শুনিয়া, মন ভালো থাকিবে বলিয়া নিজেই জেদ করিয়া সর্ব্বদা হরিপদর তত্ত্ব লইবার জন্য তাহাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। প্রফুল্ল কি তখন জানিত যে সত্য সত্যই একদিন রোগ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রতারিতা সতীর সাহায্য ও আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইতে হইবে। তাহার সে ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের দিন এখনো সমাগত হয় নাই। পাপ চারপো হইলেই আপনি ফলে। যাঁহার জন্য এতদিন অকল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এখনো সে তাঁহাকে অপমানিত করিয়া দূরে খেদাইয়া দেয় নাই। হতভাগ্য এইবার সত্য সত্যই তাহা করিল।

একদিন কৈলিসী ঝি আসিয়া সরমাকে সব কথা শুনাইয়া গেল। পতির পতনে পত্নীর অসহনীয় কষ্ট অনুভবের বিষয় বর্ণনার নহে। যাহা হউক পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া সতী পতিকে রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহাকে যদি ভালো না লাগে, তবে আর একটি বিবাহ করিবার জন্য প্রফুল্লকে পরামর্শ দিলেন। পায়ে ধরিয়া সরমা যখন অনুনয় করিলেন, কমলাদের ওখানে আর যেন যাওয়া না হয়, তাঁহার সে শুভ চেষ্টার প্রতিদানস্বরূপে পদাঘাতে প্রত্যাখ্যাতা হইলেন মাত্র। সরমা রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, সরমা চিরদিন প্রফুল্লরই রহিল, প্রয়োজন হইলে স্মরণমাত্র আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রফুল্ল ইহাতে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত বা লজ্জিত হইল না, মনে মনে বলিল, —"পাপ বিদায় হইলেই বাঁচি।" পাপ চারি পোয়া পূর্ণ হইল। অতি ভীষণভাবে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

অনেক চেষ্টার পর অর্দ্ধেক মাহিনাতে তিন মাসের ছুটি পাইয়া কত সুখের ছবি বুকে বাঁধিয়া হরিপদ ঘরে আসিবার জন্য জাহাজে উঠিল। কি জানি কেন এ সংবাদ সে কাহাকেও পূর্ব্বে দিল না, সারা পথ সুখ-স্বপ্নে বিভোর থাকিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে সহসা স্ব-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিপদর এই হঠাৎ আগমনে তাহার মাতার প্রাণটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল, কমলারও বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। দালানে ঢুকিতেই হরিপদ দেখিল, একটি সুন্দর শিশু দোলাতে নিদ্রা যাইতেছে। "কাদের ছেলে" জিজ্ঞাসা করিলে মাতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, পুত্রটি তাহারই; শুনিয়া হরিপদর মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। এই পুত্র-জনন সংবাদটা যদি পূর্ব্বেই 'তার' করিয়া জানানো হইত তাহা হইলেও সব দিক রক্ষা হইত কি না সন্দেহ। ঘরে ঢুকিয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য পালঙ্কে বসিয়া হরিপদ যেমন বালিশটি টানিয়া লইল, অমনই প্রফুল্লর নামাঙ্কিত একটি আংটি বাহির হইয়া পড়িল, দেখিয়া তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ও আংটিটি সে নিকটে রাখিয়া দিল। মাতা জলখাবার আনিয়া দিলেন। হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "বড় ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো দেখ্‌ছি—ও ঘরে কে থাকে?" যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে মাতা উত্তর দিলেন, "প্রফুল্ল কোনো দিন ঘরে যেতে না পারিলে ঐ ঘরটিতে শুইত।" হরিপদ কয়

দিন অনাহারী, পথশ্রমে পরিশ্রান্ত, শীঘ্র শীঘ্র মাথায় একটু জল দিয়া একমুঠো খাইয়া লইবার জন্য মাতা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরিপদ স্নান করিতে করিতে কমলার হাতে বহুমূল্য সোনার চুড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, ও চুড়ি কার, কে দিয়েছে?"—"সংসার-খরচের জন্য তুমি যে টাকা পাঠা'তে, খরচ-পত্র করে যা বাঁচত, প্রফুল্ল তা থেকে বউমাকে ঐ চুড়ি গড়িয়ে দিয়েছে। পাপাচরণের অঙ্কুরে যে কথাগুলি বলিয়া প্রফুল্ল তাহার পাপ অভিপ্রায় গোপন করিতে গিয়াছিল, আজ পাপের ফল ফলিবার সময় তাহার সেই কথাগুলিই তাহাকে যেন ধরাইয়া দিল। অপরাধিনী কমলা হরিপদর সহিত আগে হইতেই কথা কহিতে পারিতেছিল না; এবং সন্দেহ-বিষদিগ্ধ হরিপদও তাহাকে যেন দেখিয়াও দেখিতেছিল না। আহারান্তে সে মনে মনে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল এবং ট্রাঙ্ক হইতে কয়েকটি আবশ্যকীয় দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়া, "বড় জরুরি কাজে বারাকপুরে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যেতে হবে, না গেলে অনেক টাকা ক্ষতি হবে, রাত্রিতে আজ আসতে পারব না" বলিয়া তখনই বাহির হইয়া গেল। কমলা ভাবিল, 'প্রফুল্ল এলে আজই, যা হয় একটা বিহিত করিতে হইবে।'

বলা বাহুল্য রাত্রিতেই হরিপদ ফিরিয়া আসিল। বাগানের দিকের জানালার রন্ধ্র দিয়া লুকাইয়া সে দেখিল,—প্রফুল্ল পালঙ্কে বসিয়া আছে এবং কমলা কাতরভাবে তাহাকে কি বলিতেছে। হরিপদ এবার উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া কমলার কক্ষদ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। "করিস্ কি করিস্ কি বাবা" বলিয়া হরিপদর মাতা দৌড়িয়া আসিলেন. ভাঙা জানালার গরাদে খুলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি প্রফুল্লকে বাহির করিয়া দিল। শব্দ শুনিয়া হরিপদ বুঝিল তাহার শীকার বুঝি বা হাতছাড়া হয়। মাকে হিঁচড়িয়া টানিয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া দ্বারে শিকল টানিয়া দিল। কমলার ঘরের দরজায়ও ঐরূপ শিকল দিয়া সে প্রফুল্লর অনুসন্ধানে ছুটিল। হরিপদর মাথায় এখন খুন চাপিয়াছে, কিন্তু বিধাতা তাহাকে নরহত্যা স্ত্রীহত্যার দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন ও অন্য ভাবে অপরাধীদলের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করিলেন। প্রফুল্ল স্ব-গৃহে পলাইয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইল এবং অনুসরণকারী হরিপদর বিকট চীৎকার গালাগালি ও মর্ম্মান্তিক অভিশাপ-বাণী "যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি ভগবান্ থাকেন, তবে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইখানেই হ'বে" শুনিতে শুনিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই আকস্মিক মানসিক চাঞ্চল্যের পরিণামস্বরূপ সেই রাত্রিতেই সে উৎকট জ্বরাক্রান্ত হইল। এই জ্বরের পরিণাম ক্রমশ রক্তবিকৃতি এবং উহা হইতে শেষে গলৎকুষ্ঠ রোগ হইয়া প্রফুল্লকে একেবারে পঙ্গু ও সম্পূর্ণরূপে পরাধীন করিয়া ফেলিল। হরিপদর অভিশাপ ভীষণভাবেই হাতে হাতে ফলিয়া গেল। এই দুর্দ্দিনে সরমার দেবী মূর্ত্তি আরো প্রকটিত হইল। পূর্ব্ব-পরিত্যক্তা সরমারই সাহচর্য্যে এখন প্রফুল্লর দিন কাটে এবং অহর্নিশি সেই সতী সাধ্বীর শুশ্রূষা, ধর্ম্ম কথা ও সান্ত্বনা-বাক্যে প্রফুল্লর জীবন কথঞ্চিৎ শান্তিময় হয়।

প্রফুল্ল হাত ছাড়াইল দেখিয়া হরিপদ বাড়ি ছুটিল। শিশু-সমেত কমলাকে হত্যা করাই উহার বাসনা। সংকল্পে বাধা না পাইলে আজ সে মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহা আর করিতে হইল না, বৃদ্ধা জননী তখনো মূর্চ্ছিতা হইয়াই পড়িয়া আছেন। কমলাকে কিন্তু সে খুঁজিয়া পাইল না, সেও তাহার সেই ছেলেটিকে লইয়া ভাঙা জানালা দিয়া পলাইয়াছে। বাগানের ভিতর অনেক খোঁজ করিল, কিন্তু অন্ধকারে সে চেষ্টা সফল হইল না।

ঘাটে বসিয়া হরিপদ নানা কথা ভাবিতে লাগিল, জলের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া তাহার মাথা অনেকটা শীতল হইয়া আসিল, উত্তেজনার পর একটা অবসাদ দেখা দিল, হাতের পিস্তলটা সে ফেলিয়া দিল। হতাশ হৃদয়ে ব্যথিতপ্রাণে সে সেখান হইতে উঠিল, গৃহে আর ফিরিল না। এখন জীবন তাহার নিকট লক্ষ্যহীন, সংসার শূন্যবৎ।

হরিপদর জননীরও আর বেশী দিন স্ব-গৃহে বাস করা ঘটিল না। তিনি প্রচার করিয়া দিয়া

ছিলেন, হরিপদ আসিয়া বউমাকে লইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ হরিপদকে আসিতে দেখিয়াছিল; সুতরাং একথা সকলে বিশ্বাস করিল। এদিকে এক বিপদ ঘটিল, বাটীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। ভূতনাথ নামে পাড়ার এক দুষ্ট ছেলে হরিপদদের পুকুর থেকে রাত্রিতে মাছ চুরি করিত, উহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া ভূতের ভয়ের সৃষ্টি হইল; সেও সর্ব্ব প্রযত্নে ইহা জাগাইয়া রাখিল। রাত্রিতে আসিয়া হরিপদর বাটীর মধ্যে ঢিলটা আসটা ফেলিত, মাঝে মাঝে নাকিসুরে এমন করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি করিত যে দূরের লোকেও তাহা শুনিতে পাইত। একদিন পাড়ার এক যুবক প্রচার করিয়া দিল, সে কলিকাতায় জাহাজের আফিস হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, যে জাহাজে হরিপদ সস্ত্রীক রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছিল, পথিমধ্যে তাহা ডুবিয়া গিয়াছে—ইহা নাকি খবরের কাগজেও বাহির হইয়াছে। রমণী-মহল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অনেক পুরুষেরও বিশ্বাস হইল, হরিপদ ও তাহার স্ত্রীর প্রেতাত্মা আসিয়া বাড়ি দখল করিয়াছে। শেষে এমনই হইল, যে এই ভূতুড়ে বাড়ির কোনো খরিদদার অবধি না পাইয়া সমস্ত তৈজস-পত্রাদি অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন তাহা লইয়াই হরিপদর জননী ছয়ক্রোশ দূরে তাঁহার এক বিধবা ভগিনী বামুনদিদির বাটীতে যাইয়া একদিন উপস্থিত হইলেন। নিঃসহায় দরিদ্র হিন্দুরমণীর পুণ্য জীবনের আদর্শ কি, বামুনদিদিকে দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। রন্ধন-নৈপুণ্য, শিল্পচাতুর্য্য, অক্লান্ত পরিশ্রম-শক্তি, পর-সেবা ও প্রফুল্লচিত্ততার গুণে তিনি সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পাড়ার সকলেরই তিনি বামুনদিদি—তাঁহাকে না পাইলে কাহারো কোনো কাজ ভালো করিয়া চলে না। এ হেন বামুনদিদির আশ্রয়ে হরিপদর জননী কিছু কাল কাটাইতে না কাটাইতেই একদিন সর্পাঘাতে বামুনদিদির জীবন শেষ হইল এবং উত্তরাধিকারিণীরূপে হরিপদর জননীই তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজ ঘরখানি আরো পাকাপাকিরূপে ভূতুড়ে বাড়ি ও পোড়ো বাড়ি হইয়া পড়িল।

হরিপদ নৌকা করিয়া আসিয়াছিল এবং ঘাটেই তাহার নৌকা বাঁধা ছিল। ঘর ছাড়িয়া সে উদাসমনে সেই পথ ধরিল। পথে যাইতে যাইতে অন্ধকারে কাহার দেহ পায়ে ঠেকিল, দেশালাই জ্বালিয়া দেখে, কমলা শিশু-সন্তানটিকে বুকে লইয়া অচেতনাবস্থায় পড়িয়া আছে। কমলা যেন মরিয়াও তাহার পদাশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। হরিপদ দেখিল, কমলা মরে নাই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। তাহাকে দেখিয়া তাহার মন এখন আর জীঘাংসায় ভরিয়া উঠিল না, প্রত্যুত সে মুখ দেখিতে দেখিতে কতদিনের কত সুখ-দুঃখের কথা মনে উঠিয়া কেমন একরূপ করুণায় তাহার হৃদয় যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুজনে মিলিয়া সুখের নীড় রচনা করিতে গিয়াছিল, যাহার দোষেই হউক তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হরিপদর ভবিষ্যৎ এখন কী অন্ধকারময়! কিন্তু কমলারও কি কিছু কম! কমলা এখন আর তাহার কেহই নহে সত্য, কিন্তু উহাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়াই কি তাহার সহিত এতদিন একত্র বাসের উপযুক্ত পুরস্কার! কি করা উচিত বুঝিতে না পারিয়া কমলাকে সে তাহার নৌকাতে তুলিয়া লইল।

জ্ঞান হইলে, হরিপদর শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ও শান্ত স্বর শুনিয়া কমলা আশ্বস্ত হইল। তারপর নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া হরিপদর পায়ে লুটাইয়া পড়িল ও জানাইল এখন সে হাসিমুখে মরিতে প্রস্তুত। প্রথমে সে ভুল করিয়া শিশুটির মায়ায় পড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, এখন তাহাকে হরিপদর চরণে রক্ষা করিয়া সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে সম্মত, আর সে পলাইবে না। তাহার কোনোরূপ দণ্ডবিধানেই হরিপদকে এখন আগ্রহহীন, ও তাহার সম্বন্ধে উদাসীন দেখিয়া সে পুনরায় সকাতরে অনুযোগ করিল, তবে পথে যখন চেতনা হারাইয়া সে পড়িয়াছিল, কেন তাহাকে তুলিয়া আনা হইয়াছিল। শৃগাল কুকুরে দয়া করিয়া যে সেই রাত্রিতেই তাহার সকল জ্বালা জুড়াইত। কমলা হরিপদকে আর একটি বিবাহ করিয়া পুনরায় সংসারী হইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং দাসীরূপে একটু আশ্রয় পাইবার জন্য ও

উহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। হরিপদ স্বীকৃত হইল, তাহার সব অপরাধ সে ক্ষমা করিয়াছে। তারপর তখনো তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছো. আমার উপায় কী কোরবে?" হরিপদ একটু ভাবিবার সময় চাহিয়া কমলাকে শুইতে বলিল। কমলা নিদ্রিতা হইলে হরিপদ স্থির করিল, নিকটেই কমলার মাতুলালয় উহাকে কিছুদিনের জন্য তথায় রাখিয়া শীঘ্রই সে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। কমলাকে ক্ষমা করিলেও, তাহার শিশুপুত্রটিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে কিছুতেই সে পারিয়া উঠিতেছিল না।

নিদ্রাভঙ্গের পর কমলা দেখিল, হরিপদ চলিয়া গিয়াছে। মাঝি একখানি চিঠি দেখাইয়া বলিল বাবু তাঁহাকে তাঁহার মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন এবং ভাড়া ও চুকাইয়া দিয়াছেন। চিঠিতে লেখা ছিল বটে হরিপদ দু'চার দিনের ভিতর আসিয়াই পুনরায় তাহাকে লইয়া যাইবে কিন্তু কমলার মন ইহাতে প্রবোধ মানিল না, সে বুঝিল এইরূপে একটা আশ্রয় দেখাইয়া পতি তাহাকে সম্ভবত পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তথাপি তাঁহার পুনর্দ্দর্শনাশা সে একেবারে ছাড়িতে পারিল না।

কমলা ভাগ্যদোষে আজ সতীত্বের আদর্শ-বিচ্যুতা, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্ববিষয়েই পতিতা বা হৃদয়হীনা নহেন। এই বিষম বিপদ-সময়ে যখন সে নিজেই আশ্রয় অন্বেষণ চিন্তায় বিহ্বলা, তাহার উপর দিয়া এক অগ্নি পরীক্ষা হইয়া গেল। কমলা উদাসহৃদয়ে নদী পানে চাহিয়া সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবানকে ভাবিতেছিল, সহসা নৌকার অনতিদূরেই একটি নিমজ্জমান বালককে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং দাঁড়ি-মাঝিগণের সাহায্যে তাহার উদ্ধারসাধনে ও ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইলেন, হাতের চুড়ি একগাছি খুলিয়া ডাক্তারের ভিজিট দিলেন। প্রফুল্ল-প্রদত্ত অলঙ্কারের এইরূপে এক সদ্ব্যবহার হইল। নিরাশ্রয় অবস্থাতেও আর এক জনকে রক্ষা করিয়া ও আশ্রয় দিতে সাহসী হইয়া অচিন্তনীয় উপায়ে নিজেরই এক মহদাশ্রয় লাভের পথ পরিস্কৃত করিল। ভগবানই যেন কমলার উদ্ধারার্থ বালকটিকে পাঠাইয়া দিলেন।

বালকটি বিলাসপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল রায় চৌধুরী মহাশয়েরই একমাত্র পুত্র; কিশোর বয়স, আবেগভরা হৃদয়, সর্ব্বগুণে গুণবান্ ও সর্ব্ব সৌভাগ্যের অধিকারী; তাহার নাম সরল প্রকৃতিও সরলতায় পূর্ণ; কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই দুটি প্রাণী যেন কত জন্মের ভাই-ভগিনীর ন্যায় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কমলার নৌকা ক্রমে গন্তব্য স্থলে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু মাঝি ঘুরিয়া আসিয়া নিদারুণ সংবাদ দিল তাঁহার মাতুল বহুকাল হইল বাস উঠাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন, কেহ তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা বলিতে পারিল না। এদিকে নিরুদ্দিষ্ট সরলের অন্বেষণে দেশ তোলা-পাড় হইতেছে, ও কোনো স্থানেই সন্ধান না মিলায় জমিদার-সংসারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কমলার কৃপায় এই নিরানন্দ সংসারে পুনরায় আনন্দের আবির্ভাব হইল; চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরী-গৃহিণী পিতামাতার ন্যায় তাঁহাকে নিজ সংসারে আশ্রয় দিলেন। হরিপদর অন্বেষণভারও ইঁহারা নিজ হাতে লইলেন। নিতান্ত আপনার লোকের মত হইয়া সুখের সংসারে দিন কত কমলার অতি সুখেই কাটিল; কিন্তু তাহার ভাগ্যে বেশী দিন এ সুখ সহিল না। কিছুকাল পরে ভগ্ন-স্বাস্থ্য চৌধুরী মহাশয়, বায়ু-পরিবর্ত্তন ও সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ-দর্শন-জন্য সস্ত্রীক বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কালীশঙ্কর চৌধুরী। ইনি ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতেন। ইঁহার সংসার চৌধুরী মহাশয়দের সংসারের ঠিক বিপরীত—নানা দোষ ও অশান্তির আগার। অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে; পত্নী, কন্যা মুখরা, পুত্র তারানাথ উচ্ছৃঙ্খল ও দুশ্চরিত্র,

ও সকলেরই হৃদয় অত্যধিক পরিমাণে ঈর্ষা দ্বেষ স্বার্থপরতা প্রভৃতিতে পূর্ণ। তথাপি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া, বিদেশ-যাত্রার আগে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। এই এক অছিলা পাইয়া চৌধুরী মহাশয় চলিয়া যাইতে না যাইতে ইঁহারা আসিয়া বাটী দখল করিয়া বসিলেন এবং সংসার গুছাইতে গিয়া চৌধুরী মহাশয়ের সোনার সংসার ওলট-পালট করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জমিদারি দেখিবার জন্য সরলকে স্থানান্তরে পাঠনো হইল। অতিথিশালা উঠাইয়া দিয়া নিত্য এক মণ চাউল খরচ বাঁচানো হইল! কত দরিদ্র ছাত্র সাহায্য পাইয়া লেখা পড়া করিত; এ অনাবশ্যক ব্যয়টা বন্ধ হইল; মিতব্যয়িতার চূড়ান্ত দেখাইবার জন্য পুরাতন ঝি-চাকর সব ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই ঝড়ের মুখে কোথাকার-কে কমলাও আশ্রয়ান্তর দেখিতে বাধ্য হইল। বৃদ্ধ গঙ্গাধর পুরোহিত এ বিপদের দিনে তাহাকে আশ্রয় দিলেন।

কমলার উপর দুশ্চরিত্র তারানাথের পাপ-নজর পড়িয়াছিল। একদিন এক জাল টেলিগ্রাম আসিল, হরিপদ লিখিয়াছেন.—সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে রহিয়াছেন, কমলার সহিত একবার দেখা হইলে সুখী হ'ন।

জরুরি টেলিগ্রাম পাইয়া কমলার কাতরতায় বৃদ্ধ গঙ্গাধর অস্থির হইয়া উঠিলেন। চৌধুরী মহাশয়েরই প্রজা নবীন মণ্ডল নামে তাঁহার একজন পরিচিত ব্যক্তি সেই রাত্রিতেই নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইতেছে শুনিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া কমলাকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেন।

তারানাথ ও তাহার উপযুক্ত বন্ধু বিনয় ডাক্তার কমলা-সম্বন্ধে সব খবর রাখিতেছিল। বলা বাহুল্য তাহারাই এই টেলিগ্রাম পাঠাইবার মূল। মাঝিকে হাত করিয়া রাত্রির অন্ধকারে বিনয় ডাক্তার পথেই সেই নৌকায় উঠিল; নিজের ডাক্তারি বিদ্যা-প্রভাবে নিদ্রিত সকলের চেতনা লোপ করিয়া নবীন মণ্ডলকে জলে ফেলিয়া দিল. মাঝির হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বুঝাইল, কমলাকে লইয়া যাইবার ভার তাহার উপর দিয়া নবীন মণ্ডল পথেই নামিয়া গিয়াছে, সে-ই এ কার্য্যে যোগ্যতর, কারণ মেডিক্যাল কলেজ-সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা আছে। কমলার জ্ঞান হইলে তাহাকেও উহা বলিয়া বুঝাইল। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া বেলগেছিয়ায় তাহার এক মাতুলের বাগানবাটীতে কমলাকে লইয়া তুলিল। কলেজের ভিতর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হরিপদ ভালো আছে! কিন্তু সে দিন আর দেখা করার নিয়ম নাই, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পরদিন পুনরায় দেখা হইবে।

এদিকে তারানাথ খাতাঞ্চিকে মারধর ও পাঁচশো টাকা তহবিল-তছরুপ করিয়া ও কিছু অলঙ্কার হাত করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে ও বিনয়ের সহিত আসিয়া মিলিয়াছে। বিনয় পরদিন মেডিক্যাল কলেজ হইতে সংবাদ আনিল, হরিপদ ভালোই ছিল কিন্তু সহসা ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়ানোর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তাহাকে সেই রাত্রিতেই কসৌলি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কমলা 'কসৌলি' শুনিয়া ভাবিল কাশী, ও বিনয়ের সহিত কাশী যাইবার জন্য তখনই প্রস্তুত হইল। ষ্টেশনে তারানাথ তাহাদের সঙ্গ লইল। গাড়িতে যাইতে যাইতে উভয়ে শুনিল, জনকতক লোক মিলিয়া এক বিজ্ঞাপন পড়িতেছে,—"যে কেহ তারানাথ ও তাহার সঙ্গী বিনয় ডাক্তারকে ধরাইয়া দিবে, বিলাসপুরের কালীশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় তাহাকে একশো টাকা পুরস্কার দিবেন। বিজ্ঞাপনে উহাদের আকৃতি প্রকৃতির বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিজ্ঞাপন লইয়া পাঠকদের জল্পনা-কল্পনা করিতে শুনিয়া ভয়ে উহাদের মুখ শুকাইয়া গেল, তার পর কাশীতে নামিতে না নামিতে পুলিসের লোকে অন্য লোকের ন্যায় উহাদেরও নাম ধাম ইত্যাদি টুকিয়া লইল। ইহাতে আরো ভীত হইয়া অপরাধীযুগল কোনো সূত্রে কমলাকে একেলা ফেলিয়া কাশী হইতে সরিয়া পড়িল।

সরল বাড়ি আসিয়া দেখিল কমলা নাই। কলিকাতা গিয়া মেডিক্যাল কলেজেও কাহারো কোনো উদ্দেশ পাইল না। সে মধুপুরে তাহার পিতার নিকট সংবাদ দিতে

ছুটিল। মুকুন্দবাবু আগে হইতেই পত্রে বাটীর অবস্থা কিছু কিছু জানিয়াছিলেন, এখন সকলকে দেখে ও তাহার মুখে সবিশেষ শুনিয়া তখনই বাটী রওনা হইলেন।

এদিকে কমলাকে নিতান্ত অসহায় ও উদ্বিগ্ন-ভাবে একা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বাড়িওয়ালী মোক্ষদার দৃষ্টি তাহার উপরে নিপতিত হইল। তাহার মৌখিক যত্নে প্রতারিতা কমলা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারে নাই। শেষে সব বুঝিতে পারিয়া কমলা যখন পাপবৃত্তি অবলম্বনে নিতান্তই অসম্মতা হইল, পাপীয়সী মোক্ষদা তাহার হাতের চুড়ি কাড়িয়া লইয়া, গালাগালি দিতে দিতে রাজপথে তাহাকে তাড়াইয়া দিল। কাশীধামে যোগ-উপলক্ষ্যে তখন অসম্ভব ভিড়। জনতার ছুড়াছুড়িতে কমলার শিশুসন্তান মাণিক তাহার কক্ষভ্রষ্ট হইয়া কোথায় গিয়া পড়িল। মাণিককে হারাইয়া কমলা পাগলিনী-প্রায় হইয়া উঠিল, মোক্ষদা ও তাহার দলবলের চেষ্টায় সকলে তাহাকে পাগলিনী স্থির করিল। পাগলিনীর ন্যায় নানালোকের লাঞ্ছনা নিগ্রহ সহিতে সহিতে মাণিক মাণিক বলিয়া কাশীধামের সেই জনাকীর্ণ রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কমলাকে ঘিরিয়া সকলে রাস্তার উপর একটা ভিড় করিয়া তুলিল। পাগলী ভাবিয়া কেহবা তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পথের উপরে ভিড় দেখিয়া একজন কনেষ্টবল আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল, পরে মোক্ষদার দ্বারবান তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া গঙ্গারতীরের পথে ছাড়িয়া দিল, তখন তাহার দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। সে সেই পথের ধারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। রাত্রি-শেষে যখন তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল তখন তাহার সমস্ত কথা স্মরণ হইল, সে বুঝিল এখন তাহার সকল বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে, মরণের পথ এখন তাহার সুগম, সে উঠিয়া আসিয়া সন্তাপহারিণী জাহ্নবীর স্নিগ্ধ অঙ্কে আশ্রয় পাইবার জন্য সোপান বাহিয়া নামিতে নামিতে ধ্যান-নিরত এক মহাপুরুষের দর্শন পাইল। সে তখন মরণের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। মহাপুরুষের মধুর বাক্যে তাহার তপ্ত প্রাণ শীতল হইয়া আসিল। সে তাঁহার নিকট দীক্ষা চাহিল এবং সংসার হইতে দূরে—বহু দূরে পাহাড়ের দেশে তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া শান্তিলাভ করিবার অভিপ্রায় জানাইল। মহাপুরুষ তাহাকে দীক্ষা দিলেন না বটে, কিন্তু সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, কথা রহিল দীক্ষা দিবেন তাঁহার গুরু।

পুলিসের ভয়ে ভীত হইয়া কমলাকে একলা ফেলিয়া বিনয় ও তারানাথ একটু রাত্রি থাকিতে উঠিয়া নীরবে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, এবং ধীরে ধীরে দশাশ্বমেধের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অর্দ্ধোদয়যোগ। ঘাটে অসংখ্য নৌকা বাঁধা ছিল। উহারা একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া মিরজাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানে যোগমায়া ও ভোগমায়া দেখিয়া রাত্রিটা পাণ্ডার বাসাতেই অতিবাহিত করিল। তারানাথ তথা হইতে দেশে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় জানাইল, বিনয় বুঝিল সে দেশে ফিরিয়া যাইয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে, তখন সে খুনী আসামী বলিয়া ধরা পড়িবে; বিচারে তাহার ফাঁসি! সে মনে মনে একটা মতলব খাটাইয়া তারানাথকে বুঝাইয়া কহিল, যখন এতদূর আসিয়াছে তখন তাজ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে। তারানাথ বিনয়ের কথায় স্বীকৃত হইল এবং কথা রহিল, তাজ দেখিয়া উভয়েই এক সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া বিনয় দেখিল পুলিশ প্রত্যেক বাঙালীর হস্ত পরীক্ষা করিয়া ছাড়িতেছে। তখন তাহার নিবারণের কথা মনে পড়িল। নিশ্চয়ই সে পোষ্টকার্ড ছাপাইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারদের পাঠাইয়াছে। বিনয় একথা তারানাথকে জানাইল; উভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং কোনোরূপে এলাহাবাদ অতিক্রম করিল। বিনয় ভাবিল ইহার পর বড় ষ্টেশন কানপুর, সেখানে নিশ্চয়ই আবার পরীক্ষা হইবে তখন তারানাথ আগেই ধরা পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারো সেই দশা হইবে। কানপুর পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাহাকে কোনোরূপে সরাইতে হইবে, সে-ই এখন তাহার পথের কণ্টক। চাকেরি ষ্টেশনের দিকে ট্রেনখানি যখন

নিশীথ অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিতেছিল, সুরাপানে মত্ত বিনয় তখন ঘুমন্ত তারানাথকে জাপটাইয়া ধরিয়া ট্রেণ হইতে ফেলিয়া দিল।

কানপুরে আসিয়া তারানাথ এক ভক্ত বৈষ্ণব সাজিল। মস্তকে শিখা রাখিল, কণ্ঠে কণ্ঠিধারণ করিল, অঙ্গে রাধা-শ্যাম-ছাপ ইত্যাদি এক অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া শ্যামদাস নাম লইয়া যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভক্তমণ্ডলী তাহার কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে সাদরে আহ্বান করিল। বৃন্দাবনে তখন একটা সাড়া পড়িয়া গেল, তাহার একবিন্দু পদরজের জন্য সকলে লালায়িত হইতে লাগিল। শ্যামদাস তখন অবাধে সকল ভক্তের কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিতে লাগিল, তাহার আদর অভ্যর্থনার কোথাও ত্রুটি নাই। শ্যামদাস অনেক কুঞ্জে ঘুরিয়া শেষে যমুনা-পুলিনের নিকট প্রেমদাস বাবাজীর কুঞ্জে আসিয়া অবস্থিত হইল। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া একদিন গভীর রাত্রে সে বাবাজীর সেবাদাসী রাধামতীকে লইয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। সারা বৃন্দাবন খুঁজিয়াও কেহ তাহার সন্ধান পাইল না।

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

যথা সময়ে নিবারণের পোষ্টকার্ডগুলি ষ্টেশন-মাষ্টারদের হাতে আসিয়া পড়িল। তাঁহারা সেগুলি রেলওয়ে পুলিসের স্কন্ধে চাপাইয়া আপনাদের দায়ীত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। বহুদিন বিরামের পর পুলিশ এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত এই নূতন কার্য্যের তদন্ত সুরু করিয়া দিল। ষ্টেশনে গাড়ি থামিলেই পুলিস আসিয়া প্যাসেঞ্জারদের পরীক্ষা করিতে লাগিল। কানে কিম্বা হাতে কোনো একটা চিহ্ন থাকিলেই হইল, উহা তিলই হউক আর জড়ুলই হউক, D. N. C.ই হউক বা N. N. C.ই হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। একটা কিছু পাইলেই হইল। ইহার ফলে নিবারণ একদিনে তিনখানি টেলিগ্রাম পাইল। টেলিগ্রাম তিনখানি তিনটি বিভিন্ন ষ্টেশন হইতে আসিয়াছে। টেলিগ্রাম তিনখানির মর্ম্ম এইরূপ—"আপনার আসামী ধৃত হইয়াছে শীঘ্র আসিয়া identify করুন।" নিবারণ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তিনখানি টেলিগ্রাম তাহার নামে আসিতে পারে। সে ভাবিয়াছিল একখানিমাত্র টেলিগ্রাম তাহার নামে আসিবে, এবং সে স্বচ্ছন্দে T. N. C. মার্কা দেখিয়া তারানাথকে চিনিয়া লইয়া তাহার পিতার নিকট বিলাসপুরে টেলিগ্রাম করিবে। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, কার্য্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। নিবারণেরও তাহাই হইল, সে একেবারে তিনখানি টেলিগ্রাম পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিল, সে ভাবিল যদি তিন-জনেরই হস্তে T. N. C. মার্কা থাকে তাহা হইলে identify করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না তা ছাড়া টেলিগ্রামগুলি আসিয়াছে হুগলি, ব্যারাকপুর ও শ্যামনগর হইতে। এই তিন স্থানের যাতায়াতের খরচও প্রচুর।

তবে যদি কোনোরূপে তারানাথকে বাছিয়া লইতে পারে তাহা হইলে তাহাও পিতার নিকট হইতে একশত টাকা যায় খরচা সমেত আদায় করিবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া "জয় মা দুর্গে" বলিয়া নিবারণ সেই দিনই যাত্রা করিল, এবং হুগলিতে আসিয়া দেখিল, একজন হুগলি কলেজের ছাত্রকে পুস্তক-সমেত আট্‌কাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার অপরাধ যে তাহার হস্তে M. N. C. মার্কা ছিল, সে বেচারা মুক্তিলাভ করিয়া নিবারণকে খুব দুই কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু ভয়ে পুলিসকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। বারাকপুরে আসিয়া নিবারণ দেখিল,—একটি ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্র লইয়া পুলিসের জিম্মায় ষ্টেসনের একধারে বসিয়া আছেন। ভদ্র লোকটির হাতে ছোট ছোট অক্ষরে S. N. C. লেখা ছিল। ভদ্রলোকটি মুক্ত হইয়া কর্কশকণ্ঠে নিবারণকে কহিল,—"আপনি জানেন আমায় আট্‌কাবার জন্যে আমার কত ক্ষতি হয়েছে? আমি আপনার নামে মানহানি আর damage সুট আনবো।"

নিবারণ বিনীতভাবে কহিল,—"দেখুন মশাই যদি সুট টুট আনতে হয় তবে এই পুলিশের নামে আনবেন, আমার অপরাধ কি বলুন—আমি ত আপনাকে ধরবার কথা বলি নি!"

ভদ্রলোকটি উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"আপনি জানেন আমি কে—আমি আপনাকে দেখে নেবো।"

ষ্টেসনের উপর গোলমাল হইতেছে দেখিয়া নিবারণ ইতিমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়া অনেকটা পিছাইয়া আসিয়াছে এই সময় একজন পুলিসকর্ম্মচারি আসিয়া কহিল,—"বক্‌সিস্ বাবু!"

"যা কাজ করেছ বাবা—সে কথায় আর কাজ কি—আবার বকসিস্!" বলিয়া নিবারণ হন্-হন্ করিয়া একদিকে চলিয়া গেল আর সে বেচারা সেইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল। শ্যামনগরে আসিয়া নিবারণ দেখিল, পুলিস এক হালুইকর ব্রাহ্মণকে ঝাঁজরি খুন্তি সমেত ধরিয়া রাখিয়াছে। সে নিবারণকে দেখিয়া ক্রন্দন-স্বরে কহিল,—"মশাই আমার কি অপরাধ বলুন, পুলিস আমার হাতে এই ইংরাজী অক্ষর ক'টা আমাকে ধরে রেখেছে। আমার নাম হরিনাথ চক্রবর্ত্তী, আমি বাবুদের বাড়ি শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে লুচি ভাজতে যাচ্ছিলুম আমার একটা রোজ মাটি হ'ল মশাই, আর এই বেলা অবধি পেটে অন্নজল পড়েনি, ব্রাহ্মণ আর চলিতে পারিল না, স্কন্ধদেশ হইতে গামছাখানি তুলিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

নিবারণ কহিল,—"নাহে তোমার কোনো দোষ নেই, পুলিস ভুল করে তোমায় ধরেছে তুমি এখন যেতে পার।"

ব্রাহ্মণ একটি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তখন একজন পুলিসের লোক কহিল,— যাও যাও চলা যাও।" সে ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে কোনোরকমে হাতের অক্ষর ক'টা তুলিয়া ফেলিবে

নিবারণ বাটীতে আসিয়াই আর একখানি টেলিগ্রাম পাইল, উহা শ্রীরামপুর হইতে আসিয়াছে। উহাতে লেখাছিল,—'হাতে T. N. C. মার্কাযুক্ত আপনার আসামী মায়-বামাল সমেত ধরা পড়িয়াছে, আপনি অবিলম্বে আসিয়া identify করুন।' T. N. C. কথাটি পড়িয়াই নিবারণের মুখে হাসি দেখা দিল; সে ভাবিল একশো টাকা আর যায় কোথা, এইবার পকেটে এসেছে।

নিবারণ সেই দিনই শ্রীরামপুরে আসিয়া দেখিল, পুলিস একটি সুন্দর যুবককে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার পায়ে পম্প-সু, হাতে ছড়ি, গরদের পাঞ্জাবীতে শ্রীঅঙ্গ ঢাকা, তাহার উপর সিল্কের চাদর; নিবারণ কহিল, "আপনার নাম।"

—"শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

—"পিতার নাম ?"

—"যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

—"নিবাস ?"

—"উত্তরপাড়া।"

—"আপনার হাতে যে বালা রয়েচে এ কার ?"

—"আমার স্ত্রীর।"

—"আপনি শ্রীরামপুরে নেবেছেন কেন ?"

"এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি আমাকে আটকে রাখবার কারণ কি সেটা আমাকে জানালে ভালো হয় ?"

একজন পুলিসকর্ম্মচারী কহিল—"এ বালা আর এ লোক আপনার কিনা তা আপনি বল্‌তে পারেন না ?"

নিবারণ এইবার বড় ফাঁপরে পড়িল, T. N. C. দেখিয়া identify করা যত সহজ মনে করিয়াছিল এখন দেখিল তত সহজ নয়। সে হটাৎ কি বলিবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া কহিল,—"এ লোক আমার নয়!"

"তবে এ-কে যেতে দেওয়া হোক"—বলিয়া পুলিস কর্ম্মচারি তারকনাথের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনি এখন যেতে পারেন।"

নিবারণ অনুচ্চস্বরে কহিল,—"আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্চে—আমি একবার শ্বশুরবাড়িটা দেখতে চাই।"

পুলিসকর্ম্মচারি বিরক্তির সহিত কহিল,—"যখন identify করতে পারলেম না তখন আমাদের আর কোনো responsibility নাই, তবে ইচ্ছে হয় আপনি সঙ্গে গিয়ে ওঁর শ্বশুর-বাড়িটা দেখে আসুন।

"আমার শ্বশুর-বাড়ি দেখতে যাবেন৷ আসুন আসুন মশাই" বলিয়া তারকনাথ নিবারণকে ডাকিয়া লইল এবং ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়াই একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ির অনুসন্ধান করিল। কিন্তু তখন ট্রেণের সময় নয় বলিয়া একখানিও গাড়ি পাওয়া গেল না, কাজেই উভয়ে পদব্রজে যাইতে বাধ্য হইল। খানিক দূর আসিয়া তারকনাথ কহিল,—"আপনি কি ডিটেক্‌টিভ ?" মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিবারণ কহিল,—"না—না ডিটেকটিভ হব কেন, তবে আমাদের একটি লোক পালিয়েছে—তাকে ধরবার জন্যে চেষ্টা করচি।"

"আপনাদের লোককে আপনি চিন্তে পারেন না; এ কী রকমের কথা!"

নিবারণ অন্যমনস্কভাবে কহিল,—"সে লোককে আমি দেখি নি।"

তারকনাথ বিস্মিতস্বরে কহিল,—"দেখেন নি তবু আপনি তাকে ধরবেন ? তবে ডিটেকটিভ নয় বলচেন!"

নিবারণ অপ্রস্তুতভাবে কহিল,—"না না বাস্তবিক আমি ডিটেকটিভ নই।"

"মহাশয়ের বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয় ?"

"এই একটা চাকরি-বাকরি এখন খুঁজ্‌চি।"

"ওঃ বুঝেছি—পেঁছিয়ে প'ড়চেন কেন আসুন না, ঐ যে আমার শ্বশুড়বাড়ি দেখা যাচ্চে" বলিয়া অঙ্গুলী-সঙ্কেতে তারকনাথ একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

"না না পেঁছিয়ে পড়বো কেন,—যাচ্চি" এই যে বলিয়া নিবারণ একটু দ্রুত চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে বাটীর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারবান অভিবাদন করিলে উভয়ে একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় আসিয়া প্রবেশ করিল এবং নিবারণকে বসিতে বলিয়া তারকনাথ

সত্বর বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। প্রায় দশ মিনিট পরে নিবারণ উঠিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তিন চারিটি যুবক আসিয়া হঠাৎ নিবারণকে জাপটাইয়া ধরিয়া ফেলিল! একজন একখানি ক্ষুর লইয়া তাহার একদিকের গোঁফ, দাড়ী, ভ্রু ও মাথার চুলের সম্মুখভাগ বেশ পরিষ্কার করিয়া চাঁচিয়া দিয়া কহিল,"—বাবা ডিটেকটিভ্ গিরি করতে এসেছ এখানে! ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি?—দরওয়ান ইস্কো রাস্তামে ছোড় দেও।"

দ্বারবান আসিয়া নিবারণের হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে নিবারণ এতটুকু হইয়া গেল। রাস্তার লোক তাহার এই অদ্ভূত মূর্ত্তি দেখিয়া পাগল সাব্যস্থ করিয়া হাসিতে লাগিল। নিবারণ গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নাপিত ডাকিয়া বাকি অংশগুলির ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া বাটীতে ফিরিল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল খুড়োর উপদেশ সে আর জীবনে গ্রহণ করিবে না। বাটীতে আসিয়াই সে লিষ্ট বাহির করিয়া যে-যে ষ্টেশন-মাষ্টারকে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল, সেই সেই ষ্টেশন-মাষ্টারকে আর একখানি করিয়া পত্র এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইল যে,—সে তাহার লোককে পাইয়াছে আর কষ্ট করিয়া লোক ধরিবার আবশ্যক নাই।

নিবারণের পোষ্টকার্ডের ফলাফল কি হইল জানিবার জন্য সেইদিন বৈকালে নিমাই উমেশকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অনেক ডাকাডাকির পর নিবারণ একজন পরিচারিকার দ্বারা বলিয়া পাঠাইল,—সে দেখা করিতে পারিবে না তাহার অসুখ করিয়াছে।

নিমাই বিস্মিতভাবে কহিল,—"অসুখ করেছে আজ ক'দিন—কি অসুখ বিছানা থেকে কি উট্‌তে পারে না?"

পরিচারিকা মৃদুস্বরে কহিল,—"তা আমি জানি না বাবু।"

"জান না! তবে তো আমাদের দেখা করা বিশেষ দরকার, কি বল উমেশ!"

উমেশ গম্ভীরস্বরে কহিল,—"নিশ্চয়ই!" তারপর সে পরিচারিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"তুমি বাছা মেয়েদের একটু সরে যেতে বলগে আমরা ওপরে গিয়ে দেখা করে আসি।"

নিবারণ প্রথমে মনে করিয়াছিল উহাদিগের সহিত আর দেখা করিবে না বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু যখন সে শুনিল—তাহারা উপরে আসিয়া দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন সে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা

করিয়া ভাবিয়া দেখিল, দোষ তো তাহাদের নয় দোষ তাহার অদৃষ্টের, তাহারা কখনো তাহার অনিষ্ট-চেষ্টা করে নাই। নিবারণ কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। উমেশ ও নিমাই নিবারণের মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর যতবার উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহে ততবারই হাস্যের বেগ উহারা কেহই থামাইতে পারে না; ক্রমে হাস্যের রোল যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল তখন উভয়ে মুখে রুমাল গুজিয়া মাটির পানে চাহিয়া রহিল। এই সময় নিবারণের এক বালক-চাকর তফাতে থাকিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছিল, এ হাসিটা কিন্তু নিবারণের একেবারে অসহ্য হইল, সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বালকের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তুই বেটা হাসচিস কেন্ রে? বেরো বেটা বাড়ি থেকে দূর হ!" বালক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

নিমাই নিবারণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে আর একবার তাকাইয়া অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া কহিল,—"একি ঢং বাবা হঠাৎ পরমহংস হ'য়ে গেলে নাকি? কিছু যে বুঝতে পারছি নে, ব্যাপারটা কি খুলেই ছাই বল; তোমার নাকি অসুখ করেছে?"

নিবারণ স্থিরভাবে কহিল,—"হুঁ অসুখ করেছে।"

উভয়ে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"অসুখটা কি শুনি?"

নিবারণ মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটাইয়া কহিল, "যা দেখ্‌চ।"

নিমাই কহিল,—"কি একটু স্পষ্ট করেই বল না?"

"এই যা দেখে এত হাসলে সেইটেই আমার অসুখ।"

"তার মানে? কিছু বুঝতে পারছি নে, তুমি কারুর শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ করে এসেছ?"

"শ্রাদ্ধ আর কার কর্ব্বো, নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করেছি।"

"ব্যাপারটা কি একটু খুলেই বল না, হে সব যেন হেঁয়ালীর মত ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব!"

এইবার নিবারণ উহাদের আপনার বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইল এবং একে একে সমস্ত কথা বলিয়া গেল; শেষে নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া "খুড়ো তোমারি পরামর্শে আমার এই অর্থনাশ আর মনস্তাপ" বলিয়া কোঁচার খুটে চক্ষু মুছিল।

নিবারণের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া বাস্তবিকই উহাদের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল, নিমাই ধীরে ধীরে কহিল,—"নিবারণ, আমার কি দোষ ভাই তোমার

যে এতটুকু বুদ্ধি নেই তা আমি জানতুম না, তুমি যখন বুঝতে পারলে সে একজন বড়লোকের জামাই তারপর অত বড় বাড়ি দরওয়ান, দেখে তুমি কি বলে' সেথায় মাথা গলালে? তাদের জামাইকে তুমি এক-রকম চোর সন্দেহ করে ডিটেকটিভ সেজে এসেছ, তারা এখন তোমায় ছাড়বে কেন? বেশ শিক্ষা দিয়েছে তোমার একটু ভাবা উচিত ছিল।"

নিবারণ ম্লানমুখে কহিল,—"আমায় তখন সাপে ছুঁচো গেলা গোছ হ'য়েছিল পিছুতেও লজ্জা বোধ হয় এগুতেও তাই ছোঁড়াটা কথায় কথায় আমাকে একেবারে তার শ্বশুর-বাড়ির সাম্‌নে ফেললে তখন আর পালাবার পথ পেলুম না।"

"তবে আর মিছিমিছি আমার দোষ দিয়ো না।"

"না খুড়ো কিছু মনে কোরো না, দোষ আমার অদৃষ্টের" বলিয়া নিবারণ ডাকিল,—"ওরে বাঁশি, আমাদের চা দিয়ে যা।" (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়

আকাঙ্ক্ষা

আমি নিখিল-মাঝে তোমারি কাজে বিলা'য়ে দিব আপনা;
নব বিশ্ব-প্রেমে হইয়ে মত্ত করিব তব সাধনা।
মনে নাহিক র'বে গরব কভু ভুলিয়া যাব আপনা;
শুধু আদেশ তব পালিয়া যা'ব না করি কোনো কামনা।
আছে আতুর যেবা করিব সেবা ফেলিব সত্তা হারা'য়ে;
ভবে যতেক দুঃখী করিব সুখী দিব গো অশ্রু মুছা'য়ে।
সদা পাপের চিন্তা তাড়া'য়ে দিব তোমারে করি' ধারণা;
প্রভু তোমার প্রীতি বিলা'ব বিশ্বে—বিলা'ব নব ভাবনা।
মোরে দিয়ো গো শক্তি দিয়ো গো ভক্তি দমিতে যত বাসনা;
তুমি 'দিয়ো গো দিয়ো পরাণ-প্রিয়' দিয়ো গো মোরে প্রেরণা।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণকুমারী

বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠে জানা যায়, একদা রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরের মহারাণার অলোকসামান্যা দুহিতা কৃষ্ণকুমারী তৎকালে সমস্ত রাজস্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ-লাবণ্যবতী ও বহুবিধ সদ্গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার সুকোমল মাধুরীমাখা দেহখানি সর্ব্ববিধ সুষমার আধার ছিল। দেশ-বিদেশের প্রধান প্রধান রাজপুত ভূপতিরা কৃষ্ণকুমারীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহাদের সকলেই উদয়-পুরাধিপতির নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু মহারাণা স্বীয় প্রিয়তমা কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বিবিধ গুণশালী রাজা জগৎ-সিংহের করে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। জয়পুর-পতি জগৎ-সিংহ ইহা অবগত হইয়া মহারাণার নিকট ত্রিশ হাজার সৈন্য ও বহু মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারাদি উপঢৌকন-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র রাজপুতানার নানাস্থানেই যুদ্ধ-সজ্জা চলিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকেই হিংসা ও বিদ্বেষের অনল জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ফলেই শত শত রাজপুত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইতে লাগিল। সমগ্র দেশটাই যেন প্রলয়-বারিধি গর্ভে নিমজ্জিত হইতে বসিল! কৃষ্ণকুমারীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যই যে এই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দেশোৎসন্নের একমাত্র কারণ তদ্বিষয়ে কাহারো অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মারবারাধিপতি মণিসিংহও কৃষ্ণ-কুমারীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। উদয়পুরের মহারাণাকে তিনি লিখিয়া পাঠাই-লেন,—"আপনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অভি-লাষী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে আমিই এখন তাঁহার উত্তরাধি-কারী রাজা, অতএব আমাকেই আপনার কন্যা সম্প্রদান করুন। আর নিতান্তই যদি আপনি ইহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে বাহুবলেই আমি আপনাকে সম্মত করাইতে বাধ্য হইব।"

উদয়পুরের মহারাণা রাজপুতদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তৎকালে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা বলবিক্রম তাদৃশ প্রবল ছিল না। তাঁহার সামন্তরাজগণ সর্ব্বদা সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত থাকিতেন।

রাজ-দুহিতা কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করিবার জন্য যখন সমস্ত রাজপুত বীরগণ চারিদিকে রক্তের নদী প্রবাহিত করাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র-সৈন্য-বাহিনী-সহ মহারাজা সিন্ধিয়া রাজপুতানা আক্রমণ পূর্ব্বক ধন-রত্ন লুণ্ঠন ও নগর বিধ্বস্ত করিতেছিলেন। এই প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র বীরগণের নিকট পরাজিত হইয়া রাজস্থানের সমুদায় সামন্তরাজ ও সর্দ্দারগণ এমন কি মহারাণা পর্য্যন্তও আপন আপন আয়ের 'চৌথ' অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ সিন্ধিয়াকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। আত্মকলহের ফলেই রাজপুতানার এই শোচনীয় অধঃপতন!

তৎকালে আমীর খাঁ নামক জনৈক শঠ ও প্রবঞ্চক মুসলমান উচ্চশ্রেণীর রাজপুতদিগের মধ্যে খুব বীর বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার অন্তঃকরণ খলতায় ও নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ ছিল। সে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এক একবার এক এক রাজপুত সর্দ্দারকে সাহায্য করিতে লাগিল। সমস্ত সামন্তরাজ ও সর্দ্দারগণের সর্ব্বনাশ-সাধনই আমীর খাঁর আন্তরিক অভিপ্রায়। তাহার কপট ব্যবহারে সমস্ত রাজপুতই ক্রমে দুর্ব্বল ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতে লাগিল। মহারাজ সিন্ধিয়া মারবার-পতি রাজা মণিসিংহকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন। আমীর খাঁ উদয়পুরের মহারাণাকে এবং সামন্ত নৃপতিগণ রাজা জগৎসিংহকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আট সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মহারাজ সিন্ধিয়া উদয়পুর-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক তিনি মহারাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনি জগৎসিংহকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অবিলম্বে মারবার-রাজ মণিসিংহের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন।" এই সংবাদে মহরাণা সমধিক ভীত হইলেন; এবং মহারাষ্ট্র-সেনার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব ভাবিয়া সিন্ধিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া জয়পুরাধিপতি রাজা জগৎসিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। রাজা মণিসিংহ নিজ সৈন্যদলসহ মহারাজ সিন্ধিয়ার সহিত যোগ দিলেন। ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। শোণিত-ধারায় রণভূমি প্লাবিত হইতে লাগিল! কিন্তু কোনো পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। এমন সময়ে আমীর খাঁ উদয়পুরের মহারাণাকে বলিল,—"যার জন্য এই অসংখ্য নরহত্যা, যার জন্য

সমস্ত রাজপুতানা উৎসন্নপ্রায়, আপনার সেই কন্যাকে শীঘ্রই লোকান্তরিত করুন নতুবা এই প্রচাণ্ড সমরানলে সমস্ত রাজস্থান ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।”

এই নিষ্ঠুর বাক্যে মহারাণা স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং প্রত্যুত্তরে আমীর খাঁকে বলিলেন,—“আমি কখনই এরূপ নির্ম্মম ও ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারিব না।” আমীর খাঁ কিন্তু এই কথায় নিরুৎসাহ হইল না, সে বিবিধ প্রকার শ্রুতিমধুর কু-যুক্তিদ্বারা মহারাণাকে এই হৃদয়বিদারক কার্য্যে উত্তেজিত করিতে লাগিল। উহার প্ররোচনায় শেষে মহারাণা ঐ পৈশাচিক কার্য্যে সম্মতি দিলেন। কিন্তু এই নিন্দনীয় কার্য্য কে করিবে? এমন পাষাণহৃদয় কে আছে যে একটি নিষ্কলঙ্কহৃদয়া পরমাসুন্দরী বালিকার জীবন নষ্ট করিবে!

মহারাণা নিজ শ্যালক দৌলতসিংহকে প্রথমে এই নৃশংস কার্য্যের কথা বলায়, দৌলতসিংহ সাতিশয় ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া এই পাপকার্য্যের প্ররোচক ও পরামর্শদাতা আমীর খাঁকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল। অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত ও নিরস্ত করিয়া মহারাণা নিজ পুত্র জীবনদাসকে কৃষ্ণকুমারীর প্রাণান্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা জীবনদাস কৃষ্ণকুমারীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনি এই লোমহর্ষণ আদেশ শুনিয়া মহারাণার নিকট অত্যন্ত বিনীত ও সকরুণভাবে নিজ ভগিনীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু মহারাণা তাঁহাকে ঐ পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অশেষপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। জীবনদাস অশ্রুপূর্ণনেত্রে গদ-গদ-কণ্ঠে বলিলেন,—“কৃষ্ণকুমারী আমার ভগ্নী, আমি কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে স্বহস্তে সেই নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক সুকোমলহৃদয়া বালিকার প্রাণসংহার করিব? আমাদ্বারা এই কার্য্য হইবে না, বরং আপনি আজ্ঞা করিলে, আমি আমার নিজের জীবন এখনই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি।”

মহারাণা বলিলেন,—“কি করিব আর কোনো উপায় নাই, কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ভিন্ন রাজস্থানের আর কল্যাণ নাই। সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্যই আমি আমার প্রাণাধিকা কন্যার জীবননাশে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; অতএব তুমি আর বিলম্ব না করিয়া সমস্ত রাজপুতজাতির—সমস্ত হিন্দুস্থানের কল্যাণের জন্য আমার এই আদেশ পালন কর।” রোদনোন্মুখ জীবনদাস পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ গমন করিলেন।

জীবনদাস কৃষ্ণকুমারীর কক্ষে গমন করিবামাত্রই কৃষ্ণকুমারী অত্যন্ত

উৎসাহের সহিত তাঁহার নিকট আসিয়াই হাসিমুখে সরলভাবে তাঁহার কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—"বাবা কি আমাক কিছু বলিয়া পাঠাইয়াছেন?" জীবনদাস বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি আমাকে তোমার জীবনান্ত করিতে পাঠাইয়াছেন।" ইহাতে কৃষ্ণকুমারী হাসিয়া উঠিলে, জীবনদাস বলিলেন;—"আমি তোমার সহিত তামাসা করিতে আসি নাই, মহারাণা আমাকে এই আদেশই দিয়াছেন, অতএব তুমি পিতার আজ্ঞায় সমস্ত রাজপুতজাতি ও রাজস্থানের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন বলি দাও। তোমার প্রাণান্ত ভিন্ন এই ভয়ানক সর্ব্বধ্বংসী সমরানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না।"

অনিন্দ্যসুন্দরী কৃষ্ণকুমারী ক্ষণকাল স্থির অচঞ্চলভাবে দাণ্ডায়মান থাকিয়া উত্তর করিলেন,—"দাদা, ইহা তো আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। ইতিপূর্ব্বে শতশত রাজপুত-মহিলা দেশের ও ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমি তো সেই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদেরই পূত শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, আমি তাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না। আমি তাঁহাদের অপেক্ষা হীন নহি। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়ে, দেশের লক্ষ লক্ষ বীরের জীবন রক্ষা ও সমগ্র দেশময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে; ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? অতএব দাদা, আপনি শীঘ্র পিতার আদেশ পালন করিয়া দেশের ও জাতির যথার্থ হিত-সাধন করুন।"

জীবনদাস ভগিনীর এই প্রকার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। এবং তিনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া রাজভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গেলেন তাহা কেহই বলিতে পারে না। যথাসময়ে মহারাণার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সর্দ্দারগণকে একে একে এই পাশবিক হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কাহারো দ্বারা এই পৈশাচিক নিষ্ঠুর কার্য্য সাধিত হইল না। তখন মহারাণা একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কৃষ্ণ-কুমারীর প্রাণসংহারের জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন। রাজভবন হইতে বিলাপ ও ক্রন্দনের ধ্বনি এবং হাহাকার শব্দ উঠিতে লাগিল। মহারাণী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন এবং বারবার মহারাণার নিকট কন্যার

জীবনভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই ভাবিল যে, এই নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদনের জন্য মহারাণা আর কোনো চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু মহারাণা যে তখন আমীর খাঁর নিকট ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায়। আমীর খাঁ পুনঃ পুন তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আমার আদেশ প্রতিপালিত না হইলে আমি সকলেরই প্রাণদণ্ড করিব। একজনও বাঁচিতে পারিবে না।" তখন একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া উঠিল। বহু রাজপুত সর্দ্দার সমবেত হইয়া সসৈন্যে কৃষ্ণকুমারীকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া নীচাশয় আমীর খাঁ অবিলম্বে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিবার জন্য মহারাণাকে বারবার সাতিশয় উত্তেজিত ও ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল। অগত্যা মহারাণা, বিষদানে কন্যার প্রাণনষ্ট করিবার জন্য পুরনারীদিগকে আদেশ করিলেন।

রাজবালা কৃষ্ণকুমারী স্বীয় জীবন বলি দিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া সম্পূর্ণ নির্ভীকচিত্তে হত্যাকারী ঘাতকের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁহার জীবন পুষ্পের সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের ন্যায় শান্ত স্নিগ্ধ ও নীরব প্রভাব বিস্তার করিয়া সকলকেই আনন্দিত করিয়াছিল। তাঁহাকে জীবন-বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তাঁহার সহচরিগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে মৃদুমধুর সস্নেহ-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—"প্রিয় সখিগণ, তোমরা অকারণ রোদন করিয়া আমার প্রাণে ব্যথা দিয়ো না। আজ আমার বড় সুখের দিন। তোমরা দেখিতেছ যে, আমার জন্যই রাজপুতানা শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে! আমার জন্যই একটা প্রবল জাতি ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে, আজ যে আমি দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য নিজের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইতেছি ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। এখন আমার এই আনন্দের সময় তোমরা বৃথা শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিয়ো না।"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা বিষপাত্র লইয়া কৃষ্ণকুমারীর নিকট উপস্থিত হইল। এবং বিষণ্ণচিত্তে মহারাণার নিদারুণ আদেশ জানাইয়া পাত্রটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। অবিচলিতহৃদয়া রাজকুমারী দাসীর হস্ত হইতে বিষপাত্র লইয়া নিজ সখিগণকে বলিলেন,—"ভগ্নীগণ, আমি চলিলাম, তোমরা প্রসন্নমুখে আমাকে বিদায় দাও।" এই সময়ে মহারাণী

উন্মাদিনীর বেশে ঝড়ের মতো তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কৃষ্ণকুমারীকে বিষ পান করিতে নিষেধ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী ভক্তির সহিত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"মা, এ সময় তুমি এরূপ বৃথা শোক-মোহে অভিভূত হইলে আমি অত্যন্ত বেদনা পাইব; তুমি তো জান যে, সকলকেই একদিন না একদিন মরিতেই হইবে, কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না। আজ হোক্ কাল হোক্ বা দু দিন পরেই হোক্ আমাকে তো মরিতেই হইবে; কিন্তু সমগ্র দেশের ও জাতির মহাকল্যাণের জন্য আমি যে এই অকিঞ্চিৎকর জীবন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম, ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? মা, তুমি তো সবই জানিতেছ, আমি আর তোমাকে কি বুঝাইব? তুমি হৃষ্টমনে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি।"

অনন্তর কৃষ্ণকুমারী করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন;—"হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তুমি সমস্ত জীবের রক্ষক ও প্রতিপালক, তুমি আমার পিতা-মাতাকে সকল বিপদ ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর। এই দেশবাসীর প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। শান্তিদাতা, এই দেশে তুমি শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। আমার প্রাণে বল দাও, শান্তি দাও, যেন আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি।"

প্রার্থনান্তেই তিনি বিষপান করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বমি হইয়া সমস্ত বিষ উঠিয়া পড়িল। দ্বিতীয় বার তিনি বিষপান করিলেন, কিন্তু সে বারও ঐরূপ হইল। তৎপরে তঁাহাকে আর এক পাত্র বিষ দেওয়া হইল; ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া নিমিলিতনেত্রে তিনি তৃতীয়বার তীব্র হলাহল পান করিলেন। অবিলম্বেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার অকলঙ্ক অমর আত্মা অমৃত-লোকে প্রয়ান করিল! অনবদ্য সুষমার আকর অনতিবিকশিত অনাঘ্রাত স্বর্গীয় পবিত্র প্রসূন জগৎপিতার চরণ-তলে আশ্রয়লাভ করিল। সমগ্র রাজস্থানে যে প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই কুসুমকোমলা রাজবালার জীবনাহুতিতে সেই ভীষণ প্রলয়াগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

সম্প্রতি গোবরডাঙ্গার থিয়েটারপার্টি একটি সৎকার্য্য করিয়াছেন। জনৈক প্রতিবাসীর মৃত্যুতে তাহার দুস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে একরাত্রির অভিনয়ের সমস্ত আয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে গ্রামবাসি ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থিয়েটার-সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই থিয়েটার-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পল্লীগ্রামের থিয়েটারগুলিও সহরের বারাঙ্গনা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটারের আদর্শের অতীত নহে ; তাহাদের ভাবের সঙ্গে ইহাদের কোনো বিশেষ পার্থক্য নাই। সহরের থিয়েটারগুলি বারাঙ্গনা দ্বারা অভিনয় করিয়া দেশের কী না অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, আবার সেই সকল থিয়েটার-কোম্পানী মধ্যে মধ্যে দুস্থের সাহায্যার্থ কোনো কোনো রাত্রির আয় দান করিয়া থাকেন। যদি কেহ মনে করেন পাপ-পুণ্যের জমা-খরচে ওয়াশীল বাকী হয়, তিনি এইরূপ বিষয়ে ধন্য ধন্য করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক মানব-চরিত্র বাজ্যে তাহা হয় না। জীবনে যদি গলদ থাকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আর একদিকে পুণ্যকার্য্যও চলে, তবে তাহাতে মনুষ্যের চরিত্র পবিত্র হয় না। যে কার্য্যক্ষেত্রের মূল দৃষ্টান্ত ভালো নয়, তাহাতে ২।১টা সৎকার্য্য করিলে কি তাহার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয় ? এই যে সেদিন গোবরডাঙ্গা থিয়েটারপার্টি কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনা আনাইয়া অভিনয় করিয়া দেশের অনিষ্ট সাধন করিলেন, আবার আজ একটা ভালো কাজ করিয়া তাহার কতকটা ওয়াশীল কাটা হইল না কি ? দেশের কি এমনই দুরবস্থা হইয়াছে, যে, থিয়েটার-পার্টির হাত দিয়া গরীবের সাহায্য করিতে সকলে মহা উৎসাহী কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞানে দশজনে মিলিয়া দেশের এরূপ ভালো কাজে অগ্রসর হইতে পারেন না কেন ?

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৭ই চৈত্র চৌবেড়িয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। অমর-কবি দীনবন্ধু মিত্রের জন্মভূমি, চৌবেড়িয়া গ্রাম এক সময় কত সমৃদ্ধিশালী ছিল, আজ সেই স্থান জন-শূন্য-বনাকীর্ণ হিংস্র জন্তুর বাসস্থান হইতে চলিয়াছে। এমন দিনেও সদাশয় সৎকার্য্যশীল মহেন্দ্রবাবুর বর্ত্তমানে তবুও গ্রামের নাম রক্ষা হইতেছিল, তাই আজ তাঁহার অভাবে গ্রামবাসী সকলে সত্য সত্যই ব্যথিত। তবে তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ রায়ও পিতার ন্যায় সহৃদয় এবং সদ্‌গুণান্বিত। আমরা আশা করি তিনিও পিতৃপদানুসরণ করিয়া দেশের হিত-সাধনে চিরদিন রত থাকুন। দয়াময় পরমেশ্বর মহেন্দ্রনাথের অমরাত্মার কল্যাণ ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের মনে শান্তি বিধান করুন।

কুশদহ

খাঁটুরা দাতব্য চিকিৎসালয়
স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ রক্ষিত কর্ত্তৃক
১৩০৬ সালে স্থাপিত
শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক
পরিচালিত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ | দ্বিতীয় সংখ্যা

কীর্ত্তন

(মনোহরসাঁই—লোফা)

আছ অন্তরে বাহিরে; (আছ মা, মা গো)
তবু দেখি না দেখি না তোমারে।
বুকে ক'রে আছ মা, পালিছ কতই আদরে;
মোহে অচেতন, হ'য়ে আমার মন,
না দেখিয়ে ভাসে নয়ন-নীরে।
প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম, মা হ'য়ে আছ অবিরাম,
আমার ঘুমানো মন, দেখে স্বপন,
শাস্তি শাস্তি কোরে ছুটে যায় দূরে।
ভেঙ্গে দেও গো বিকৃত এ মোহের স্বপন,
জেগে উঠুক প্রাণ, গেয়ে তব নাম
প্রকাশ দেখি মা অন্তরে বাহিরে।

(ব্রহ্মসঙ্গীত ৫০৮ পৃষ্ঠা)।

প্রসঙ্গ

ভাব—এক বন্ধুকে কিছু বলিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, মনে হইল ভাব করিয়া বলিতে পারিলে সকল কথাই বলা যায়। তখনই মনে একটি ভাব আসিল; আহা! সেটি কি সুন্দর ভাব! কিরূপে তাহা প্রকাশ করিব? সকল মানুষের মধ্যেই ভাব আছে। এই ভাব অনেক রকমে প্রকাশ পায়। ভালো ভাবেও পায় মন্দ ভাবেও পায়। ভাবের স্বরূপ নিরাকার, অর্থাৎ দীর্ঘ প্রস্ত; শীতল বা উষ্ণ, হরিৎ বা পীতাদি কোন আকার বা বর্ণ বিশেষ নহে। অথচ ভাব আমরা বুঝি, নিরাকার মনের ভিতর দিয়াই বুঝি। সুতরাং ভাব আমাদের মধ্যে সামান্য বিষয়ের জন্য নহে, সেই তো শ্রেষ্ঠ ভাব, যে ভাবের দ্বারা ভগবানকে ডাকিয়া পাওয়া যায়। যাঁহার ভাব ভগবানকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, যিনি ভাব-যোগে ভগবানের সঙ্গে কথা কহিতে শিখিয়াছেন, যিনি আপনার প্রাণের কথা ভাবের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে বিনিময় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পাইবার অবশিষ্ট কি রহিল? সেই তো মহৎ ভাব, সে যে বিশুদ্ধ ভাব, তাহাতে জগৎ বশীভূত হইবে না কেন! ধন্য তাঁহার ভাব যিনি ভাবের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে পারিয়াছেন! সংসারেই বা তাঁহার কোন্ কার্য্য অসিদ্ধ থাকে।

সৎসঙ্গ—এ সংসারে সকলেই সঙ্গী চায়; বালকের সঙ্গী বালক, যুবকের সঙ্গী যুবক, বৃদ্ধের সঙ্গী বৃদ্ধ, সমভাবের সঙ্গী সকলে চায়। কুসঙ্গীর অসৎ সঙ্গে, সংসারে মানুষের কি না অনিষ্টই হইতেছে। কত সরল প্রকৃতির যুবক কুসঙ্গে পড়িয়া একবারে মনুষ্যত্বের বাহিরে গিয়া পড়িতেছে। যে ভালো ভাবে গঠিত হইতে পায় নাই, সে কুসঙ্গীর অনুকূল কুসঙ্গে পড়িয়া দিন দিন আরো অধঃপতনের পথে চলিয়া গেল। কিন্তু এই সঙ্গ আর একদিকে মানুষের পক্ষে মহৎ উপকারী; তাহা ধর্ম্মবন্ধু-সঙ্গ; মধুর সঙ্গ। ধর্ম্মবন্ধু-সঙ্গ সৎকার্য্যে উৎসাহী করে; ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট করে, নিরুৎসাহের সময় উৎসাহদান করে, যদি কখনো মনে কুভাব কিম্বা রাগ দ্বেষ আসিবার সম্ভাবনা হয়, ধর্ম্মবন্ধু-সঙ্গ তাহা হইতে লজ্জিত করিয়া ফিরাইয়া আনে। দুঃখের দিনে ধর্ম্মবন্ধু-সঙ্গ প্রাণের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দান করে, ধর্ম্মবন্ধু-সঙ্গ কি মধুর জিনিস, ইহার মাধুরী কে বর্ণনা করিবে! যিনি উপভোগ করেন তিনিই জানেন। ভগবৎ সঙ্গের পরই ধর্ম্মবন্ধু-সঙ্গ।

সোপান চতুষ্টয়—সে দিন প্রসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বলিলেন,—"ধর্ম্মের চারিটি সোপান দেখা যায়"—১ম নীতি, ২য় ধর্ম্ম, ৩য় ব্রহ্মজ্ঞান, ৪র্থ ভক্তি।" অর্থাৎ প্রথমাবস্থার একশ্রেণী নীতিকেই একমাত্র ধর্ম্ম মনে করেন। তারপর আর একশ্রেণী ধর্ম্মকে অবলম্বন করেন, অর্থাৎ যাগযজ্ঞ বা ব্রত নিয়ম পূজা পাঠ অথবা পরম্পরাগত বাহ্য ধর্ম্ম-সাধনই তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। ৩য় ব্রহ্মজ্ঞান, বন্ধুর মতে ইহাতে পরমেশ্বরের দর্শন হয় বটে, কিন্তু এ দর্শন পরোক্ষ দর্শন। অর্থাৎ সৃষ্টি দেখিয়া জানা যায় ইহার এক জন স্রষ্টা আছেন। মানব-জীবনের বিচিত্র ঘটনা-পুঞ্জের মধ্যে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ইহার একজন বিধাতা আছেন ইত্যাদি। এই-রূপ সিদ্ধান্ত জ্ঞানকেই তিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানের অবস্থা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবানের লীলার রূপ—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চ ভাবের ভিতর দিয়া দর্শন হয়, তাহাই প্রকৃত দর্শন। ভক্তি না আসিলে এই দর্শন হয় না, অর্থাৎ ভগবান্ কি বস্তু তাহা পরোক্ষ জ্ঞানে নির্ণয় হয় না। পরোক্ষ জ্ঞান, দুই আর দুইএ চার হয় এইরূপ বলিয়া দিতে পারে মাত্র। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ভক্তিতেই হয়।

এই মতের উপর অনেক কথা বলিবার আছে, সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব। শুষ্কজ্ঞানে ঈশ্বর দর্শন হয় না একথা সত্য, কিন্তু ভগবানের সত্য জ্ঞান অনন্ত, মঙ্গল, পুণ্য, আনন্দ, আধ্যাত্মিক স্বরূপগুলি জ্ঞান-চক্ষেই তো দর্শন হয়? স্বরূপ দর্শন করিয়া যখন প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া যায়, সে মাধুর্য্যে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া, কেবল তাঁহার চরণের দাস হইতে বাসনা হয়, তখনই ভক্তির অবস্থা আসে। জ্ঞানের ভূমিতে যে ভক্তি সেই তো নির্ম্মলা ভক্তি। দর্শনে মুগ্ধ করে অন্তরের অনুরাগ; অনুরাগ অহেতুকি, সে তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায়না। ভক্তির পূর্ব্বাবস্থা অনুরাগ। অতএব দিব্যজ্ঞানে বা ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবানের প্রকৃত দর্শন হইবে না কেন? জ্ঞানে কি লীলা দর্শন হয় না? দ্বিতীয় কথা, জ্ঞান হইতে ভক্তিকে স্বতন্ত্র করা হইতেছে কেন? ইহাতেই তো এদেশের ধর্ম্মে ভেদ ঘটিয়াছে। শুষ্ক জ্ঞানী দিগের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী দিগকে ছাড়িয়া, ভক্ত ভাইরা পুনরায় সাকারের আকর্ষণে চলিয়া যাইবেন কেন?

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

সপ্তম অধিবেশন

২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে, চৈত্র ১৩২০

স্থান—কলিকাতা টাউনহল।

"কলিকাতা মহানগরীর এই বিশাল পুরশ্রীমণ্ডপে বঙ্গ সরস্বতীর অনুরক্ত ভক্ত পুত্রগণকে একত্রে সমাসীন দেখিয়া আমার কী যে আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা হইতেছে, দুই দণ্ড নিস্তব্ধ হইয়া অকুল আনন্দ-সাগরে মনকে ভাসাইয়া দিই।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ।

আজীবন সাহিত্য-সেবক দার্শনিক শ্রেষ্ঠ আচার্য্য

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি।

সম্রাট্

হুমায়ুনের আত্মজীবনী *

উপক্রমণিকা

এই জীবন-স্মৃতির লেখক জহর, সম্রাট্ হুমায়ূনের একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য ছিলেন বলিয়া সম্রাট্ যেখানে গমন করিতেন, ইঁহাকেও তথায় যাইতে হইত। ইনি সম্রাটের জন্য তাম্বুল ও পানীয় জল এবং সরবৎ প্রভৃতি সরবরাহ করিতেন। পারস্য ভাষার এই প্রকারের ভৃত্যকে "আফ তাব্‌চি" বলিত। জহর এই জীবন-স্মৃতির প্রারম্ভে যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন. তদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনী জানিবার অন্য কোনো উপায় নাই। জীবন-স্মৃতি লিখিবার সময় জহর রাজকার্য্যে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন যে, তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত হাইবাতপুর পরগণার করসংগ্রাহক ছিলেন; বলা বাহুল্য জহরও এই কথা বলিয়াছেন।

জহর স্বলিখিত জীবন-স্মৃতির "তেজাকরতি-উল্-ওয়াকিয়াত" নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি ১৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সম্রাট্ হুমায়ুনের জীবনলীলা সংবরণের ত্রিশ বৎসর পরে প্রভুর জীবন-স্মৃতি লিখিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক ডাউসন (Porf. Dowson) বলেন যে,—"The fact of their having been commenced full thirty after the death of Humayun greatly diminishes their clain to be considerd a faithful and exact account of the occurences they record." অর্থাৎ ঘটনাগুলি সম্রাটের পরলোকপ্রাপ্তির ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত হওয়ায় সে গুলিকে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। লেখক জহর সম্রাট্-সংক্রান্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হইবার বহুদিন পরে আপন স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকাকারে লেখেন; সুতরাং তিনি যে সর্ব্বাংশে

* পারস্য ভাষায় সম্রাট্ হুমায়ুনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জহর কর্তৃক লিখিত "তেজকেরে অল্ ভকিয়ত" নামক গ্রন্থের মেজর ষ্টুয়ার্ট কৃত ইংরাজী অনুবাদ Private memoirs of the Emperor Humayun নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক।

অভ্রান্ত; একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।" অধ্যাপক ডাউসন্ (Prof Dowson) আরও বলিয়াছেন—

"They pre contemporary records of the events as they occurred, but reminiseenes of more than thirty year's standing so that whatever the sincerity and candowr of the writedr, time must must have staned down his impressions, and memory had doubtless given a favourable colour to the recollections he retained of a well-beloved master. The conversations attributed to various personages who figure in his memoris must therefore contain quite as much of what the author thought they might or ought to have said as of what really was uttered." অর্থাৎ ঘটনাগুলি সমসাময়িক নহে, পরন্তু ত্রিশ বৎসর পরের পূর্ব্ব স্মৃতিমাত্র। সুতরাং স্থানবিশেষে যে লেখক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং রাজার অনুকুলে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সম্রাট্ হুমায়ুনের রাজত্বকালীন ইতিহাস জানিতে হইলে ঐতিহাসিক ফেরিষ্টার বৃত্তান্ত (Ferishtas account), জহরের জীবন স্মৃতি এবং আবুল ফজলের আকবর নামা পড়া প্রশস্ত। অধ্যাপক ডাউসন্ ফেরিষ্টা-লিখিত বৃত্তান্তকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন। তিনি স্ব-রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ফেরিষ্টার বৃত্তান্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এল্ফিন্‌ষ্টোন্ (Monstuart Elphinstone) উল্লিখিত ঐতিহাসিকত্রয়ের ইতিহাস হইতে স্ব-লিখিত ভারতের ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক খোঁদামিরের হুমায়ুননামা এবং সম্রাট্ বাবরের আত্ম-জীবনী পাঠে হুমায়ুন-সম্বন্ধে এল্ফিন্‌ষ্টোন্ লিখিয়াছেন—

"He was in constant attendance on Humayun and although unacquainted with his political relations and secret designs, was a minute and correct descover of all that came within his reach and describes what he saw with simplicity and distinctness. He was devoted to Humayun and anxious to put all his actions in the most favourable light; but he

seldom imagined that anything in his master's conduct required either concealment or apology" অর্থাৎ তিনি (জহর) সম্রাট্ হুমায়ূনের নিরন্তর সেবাব্রতে ব্রতী ভৃত্য ছিলেন। তিনি, সম্রাটের রাজনৈতিক অভিসন্ধির বিষয় বিশেষ কিছু জানিতে পারিতেন না বটে, তথাচ সংঘটিত ঘটনাবলী সাধ্যানুযায়ী মনে করিয়া রাখিতেন। সেই সমস্ত সংঘটিত বিষয়ের উল্লেখ তিনি পরিষ্কাররূপে ও সরলভাবে করিয়াছেন। তিনি সম্রাটের একজন অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। অনুকূল ভিন্ন, প্রতিকূল দৃষ্টিতে তিনি কখনো তাঁহার প্রভুর অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার প্রভুর চরিত্রে কিছু গোপন বা মার্জ্জনা করিবার আছে, এ চিন্তা কখনো তাঁহার কল্পনার সীমায় উপস্থিত হয় নাই।"

সম্রাট্ জহরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আপন অযোগ্যতা সত্বেও প্রভুর স্নেহগুণে জহর উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং জহর যে প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দ জহরকে পক্ষপাতীত্ব ও অত্যধিক প্রভু-প্রশংসা-দোষে দুষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু সহৃদয় পাঠকগণ ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাইবেন যে, জহর নিরপেক্ষ।

জহর প্রথমে সম্রাটের একজন অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন,এবং জীবন-চরিত-প্রণেতার ন্যায় তাঁহার তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধিও ছিল না। ঐতিহাসিক মেজর ষ্টুয়ার্ট বলেন,—The author of this work was not a learned man, it has no claim to erudition. This book being written with the greatest sincerity, sometimes to the disparagement of his heroe, I have no doubt of its authenticity." অর্থাৎ এই পুস্তকের লেখক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না। ইহাতে পাণ্ডিত্যেরও কোনো পরিচয় নাই। তবে এই পুস্তকখানি সমধিক সরলতার সহিত লিখিত হওয়ায় এবং ইহার স্থানে স্থানে সম্রাটের নিন্দাবাদ থাকায় এই পুস্তকের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" অধ্যাপক ডাউসনও বলিয়াছেন,—These memoris afford much amusement from the raine and simple style in which they are written." অর্থাৎ এই জীবন-স্মৃতি সরল ভাষা-বিন্যাসের জন্য বড়ই আনন্দদায়ক।

দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে সম্রাট্ হুমায়ূন সিংহাসনারোহন করেন। তখন হইতে জহর এই জীবন-স্মৃতির ঘটনাবলী স্মৃতি-পথে রাখিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং সম্রাট্ হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী জানিবার কোনো উপায় নাই।

হুমায়ূনের পিতা বাবরের জীবন-স্মৃতি পাঠে জানা যায় যে, আফগান দিগের সহিত যুদ্ধকালে হুমায়ূন স্বীয় জনকের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বাবর জীবিতাবস্থায় হুমায়ূনকে অনেক প্রকার সদুপদেশ দিতেন। একদিন বাবর হুমায়ুনকে লিখিয়াছিলেন, যদি তুমি আমার প্রশংসা লাভ করিতে চাও তবে আমোদপ্রিয় লোকের সহিত মিশিয়া কখনো সময় বৃথা নষ্ট করিয়ো না।

পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাবত্তার জন্য সম্রাট্ হুমায়ূন প্রসিদ্ধ। তাঁহার লিখন-পদ্ধতি অতি সুন্দর এবং ভাষাও অত্যন্ত সরল ছিল। একদিন হুমায়ূন পিতাকে আধুনিক "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী লোকসুলভ" দুরূহ শব্দ-বাহুল্য-পূর্ণ একখানি পত্র প্রেরণ করায় তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া হুমায়ূনকে লিখিয়াছিলেন—

* * * তোমার পত্র পড়িতে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য হয়, কিন্তু দুরূহ ও জটিল বাক্যাবলীর সমাবেশে পত্রের বিষয় বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। ভবিষ্যতে স্পষ্ট করিয়া সরল কথায় পত্র লিখিবে, তাহাতে পত্র লেখক ও পাঠক উভয়েরই শ্রমের লাঘব হইবে।" বলা বাহুল্য তদবধি হুমায়ূন সরল ভাষায় লিখিবার অভ্যাস করেন।

পুত্রের অসদাচরণের জন্য সম্রাট বাবরকে কখনো মনোকষ্ট পাইতে হয় নাই। একবারমাত্র হুমায়ুন দিল্লীতে আসিয়া বলপুর্ব্বক কয়েকটি গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া তন্মধ্য হইতে অর্থ লইয়াছিলেন। রাজ-নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য করায় তিনি হুমায়ূনকে কয়েকখানি ভৎসনা-পূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। দুঃখের বিষয় Memoirs of Baber সেই পত্রগুলির একখানিরও উল্লেখ করেন নাই। কথিত আছে হুমায়ূন একদা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার জীবনের আদৌ আশা ছিল না। তখন আবুলবক নামে জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ লোক বলিলেন যে, যদি রোগীর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে রোগীর রোগের বিনিময়ে আপন বহুমূল্য পদার্থ প্রদান করেন তবেই ইহার পুনর্জ্জীবনলাভের সম্ভাবনা। পুত্রগত প্রাণ বাবর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিলেন,—আমি পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে আপন প্রাণ প্রদান করিব। ওমরাহগণ এই

নিদারুণ সংকল্প হইতে সম্রাটকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন এবং আপন প্রাণের পরিবর্ত্তে আগ্রার প্রাপ্ত হীরক-খণ্ডের বিনিময় করিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু পুত্রবৎসল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ সম্রাট বাবর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে হুমায়ূন ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া সতেজ হইতে লাগিলেন। এদিকে পিতা বাবরও ক্রমে ক্রমে শক্তিশূন্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে হুমায়ূনের আরোগ্যলাভের কয়েক দিন পরে সম্রাট বাবর ইহলোক ত্যাগ করেন।*

এই জীবন-স্মৃতি পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট হুমায়ূন নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন। তবে যে তিনি নিখুঁত ধার্ম্মিক ছিলেন, এ কথা বলা যুক্তি-সম্মত নহে। কারণ মানুষের পক্ষে পূর্ণগুণশালী হওয়া সম্ভবপর নহে।

অবতরণিকা

হুমায়ূন সম্রাট বাবরের পুত্র। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আলমগীর আওরেঙ্গজেব, বাহাদুর শাহ, ফররুকসির, মহম্মদ, আহম্মদ, আলমগীর (দ্বিতীয়), সাহ আলম এরং আকবর (দ্বিতীয়) এই একাদশ জন সম্রাট হুমায়ূনের উত্তরাধিকারী।

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে হুমায়ূন কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৎসরেই তাঁহার পিতা বাবর "পাদ্‌শাহ" উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম কামরণ, তৃতীয়ের নাম হিন্দাল এবং চতুর্থের নাম আস্কারী এবং সমস্ত ভ্রাতারই "মির্জ্জা" বা যুবরাজ উপাধি ছিল।

প্রথম অধ্যায়

(সম্রাট বাবরের মৃত্যু ও নাসিরুদ্দিন মহম্মদ হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণ—১৫৩০ খৃষ্টাব্দ)

সম্রাট হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের পর বিন্ ও বাইজিদ্ এবং মহম্মদ লোদী বিদ্রোহাবলম্বন করেন। সম্রাট বিদ্রোহ-দমনার্থে কালিঞ্জর হইতে জৌনপুর-অভিমুখে যাত্রা করেন। গুম্তী নামক নদীর তীরে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। এইখানে বিদ্রোহ

* Vide memoirs of Baber p. 427.

দমন করিয়া সম্রাট চুণার দুর্গ অধিকার করিতে যাত্রা করেন। চুণার দুর্গ তখন সুবিখ্যাত যোদ্ধা সেরখাঁর পুত্র জেলাল খাঁর অধিকারে ছিল। চারি মাস ব্যাপি অবরোধের পর অনন্যোপায় জেলাল সম্রাটের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন, ফলে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সম্রাটের গুজরাট অধিকার—১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)

সম্রাট্ গুজরাটে যাইবার পথে চিতোর দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর সম্রাটকে লিখিয়া পাঠান যে, তিনি চিতোর অবরোধ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই সেখানে মুসলমান বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সুলতান বাহাদুরের অনুরোধ-ক্রমে সম্রাট চিতোর দুর্গাবরোধ-সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। সুলতান বাহাদুর চিতোর দুর্গ জয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সম্রাট সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া বারহাণপুর জেলান্তর্গত মুরী নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিবামাত্র সুলতানের সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিল। প্রধান প্রধান যোদ্ধার সহিত পরামর্শানন্তর তিনি শত্রু-সৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতে এবং যাহাতে মুষ্টি-পরিমাণ খাদ্য শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে আপন সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। এই ভাবে প্রায় তিন মাস অতি-বাহিত হইল। আমাদের প্রতিদ্বন্দীগণ খাদ্যাভাবে অশ্বমাংসে জঠর-জ্বালা নিবৃত্ত করিতে লাগিল। অবশ্য এই তিনমাস যে উভয় পক্ষীয় সৈন্য তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতেছিল তাহা নহে; উভয় পক্ষে সামান্য যুদ্ধ চলিতেছিল।

একদিন নিশীথে অরাতি-শিবিরে ভয়ানক কোলাহল শুনা গেল। সম্রাট কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আলিকুলীকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন, শত্রুগণ পলায়ন করিতেছে। দুর্দ্ধর্ষ শত্রু-সৈন্যের পলায়ন-সংবাদ শ্রবণে সম্রাট সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবানকে অশেষ প্রকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর সম্রাট অশ্বারোহণপূর্ব্বক সুলতানের পশ্চাদানুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে

* History of Bengal page 138.

রুমি খাঁ নামক সুলতানের একজন বিতাড়িত সেনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। রুমি খাঁকে সম্রাট আপন সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করিলেন।

সুলতান বাহাদুর সসৈন্যে মালব প্রদেশস্থ মুণ্ডু দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া সম্রাটের বিজয়ী সৈন্যগণ সেই দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং অচিরে দুর্গাবরোধ করিলেন। সেখানে অবস্থিতি নিরাপদ নহে জানিয়া সুলতান তথা হইতে চুণপাণির দুর্গাভিমুখে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে মণ্ডু দুর্গ অধিকার করিয়া চুণপাণির দুর্গাভিমুখে সম্রাট্ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। সুলতান বাহাদুর তচ্ছ্রবণে কাম্বে পলায়ন করিলেন—চুণপাণির মোগল সম্রাটের অধিকার ভুক্ত হইল। দুর্গ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু দুর্গাভ্যন্তরস্থ ধনরত্নাদির কোনোই সন্ধান পাইলেন না। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে আলম খাঁ নামক সুলতানের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী দর্শনেচ্ছু হইয়া সম্রাট্‌সমীপে আগমন করিলেন। কয়েকজন কর্ম্মচারী সম্রাট্‌কে পরামর্শ দিলেন যে, আলম খাঁকে যাতনা দিলে সে নিশ্চয়ই ধনরত্নাদির সন্ধান বলিয়া দিবে। কিন্তু আমার উদারহৃদয় প্রভু বলিলেন যে, এই ভদ্রলোক অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহার প্রতি অত্যাচার নিতান্ত

সম্রাট্ হুমায়ুন।

অন্যায় কার্য্য। যদি কোমলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করা যায় তবে রুদ্রভাব প্রদর্শনের প্রয়োজন কি? এই কথা বলিয়া সম্রাট্ অতিথির আহারের জন্য একটি ভোজের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন এবং সেই ভোজের সময় আগন্তুককে প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করাইতেও বলিলেন। অনতিবিলম্বে সম্রাটের আদেশানুযায়ী কার্য্য করা হইল। অত্যধিক সুরাপানে অচৈতন্য হওয়ায় আলুম বেগ ধনরত্নাদির সন্ধান বলিয়া দিলেন। সম্রাট সেই অপরিমেয় ধনের কিয়দংশ আপন সৈন্যদলের মধ্যে স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে বিভাগ করিয়া দিলেন। তদনন্তর সম্রাট্ তার্দ্দিবেগকে চুণপাণির শাসনকর্তৃপদে প্রতিস্থাপিত করিয়া কাম্বে-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু লব্ধধনরত্নে সৈন্যগণের ধন-পিপাসা সহজে নিবারিত হইবার নহে। তাঁহারা সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলেন যে, "সম্রাট্ সুলতান বাহাদুরকে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহার যাবতীয় ধনরত্ন হস্তগত করিয়াছেন। এখন দুই তিন বৎসর সৈন্যগণকে অগ্রিম বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য এবং অবশিষ্ট ধন ভবিষ্যত যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য রাখা প্রশস্ত। অধিকন্তু পলায়িত সুলতান বাহাদুরকে গুজরাটের ডেপুটী শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা বিধেয়। ইহাতে সম্রাটেরও যশোরশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইবে এবং সম্রাট্ও তাঁহার অন্যান্য প্রদেশের শাসন-ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবেন; বিশেষতঃ রাজধানী আগ্রা সহরে সম্রাটের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন।"

সম্রাট্ পরামর্শদাতৃগণের অযাচিত পরামর্শে বড় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, নিজ ভুজবলে এই সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ জয় করিয়া শেষে কোন্ প্রাণে আমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইব? আমি এ প্রদেশ দিল্লীর অন্তর্ভূত করিব।

পরামর্শদাতৃগণ সম্রাটের অসন্তোষ-দর্শনে বিফল প্রযত্ন না হইয়া যুবরাজ আস্কারীকে দিল্লী অধিকার করিবার জন্য দুষ্ট পরামর্শ দিতে লাগিলেন। ফলে যুবরাজ পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। যুবরাজকে এবং প্রধান প্রধান সেনা ও অমাত্যবৃন্দকে আপন মতের প্রতিকূল বুঝিয়া এবং কাম্বে গমনে তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছুক জানিয়া সম্রাট কাম্বে-যাত্রা-সংকল্প পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক আহম্মদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

পৌণ্ড্রিক

—•—

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাশাপাশি দুইটি বাড়ী। উভয়ই প্রকাণ্ড গড়খাই পরিবেষ্টিত। তদুপরি নাতি উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর। প্রাচীর অতিক্রম করিয়া আম্র, জাম, তমাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ রাজি নিবিড় বনের আকারে সজ্জিত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে কদাচিৎ শৌধ চূড়ার শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। ডাক্তার গ্রেগ বলিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দুরা জলের পবিত্রতা রাখিতে জানিত, তাই প্রাচীন নগর কি গ্রাম যাহা তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল, তথায় চারিদিকে সমুচ্চ তীর ভিতরে সামান্য একটু বকচরের পরে নীল জল পূর্ণ প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা রহিয়াছে। তাহার চারি-দিকের ঘাট ইষ্টক কি প্রস্তরে গাথা, প্রায়শ ঘাটের উপরে শিব মন্দির কি মঠ স্থাপিত আছে। আজি পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী বাঙালী এ সকল অসভ্য প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে সকলে পল্লীবাস ছাড়িয়া সহরের কলের জলে পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছেন, এবং মিউনিসিপালিটির হস্তে স্বাস্থ্যের ভার নিয়োগ করিয়া দ্বিতল গৃহের টানা পাখার বাতাস খাইতেছেন। যে বাড়ী দুইটির পরিচয় দিতেছি, তন্মধ্যে একটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। সুন্দর অট্টালিকা রাজি পরিপূর্ণ বহির্ব্বাটী অন্দর বাটী, মসজিদ প্রভৃতি বিশোভিত। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে গৃহস্বামী অতি ব্যয়ী বিলাসী ও নীতি হীন হইয়া দাঁড়াইলেন। শরীর এবং সম্পত্তি উভয় লইয়াই টানাটানি পড়িল। পরে শরীর বিনিময়ে সম্পত্তি রক্ষিত হইল। অর্থাৎ গৃহস্বামীর মৃত্যু হইল, এবং সম্পত্তি রাজশক্তি দ্বারা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে রক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে দেনা শোধ হইল, বাড়ী ঘর মেরামত হইতে লাগিল, গৃহ সুন্দর বেশ ধারণ করিল, কিন্তু দিন রাত্রি যে হৈ হৈ রৈ রৈ রব, তাহা আর রহিলনা। বহির্বাটিতে বৈঠক খানায় কয়েকটি আমলা লেখা পড়া করে, ও খানসামা চাকরেরা অবস্থান করে। গৃহ মধ্যে গৃহিণী ও তাঁহার একমাত্র কন্যা ময়মনা নিস্তব্ধ শান্তিতে অবস্থান করেন। অনেকে গৃহস্বামিণীকে নিকা করিতে চাহিয়া-ছিল, কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে রাজি হয়েন নাই।

অন্য বাড়ী ধনাঢ্য গৃহস্থ নিবাস, হিন্দুবংশোদ্ভব, পূর্ব্বে ঐ মুসলমান জমিদার বাড়ীতে কার্য্য করিতেন, এক্ষণে আর চাকর মনিব সম্বন্ধ নাই। গৃহস্বামী পরিণত পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, ক্রমে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া বহুপরিবার সহ তথায় বাস করিতেছেন। এক্ষণেও উভয় পরিবারে সৌহৃদ্দ যায় নাই। খামার অর্থাৎ জমিদার বাড়ীকে হিন্দু পরিবার বেশ সন্মান করিয়া চলিতেন। তাঁহাদের ভিতরে ভিন্ন জাতির ভাব ছিলনা। যখন জমীদার বাড়ীর পুরুষ অভিভাবক বিদ্যমান ছিলেন তখন ফকির মোসাফেরগণ হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি উক্তবিষয়ে বেশ উদার ছিলেন এবং নিকট বর্ত্তি সহরের হিন্দু হাকিম ও ভদ্রলোকগণের সহিতই অধিক মিশিতেন মুসলমানেরা বলিত সে তজ্জন্যই তিনি সুরাপান আরম্ভ করিয়াছিলেন, একথার আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। যাহাহউক এক্ষণে রামধন বাবু উক্ত পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ও উভয় পরিবারে বিশেষ বন্ধুত্ব দৃষ্ট হয়, এখনকি, খুড়া দাদা প্রভৃতি সম্বন্ধ ও আছে। প্রবাদ যে এক সময়ে উক্ত পরিবার হিন্দু ছিলেন কোন নবাব জোর করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইঁহারা খাটী মুসলমান, তবে হিন্দু বিরোধী নহেন। রামধন বাবুর ছেলেরা অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারী, ও সংসারে বেশ উন্নতি করিয়াছেন। কিন্তু রামধন বাবুর অনুরোধে উক্ত জমিদার বংশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল তাহাদের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই সকল কারণে বিপদ আপদ সময়ে চৌধুরাণী সাহেবা রামধন বাবুকে ডাকিয়া পরামর্শ গ্রহণ করেন, এবং পরদার অন্তরালে আসিয়া কথা বার্ত্তা বলেন। স্ত্রীলোক দিগেরও যাতায়াতের কোন বিঘ্ন নাই। চৌধুরাণী সাহেবার কন্যা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, এবং ঘরে পণ্ডিত রাখিয়া তাহার শিক্ষাদি চলিতেছে। হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমান বড়ঘরের কন্যাগণ অল্প বয়সে বিবাহিতা হয়েন না। এবং কেহ সাদরে সম্বন্ধের প্রস্তাব না করা পর্য্যন্ত ইঁহারা কন্যার সম্বন্ধের প্রস্তাব কোথাও করেন না। সুতরাং এক্ষণেও বিবাহের নাম করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুইটি যুবক ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার পরে ধীরে ধীরে ব্রহ্মমন্দিরের মধ্য হইতে বাহির হইলেন, এবং রাজপথে আসিয়া পরস্পর অভিবাদন করিলেন। পরে একজন একটু হাসিয়া বলিলেন, "অতুল বাবু, তোমাদের সার্ব্বজনিক

প্রেম কেবল মৌখিক? বক্তৃতায় তোমরা পটু, আচার্য্যদেব বোধ হয় ভ্রাতৃভাবের বক্তৃতা দিয়াই মনে করেন, সব কার্য্য শেষ হইল।”

অতুল। কেন রমজান মিয়া, আমরা যাহা বলি, তাহা কাজেই তো করিয়া থাকি।

রমজান। আপনারা সেই আজীমউদ্দীনকে তো কোন ব্রাহ্ম বোর্ডিংএ স্থান দিলেন না, দাসদাসীর আপত্তি বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখান করিলেন। এই কি ভ্রাতৃভাব?

অতুলের হৃদয়ে তখন আচার্য্যের উপদেশ জাগিতেছে, ভক্তিভাব প্রগাঢ় হইয়াছে, এক্ষণে তর্ক করিবার সময় নহে, বলিয়া তিনি বলিলেন, অন্য সময়ে আপনার সহিত এ বিষয়ে আলাপ হইবে। অথবা কার্য্য দ্বারা আমি আপনার এ ভ্রান্তি দূর করিব।

রমজান। সেই ভাল, Example is Better than precper.

অতুলচন্দ্র রামধন বাবুর তৃতীয় পুত্র। সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র যুবা, ধর্ম্মপথে প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি যখন এবার বাড়ী আসিলেন, তখন রমজানের কথা ভুলিলেন না। তিনি তাঁহার বিশ্বপ্রেম কার্য্যক্ষেত্রে পরিচয় দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবীন মণ্ডল নামক সেই গ্রামবাসী এক নমশূদ্রের কন্যার বিবাহ। অতুল বাবু তাহার বাড়ী গিয়া বিবাহের কি কি আয়োজন হইল, সকল পরিদর্শন করিলেন, নবীনের কন্যা দশ বৎসরের, তিনি এত অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে সুযুক্তি দিলেন, কিন্তু সে অবস্থানুসারে উপদেশ গ্রহণ করিল না, এবং সবিনয়ে জানাইল যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আর সে পিছাইতে পারে না। অতুল বলিলেন ভবিষ্যতে আর যদি এমন বাল্য-বিবাহ দিব না, প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমার বাড়ীতে থাকিতে পারি। তাহাতে সম্মত হইলে আর কোন বাধা রহিল না। পরে তিনি যে ভাবে মিশিলেন, সকলেই ভাবিল তিনি নবীন মণ্ডলের গুরু কি পুরোহিত কি আত্মীয়। নবীন তাহাকে বসিতে উৎকৃষ্ট আসন দিল, তিনি অন্য সামাজিক দিগের সহিত একত্র বসিলেন এবং তাহাদের সহিত জলপান করিলেন। নমশূদ্রগণ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। গ্রামে আন্দোলন হইল, স্বজাতীয়েরা সমাজে অবরুদ্ধ করিতে আসিলেন। তখন অতুল নির্ভীক ভাবে বলিলেন, আমি আপনাদের ও নমশূদ্রের সমান বলিয়া মনে করি। মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। অতুল সে নিপীড়ন বিনা ক্লেশে সহ্য করিলেন।

মুসলমান প্রতিবেশীর কন্যা ময়মনা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। সে দেশের নিয়ম এই যে কাক পর্য্যন্ত ওলাউঠা রোগীর বাড়ী যায় না। সে বাড়ীর হাট বাজার বন্ধ, কুটুম্ব আত্মীয় সে বাড়ীতে আইসে না। ভৃত্যেরা তো রোগের নাম শুনিয়াই পলায়ন করিল, কর্ত্রী বিবি খিড়কী দ্বার দিয়া রামধন বাবুর বাড়ী আসিয়া কান্দিয়া পড়িলেন, তখন অতুল তথায় ছিলেন, তিনি বলিলেন, মা, চিন্তা করিবেন না। চলুন আমি সঙ্গে যাইতেছি। অতুলের চিকিৎসাশাস্ত্রে বেশ অধিকার ছিল, তিনি নিজ হস্তে ঔষধ পথ্য প্রস্তুত করাইয়া সেবন করাইতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও মান্য এই চৌধুরী পরিবারের সাহায্যের জন্য আর কোন আত্মীয় কুটুম্ব আসিল না, অতুল বাবু দুই একটি বন্ধু লইয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে আরোগ্য লক্ষণ উপস্থিত হইল। ময়মনার মাতার মুখ প্রফুল্ল হইল, অতুলেরও যত্ন সফল হইল। দিবসে ও রজনীতে অতুল সর্ব্বদা ঔষধ পথ্য সেবন করাইতেন, ময়মনা বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত এবং আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিত। অতুলবাবু তখন মল ও বমন নির্গত পদার্থ সকল দগ্ধ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করাইতে লাগিলেন। রোগীর পরিত্যক্ত শয্যাদি দাহন করাইলেন, এবং মূল্যবান যাহা, তাহা বাড়ী হইতে দূরে জল উঠাইয়া আনিয়া ধৌত করাইয়া পরে গন্ধকের ধূমে তাহা শুদ্ধ করাইয়া লইলেন। বাড়ীতে সর্ব্বত্র অগ্নি জ্বালিয়া গন্ধক ও ধূপ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। শ্বেত শ্বেতে স্থানের শুষ্কতা সাধন করাইয়া দিলেন, এবং জল গরম করিয়া তাহা উত্তমরূপে ছাকিয়া পান করিতে দিলেন। এইরূপে নিজবাড়ীতে যেমন করিতেন, তথাও তেমনি যত্ন ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিলেন। কন্যার মাতামহ কি মাতুল কেহ রোগের সময় আসিলেন না। ময়মনা যেন বন্ধুহীনা, এরূপ প্রতীয়মান হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ময়মনা একদিন গভীর রজনীতে অতুলের নিকট ঔষধ পান করিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অতুল বাবু, আমার নিকট, আমাদের বাড়ীতে আসিতে আপনার ভয় করে না?

অতুল। কেন ভয় করিবে? আর ভয় হইলেই বা তোমাকে পরিত্যাগ করিব কেন? একদিন মৃত্যুত সবারই হইবে।

ময়মনা। আমার নানা কি মামু কেহ তো আসিলেন না? মা কতবার খবর দিয়াছিলেন, তাঁহারা অসুখের ভাণ করিয়া আসেন নি। আমার মামাত ভাই রমজান আপনার মতো কলেজে পড়েন, তিনিও তো একবার আসিলেন না। আর দিন নাই রাত্রি নাই আপনি আমার শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না।

অতুল। আমি আপনার অধিক কি করিয়াছি? প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য মাত্র সম্পাদন করিয়াছি।

ময়মনা। আর, কোনো প্রতিবেশী তো আসে না? মা বলিয়াছেন, আপনি যাহা করিতেছেন, আমার পিতাও তাহা করিতেন কি না সন্দেহ।

অতুল। যে পরের উপকারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারে, তাহার জীবন ধন্য।

ময়মনা। আপনি ধন্য, কারণ আমার জন্য আত্ম-প্রাণ তুচ্ছ করিয়াছেন। আমি জীবনে এ কথা কখনো ভুলিব না।

অতুল। ময়মনা, এক্ষণে তুমি এ বিষয়ের জন্য মনকে উত্তেজিত কোরো না। পরে কথা হইবে। ইহাতে তোমার রোগ বাড়িবে।

ময়মনা নিরস্ত হইল।

অতুল যে ময়মনার জন্যই এ রূপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। গ্রামের আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেরই প্রতি এইরূপ করিতেন। তাই লোকে তাঁহাকে বিপদের একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে করিত। যে সমস্ত লোক তাঁহার সামাজিক উৎপীড়নের কারণ ছিলেন, তাহাদের জন্য তাঁহার সেবাব্রত বন্ধ ছিল না। অতুল শত্রু-মিত্র বাছিতে জানিতেন না।

অতুলের পিতা রামধনবাবু সাবেকী ধরণের লোক হইলেও অতুলের এ সকল কার্য্যে কোনো বাধা দিতেন না, বরং তাঁহাকে আরো সৎকার্য্যে উৎসাহ দিতেন।

ময়মনা আরোগ্য হইলেন, একদিন তাহার মাতা আতুলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতুল অস্বীকার করিলেন না।

অতুল আহার করিতে বসিলে ময়মনা তাহার নিকট আসিয়া বসিল। ময়মনার বয়স তখন ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ হইবে। ময়মনা বলিল, "অতুলবাবু, হিন্দুরা আমাদের বাড়ি খায় না, আমাদের জল পর্য্যন্ত ছোঁয় না, আর আপনি যে খান, ইহার কারণ কি?"

অতুল। জগতে হিন্দুকে একজন ও মুসলমানকে আর একজন সৃষ্টি করেন নাই। আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের পুত্র কন্যা, আমার মতে এ হিন্দু, ও মুসলমান, এ রূপ জাতিভেদ করা অন্যায় ও অধর্ম্ম।

ময়মনা। আমরা আল্লার পূজা করি, আপনাদের কি আল্লা নামে দোষ আছে?

অতুল। আমাদের ব্রহ্ম ও তোমাদের আল্লা একই, জগতের স্রষ্টা ও পাতা একমাত্র ঈশ্বর, তিনিই সকলের পূজনীয়, এবং সকলেই তাঁহার পূজা করে।

ময়মনা। তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মগত পার্থক্য কোথায়?

অতুল। কতকগুলি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। তোমরা বলো কোরাণ অভ্রান্ত শাস্ত্র। আমরা বলি, সত্যই একমাত্র শাস্ত্র, কোরাণের মধ্যে যাহা সত্য তাহা শাস্ত্র, যাহা সত্য নহে তাহা শাস্ত্র নহে। তোমরা যে মহাত্মা মহম্মদকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া মানো, আমরাও তাঁহাকে মানি, তবে আমরা আর আর মহাপুরুষকেও তদ্রূপ উচ্চস্থান দেই।

ময়মনা। যদি ধর্ম্মে পার্থক্য না থাকে, তবে আমাদের এ রূপ ভিন্নতা কেন?

অতুল। এ সকল ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে নাই, যাহারা গোঁড়া, অর্থাৎ অর্থ বুঝিতে পারে নাই, অথচ ব্যক্তি-বিশেষ কি শাস্ত্র-বিশেষ যাহা বলিয়াছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই প্রামাণ্য মনে করে না, তাহাদেরই সেই ভাব আছে।

ময়মনা। আপনার আচার ব্যবহার ও আপনার সাধু চরিত্র দেখিয়া মনে হয় যে, আপনি প্রকৃত ধর্ম্ম কি বুঝিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, আপনার নিকট উপদেশ লই।

ময়মনার মাতা বলিলেন, "অতুল, বাবা তুমি যে সুন্দর গান ও উপাসনা করো, একদিন আমার বাড়িতে তাহা করিতে হইবে। আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা করে।"

অতুল সন্তোষ-সহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ময়মনা অতিশয় আনন্দিত হইয়া কবে সে দিন হইবে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ও ব্যগ্রতা সহকারে দিন গুণিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে নমশূদ্র, ধীবর, রজক প্রভৃতি হিন্দুর অস্পৃশ্য জাতিসকল অতুল বাবুর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত একত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। তিনি

অতি সরল ভাষায় তাহাদের সহিত উপাসনা করিতেন, এবং প্রত্যেককেই আপন ভাষায় ঈশ্বরের নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিতে শিখাইতেন। তাঁহার উদারতায় তাহারা মুগ্ধ হইল। গ্রামের মধ্যে তাহারা একটি হরিসংকীর্ত্তনের গৃহ প্রস্তুত করিল।

যেদিন ময়মনা বিবির বাড়িতে উপাসনার কথা ছিল, সেদিন একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক সঙ্গে করিয়া অতুল বাবু সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্দ্দার অন্তরালে ময়মনা, তাহার মাতা, অতুল বাবুদের বাড়ির নারীগণ ও প্রতিবেশিনী হিন্দু ও মুসলমান সকলে বসিলেন। বাহিরে অতুলবাবু ও কয়েকটি বন্ধু উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মধুর সঙ্গীত—অতুল বাবুর মধুর উপাসনা ও ভাবোচ্ছ্বাস, অতি সুন্দর উপদেশ, আমরা একমায়ের পুত্র, হিন্দু মুসলমানে কোনো ভেদ নাই, এই ভাব অবলম্বন করিয়া এমন মধুর উপাসনা আরম্ভ করিলেন তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইল।

আজি ময়মনার হৃদয়ে নূতন ভাব-তরঙ্গ ছুটিল। যদি জাতি-ভেদ কৃত্রিম হয়, যদি প্রকৃতই হিন্দু মুসলমানে ভেদ না থাকে, তবে হিন্দু ও মুসলমানেরা একত্র আহার-বিহার ও বিবাহ করিতে পারে! অতুল বাবুর মতো যদি এক জন হয়, অতুলবাবু—হাঁ, যদি সাধু, রূপবান্, গুণবান্ ও বিদ্বান্ সেইরূপ একজন হিন্দুর সহিত আমার মিলন হয়। আমার মাতা কি তাহাতে সম্মত হইবেন? মুসলমান-সম্প্রদায় কি তাহাতে আপত্তি করিবে না। করুক, আমি কোনো সম্প্রদায়ের নহি, আমি কাহারো নহি, আমি নিজে নিজের, আমি এবং মাতা, আর কেহ আমার নাই। সময়ে কত লোক বন্ধুতা দেখায়, কত জন বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছে, তাহারা আমার কলেরার দিন কোথায় ছিল, আজি শুভ দিনে সকলে আসিয়া উপস্থিত। বিশেষত আমাদের সকলের কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তিনি মত করিতেও পারেন। একবার মাকে বলিব কি? না, দেখি অতুলবাবুর কি মত, যদি তিনি রাজি হন, তবে আমার আর বাধা কি? মুখে বলিতে পারিব না।

মাতা ও অতুলবাবুর যত্নে ময়মনা বেশ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল। তাই অতুল বাবুর নিকট সে একখানি পত্র লিখিল;—

"মাননীয় অতুলবাবু,

সেদিন আপনি আপনার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান এক মাঁয়ের সন্তান। ইহাদের আহার-বিহার ও সম্মিলনে কোনো বাধা নাই।

তবে আপনাকে একটি কথা বলিলে কি আপনি তাহা ভালোভাবে গ্রহণ করিবেন? আমি দেখিলাম, জগতে আপনি ভিন্ন আমার আর বন্ধু নাই। বিপদের দিনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, এমন কেহ নাই, আমার সঙ্কট পীড়ার সময় আপনি জীবন দান করিয়াছেন। সুতরাং এই বন্ধুত্ব যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, এমন একটি বন্ধন আমাদের মধ্যে হইতে পারে কি?

আমার মনে হয়, জগতে যদি আমি আপনাকে পাই, আর সকলই পরিত্যাগ করিতে পারি, আপনি দয়া করিয়া একবার আসিবেন, আমি এ বিষয়ে আরো যাহা চিন্তা করিয়াছি তাহা আপনাকে বলিব।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—ময়মনা।"

ময়মনা মাতার নিকটও ধীরে ধীরে বলিল, "মা তুমি বলিয়াছিলে যে আমার মাতুলের পুত্র আমাকে বিবাহ করিতে চান, কিন্তু তা'হার অন্য এক স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, কেবল সম্পত্তির লোভেই আমাকে চায়। তাহার চরিত্রও ভালো নয়।

মাতা। তা তো ঠিক, কিন্তু অন্য সম্বন্ধ তো দেখি না, সকলেই এইরূপ তোমাকে তো কেহ চায় না, তোমার সম্পত্তিই সকলে চায়। তোমার যে কিসে সুখ হইবে আমি দিন রাত্রি কেবল তাহাই ভাবি।

ময়মনা। মা, সেদিন অতুল বাবু যে বক্তৃতায় বলিলেন, হিন্দু মুসলমানের মিলনে কোনো বাধা নাই, তবে—

মাতা। বাছা তাহাতে আমাদের সমাজে ও তাঁহাদের সমাজে অনেক বিঘ্ন হইবে, তবে তিনি যদি সকলকে তুচ্ছ করিতে পারেন, তাহা হইলেই হইতে পারে। যখন তুমি আমার একমাত্র কন্যা, তখন যেখানে তুমি সুখী হও, আমি তাহাই করিব। তাহাতে কোনো বাধা দিব না, আমাদের কোনো আত্মীয় কিছু বাধা দিতে পারিবে না, কারণ আমি কাহারো অধীন নই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাবইন্স্পেক্টর বনমালীবাবু পুলিসের পোষাক পরিধান করিয়া পুণ্ডরিয়া গ্রামে রামধনবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। অতুলবাবু তথায় বসিয়াছিলেন, দারোগা অতুলবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক অতি কুৎসিৎ অভিযোগ, এ গ্রামের একটি বালবিধবার সন্তান সম্ভাবনা বলিয়া একজন এই দরখাস্ত করিয়াছে। অতি লজ্জাকর বিষয় বলিয়া আমি কোনো নিম্ন কর্ম্মচারীর উপর ভার

না দিয়া নিজেই তদন্ত করিতে আসিলাম। আপনি এই অনুসন্ধানে সাহায্য করুন, বালিকার নাম হরিমতি। জাতি কৈবর্ত্ত।"

অতুলবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। হরিমতি তাহার মায়ের সহিত আমাদের বাড়িতে কত আসিয়া থাকে, তাহার মতো শান্ত মেয়ের এরূপ অপবাদ, নিশ্চয়ই কোনো পাষণ্ডের চক্রান্তে তাহার ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। তিনি কৈবর্ত্তদের বাড়ি গিয়া দারোগা আসার কথা বলিলেন।

হরিমতি অতুলবাবুর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—"দাদা, তুমি আমায় রক্ষা করো, আমি মরিব, প্রাণ রাখিব না। তুমি কি আমার কোনো উপকার করিতে পারিবে, না?

অতুল বলিলেন, "হরিমতি তোমায় এত ভালো জানিতাম, কে তোমার এমন সর্ব্বনাশ করিল?"

হরিমতি কাঁদিতে লাগিল, পরে বলিল,—"ওই পাড়ার হরনাথ, আমাদের স্বজাতি। সে বলিয়াছিল, 'হরিমতি তুমি তো শুনিয়াছ, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধির অন্তর্গত, এসো আমরা গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি'।"

অতুল। তাহার স্ত্রী আছে?

হরিমতি। না, কিন্তু একটি ছোটো মেয়ে আছে।

অতুল। তুমি প্রকাশ্যে তাহাকে বিবাহ করিবে?

হরিমতি। যদি সে সম্মত হয়।

অতুল। সে ভার আমার রইল।

তখন অতুল ও দারোগাবাবু উভয়ে হরনাথকে ডাকিলেন, এবং কতক ধমক দিয়া এবং কতক উপদেশ দ্বারা তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইলেন। সেইদিন নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পাদিত হইল। অতুলবাবু ও সাবইনিস্পেক্টরের হৃদয় হইতে একটি বিষম ভার অন্তর্হিত হইল। অতুলবাবু সাবইন্‌স্পেক্টরকে এই ভাবে কার্য্য করার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, তবে আপনার দর্শনী।

দারোগাবাবু অতি ভদ্রলোক, তিনি বলিলেন,—আমিই বরকন্যার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ২৲ টাকা আপনার নিকট দিলাম।

অতুলবাবুর সহিত বনমালীবাবুর হিন্দুসমাজের এরূপ দুর্দ্দশার কথা লইয়া আলোচনা হইল এবং অভাগিনী বালবিধবাদের দুর্দ্দশার বিষয় লইয়া উভয়ে আক্ষেপ করিলেন। বনমালীবাবু বলিলেন, "কি বলিব ভাই, আমারই

গৃহে দুইটি বালবিধবা আছে, আমি তাহাদের বিবাহের উদ্যোগ করিতেছি, আপনার সাহায্য চাই।”

অতুলবাবু বলিলেন, “আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমিদারের ম্যানেজার। এক বৎসর তাঁহার সহধর্ম্মিনীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছি যে, মৃতদারদিগের বিধবা বিবাহ করাই কর্ত্তব্য, তাঁহাদের কুমারী বিবাহের কোনো অধিকার নাই। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আপনার সেই পাত্রীটিকে আমি দেখিয়া আসি।”

বনমালীবাবু সম্মত হইলেন। বনমালীবাবু সেদিন পরম সমাদরে তথায় আহারাদি করিলেন, এবং যত শীঘ্র হয়, উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অতুল বাবুকে অনুরোধ করিলেন।

কুমার পাড়ায় বড় রাগারাগী হইতেছে, এমন কি, মারামারী হয়, এরূপ। তখন অতুল ঘটনা কি জানিতে অগ্রসর হইলেন। শুনিলেন, যে রামগতি কর্ম্মকার বড় চেঁচামেচি করিতেছে। সে অতুলের একটি পরমসুন্দর ও সচ্চরিত্র শিষ্যকে গালি দিতেছে। সে জাতিতে সোনার বেণে।

অতুল বলিলেন, “প্রহ্লাদ তো অতি সাধু যুবা ও আমার শিষ্য, তুমি তাহাকে গালি দিতেছে কেন?”

রামগতি। আরে মহাশয় দেখুন, আমার স্বজাতি এ দেশে নাই, আমার কন্যাটি বড় হইয়াছে। প্রহ্লাদ বলে, আমারো তো এখানে স্বজাতি নাই, এই মেয়ের আমার সহিত বিবাহ দাও। নিজে বলে না, প্রকারান্তরে লোক দিয়া বলায়। হতভাগিনী মেয়েটাও তাহাতে স্বীকার, এক্ষণে মহাশয় জাতি কুল খোয়া'বো?

অতুল। প্রহ্লাদ তো অতি সাধু ছেলে, পরমসুন্দর, জামাতা হওয়ার উপযুক্ত, অর্থও আছে, বিদ্যাও আছে, ক্ষতি কি?

রামগতি। আরে ঠাকুর তুমিও সেই কথা বলো, আমার জাতি কুল যা'বে, আমি মরিলে আমাকে কে ফেলবে?

অতুল বলিলেন, “আমি তোমার জাতির কার্য্য করিব। আমার যুবকদল তোমার সাহায্য করিবে।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিনোদিনী ও নিস্তারিণী দুইটি ভগিনী। বিনোদিনী বিংশ বর্ষে বিধবা দুইটি সন্তান আছে। নিস্তারিণীর সবে মাত্র পঞ্চদশ, এই বয়সেই বিধবা

হইয়াছে। বিনোদিনী গোঁড়া হিন্দু, পূজা আহ্নিক, জপ, তপ লইয়া ব্যস্ত ও একাহার, হবিষ্যান্ন একাদশী করেন। পৌরাণিক সতীগণের মহত্ব ও পবিত্রতা তাহার মনে দৃঢ়মূল ছিল। তাহাতে যে পরিবারে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহারা সমৃদ্ধ। তিনি তাহার কর্ত্রীস্থানীয়া। তিনি কদাচিৎ বনমালীবাবুর বাড়িতে ভাইকে দেখিতে আসিতেন, এ সময়ে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

নিস্তারিণী বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিতা। দিবারাত্রি কেবল বই লইয়া থাকে, বিধবার আচরণ করে তাহাতে তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। অনেক সময়ে নিজের কষ্টে ক্রন্দন করে।

একদিন বনমালীবাবু বিনোদিনী ও নিস্তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলো তো বিধবা বিবাহ ভালো কি মন্দ?" বিনোদিনী বলিল, "বিধবার আবার বিবাহ? একবারের অধিক কি স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়?"

নিস্তারিণী। কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই পড়োনি? তিনিই তো ব্যবস্থা করেছেন।

নিস্তারিণীর ১২ বৎসরে স্বামী-বিয়োগ হয়, স্বামীকে একবার ভিন্ন দেখে নাই। উভয়ের এই মতভেদ দেখিয়া বনমালীবাবু নিস্তারিণীর সহিত অতুল বাবুর ভ্রাতার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

অতুলবাবু তথায় আসিয়া নিস্তারিণীকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, বড়ই স্নেহের পাত্রী, অতি সুশীলা ও বুদ্ধিমতী, মূর্তিটিও বেশ সুন্দরী।

বাড়ি আসিয়া ভ্রাতার মত জানিলেন, এবং সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

যে গ্রামের কথা আমি লিখিতেছি, তাহার অবস্থিতি উত্তর বঙ্গে। তথায় হিন্দু যাহারা ছিল, প্রায় নির্ব্বংশ। আমি একটি তালিকা দিতেছি।

		১০ বৎসর পূর্ব্বে		লিখিত সময়ে
ব্রাহ্মণ	...	২ ঘর	...	নির্ব্বংশ
কায়স্থ	...	১০ „	...	৮ ঘর
নাপিত	...	২ „	...	১ „
তাঁতী	...	৫ „	...	২ „
কৈবর্ত্ত	...	১০ „	...	৭ „
নমশূদ্র	...	২৫ „	...	২০ „
কোচ	...	২৫ „	...	৩০ „
হাড়ি	...	১০ „	...	১২ „

মুসলমান	...	৫০ ঘর	...	৭৫ ঘর
বৈরাগী	...	১০	...	২০ „

সুতরাং দেখা গেল, যে উচ্চবংশীয় হিন্দু প্রায় নির্ব্বংশ। বিবাহ অভাবেই অনেক হিন্দু নির্ব্বংশ, অনেক বৈরাগী দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে। এক জমিদার-ঘর ব্যতীত মুসলমান বংশের উন্নতি হইয়াছে।

অতুলবাবু হিন্দুর এই অবনতির বিষয় অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটি কারণ স্থির করিয়াছেন ;—

১। জাতিভেদ।

(ক) পুরুষের বিবাহের পাত্রীর অভাব। (খ) মেয়েদের অতি শৈশবে বিবাহ।

২। বাল্য বিবাহ ও অকাল-বৈধব্য।

৩। বিধবা বিবাহের অভাব ও মৃতদারগণের অবিবাহ।

তিনি এই কয়েকটি সংস্কার দূর করিয়া যাহাতে বিবাহ বিষয়ে ও আহারাদি সামাজিক বাধা দূর হইয়া যায় এ বিষয়ে চেষ্টা করিলেন, এবং গ্রাম-মধ্যে যুবকদল গঠিত করিয়া সকলকে এই সকল কথা বুঝাইলেন।

হিন্দু মুসলমানের বিবাহ হয় কিনা, ইহা লইয়া যুবকদলের মতভেদ হইল। কেহ বলিল, যতদিন মুসলমান বহু বিবাহ করিবে, ও তালাক দিবে, ততদিন তাহাদের সহিত হিন্দুর মেয়ের বিবাহ অসম্ভব। সুতরাং ধর্ম্মের দ্বারা সকলকে টানিতে হইবে। তাই গ্রামে এক ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত হইল, হিন্দু মুসলমান সকলেরই তথায় সমান অধিকার, তার নাম হইল, **ঈশ্বরের মন্দির**। মুসলমানেরা তাহাকে আল্লার মন্দির বলিতে লাগিল। সকল ধর্ম্মের সমন্বয় এই মন্দিরের উদ্দেশ্য, একমাত্র ঈশ্বর উপাস্য। কোনো বলিদান নাই, প্রতিমা পূজাও নাই। কোনো ধর্ম্মের নিন্দাও নাই পক্ষপাতীত্যও নাই। লোকে বলিতে লাগিল, ইহারা ব্রহ্ম, ঈশ্বর, বা আল্লা-পন্থী। নামে কিছু আসিয়া যায় না। সপ্তাহে সপ্তাহে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। মোল্লাগণ যত নিষেধ করে, মুসলমান যুবকগণ ততই আগমন করে পুরোহিতগণ যতই নিষেধ করেন, হিন্দু যুবকগণ ততই আগমন করে। অতুল বলিলেন, আমাদের গ্রাম লইয়া এক দল, সুতরাং পুণ্ডরিয়া গ্রামের ভক্তদল,—আমরা পৌণ্ড্রিক। কোনো লোক আসিলে সমস্ত গ্রামের লোক সমবেত হয়। গ্রামের ক্ষুদ্র দলাদলি ভাঙিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অতুল বাবুর আসিতে বিলম্ব হইল, পত্রেরও উত্তর দিলেন না। ময়মনা অত্যন্ত চিন্তিত হইল, মনে মনে বড় লজ্জিত হইল। কথাবার্ত্তা অধিক বলে না, মুখ অতি বিষন্ন, অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিদ্রা নাই, আহার নাই। সদাই বিমর্ষ। অবশেষে শয্যাশায়ী হইল।

এ দিকে মামা আসিয়া জেদ করিলেন, তাহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতেই হইবে, ঘরের সম্পত্তি ঘরেই থাকিবে। চতুর্দ্দিক হইতে আরো বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। অনেকে কন্যা দেখিতে চায়, কিন্তু মাতা কোনো কথাই বলেন না। একমাত্র কন্যার দেহ ক্রমশ শুষ্ক হইতে দেখিয়া তাহার প্রাণে অত্যন্ত আশঙ্কা হইল। বলিতেন, আগে আমার কন্যা বাঁচুক পরে তাহার সম্বন্ধ করিব।

কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। অতুলের নিকট আবার ময়মনার মাতা বলিয়া পাঠাইলেন, "বাবা একবার ময়মনার প্রাণ দান করিয়াছ, আবার তাহাকে দেখিয়া প্রাণে বাঁচাও।

অতুল মন্দির নির্ম্মাণ, যুবক-সম্প্রদায়-গঠন, সমাজের সম্মিলন, বালক বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন, মুহূর্ত্তমাত্র অবসর পাইতেন না, আজি এই আহ্বানে লজ্জিত হইলেন, ভাবিলেন তাই তো, আমি বালিকার পত্রের কোনো উত্তরই দিই নাই।

ধীরে ধীরে তিনি ময়মনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কত দিন পরে আজ ময়মনার মন প্রফুল্ল হইল, মুখে হাসি দেখা দিল। অতুল জিজ্ঞাসিলেন—"ময়মনা, তুমি এত কাহিল হ'য়েছ ?"

ময়মনা। একথা তো আর কেহ বলিবার লোক নাই, আপনিই কেবল বলিতেছেন, বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িল।

অতুল বলিলেন, "ময়মনা, আমি তোমার পত্র অনেক দিন পেয়েছি এবং কিরূপে তোমার কথায় উত্তর দিব ভাবিতেছিলাম ; কিন্তু তোমার এখনো বিবাহের বয়স হয় নি। আমারও যুবক-সম্প্রদায়ের গঠন শেষ হয় নাই এজন্য বিলম্ব হইতেছে। আমি তোমার প্রস্তাবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মাতার ও আমার পিতামাতার মত হইলেই হইতে পারিবে। তোমার এখন বয়স কত ?"

ময়মনা। আমি সম্প্রতি পঞ্চদশ বর্ষে পড়িয়াছি।

অতুলের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার মাতার ইহাতে মত আছে ?"

ময়মনা। তিনি এ প্রস্তাবে বিশেষ সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, "আমি জাতি কুল লইয়া কি করিব, আমার এক কন্যা যাহাতে সুখী হয় তাই আমার ইচ্ছা। "অতুলবাবু যাইতেছিলেন, তখন ময়মনা তাহাকে ডাকিয়া আবার বলিল, "বসুন অতুলবাবু, আমি এ জন্য কত ভাবিয়াছি, আমি জানি যে এরূপ সম্বন্ধ সম্ভব নহে, তথাপিও আমি আপনাকে পাইতে চাহিয়াছি, আমার হৃদয় বলে, জগতে অতুল ভিন্ন এরূপ সাহস আর কেহ করিতে পারে না। দেখ কত দিক হইতে প্রস্তাব আসিয়াছে, আমার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে, তজ্জন্য চারিদিক হইতে কত সম্বন্ধ আসিতেছে। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছিলাম যদি অতুল আমার না হন, তবে আমি চিরকুমারী থাকিব। আমার মা বলেন, আমি কাহিল হইয়াছি। আমার রোগ হইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ কোনো রোগ দেখে নি। কিন্তু আপনার চিন্তাই আমার রোগ; আজি আপনাকে পাইয়াছি, প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেছি, বোধ হয় আমাকে মুখরা মনে করিতেছেন, কিন্তু জগতে আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি জানি না।"

অতুল ময়নার হস্ত দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "ময়মনা, আমার ইচ্ছা যে দেশ হইতে এ জাতিভেদ বর্ণভেদ উঠিয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছা বা বক্তৃতায় কিছু হয় না। যাহা ভালো বোধ কর নিজে তাহা করিতে হইবে। নতুবা মুখের কথায়, লোকে তোমাকে বিশ্বাস করিবে না। তাই আমি কি একটা অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইব, তাহাই ভাবিতেছিলাম। এই সময়ে তোমার মুখখানি আমার চক্ষে পড়িল। আমি ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, ব্যাকুলতা জানানো আমার অভ্যাস নয় কিন্তু আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং এরূপ বিবাহ সম্ভব কি না ভাবিতেছিলাম। যাহা হুউক, তুমিই আগে প্রস্তাব করিয়াছ। সুতরাং আমি আরো প্রীত হইয়াছি।"

"দয়াময় ঈশ্বর আমাদের শুভ সম্মিলন বিধান করুন। হিন্দু মুসলমান চিরদিন পরস্পরকে ঈর্ষ্যা করে, আজ উভয় দলের মিলন সম্পন্ন হউক।

আমি আমার নাম পরিবর্ত্তন করিব না। ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। তুমিও তোমার নাম ও ধর্ম্ম ঠিক রাখিবে। আমার তোমার বিবাহ ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাহ হইবে। জাতিতে জাতিতে বিবাহ হইবে। এতদিন যে বিভিন্নতা মারামারি কাটাকাটি বিবাদ-বিসম্বাদের মূল ছিল, আজ তাহা বিদূরিত হইবার প্রথম সোপান আবিষ্কৃত হইবে, আমায় দেখিয়া আরো অনেক লোকে এইরূপ উদাহরণ গ্রহণ করিবে। আজ জগৎবাসী দেখুক, ভারতে হিন্দু মুসলমান নাম ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন না করিয়াও পরস্পর মিলিত হইতে পারে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক ব্রাহ্মণ পথিক আজি পুণ্ডরিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড এক রাজপথ নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। সেটা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। আর একটা তাহাকে সম দ্বিখণ্ডিত করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই পাশের পয়ঃপ্রণালী প্রশস্ত ও একদিকে নদী, অন্যদিক ময়দানে চলিয়া গিয়াছে। যেখানে পথ দ্বিখণ্ড হইয়াছে, তাহার চারিদিকে চারিটি মন্দির, একটি ঈশ্বরের মন্দির, একটি বালিকাবিদ্যালয়, একটি ইস্কুল, একটি গ্রাম্য সম্মিলনী। আজ সকলেই সুন্দর বেশে সজ্জিত, যেন মহোৎসব।

একটি গ্রামবাসীকে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কী উৎসব?" গ্রামবাসী বলিল, আজ আমাদের গ্রামের জমিদার-কন্যার সহিত অতুলবাবুর বিবাহ। ব্রাহ্মণ অবাক হইলেন, বলিলেন, "অতুলবাবু কি জাতি?"

গ্রামবাসী। পৌণ্ড্রক।

ব্রাহ্মণ। পৌণ্ড্রক কি? তোমরা কি জাতি?

গ্রামবাসী। পৌণ্ড্রক।

ব্রাহ্মণ। সে কি? পৌণ্ড্রক হিন্দু না মুসলমান?

গ্রামবাসী। তাহারা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ নয়, তাহারা পৌণ্ড্রক। এই পুণ্ডরিয়া গ্রামের লোকমাত্রই পৌণ্ড্রক।

ব্রাহ্মণ। তোমাদের কি ধর্ম্ম।

গ্রামবাসী। এক ঈশ্বরের ধর্ম্ম, ঐ আমাদের আল্লা ব্রহ্মের-মন্দির। আমরা জাতি মানি না, হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে। আমরা

একত্র বসিয়া সকলে খাই। সকলের মধ্যেই বিবাহ করি। দেখুন আজ যত স্থানে বিবাহ দেখিতেছেন, তাহা অসবর্ণ বিবাহ। যাহারা পূর্ব্বে নমঃশূদ্র ছিল, এক্ষণে পৌণ্ড্রিক, তাহাদের মুসলমান পাত্র-পাত্রীর সহিত বিবাহ হইতেছে। আমাদের অতুলবাবু হিন্দু ছিলেন, আজ মুসলমান কন্যা বিবাহ করিতেছেন, তাঁহার ভগ্নীর সহিত রমজান মিয়া নামক মুসলমানের বিবাহ হইবে। আজ গ্রামে পঁচিশটি বিবাহ।

ব্রাহ্মণ। আজি তো বিবাহের দিন নাই।

গ্রামবাসী। ঈশ্বর কোনো দিন ভালো কি মন্দ করেন নাই, সকলই সমান।

ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইলেন ও বলিলেন, "ওই যে গৃহে অনেক লোক দেখিতেছি; ওটা কি ?

গ্রামবাসী। গ্রাম্য-সমিতি। আমাদের গ্রামের যত মকদ্দমা বিবাদ বিসম্বাদ সামাজিক সমস্যা ওখানে মীমাংসা হয়। আমরা জেলায় গিয়া খাজনা ও ট্যাক্স দিই, এই মাত্র। অন্য সব বিষয় ঐ গৃহে মীমাংসা হয়।

ব্রাহ্মণ। তোমাদের নেতা কে ?

গ্রামবাসী। অতুলবাবু, ওই যে তিনি আসিতেছেন।

অতুলবাবু আসিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন—"এস ভাই দেবনাথ, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এই শুভদিনে এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছ। আজি আমার বিবাহ মুসলমান জমীদার বাড়ির কন্যাকে আমি বিবাহ করিব। তোমায় পৌরহিত্য করিতে হইবে। রমজান মিয়া আমাদের কলেজের সমপাঠী, আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিবেন। ওই তিনি আসিতেছেন।

রমজান আসিয়া বলিলেন, "ভাই দেবনাথ, সত্যই অতুলবাবু আমাদের অবাক করিয়াছে, মনে আছে, অতুলবাবু, আমি একদিন বলিয়াছিলাম Example is better than precept. ইনি আজ তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন! এই আদর্শ পল্লী।"

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

দাসের আত্ম-কথা

প্রথম পরীক্ষা—গৃহত্যাগ

১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমে দেওঘর হইতে বাড়ি আসিয়া প্রথম কাজ চিনির কারখানার দেনা পরিশোধ করা, কিন্তু যতদিন অবশিষ্ট চিনি বিক্রয় হইয়া দেনার হিসাব স্থির না হইতেছে ততদিন আমার কিছু করিবার রহিল না. সে কাজ দণ্ডীদাদার হাতে ছিল।

আমার দৃষ্টি পড়িল লাইব্রেরীর উন্নতি সাধনে। বালিকা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর লাইব্রেরীর পুস্তক দেওয়া নেওয়ার ভার দিয়া আমি কলিকাতায় গিয়া পুস্তক সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রবাবুর আহিরীটোলার বাসায় থাকিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ ও ব্রাহ্মসমাজের কথাবার্ত্তা শুনিতাম। মধ্যে মধ্যে বাড়ি আসিয়া ২।৫ দিন থাকিতাম।

সুরেন্দ্রর মৃত্যুর পর আমার ভগিনী ত্রৈলোক্যতারিণী অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া পড়ে। বিশেষত তাহার কোনো সন্তনাদি না থাকায় একটা সান্ত্বনার কারণও ছিল না। তদ্ব্যতীত পূর্ব্ব হইতে সংসারের নানা প্রকার কুসংস্কারে তাহার মন ভালো ছিল না, তারপর এই ঘটনায় তাহার অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। রাত দিন তাহার ক্রন্দন-রবে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিলাম।

কিছু পূর্ব্ব হইতে স্বভাবত আমার একটি অভ্যাস হইয়াছিল। যে দিন মনে কোনো গুরুতর চিন্তার উদ্রেক হইত, কিম্বা শারীরিক অবস্থানুসারে মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতাম। অর্থাৎ সমস্ত দিন আহারাদি না করিয়া দিনান্তে একবার আহার করিতাম। তাহাতে চিন্তার একাগ্রতা ও ভাবের গাঢ়তা অনুভব করিতাম। একদিন দেখিলাম, ত্রৈলোক্য রাগ এবং দুঃখে অভিভূতা হইয়া সমস্ত দিন আহারাদি না করিয়া পড়িয়া আছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সেদিন আমার মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল। আমিও দিনে কিছু আহার করিলাম না। সমস্ত দিন ভাবিতে লাগিলাম, কি করা কর্ত্তব্য, কি করিলে অশান্তির প্রতিকার হইতে পারে। এমন ভাবে সংসারে আর থাকা যায় না।

সমস্ত দিনের পর একটা আশার আলোক পাইলাম, তাহাতে মনের গ্লানি অনেকটা চলিয়া গেল। বাড়ির ভিতর যে ঘরে ত্রৈলোক্য ধরা-শায়িনী হইয়াছিল সেখানে আসিয়া বলিলাম, "দেখো, আজ আমিও উপবাস করিয়া সমস্তদিন তোমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, সংকল্প করিয়াছিলাম যতক্ষণ তোমার জন্য কোনো সদুপায় স্থির করিতে না পারি ততক্ষণ আহার করিব না, এখন তোমার জন্য ভগবানের কিছু ইঙ্গিত পাইয়াছি, তুমি উঠিয়া আহারাদি করিয়া এসো। আমিও আহার করিতে যাইতেছি, আসিয়া তোমাকে সমস্ত বলিব।"

যে শোকে বিষাদে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল সে আমার এই কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল, এবং আমি আহার করিলে সেও আহারাদি করিল।

রাত্রে তাহাকে বলিলাম, "আমি বুঝিতেছি, তোমার এই চির অশান্তি দূরের আর কোনো উপায় নাই, এক উপায় আছে, যদি ধর্ম্ম-চিন্তায় মন নিবেশ করিতে পারো। আমি দেখিতেছি, এ সংসারে থাকিয়া তোমার শান্তি-লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই; তোমার মনের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। তুমি যদি ইচ্ছা করো, আমি তোমাকে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে অর্থাৎ তোমার মামা-শ্বশুর ক্ষেত্রবাবুর বাসায় লইয়া যাইতে পারি। সেখানে গিয়া তুমি যদি ঈশ্বরোপাসনাদি শ্রবণ করো, এবং লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারো, তবে তোমার ভালোই হইবে; বিশেষত ক্ষেত্রবাবু তোমার পিতৃতুল্য; সেখানে তোমার কোনো কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।" আমার কথায় ত্রৈলোক্য সম্পূর্ণ সম্মত হইল। আমি বলিলাম, "তবে কল্যই কলিকাতায় যাওয়া উচিত, কিন্তু তোমাকে আগে সাবধান করিয়া দিতেছি, এ কথা কাহাকেও কিছু বলিয়ো না। সঙ্গে অধিক কিছু লইবার প্রয়োজন নাই। সামান্য বস্ত্র ২।১ খানা লইবে মাত্র এবং প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। আমি কল্যই আহারান্তে ২টার ট্রেণে তোমাকে লইয়া কলিকাতায় যাইব।"

এই কথার পর রাত্রে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমি কিরূপ কাজে অগ্রসর হইতেছি; ইহা বিনা বাধায় সম্পন্ন হইবার নয়, ইহাতে নিন্দা অপমানেরও সম্ভাবনা অনেক আছে। তখনই মনে হইল, আমি সত্যের পক্ষ হইব বলিয়া একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সমস্ত জীবনব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, ঈশ্বরের পথে যাইতে নরনারীকে সাহায্য করিব।

তবে আজ আপনার ভগিনী ঘরের বাহির হইবে, নিন্দা হইবে বলিয়া ভাবিতেছি কেন? যদি আর কোনো নারী আজ ঈশ্বরের পথে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে চায়, আমি কি তাহাকে সাহায্য করিব না? তাহা যদি করি, তবে ইহাকেও করিব না কেন? ঈশ্বরের পথে আপন পর কে? সকলেই সমান। এইরূপ ভাবে মনে খুব বল পাইলাম। মনে হইল, যত বাধা বিঘ্নই আসুক, সকলই কাটাইতে হইবে।

পরদিন যখন আমরা যাত্রা করিব, তখন উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! দিদিকে কোথায় লইয়া যাইবেন?" আমি তাহার ভাব বুঝিয়াছিলাম, সে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত নহে। তাই বলিলাম, "পরে জানিতে পারিবে।" এ কথায় তাহার মন সন্তুষ্ট হইল না, কোনো বাধা দিতেও পারিল না, কেমন এক রকম হইয়া গেল। মা বলিলেন, "বাবা, যাহাতে ভালো হয়, তাহাই করিয়ো।" আমি বলিলাম, "ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।"

আমরা ক্ষেত্রবাবুর বাসায় গেলাম। ত্রৈলোক্যকে তথায় রাখিয়া পরদিন আমি গোবরডাঙ্গার বাড়ি আসিলাম। আসিয়া দেখি, আমার জন্য অগ্নি-পরীক্ষা প্রস্তুত। উপেন্দ্রর মন ভয়ানক উত্তেজিত হইয়াছে, তৃতীয় সহোদর শচীন্দ্র আজো পর্য্যন্ত আমার সামনে উচ্চ-রবে কথা কহে নাই, উপেন্দ্র তাহাকেও সঙ্গে লইয়াছে। আমাকে দেখিয়া উপেন্দ্র বলিল, "দিদিকে এখনি বাড়ি আনা হউক, নচেৎ আপনি এ বাড়ি হইতে চলিয়া যান।" দ্বিতীয় প্রস্তাবই আমার পক্ষে সহজ, কারণ পূর্ব্ব হইতে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দমনে আমি মধ্যে মধ্যে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বেলা ১১টা কিম্বা সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ি হইতে মন্দিরে চলিয়া গেলাম। মনে আছে, বাবা মা ও তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু উপেন্দ্র তখন সে কথায় কর্ণপাত করিতে পারে নাই।

আমি খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিলে উপেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া আমাদের ছোট ভাই যতীন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রবাবুর বাসায় আসিয়া ত্রৈলোক্যকে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করে। তাহাতে ক্ষেত্রবাবু বলেন, "তোমার দাদা আসিয়া লইয়া গেলেই ভালো হয়।" এই কথা শুনিয়া উপেন্দ্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে। যখন

বুঝিল, ত্রৈলোক্যও স্ব-ইচ্ছায় আসিতে সম্মত নহে, তখন পুনরায় মাসী-মাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া একটি স্তোক্‌বাক্যে ভুলাইয়া পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া বাড়ি ফিরাইয়া আনে। আমি পর দিন একবার বাড়ি আসিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম।

আমাকে দেখিয়া ত্রৈলোক্য আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি ফিরিয়া আসিয়া ভালো কাজ করি নাই, আপনি আমাকে পুনরায় আর একবার লইয়া চলুন, আর আমি বাড়ি আসিব না।" আমি বলিলাম, এখন থাকো, পরে যাহা হয় হইবে। তাহার পর তাহার জ্বর ও অল্প বসন্ত হয়, তাহাতে প্রায় এক মাস গত হইল।

ত্রৈলোক্য একবার কলিকাতায় আসিয়াই হউক, অথবা সংসারের চির অশান্তির জন্যই হউক, তাহার মন পূর্ব্বের ন্যায় সংসারে থাকিতে চাহিল না। কলিকাতায় আসিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার এই ভাব দেখিয়া শশীন্দ্র একদিন ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উহার সহিত কলহ করিল। তাহার কথা এই যে, "যেমন সংসারের কাজে পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিলে, তেমনি ভাবে যদি থাকো ভালো, নচেৎ বাড়ি হইতে আজই চলিয়া যাও, তোমার জন্য আর অশান্তি গণ্ডগোল আমরা ভোগ করিতে চাই না।" এই বলিয়া তাহার গহনা ও সামান্য অর্থাদি যাহা ছিল, সমস্তই কাড়িয়া লইল। এই ঘটনায় সে একেবারে অধীর হইয়া পড়িল, আমাকে ভয়ানক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, "আমাকে আর একবার যাইবার সাহায্য করুন, আমি কিছুই চাই না, আমি নিঃসম্বলে ঈশ্বরের পথে যাইব, তাই তিনি আমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।"

আমি দেখিলাম, প্রথমবার হইতে এবার তাহার মন আরো প্রস্তুত হইয়াছে, এখন যদি আমি অবহেলা করি, তবে ভয়ানক অন্যায় করা হয়। তাহা করা আমার পক্ষে কখনই উচিত নয়; কিন্তু এবার লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। যদিও শশীন্দ্র যাইতে বলিয়াছে; কিন্তু তাহার আন্তরিক ইচ্ছা, তাহা নহে। বিশেষত উপেন্দ্র অত্যন্ত বিরোধী। এখন ভগবানের উপর নির্ভর ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রহিল না। আমি ত্রৈলোক্যকে বলিলাম, "দেখো, এবার তোমার যাওয়া সহজ নহে, বাড়ি-শুদ্ধ সকলেই বাধা দিবেন। আমি

সকলের সমক্ষে সকলকে উপেক্ষা করিয়া তোমাকে কিরূপে লইয়া যাইব! অতএব আমি তোমাকে এ জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলি, যদি তিনি তোমাকে যাইতে সাহায্য করেন, তবে বুঝিব, তাহাই সত্য এবং তাহাতেই তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ হইবে। আমি একখানি গোরুর গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব, রাত্রি ২টার ট্রেণে যদি তোমার যাওয়া নিরাপদ হয়, তবে হইবে, নচেৎ নয়।"

ত্রৈলোক্য যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল, কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন রাখিল, তথাপি বাড়ির সকলে বুঝিলেন যে, আজ যাইতে পারে। আমি সদর বাড়িতে যেমন থাকি তেমনি রহিলাম বাড়ির সকলে অর্থাৎ ভায়ারা, মাতা ও মাসীমাতা, রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। রাত্রি যখন ১টা, মন্দিরের মালী গাড়ি লইয়া ডাকিল, এদিকে ত্রৈলোক্য আসিয়া বলিল, "সকলে এখন নিদ্রিত, এই যাইবার সময়, আমি ঈশ্বরের পথ আর পরিত্যাগ করিব না, আপনি আর একবার আমার সহায়তা করুন।"

আমরা পুনরায় ক্ষেত্রবাবুর বাসায় আসিলাম, এবার আর কেহ ফিরাইতে চেষ্টা করিল না।

জীর্ণ মন্দিরে

"কে তুমি? কেন এ জীর্ণ মন্দিরে বসিয়া?
কে বা ও ললনা, পাশে তোমার র'য়েছে শুইয়া?"
"ভ্রান্তি" আমি, "শ্রান্তি" ওই র'য়েছে পাশেতে পড়িয়া!
ভগিনী ও মম, ওরে থাকি না কখনো ছাড়িয়া!
"পড়-পড় এই জীর্ণ মন্দির, সাহসে কেমন
নিশ্চিন্ত র'য়েছ, ধ্রুব মরণে দিতে আলিঙ্গন?"
অধ্রুব মরণ নাহি কোথাও জগতের মাঝে!
মরণই জগতে ধ্রুব, সদা সব ঠাঁই বিরাজে!

কোল যদি দিতে হয়, ধ্রুব যে, না দিয়ে তাহারে,
সুখ পা'বো প্রাণে, কোল দিয়ে বলো আর কাহারে!
মৃত্যু-আলিঙ্গনে লোকে নিমেষে আপনা হারায়!
অহরহ কোল দিয়ে মরণে, আছি তো বজায়!
মরণের অগ্রদূতী যুগল ভগিনী আমরা!
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে বহি যে ধ্বংসের পসরা!
"হয় হো'ক্ তাই, কিন্তু সাধ কি হয় না কখন
চারু-শোভাময় নব মন্দিরে পাতিতে আসন?"
সাধ হয়; কভু গিয়েও থাকি নবীন মন্দিরে!
তিষ্ঠিতে না পারি' শত্রু-পীড়নে, পুন আসি ফিরে!
"সে প্রবল শত্রু যদি এ জীর্ণ মন্দিরে আসিয়া,
দেয় তাড়াইয়া তোমা', যা'বে কোথা পলাইয়া?"
আসিবে না কভু তা'রা এ জীর্ণ মন্দির-ভিতরে!
পড়-পড় হ'ল এই মন্দির, তারা গেছে স'রে!
"কা'রা সে কৃতঘ্ন, চির আবাস ছাড়িল যাহারা?
"সাহস," "উদ্যম," "অধ্যবসায়"—অরাতি তাহারা!"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

সরমা

—::*::—

দ্বাচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

জগদীশপুরের বিখ্যাত জমিদার রাজা বিধুশেখর রায় সস্ত্রীক কাশীতে আসিয়া একটা প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া লইয়াছেন। দাসদাসী গাড়িঘোড়া লোক জনের অভাব নাই। দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতেছে। বিধুশেখর বাবুর কিছুরই অভাব নাই, অভাব শুধু তাঁহার একটি -তিনি নিঃসন্তান। এত বড় জমিদারীটা ভোগ দখল করিবার কেহ নাই। ইহার জন্য কখনো কখনো তাঁহাকে ম্রিয়মাণ দেখিতে পাওয়া যাইত। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যেখানে কমলার কৃপা অধিক, সেইখানেই দেখিবে মা ষষ্ঠীর দৃষ্টি-হীনতা। ভাগ্যহীনের ঘরে তাঁহার অবাধ গতি। লক্ষ্মী-স্বরূপা ইন্দুবালা যখন

মা ষষ্ঠীর পূজা দিয়া মনসা-গাছে ঢিল বাঁধিয়া, মা কালীকে জোড়া পাঁঠা মানিয়া, ক্ষেত্রপালের ঔষধ খাইয়া এবং রাশীকৃত মাদুলী কবচ ধারণ করিয়াও পুত্র লাভের কোনো সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বিশ্বেশ্বরের নিকট পুত্র কামনা করিবার জন্য স্বামীকে লইয়া কাশীতে আসিলেন।

অর্দ্ধোদয় যোগের যাত্রীর ভিড় তখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ইন্দুবালা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে বিল্বদল ও গঙ্গা জলে তাঁহার পূজা করিলেন। পরে গলায় অঞ্চল দিয়া ভক্তিভাবে প্রশান্ত-চিত্তে সেই ইষ্ট দেবতার চরণ-তলে আপনাকে লুটাইয়া দিলেন এবং ভূমিতে মাথা ঠুকিয়া সেই দেবতার উদ্দেশে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, একটি ছেলে দিয়ো—একটি ছেলে, আর কিছু না, আমি তোমার সামনে তার পৈতে দেবো। তোমার মাথায় সোনার মুকুট গড়িয়ে দেবো! মা কালীর কাছে বুক চিরে রক্ত দেবো, মাথায় কোরে ধুনো পোড়াবো। ইন্দুবালা তখন আত্ম-হারা হইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ-তল আশ্রয় করিয়াছিল। বাঁধ-ভাঙা নদীর ন্যায় অজস্র অশ্রু রাশি প্রাণের আবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া সেই ইষ্ট-দেবতার চরণ-তল ধৌত করিতেছিল। ইন্দুবালা এই ভাবে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল; তখন সে তন্ময় আত্ম-হারা! কে যেন তখন তাঁহার কর্ণ যুগলে সেই ইষ্ট-দেবতার আশ্বাস-বাণী ঢালিয়া দিল। কী মধুর সে স্বপ্ন! কী শ্রবণ-তৃপ্তিকর সে বাণী! ইন্দুবালা উঠিয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরকে পুনঃ প্রণাম করিয়া পরিজন-বেষ্টিত হইয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই ভিড়ের মধ্য হইতে ইন্দুবালার বসনাঞ্চলে একটু টান ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইল, 'মা! মা! মা!' পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, একটি তিন চারি বৎসরের নগ্ন শিশু তাঁহার বসন ধরিয়া ডাকিতেছে, 'মা! মা! মা!' শিশুটি ফুলের মতো কোমল রং তাহার জ্যোৎস্নার মতো, কিন্তু মুখখানি তাহার মলিন শুষ্ক তাহার রেশমের মতো কোমল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি মুখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে; যেন পাতার পাশে ফুলের মতো নীরবে সে ফুটিয়া আছে!

শিশুটির সুধামাখা মাতৃসম্ভাষণ ইন্দুবালার প্রাণের তারে আসিয়া ঘা দিল! তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা নিমেষে মাতৃত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি শিশুটিকে বক্ষে লইয়া অজস্র চুম্বনে তাহার কচি কোমল মুখখানি রাঙাইয়া তুলিলেন। শিশুটি ইন্দুবালার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখের নিকট মুখ আনিয়া

ডাকিল 'মা'—কে যেন তাঁহার মরু-তপ্ত হৃদয়-মাঝে অমৃত সিঞ্চন করিল—কে যেন তাঁহার প্রাণের মাঝে স্নেহের উৎস ছুটাইয়া দিল। তিনি শিশুটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার দেহটা যেন শীতল হইল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ও-কে নামিয়ে দিন,ও হয় তো কোনো ভিকিরির ছেলে, অমন ছেলে রাস্তায় অনেক ঘুরে বেড়ায়। কেহ বলিল, ওর হয় তো মা মরে' গেছে, তাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যা'কে দেখে, তা'কেই মা বলে।" ইন্দুবালা এ সব কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "ইহা বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ, সন্তান কামনা করিয়াছিলাম, দিয়াছেন তিনি হাতে হাতে। আমি এ আশীর্ব্বাদী ফুলটি ফেলিতে পারিব না, অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিব।" তাঁহার চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিল। তিনি বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে মনে মনে বলিলেন, "হে দয়াময়, যদি দিয়েছ তো আর কেড়ে নিয়ো না,কাঙালকে আর কাঁদিয়ো না।" ইন্দুবালা শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া আপনার শিবিকায় আসিয়া বসিলেন। অনতিবিলম্বে শিবিকা আসিয়া অন্দরের দ্বারে লাগিল। ইন্দুবালা পুলক-চঞ্চল, উদ্বেলিত-হৃদয়ে শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া উপরে উঠিলেন। বিধুশেখর বাবু তখন শট্‌কা মুখে দিয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া একখানা কাগজ দেখিতেছিলেন। ইন্দুবালাকে হঠাৎ শিশু ক্রোড়ে গৃহ-মধ্যে আসিতে দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই, ইন্দুবালা শিশুটিকে তাঁহার স্বামীর ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া কহিলেন, "এই নাও বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ধরো, আমি সন্তান কামনা করেছিলুম, তিনি হাতে হাতে দিয়েছেন।" বিধুশেখর বাবু শিশুটির মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, "দেখ্‌চি এ কোনো ভদ্রলোকের ছেলে, এই যোগে হয় তো স্নান করতে এসে ছেলেটিকে হারিয়ে ফেলেচেন, আহা! এর মা বাপ হয় তো এর জন্যে কত না কেঁদে কেটে সারা হচ্চেন—একে কি এমন কোরে আট্‌কে রাখা যায়?"

ইন্দুবালার চমক ভাঙিল, তিনি বুঝিলেন, কথাটা সত্য। শিশু-হারা পিতা মাতার প্রাণের ব্যথাটা তিনি অনুভব করিলেন। বলিলেন, তবে তাঁদের খোঁজ করো।"

তিন দিন ধরিয়া কাশীর অলিগলি সর্ব্বস্থানে ঢেঁট্‌রা দেওয়া হইল, কিন্তু কেহই এই শিশুটির পিতা মাতা বা অভিভাবক রূপে হাজির হইল না। তখন ইংরাজী বাংলা অনেকগুলি সংবাদপত্রে এই হারানো শিশুটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। বিজ্ঞাপনে অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল যে, শিশুটির

নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'মাণিক' সে 'দাদা, কাকা, মা' আরো অনেক অসংলগ্ন কথা বলিতে পারে।

ত্রয়োচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

লোয়ার সার্কুলার রোডে একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া সরল তাহার পিতার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিল। কলিকাতায় সুচিকিৎসার ফলে চৌধুরী মহাশয় এখন বেশ সুস্থ হইয়াছেন। তবে ডাক্তারেরা বলিতেছেন, বর্ষাটা কাটাইয়া শীতের পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কাজেই চৌধুরী মহাশয়কে কলিকাতায় আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। দেশের সমস্ত ভার ম্যানেজারের উপর। সরলও মাঝে মাঝে যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া বন্দোবস্ত করিয়া আসে।

সরলের বিবাহ লইয়া কলিকাতার ধনী-মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ঘটকের উপর ঘটক আসিতে লাগিল। অনেকেই তাঁহাদের মেনকা উর্ব্বশীর ন্যায় কন্যাগুলির সহিত প্রভূত ধন-রত্ন দিয়া সরলকে ক্রয় করিতে চাহিল; কিন্তু সরল রাস্তার ধূলা মাটী নয়, সে বিকাইল না। সে ধনুক-ভাঙা পণ করিয়া বসিল, যদি তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তবেই তাহার বিবাহ হইবে, নচেৎ এখন কিছুতেই সে বিবাহ করিবে না। পুত্রের এই ধনুক-ভাঙা পণে তাহার পিতামাতার মনে যে একটা অশান্তি আসিয়াছিল এটা ঠিক, কিন্তু উপায় কি? অনেক অনুসন্ধানেও যখন কমলার কোনোই খোঁজ খবর পাওয়া গেল না, তখন সকলেই তাহার স্মৃতির ছায়াটুকু মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সরলের সে চেষ্টায় কোনো ফল হইল না। এখনো সে স্বপ্নের ঘোরে 'দিদি' বলিয়া ডাকিয়া উঠে, তাহার প্রাণটা মাণিকের জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

সে দিন অপরাহ্ণে একটা বিশেষ কার্য্যে সরলের ফিটন আসিয়া বহুবাজারের মোড়ে দাঁড়াইল। স্থানটা তখন মহা সরগরম। চারিদিক হইতে অপূর্ব্ব কণ্ঠের অনন্ত ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। একজন মোলায়েম কণ্ঠে হাঁকিল "জুঁয়ের গোড়ে, বাবু বোঁটাকাটা বেল ফুল।" তারপর আর একজন "বরফ চাই বরফ বলিয়া চলিয়া গেল। তারপর 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' সঙ্গে সঙ্গে স্বরটা তাহার দৃঢ় ও গম্ভীর। অপূর্ব্ব কণ্ঠে আর একজন হাঁকিল "পাঁটার মাংস, হাঁসের ডিমের

দম, চিংড়ি মাছের কুলুরি।" একজন পঞ্চমস্বরে হাকিল, "পকৌড়ি" তার পর আর একজন "রসের বাদাম টাট্‌কা দানার" ছড়া বলিয়া ঘুরিতে লাগিল। এই সময় সরল দেখিল, একটি ক্ষীণাকার যুবক, দু'খানি লাঠির উপর ভর দিয়া, এক পায় হাটিয়া আসিয়া তাহার নিকট একখানি ক্ষীণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-কণ্ঠে কহিল, "বাবু মশায়ই একটি পয়সা।" কিন্তু সে সরলের মুখের দিকে একবার চাহিয়াই হাতটি গুটাইয়া লইয়া যেমন ভাবে আসিয়াছিল, তেমনি ভাবে রাস্তার অপর দিকে চলিয়া গেল।

সরলের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। লোকটা কেনই বা আসিয়াছিল, পয়সা চাহিয়া কেন বা চলিয়া গেল! সে ভাবিল, আহা! লোকটার একখানা পা নাই। কিন্তু চেহারা ভদ্রলোকের মতো বটে, দারিদ্র্যের কাষাঘাতে এমন হইয়াছে ভিক্ষায় অনভ্যস্থ সে, দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করা বুঝি তার মরমে আঘাত করে, তাই বুঝি সে সত্বর চলিয়া গেল। আহা বেচারা! গরিবের দুঃখে সরলের প্রাণটা গলিয়া গেল, সে তাহাকে কিছু দিবার মানসে সহিসকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইল, কিন্তু সহিস ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"হুজুর সে এদিকে আসতে চায় না।"

সরল পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং জনতার মধ্য দিয়া যেখানে সে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলকে সম্মুখে দেখিয়া বেচারার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তাহার হাতের লাঠি পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ভূমিতে পড়িয়া সরলের পদ স্পর্শ করিয়া করুণস্বরে কহিল, "ভাই সরল আমায় রক্ষা করো—ক্ষমা করো আমার পাপের যথেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।"

সরল একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল, "ভয় কি বিজয়? তোমার এ কী চেহারা হ'য়েছে? তোমাকে যে একেবারে চেনা যায় না! তোমার আর একখানা পা কি হ'ল?" "আমার পা-খানা গিয়েছে ভাই, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে।" বিজয়ের শীর্ণ শুষ্ক পাণ্ডু মুখের উপর দিয়া তখন অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সরল বিজয়কে ফুটপাতের এক কোণে আনিয়া দাঁড় করাইল। পরে আর্দ্র-স্বরে কহিল, "ভগবান্ তোমায় এ কী শাস্তি দিলেন, কই আমি তো একদিনের জন্য তোমার অমঙ্গল কামনা করি নি।"

"তুমি কোরবে কেন ভাই ? তুমি দেবতা, আমি দানব। ভগবান্ আমার ঠিক বিচার করেছেন।"

"তুমি এত দিন কল্‌কাতাতেই ছিলে ?'

"ব'ল্‌ছি শোনো—সব কথাই বোল্‌বো, তবে যদি প্রাণটা একটু হাল্‌কা হয়। থিয়েটারে মিশেই আমার অধঃপতনের সুরু হয়। থিয়েটার-পার্টির জন কয়েকের সঙ্গে আমার খুব মেশামিশি আলাপ হ'য়েছিল তাদেরি প্ররোচনায় বেড়া'তে যা'বার ভাণ কোরে রাত থাক্‌তে আমি তোমার নৌকায় এনে তুলেছিলুম। নৌকাখানা কার তা' জানি না, নৌকাতে মাঝি মাল্লা কেউ ছিল না। চার পাঁচ জন থিয়েটারের লোকই কম্বল মুড়ি দিয়ে মাঝি মাল্লা সেজে ব'সে ছিল, তুমি নৌকায় উঠ্‌লে তারাই নৌকা চালিয়ে এনেছিল। তোমাকে জলে ফেলে দিয়ে তোমার টাকাগুলো অপহরণ কোরে, আমরা একটা ঘাটে এসে নৌকাখানা বেঁধে রেখে ট্রেনে চেপে কল্‌কাতায় এলুম। এখানে একটা কদর্য্য পল্লীতে আমাদের বাসা ঠিক হ'ল। দিনকতক খুব থিয়েটার দেখবার ধুম পড়ে গেল—তারপর সঙ্গ-দোষে আমার স্বভাব চরিত্র নষ্ট হ'য়ে গেল—আমি মদ খেতে শিখ্‌লুম একদিন মাতাল অবস্থায় ট্রাম থেকে নাম্‌তে প'ড়ে গেলুম, পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চ'লে গেল। আমাকে হাঁসপাতালে পাঠানো হয় সেখানে পাখানি দিয়ে আজ এক মাস হ'ল বেরিয়ে এসেছি, হাঁসপাতালে থাক্‌তে আমার সে বন্ধুগুলি একবার উকি মেরেও দেখেন নি। বেরিয়ে এসে তাদের কোনো খোঁজ খবর পেলুম না। কাজেই পোড়া পেটের দায়ে এখন ভিক্ষে কোরতে বেরিয়েছি ভাই !"

সরল বলিল, "ভিক্ষে কোরবে কেন ভাই, দেশে চলো আমাদের বাড়িতে তো অনেক লোক খাচ্চে তুমিও একমুঠা খাবে—তাতে আর হ'য়েছে কি ! বিজয় আর্দ্র-কণ্ঠে কহিল,—তোমার দয়া জীবনে ভুলবো না ভাই—কিন্তু দেশে আর যাবো না এ পোড়া মুখ আর কাউকে দেখাবো না " বিজয়ের দাপ্তিহীন চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল। সে একবার সরলের মুখের পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে প্রাণের কাতরতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সরল বিজয়ের মুখের পানে আর চাহিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া বিজয়ের হাতে গুঁজিয়া দিয়া সত্বর গাড়িতে আসিয়া বসিল এবং রুমালে একবার চোখ্ মুছিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সরল বঙ্গবাসীর গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। নূতন পুস্তক বাহির হইলেই উহা কিনিবার সরলের একটা বাতিক ছিল। সে প্রতিবারই বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাগুলি একবার পড়িয়া লইত, যদি সে সপ্তাহে কোনো নূতন পুস্তকের বিজ্ঞাপন থাকে। সে দিন সে বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলি দেখিতে দেখিতে বিধুশেখর রায়ের বিজ্ঞাপনটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া সরল উঠিয়া দাঁড়াইল; অপ্রত্যাশীত অগাধ ধন-রত্ন লাভের ন্যায় সরলের প্রাণটা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কমলার পুরাতন স্মৃতিগুলা তাহার হৃদয়-মাঝে সজাগ হইয়া দেখা দিল। সে কাগজখানা হাতে করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে ছুটিয়া তাহার মাতার নিকট আসিল এবং চঞ্চল-চিত্তে কহিল—"মা-মা মাণিককে পাওয়া গিয়েছে।"

বিস্মিত ভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বিমলা কহিল,—"অ্যা, মানিক! কোথায়? আর কমলা!"

"মাণিক এখন রাজা, বিধুশেখর রায়ের কাছে কাশীতে আছে, কৈ দিদির কথা বিজ্ঞাপনে কিছু লেখা নেই। সেখানে গেলেই বোধ হয় তাঁর খবর পাওয়া যাবে। মা আমি আজই রওনা হব। তুমি একবার বাবাকে বলে এস।"

কাগজখানা হাতে করিয়া বিমলা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"তিনি বলচেন এখন তাঁর শরীরটা একটু ভালো আছে, এই সুযোগে তিনিও তোমার সঙ্গে গিয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন করে আস্‌বেন।"

মাতার মুখের পানে চাহিয়া সরল কহিল,—"আর তুমি?"

"আমাকে আর কে নিয়ে যাবে বল বাবা?"

"আমি তোমাকে নিয়ে যাব, তোমাকে যেতেই হবে মা।"

মৃদু হাসিয়া বিমলা কহিল,—"যদি যেতেই হয়—তবে সরকারকে ডেকে তার বন্দোবস্ত করতে বলো।"

* * * * *

যথা সময়ে চৌধুরী মহাশয় সপরিবারে কাশীতে আসিয়া একটা বাটী ভাড়া করিলেন। সরল সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই বিধুশেখর বাবুর বাড়ি ছুটিয়া আসিল। তাহার প্রাণের মধ্যে জাগিতেছিল, তখন মাণিকের সেই সুন্দর কোমল মুখখানি! সরলের গাড়ি যখন বিধুশেখর বাবুর দরজায়

আসিয়া দাঁড়াইল, তখন একজন পরিচারক আসিয়া তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। যখন শুনিল যে, সে বিধুশেখর বাবুর সহিত দেখা করিতে চায় তখন তাহাকে দ্বিতলের এক প্রশস্ত বৈঠকখানায় বিধুশেখর বাবুর সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। সরল বিধুশেখর বাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিধুশেখর বাবু তাহাকে একখানা চেয়ারে বসিতে বলিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরল বিনীতভাবে কহিল,—"বঙ্গবাসীতে আপনার বিজ্ঞাপন পড়ে আমি মাণিককে নিতে এসেছি, মাণিক কোথায় ?" মাণিককে লইতে আসিয়াছি এই খবরটা, তার-বিহীন টেলিগ্রাফের ন্যায় তখনই অন্দরের কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া ইন্দুবালার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। ইন্দুবালা তখন মাণিককে কোলে লইয়া তাহার মুখের নিকট দুগ্ধের বাটি ধরিয়া বসিয়া ছিলেন। প্লেগের নামে কলিকাতা-বাসী যেমন একদিন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল— ইন্দুবালা আজ আতঙ্কে তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতের দুধের বাটী ভূমিতে পড়িয়া গেল, তিনি কম্পিত-হৃদয়ে মাণিককে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মাণিক বিশ্বেশ্বরের দান, তাহাকে আবার লইবে কে ? কিন্তু সত্য সত্যই যখন তাহাকে লইতে আসিল, তখন ইন্দুবালা নিরুপায় হইয়া বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে ঘরের মেঝেয় মাথা ঠুকিতে লাগিলেন।

বিধুশেখর বাবু সরলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে সে বিলাসপুরের বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। তখন আর তাঁহার অবিশ্বাস করিবার কিছুই রহিল না। তখন তিনি সরলের গায় হাত বুলাইয়া স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন "মাণিক তোমার কে ? এই সময় ইন্দুবালা ধীরে ধীরে উঠিয়া মাণিককে ক্রোড়ে লইয়া বৈঠকখানার দরজার পর্দ্দার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সরল,—"কহিল মাণিক আমার কেউ নয় কিন্তু মাণিক আমাদের সব চেয়ে আপনার, সে আমাকে কাকাবাবু বলে। বাবাকে দাদাবাবু বলে।"

"মাণিক আমাদের কেউ নয়" ইন্দুবালার প্রাণের মধ্যে কে যেন অমৃত বর্ষণ করিল!

বিধুশেখরবাবু কহিলেন মাণিক যদি তোমাদের কেউ নয় তবে তোমাদের বাড়িতে এসেছিল কি করে ?" সরল অকপট-চিত্তে কমলা-সংক্রান্ত সমস্ত কথা বলিয়া গেল, এমন কি হরিপদ কমলার মাতুলকে যে চিঠি

খানি লিখিয়াছিল সেখানির উল্লেখ করিতে ভুলিল না। বিধুশেখরবাবু বুঝিলেন মাণিক ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহার পিতা এবং মাতা আছে কিন্তু উভয়েই নিরুদ্দেশ।

এই সময় বিধুশেখর বাবু উঠিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং দরজার পার্শ্বে ইন্দুবালাকে দেখিয়া কহিলেন,—"সব শুনেছ বোধ হয় ?"

ইন্দুবালা কহিলেন,—"হ্যাঁ সব শুনেছি তুমি ছেলেটিকে এতক্ষণ ধরে মিছি মিছি বকাচ্ছিলে কেন—আহা দেখ্‌তে পাচ্ছ না বাছার মুখখানি শুখিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—বোধ হয় এখনো ওর খাওয়া হয় নি তুমি ওকে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দাও—আমি ওর খাবার যোগাড় করে দিই তার পর মাণিককে আমি ওর কাছে ভিক্ষে করে নেব।"

বিধুশেখরবাবু লজ্জিত, ভাবে—"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো" বলিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুমূল্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত মাণিক হেলিতে দুলিতে আসিতেছিল মাণিককে দেখিয়া সরল পুলক-চঞ্চল-হৃদয়ে স্নেহ-সিক্ত মধুরস্বরে ডাকিল,—"মাণিক" !

শিশুর পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে সরলের মুখের পানে একবার চাহিয়া "কাকা বাবু" বলিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরে "এযো মা, এযো মা" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া দরজার নিকট টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সরলকে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিধুশেখর বাবু কহিলেন,—"যাও না বাবা ভেতরে যাও মাণিকের মা বুঝি তোমায় ডাক্‌ছেন।"

রবিকর-স্পর্শে কুহেলিকার যবনিকাখানা, যেন সরলের সম্মুখ হইতে নিমিষে সরিয়া গেল। সে ভাবিল মাণিকের মা—তাহার দিদি, সে কি এখানে আছে, তাহাও কি হইতে পারে ? তাহা হইলে বিজ্ঞাপনে সে কথা খুলিয়া লিখিল না কেন ? সে যেন একটা জটিল রহস্যের ভিতর আসিয়া পড়িল। সরলকে ভিতরে যাইতে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বিধুশেখর বাবু পুনরায় কহিলেন "যাও বাবা লজ্জা কি—এ তোমার বাড়িঘরের মত মনে করো। সরল চঞ্চলচিত্তে মাণিকের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল, যদি সে তাহার দিদিকে পায়।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া সরল স্তম্ভিত হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মানিক ইন্দুবালার অঞ্চল ধরিয়া রহিল "মা এযো কাকা বাবু।"

ইন্দুবালা ধীর শান্ত স্নেহ-পূর্ণ স্বরে কহিলেন, "আমি নিঃসন্তান বাবা

মাণিককে আমি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে কুড়িয়ে পেয়েছি, এটি তাঁরই দান। আমি এই রত্নটিকে তোমার কাছে ভিক্ষে মাগচি বাবা!"

সরল বিনীতভাবে কহিল,—"বিশ্বেশ্বর যখন মাণিককে আপনার হাতে দিয়েছেন, তখন আমি তাকে ধরে রাখবার কে! তবে মাণিককে নিয়ে যাবার জন্যে আমার সঙ্গে আমার মা এসেছেন, বাবা এসেছেন।" ইন্দুবালা বিস্মিত ভাবে কহিলেন,—"বটে, কখন তোমরা এসেছ, কোথায় তোমরা আছ?"

"এই বাঙালী-টোলার দিকে একটা বাড়ি নিয়েছি। আজ সকালে এসে পৌঁছেছি।"

"তোমাদের এখনো খাওয়া হয় নি বোধহয়?"

সরল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দুবালা সরলের জলযোগের বন্দবস্ত করিয়া দিয়া মাণিককে তাহার কাছে রাখিয়া গাড়ি তৈরি করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। পরে বিধুশেখর বাবু ইন্দুবালাকে লইয়া সরলের পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনো বন্দোবস্ত নাই। বিধুশেখর বাবুকে আসিতে দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন- ইন্দুবালা একজন পরিচারিকার সহিত অন্দরে চলিয়া গেলেন।

পরিচিত বন্ধুর ন্যায় বিধুশেখর বাবু চৌধুরী মহাশয়কে কহিলেন,—"আপনি যখন এখানে এসেছেন তখন আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকা আপনার কিছুতেই হবে না আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধূলো দিতেই হবে, সেখানে খাবার-দাবার সব প্রস্তুত, সরল সেথায় মাণিককে নিয়ে বসে আছে। ইন্দুবালা বিমলার দুটি পা ধরিয়া কহিল,—"দিদি, আমি থাকতে তুমি আলাদা বাড়িতে থাকবে আমার বাড়ি কি আপনার বাড়ি নয়?" চল দিদি আমি তোমায় নিতে এসেছি, সরল মাণিক সেথায় বসে আছে। বিধুশেখর বাবুর ও ইন্দুবালার এই সবিনয় আহ্বান কেহই ঠেলিয়া ফেলিতে সাহস করিলেন না।

আহারাদির পর অপরাহ্নে চৌধুরী মহাশয় ও বিমলা একমত হইয়া বিধুশেখর বাবুর হস্তে মাণিককে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

ইন্দুবালার বুকের উপর যে পাষাণ খানা চাপানো ছিল তাহা যেন কাহার ফুৎকারে সহসা উড়িয়া গেল। আনন্দ-বিগলিত-হৃদয়ে তিনি মাণিকের

মুখ চুম্বন করিলেন এবং সেই দিনই শেকরা ডাকাইয়া বিশ্বেশ্বরের মুকুট গড়াইতে দিলেন।

চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে কাশীতে কমলার অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। এই অনুসন্ধানের ফলে একব্যক্তি বলিল, সে এক পাগ্‌লিকে মাণিক মাণিক বলিয়া কাঁদিতে শুনিয়াছিল, পুলিসের তাড়নায় সে অনেকবার আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল। ফিরিবার সময় সে তাহাকে গঙ্গার তীরের পথে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সম্ভবত সে মরিয়া গিয়াছে। আরো দুই এক জনের মুখে এই কথাই শুনিতে পাওয়া গেল। তখন সাব্যস্থ হইল, কমলা হয় তো মেলার সময় বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পথের ধারে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। মাণিক বিশ্বেশ্বরের কৃপায় কোনো গতিকে তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

কুশদহ আমার দেশ

মেঘের কোলে, বিজ্‌লি খেলে,
দেখ্‌তে চমৎকার ;
শস্যে ভরা, বসুন্ধরা,
কোথায় পাবে আর।
মৃদুল পবন, জুড়ায় জীবন,
পাতায় পাতায় মিশি
স্বভাব সতী, জ্বালায় বাতি,
উজলি দশ দিশি।
ধরা-মাঝে, মোহন সাজে,
কোথায় এমন বেশ ?
জান-না-কি ? ব'লবো আর কি
'কুশদহ' আমার দেশ।

যমুনা নদী,　　　　নিরবধি
চল্‌ছে নিঝুম ব'য়ে,—
পাপিয়া ডাকে,　　　　থেকে থেকে
তার মাঝেতে গিয়ে,
সুধার ধারা,　　　　ঢালে তারা,
নাইক তাহার শেষ;
জান-না-কি ?　　　　ব'লবো আর কি—
'কুশদহ' আমার দেশ !

মোহন ছবি,　　　　রাঙা রবি,
ঐ খানে যে ওঠে ?
ছড়িয়ে মালা,　　　　বিকাল বেলা,
তার কিরণটি ছোটে ?
সাঁঝের বেলা,　　　　তারার খেলা,
যেখানেতে আছে ?
সুধার ধারে,　　　　ললিত হারে,
চাঁদ্‌টি সেথায় রাজে ?
পল্লী-মাঝে,　　　　কোথায় আছে,
এমন মধুর দেশ—?
সে যে আমার　　　　আমি তাহার
কুশদহ আমার দেশ।

বিদেশ থেকে,　　　　কাহার দিকে
চাইতে সদা চায় ?
কাহার খ্যাতি,　　　　দিবারাতি,
শুন্‌তে পরাণ ধায় ?
দিগ্‌ দরশন,　　　　উত্তরে যেমন,
থাকে সবার শেষ;
তেম্‌নি আছে　　　　আমার কাছে,
ঐ টি আমার দেশ।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

(প্রাপ্ত)

গত ৫ই বৈশাখ শনিবার সায়াহ্নকালে গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুদিগের বাটীতে জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্‌যোগে "পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি" সম্বন্ধে এক সাধারণ সভা হইয়াছিল। প্রথমেই শ্রীযুক্ত বাবু সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয় সভার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া স্থানীয় প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস মহাশয়কে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কেশব বাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হন্। সভাপতি সভার উদ্বোধন-মুখে "গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান" সম্বন্ধে একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বহুদর্শী সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা তাঁহার যোগ্যই হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন বাবু "সভাপতির অভিভাষণ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতি আনন্দ-প্রকাশ ও আমাদের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কারণ" মূলক একটি চিত্তাকর্ষক, জ্ঞানগর্ভ, সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পরেই বসুমতীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে স্বাবলম্বন ও রাজধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ বক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। শশী বাবুর পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "আর্য্য স্বাস্থ্যবৃত্তি" সম্বন্ধে অনেক হিতকর কথার আলোচনা করিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। কবিরাজ মহাশয় ম্যালেরিয়ার পুরাণত্বে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় "স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পল্লীর অবস্থা" শীর্ষক স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট হিতোপদেশ বিন্যস্ত ছিল। "কুশদহ" কুশদহবাসীর অশেষ হিতসাধন করিতেছে। এইজন্য ঐ প্রবন্ধে পণ্ডিত মহাশয় কুশদহের সম্পাদক যোগীন্দ্র বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্রিকা পরিচালনার সাহায্য-কল্পে গ্রাম্য বারয়ারির তহবিল হইতে কিছু টাকা দিবার জন্য সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে দেশহিতব্রত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস

মহাশয় দেশের দুর্গতির সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন বাবুর বিনয়, সৌজন্য ও উদারতা দেখিয়া দেশবাসী সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, এই সমদর্শী যুবক পরিণামে এ দেশের একজন আদর্শ পুরুষ হইবেন।

গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে শীঘ্রই এখানে একটি কমিটি গঠিত হইবে।

সম্প্রতি ধর্ম্মপুর গ্রামে এক 'বুজরুক' সাধুর আবির্ভাব হইয়াছিল ; সাধুই বা বলি কেন, তিনি নিজে প্রচার করেন, "আমি এই কলিযুগে স্বয়ং ভগবানের অবতার। একান্ত বিশ্বাস সহকারে আমাতে আত্মসমর্পণ করিলেই মুক্তি হইবে, আর কোনো ভজন সাধন কিছুরই প্রয়োজন নাই। বিশেষত যাহারা বালবিধবা, যাহাদের সরল বিশ্বাস, তাহাদের মুক্তির পথ আরো সহজ।" তাঁহার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক আছেন ; তিনি বাটীর মধ্যে যাইয়া অবতার মহাশয়ের অলৌকিকত্ব প্রচার করিয়া বিধবাগণকে তাঁহার নিকট আনয়ন করেন। সাধুর এই উৎকট মত এবং কার্য্য দেখিয়া ভদ্রবৃন্দ ছলে বলে বা কৌশলে তাঁহাকে গ্রাম-বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তৎপরে নাকি তাঁহার কোনো কোনো বিধবা শিষ্যা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, হিন্দু সমাজে বালবিধবাগণের পক্ষে কেবল কতকগুলি কঠোর শাসন নিয়ম পালন ভিন্ন, সরল ভাবে ধর্ম্ম-সাধন-দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব দেখা যায়। তাই তাহারা কোনোরূপ স্বেচ্ছাচারের পথ পাইলে তাহাতে সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অন্য দিকে ধর্ম্মের উচ্চ নীতি জ্ঞানের অভাবে এরূপ ঘটনা সকল হইয়া থাকে।

আজ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটি শোচনীয় ঘটনা পত্রস্থ করিতেছি। গত ৭ই চৈত্র চৌবেড়িয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়ের পরলোকগমন সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। তৎপরে তাঁহার উপযুক্ত একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ রায় পিতৃ-বিয়োগের উনিশ দিন পরে অর্থাৎ গত ২৬শে চৈত্র অভাবনীয় রূপে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি অশৌচাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের দ্বারস্থ হইবার জন্য নানা

স্থানে পদব্রজেই গমন করেন। শেষে কলুসুর গ্রামে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডলের বাটীতে আসিয়া কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং ৩ দিনের পর দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। কৃষ্ণপদ বাবু তাদৃশ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন না, প্রচলিত সংস্কার বশত তিনি এই অবস্থায় কঠোর নিয়ম পালন করেন; বোধ হয় তাহা তাঁহার শরীরের পক্ষে সহ্য না হওয়াতেই এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। এক্ষণে তাঁহার মাতা, পত্নী, বিধবা ভগিনী, ভাগিনেয়ী প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোককে একের অভাবে আজ নিঃসহায়প্রায় হইতে হইল, এবং চৌবেড়িয়া গ্রামের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতি হইল। চৌবেড়িয়া হইতে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, "তাহার অসীম গুণের কথা বলিয়া বা লিখিয়া শেষ হয় না, এই অল্প বয়সে তাহার ভিতরে যেরূপ ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল সেরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তাহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও সরলতা-মাখা মুখ যে একবার দেখিয়াছে সে আর ভুলিতে পারিবে না। দেশের কাজে দশের কাজে সকল সময়ে সকল বিষয়ে সে অগ্রবর্ত্তী ছিল। চৌবেড়িয়ার প্রতি ধূলি-কণাতে সে যেন মিশানো রহিয়াছে। যত দিন চৌবেড়িয়ার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না। তাহার মৃত্যুতে চৌবেড়িয়ার যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে!

প্রাপ্তি স্বীকার।

বৈশাখ মাসে যাঁহারা অতিরিক্ত সাহায্য দান করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি; ভগবান্ দাতৃগণের প্রাণে শুভ ইচ্ছার বিকাশ করুন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল ও
" খগেন্দ্র নাথ পাল .. ... ২৲
" সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ... ... ২৲
" দুর্ল্লভচন্দ্র পাল ... ... ২৲
" অনাথকৃষ্ণ শীল... ... ২৲
" ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র... ... ... ২৲

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন ... ২৲
" দ্বিজরাজ দত্ত ... ... ২৲
" কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (ডেঃ ইঃ স্কুলস্ বৰ্দ্ধমান)... ৫৲
" সহায়নারায়ণ পাল... ... ২৲

(ক্রমশঃ)।

গোবরডাঙ্গা-জমিদার বাটীর সম্মুখস্থ
সূর্য্য ঘড়ি (Sun Dial)

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"
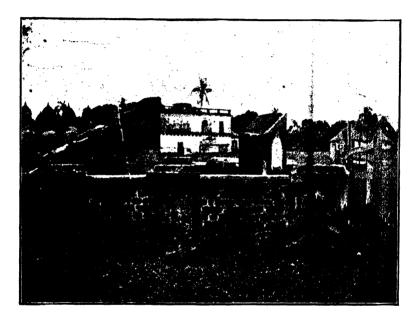
ষষ্ঠ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২১ | তৃতীয় সংখ্যা

উদ্বাহ-সঙ্গীত

—:•:—

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক নূতন রচিত]

দুজনে এক হয়ে যাও,
মাথা রাখো একের পায়ে।
দুজনের হৃদয় আজি
মিলুক তাঁরি মিলন ছায়ে।
তাঁহারি প্রেমের বেগে
দুটি প্রাণ উঠুক জেগে,
যা কিছু শীর্ণ মলিন
টুটুক্ তাঁরি চরণ-ঘায়ে।
সম্মুখে সংসার-পথ
বিঘ্ন বাধা কোরো না ভয়।
দুজনে যাও চলে যাও
গান কোরে যাও তাঁ'রি জয়।
ভকতি লও পাথেয়,
শকতি হোক অজেয়
অভয়ের আশীষ বাণী
আসুক্ তাঁর প্রসাদ বায়ে।

প্রসঙ্গ

মঙ্গলময় বিধাতা—শিশু কাঁদে, অধিকাংশ সময় তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না বলিয়া। শিশু যাহা ইচ্ছা করে, তাহা তো তাহার পক্ষে সমস্তই মঙ্গলজনক নহে। তাহার সে সমস্ত পাওয়া কি উচিত? সে তাহা বোঝে না, তাই কাঁদে। অনন্ত জ্ঞানময়-মঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমরা শিশু হইতেও শিশু। আমরা কি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি আমাদের কিসে মঙ্গল? আমরা কি সম্পূর্ণরূপে তাহা জানিতে পারি? অসম্ভব। আমরা জানি না বুঝি না বলিয়াই অভিষ্ট সিদ্ধি না হইলে কাঁদি। যাহা চাই তাহা পাইলে হাসি, না পাইলে কাঁদি। যাহা চাহি না তেমন অবস্থা আসিলে কাঁদি। যাহা চাহি তেমন অবস্থা না আসিলেও কাঁদি। আমাদের এই রোদন কি শিশুর রোদনের ন্যায় নহে? তাই বিশ্বাসী ভক্তগণ মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া হাসি কান্নার অতীত হইয়া যান।

দুইপ্রকার অদৃষ্টবাদী—এই দৃশ্যমান্ জগতের মধ্যে কতটুকু স্থান আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দৃষ্ট হয়? অতি অল্প। আর সমস্তটাই অদৃষ্ট। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আমরা কি বুঝি? প্রায় কিছুই নয়। সমস্তই অজ্ঞেয়। চক্ষুহীনের দৃষ্টি-শক্তি একেবারেই নাই। জ্ঞান-চক্ষুহীন, অধ্যাত্ম-রাজ্যের কিছুই বুঝিতে পারে না। তাই সকল বিষয়েই অদৃষ্টের দোহাই দেয়। যাঁহার অধ্যাত্ম-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনি জ্ঞান-চক্ষে, পাপ-পুণ্য মঙ্গলামঙ্গল বুঝিয়া চলেন। জ্ঞানের অতীত বিষয়ের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। নির্ভরের গুণে তাহার আর অমঙ্গল কিছুই থাকে না। তাঁহাকে অজ্ঞ অন্ধ অদৃষ্টবাদীর ন্যায় দুষ্কর্ম্মের কুফল ভোগ করিতে হয় না।

যোগী—দুই বস্তুর মিলনের নাম যোগ। মানুষ যতক্ষণ দেহাত্ম-বুদ্ধিতে অর্থাৎ দেহই আমি [illegible] অহংজ্ঞানে অভিমানী থাকে, ততক্ষণ অযোগী। অর্থাৎ দুই বস্তুর যোগ হয় নাই। যখন দেহাত্ম-বুদ্ধি অহংজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তখন দৃষ্ট হয় আমি একা নহি। পরমাত্মাতে আমি, আমাতে পরমাত্মা। পরমাত্মা ছাড়া আমার অস্তিত্ব কিছুই নহে। সেই

এক শক্তিতে সমস্ত পূর্ণ। "অন্তরীক্ষ নহে শূন্য তোমার সত্তায় পূর্ণ।" কোনো স্থান শূন্য নাই। ব্রহ্ম ছাড়া কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না। ইহার নামই 'ব্রহ্মজ্ঞান,' এই জ্ঞান হইলে আত্মাতে যোগের ভাব উপস্থিত হয়। ক্রমে যোগাবস্থা গাঢ় হইয়া আসে, তখন হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইতে থাকে। হৃদয় কোমল হয় স্থির হয় সংযত হয়। যোগী কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ক্রমে যোগ শক্তিতে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। যিনি পূর্ণ যোগী তিনি সংসার-ত্যাগী নহেন, কিন্তু অন্তরে সংসারাসক্তি ত্যাগী, কেন ত্যাগ হয়? আপনিই ত্যাগ হয়। ঈশ্বরাসক্তি জন্মিলে সংসারাসক্তি সহজেই ত্যাগ হইয়া যায়। ঈশ্বরে প্রেম হইলে সেই প্রেম সকল জীবে না হইয়া পারে না। সে প্রেমে সংকীর্ণতা থাকে না। সকলকেই ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে। যোগীর সেবা পাইলে জগৎ পরিতৃপ্ত হয়। যোগী সকল কর্ম্মই সম্পাদন করেন। আবশ্যক হইলে ক্রোধ পর্য্যন্ত যোগীর হয়। সে ক্রোধের ভিতরেও ভাব থাকে। তাই তাহাতে তাহার চিত্ত-বিকার হয় না। অন্যায় পাপ দেখিয়া ক্রোধ হয়। দুঃখের সহিত ক্রোধ হয়, সে ক্রোধে পাপীর পাপ বিমোচন হয়। অপরাধী ক্ষমা চাহিলে যোগীর ক্রোধ তখন শান্ত হয়। পাপীকে কোল দেন। যোগীর স্বভাব স্বতন্ত্র। তাহা যোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না।

সম্রাট

হুমায়ুনের আত্ম-জীবনী

তৃতীয় অধ্যায়

আহম্মদাবাদ* হইতে সম্রাট্ নিরাপদে আগ্রাপ্রসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। যুবরাজ হিন্দাল ও আস্কারীর সদাচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া সম্রাট্ প্রথমোক্ত জনের পরিণয় কার্য্য সমাধা করাইলেন এবং শেষোক্ত জনকে পারিতোষিক স্বরূপ সম্বলপুর জেলা প্রদান করিলেন। এই সময়ে সম্রাট্ সংবাদ পাইলেন যে, সের খাঁ বেহারের অন্তর্গত ঝারখন্দ ও রোটাস্ দুর্গ অধিকার করিয়াছেন এবং বঙ্গের রাজধানী গৌড় অবরোধ করিয়াছেন, সম্ভবত সত্বরই গৌড় অধিকার করিবেন।

* আহম্মদাবাদ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

সম্রাট্ সের খাঁর ব্যবহার শ্রবণে তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি রুমিখাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া চুণার দুর্গ অধিকারে বদ্ধপরিকর হইলেন। সম্রাটের যে কথা সেই কাজ। অমনি সম্রাট্-সৈন্য তীর বেগে যাত্রা করিয়া চুণাকরের পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিল। এই সময়ে মহম্মদ সুলতান-প্রমুখ বিদ্রোহী রাজাগণ আসিয়া সম্রাটের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করায় সম্রাট্ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া আপন সেনাদলে তাঁহাদের ক্ষমতানুযায়ী পদ প্রদান করিলেন।

রুমিখাঁর অপূর্ব্ব কৌশল-বলে সুদৃঢ় চুণার দুর্গ অধিকৃত হইল। শত্রুপক্ষ পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

সম্রাট্ তখন কাহার উপর চুণার রক্ষার ভারার্পণ করিবেন তৎসম্বন্ধে রুমিখাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রুমি খাঁ বেগ্ মাইরেককে চুণারে স্থাপিত করিতে পরামর্শ দিলেন, বলা বাহুল্য সম্রাট্ও তাহাই করিলেন! ইহাতে অন্যান্য প্রধান সেনাগণ এতদূর ক্রোধান্ধ হইলেন যে, কিয়দ্দিবস পরে গরল-মিশ্রিত সুরাপান করাইয়া তাঁহারা রুমিখাঁর প্রাণসংহার করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

(সম্রাটের বঙ্গদেশ অধিকার, ১৫১৮—৩৯ খৃষ্টাব্দ)

চুণার দুর্গ অধিকারের পর সম্রাট্ বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রাজার নিকট শুনিলেন যে, সের খাঁ গৌড় অধিকার করিয়াছেন। সম্রাট্ ইহা শুনিয়া আফ্‌গানদিগকে দমন করিবার জন্য রোটাস্ দুর্গাবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু শোন নদের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, সের খাঁ গৌড় অধিকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি যুবরাজ হিন্দাল ও জদ্গর মির্জ্জার উপর দিল্লী ও আগ্রা রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্গে পৌছিবার পূর্ব্বে তিনি সের খাঁর নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, সের খাঁ যদি বঙ্গের রাজছত্র সম্রাট্‌কে প্রদান করেন তবে সম্রাট্ তদ্বিনিময়ে সের খাঁকে চুণার প্রমুখ অন্যান্য দুর্গ ছাড়িয়া দিবেন।

সের খাঁ দূতের বিশেষ সমাদর করিয়া বলিলেন, তিনি বহু পরিশ্রম ও

ক্লেশ স্বীকার করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ শ্রমলব্ধ প্রদেশ কখনো তিনি অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দূত এই সংবাদ লইয়া সম্রাট্-শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সম্রাট্ যখন গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মুনীতে উপস্থিত হইলেন তখন বঙ্গের রাজ্য-চ্যুত রাজা সৈয়দ মহম্মদ তদ্‌শিবিরে উপস্থিত হইয়া সম্রাট্‌কে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গদেশে এখনো তাঁহার অনেক শস্য-ভাণ্ডার আছে। সেই সমস্ত শস্য-ভাণ্ডার হইতে বহু সৈনিকের আহার্য্যের সঙ্কুলান হইবে।

সম্রাট্ হতভাগ্য সৈয়দকে বিশেষ যত্ন করিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে বঙ্গের সিংহাসনে বসাইবার আশ্বাস প্রদান করিলেন।

গৌড় অধিকার করিতে ও আফগানদিগকে দূরীভূত করিতে সম্রাট্ চারিদিনেই সমর্থ হইলেন। *

গৌড় পরিষ্কার করাইয়া সম্রাট্ তাঁহার কর্ম্মচারীগণের মধ্যে জায়গীর বিভাগ করিতে লাগিলেন। এতদিনের পর একটু বিশ্রাম পাইয়া সম্রাট্ কয়েক মাস আমোদে আহ্লাদে কাটাইতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সম্রাটের আনন্দ-রবি দুঃসংবাদ-ঘনঘটায় আবৃত হইল। সম্রাট্ শুনিতে পাইলেন যে, সের খাঁ সাত শত মোগলসৈন্য নিহত করিয়া চুণার দুর্গ অধিকার করিয়াছেন, বারাণসী আপন করায়ত্ত করিয়াছেন এবং কনৌজ অধিকারার্থে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে, অধিকন্তু সম্রাটের কয়েকজন কর্ম্মচারীর পরিবারস্থ লোককে বন্দী করিয়া রোটাস্ দুর্গে প্রেরণ করিয়াছেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি কর্ম্মচারীবর্গকে ডাকিয়া কাহার হস্তে বঙ্গের শাসনভার অর্পণ করিবেন তৎসম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিলেন সম্রাট্ যাহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করেন তাঁহারই হস্তে বঙ্গের শাসন-দণ্ড প্রদান করুন। তখন সম্রাট্ বলিলেন যে, জাহিদ্ বেগ তাহার পদোন্নতির জন্য অনেক দিন যাবত আমাকে অনুরোধ করিতেছে, আমি তাহারি হস্তে বঙ্গের শাসন-ভার অর্পণ করিলাম।

জাহিদ্ বেগ স্বয়ং সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন,—"আপনি কি আমাকে মারিবার জন্য বঙ্গদেশ ছাড়া অন্য কোনোস্থান খুঁজিয়া পাইলেন না।" সম্রাট্ জাহিদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উত্তরে এতদূর ক্রোধান্বিত হইলেন যে, তিনি জাহিদের

* The History of Bengal, page 121.

প্রাণসংহারের আদেশ করিলেন। নির্ব্বোধ জাহিদ্ তখন আগ্রায় হিন্দালের নিকট পলাইয়া যাইয়া প্রাণ রক্ষা করে।

সম্রাট্ তখন জাহাঙ্গীর্‌লোদীকে বঙ্গদেশের মস্‌নদে বসাইয়া মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার অগ্রে প্রেরিত সৈনিক খানান লোদীকে * সের খাঁর সৈন্যগণ বন্দী করিয়া সের খাঁ-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছে।

এই ঘটনায় সম্রাট্ যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ যুবরাজ আস্কারীকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। আস্কারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সম্রাট্ তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি আমাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তুমি যাহা চাও আমি তোমাকে তাহা দিব। যুবরাজও স্বার্থপর সৈনিকদিগের প্ররোচনায় সৈন্যদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিলেন, বলা বাহুল্য সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

যুবরাজ আস্কারী সম্রাটের নিদেশানুসারে কলগঙ্গে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, সের খাঁ "শাহ্" (রাজা) উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, চুণার ও জৌনপুর আক্রমণ করিতেছেন, কনৌজ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং রোটাস্ দুর্গের নিকট অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ সকলকে আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই সম্রাটকে জৌনপুর-অভিমুখে যাত্রা করিতে পরামর্শ দিলেন; কেবল মুবীদ বেগ নামক একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিলেন যে, সম্রাট যদি গঙ্গা অতিক্রম না করেন তবে সের খাঁ নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, আপনি সেরের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। অবশেষে মুবীদ বেগের পরামর্শই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইল। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করিয়া শোন নদীর মোহনামুণীতে উপস্থিত হইল। পরদিন সেরের সৈন্য আসিয়া সম্রাটের শিবির-সন্নিকটে উপস্থিত হইল; ফলে দুই দলে একটু খণ্ডযুদ্ধ হইল।

চতুর্থ দিবসে আমরা চৌসার † নামক গ্রামে উপনীত হইলাম। এই গ্রামে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান কালীন সের শাহের সৈন্যগণকে গমন করিতে

* খানখানান্ লোদী আফগানদেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস খান্‌খানানের সহিত সের খাঁর গুপ্তলিপি ব্যবহার হইত।

† এইস্থানে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সুজাদ্দৌলার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে সাধারণত বক্‌সরের যুদ্ধ বলে।

দেখিলাম। কাসিম হোসেন নামে জনৈক সেনা বলিলেন যে, সের শাহের সৈন্যগণ এখন পরিশ্রান্ত সুতরাং এখনই উহাদের আক্রমণ করা যাউক। কিন্তু দুষ্ট মুদীদ বেগ সম্রাটকে বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির আবশ্যক কি? আমাদের শিবিরের ত্রিশ ক্রোশ দূরের সেরের সৈন্যগণ অবস্থান করিতে লাগিল। প্রতি-দিনই উভয়দলের সৈন্য মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিত, ফলে উভয় দলেরই কয়েক-জন সাহসী লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেলে বন্যায় সেরের শিবিরাদি ভাসিয়া গেল, সেরের ভয়ে বন্যা গতি পরিবর্ত্তন করিল না। তখন অনন্যোপায় সের সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। সম্রাট্ সেরকে চুণার ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সেরকে প্রতিদান করিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

উপদেশ *

—:*:—

নরনারীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রেম মানব প্রকৃতির এক অদ্ভুত রহস্য। কেবল মানব প্রকৃতির কেন, দাম্পত্য-প্রেম প্রাণিজগতেও এক অদ্ভুত রহস্য। এই কথা বলিতে গিয়া আমার বাল্যকালের এক ঘটনা স্মরণ হইতেছে। আমি বাল্যকালে পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালবাসিতাম। আমার একজন খেলার সঙ্গী একবার আমাকে এক জোড়া পায়রা দিল। তাহার মধ্যে মাদী পায়রাটা গোলা পায়রা, কালো কদাকার ও ছোট। মদ্দা পায়রাটা সিরাজু পায়রা। সে যেন পায়রা-কুলের রাজা। দীর্ঘাকার ও সুন্দর; তার যেমন রূপ তেমনি ডাক; শুনিলে মন মুগ্ধ হয়। আমি পায়রা দু'টি বাড়িতে আনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিয়া তাহাদিগকে নিজের বাড়িতে ধরিয়া রাখি। অবশেষে স্থির করি-লাম যে, তাহাদের ডানা কাটিয়া দিব, তাহা হইলে আর তাহারা উড়িতে পারিবে না। যখন ডানা কাটিতে যাইতেছি, তখন আমার মা বলিলেন—"গোলা পায়রাটার ডানা কেটে দে, বড়টার ডানা কাটিস নে," আমি বলিলাম "তা' হলে

---

* গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত উপদেশ।

যে ও উড়ে যাবে।" মা বলিলেন—"না, ঐ গোলা পায়রা উড়িতে না পারিলে, বড়টাও এখানে থাকবে।" আমি মায়ের কথায় গোলা পায়রাটার ডানা কাটিয়া দিলাম। সে বসিয়া রহিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই সিরাজু পায়রাটা উড়িয়া বাহির হইয়া গেল; তখন আমি মায়ের উপর রাগ করিলাম। মা বলিলেন—"রোস্ না, সে আসে এই।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি সিরাজু পায়রাটা আসিয়াছে; এবং ডাকিয়া ডাকিয়া লেজ ফুলাইয়া সেই গোলা পায়রার চারিদিকে ঘুরিতেছে। তখন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মাকে সেই সংবাদ দিলাম। মা বলিলেন—"দেখ্‌লি আমি বলছিলাম। ঐ গোলা পায়রাটা বড় পায়রাটার স্ত্রী, ওকে ও ভালবাসে, সেইজন্যে এসেছে।" আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম,—"ওমা একি, ভালবাসা কি এমন।" সেইদিনকার ঘটনা চিরদিন আমার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। দাম্পত্য-প্রেম বলিলেই, সেই দিনকার সেই দৃশ্য মনে আসে।

এখন প্রশ্ন এই, পক্ষীরা কি জানে তারা কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ সূত্রে কাহার দ্বারা এই দাম্পত্য-প্রেমে বদ্ধ হয় এবং যিনি জীব-রাজ্যের কর্ত্তা ও বিধাতা তিনিই জীব-প্রবাহ রক্ষার জন্য তাহাদিগকে এই দাম্পত্য-প্রেমে আবদ্ধ করেন? মানব-কুলে যে দাম্পত্য প্রেম, তাহার উপরে কি তাঁহার হাত নাই? তাঁহারি প্রেরণার অধীন হইয়া নরনারী কি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয় না? তবে একটু বিশেষত্ব আছে। প্রাণিরাজ্যে মানুষ যেমন জ্ঞানে প্রেমে ও ধর্ম্মনিষ্ঠাতে সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, তেমনি মানবের দাম্পত্য প্রেম অপরাপর প্রাণীর দাম্পত্য প্রেমের ন্যায় কেবল জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য নয়, তাহার একটা আধ্যাত্মিক দিকও আছে। এই দাম্পত্যপ্রেম মানব-জীবনের মহাকল্যাণ সাধন করে। অবশ্য যাঁহারা পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইতে যান, তাঁহারা অনেক সময় সেই মহাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহারা পরস্পরকে পাইলে সুখী হইবেন, এবং পরস্পরের কার্য্যের সহায় হইবেন, এই ভাবই প্রধানরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে থাকে। কিন্তু বিধাতা অনেক সময় তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সেই পরিণয়-সম্বন্ধকে তাঁহাদের জীবনের ও চরিত্রের উন্নতি ও বিকাশের অদ্ভুত উপায়-স্বরূপ করিয়া থাকেন। তাঁর কার্য্যের প্রণালীই এইরূপ। আমরা যে প্রতিদিন অন্নজল গ্রহণ করি, আমরা কি আহার করিবার সময় ভাবি যে, দেহের মধ্যে একটি পাকযন্ত্র আছে, সেই অন্নজল যেখানে যাইবে, পরিপাক হইবে, দেহের রুধিরে, মাংসে, স্নায়ুতে অস্থিতে পরিণত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আহার করিবার

সময় সে সকল বিষয় কিছুই আমাদের মনে থাকে না; ক্ষুধার আবেগে আহার করি, নব নব রসের আস্বাদন পাই বলিয়া আহার করি। সেইটুকু আমাদের হাতে থাকে। অবশিষ্ট পরিপাক ও দেহের গঠন-কার্য্য—ভগবানের হাতে থাকে! পরিণয় সম্বন্ধেও সেইরূপ। পরস্পরকে অন্বেষণ করা, পাওয়া-দম্পতীর কার্য্য। তদ্দারা জীবনের ও চরিত্রের যে উন্নতি ও বিকাশ হয়, তাহা সেই মঙ্গলবিধাতার কার্য্য।

এই পরিণয় সম্বন্ধের দ্বারা, মানব জীবনের কিরূপ উন্নতি হয়, তাহা সংক্ষেপে সামান্যভাবে কিছু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম উন্নতি, স্বার্থচিন্তার স্থানে পরার্থচিন্তার আবির্ভাব! যে পুরুষ বা রমণী বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে, চিন্তা করিতে গেলেই নিজের স্বার্থ বিষয় চিন্তা করিতেন, অন্বেষণ করিতে গেলে নিজের সুখই অন্বেষণ করিতেন, দাম্পত্য-সম্বন্ধ হৃদয়ক্ষেত্রে এমন একজনকে আনিয়া দিল, যাঁহার সুখকে প্রথম স্থানে রাখিয়া, নিজের সুখকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিতে হইল। মানব জীবন ও মানব চরিত্রের পক্ষে ইহা কিরূপ পরিবর্ত্তন তাহা সকলে একবার চিন্তা করুন। এরূপ কতবার দেখা গিয়াছে, যে নারীকে আমরা অলস, সুখপ্রিয় ও শ্রমকাতর জানিতাম, পরিণয়পাশে বদ্ধ হওয়ার পর তাঁহাকে পতিসেবা ও গৃহধর্ম্ম পালনের জন্ম বদ্ধপরিকর দেখিলাম। ইহা কিরূপ পরিবর্ত্তন!

দ্বিতীয় গুণ আত্মসংযম শিক্ষা। পরিণয় সম্বন্ধের দ্বারা গৃহধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পুরুষ ও নারী উভয়কেই পদে পদে আত্মসংযম ও প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া চলিতে হয়। মন যাহা চায়, তাহাকে পদে পদে বাধা দিতে হয়; সুখপ্রিয়তাকে পদে পদে খর্ব্ব করিতে হয়; আরামের আকাঙ্ক্ষাকে পদে পদে শৃঙ্খলিত করিতে হয়; প্রবৃত্তি কুলের মুখে লাগাম দিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন করিতে হয়; ইহা মানব প্রকৃতির পক্ষে কিরূপ শিক্ষা!

তৃতীয়, এই পরিণয় সম্বন্ধ মানব-মনকে কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধির ন্যায় মানব চরিত্রের উন্নতি বিধায়ক আর কিছু আছে কি না জানি না। ইহাতে মানব জীবনে মহত্ত্ব ও দেবত্ব আনিয়া দেয় এবং তাহাকে ঈশ্বরের সহবাসের উপযুক্ত করে। পরিণয় সম্বন্ধ পদে পদে এই ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিকশিত করে। নারী যখন গৃহধর্ম্মে বসিলেন, তখন পতির প্রতি কর্ত্তব্য, পতির আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য, ক্রোড়ে শিশুরা আসিলে তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য, দাসদাসীর প্রতি কর্ত্তব্য এইরূপে পদে পদে কর্ত্তব্যের পর

কর্ত্তব্য আসিতে থাকে এবং চিত্তকে দৃঢ় উন্নত ও পবিত্র করিয়া দেয়। এ কেমন শিক্ষা!

চতুর্থ, দাম্পত্য সম্বন্ধ গৃহ পরিবারকে সৃষ্টি করিয়া মানুষকে জনসমাজের সহিত আবদ্ধ করে। তখন নিজ নিজ সুখ দুঃখের চিন্তার সঙ্গে অপরের কল্যাণ চিন্তা আসিয়া পড়ে। বিবাহিত দম্পতী সমাজের উন্নতি চিন্তা হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিতে পারেন না। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, দাম্পত্য-প্রেম হইতেই মানবের সামাজিকতার সৃষ্টি। দাম্পত্য-প্রেমের ন্যায় মানবের সামাজিকতাও মানব প্রকৃতির এক অদ্ভুত রহস্য, বিধাতার এক বিচিত্র বিধান। আমাদের প্রাচীন আচার্য্যেরা মানব-সমাজকে কারাগার ও মানবের গৃহ পরিবারকে মায়ার বন্ধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, মানব-সমাজ মানব জীবনের শিক্ষা উন্নতি ও বিকাশের উপায় স্বরূপ, ইহা বিধাতার বিধান। বিমল দাম্পত্য-প্রেম যে হৃদয়ে বাস করিতেছে, সে হৃদয় জনসমাজের কল্যাণের প্রতি উদাসীন হইতে পারে না। দুইটি হৃদয় যখন অকপট দাম্পত্য-প্রেমে আবদ্ধ হয়, তখন তাহারা দুই হৃদয় ও চারি হস্ত এক করিয়া জন-সমাজের সেবা ও উন্নতি বিধানে আপনাদিগকে অর্পণ করে।

সর্ব্বশেষে বলি, যে হৃদয়ে বিমল দাম্পত্য-প্রেম বাস করে, যে হৃদয়ে স্বার্থনাশ ও পরার্থপ্রবৃত্তি বলবতী হয়, যে হৃদয়ে আত্ম-সংযমের শক্তি কার্য্য করে, যাহাতে কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত, যাহাতে নিজের কল্যাণ চিন্তার ন্যায় জন-সমাজের কল্যাণ চিন্তা প্রবল, তাহাতে আধ্যাত্মিকতা ও ভগবদ্ভক্তি স্বতই প্রস্ফুটিত হয়। এইজন্য দেখা যায় বিমল দাম্পত্য-প্রেম যেখানে আছে, ভগবদ্ভক্তি সেখানে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পায়। এইজন্য আমরা নরনারীর পরিণয় সম্বন্ধকে ধর্ম্ম জীবনের একটি প্রধান সহায় বলিয়া মনে করি।

শচীন্দ্রপ্রসাদ ও কুমুদিনি! এই সকল কারণে আমরা অদ্য তোমাদের এই পরিণয়কে ধর্ম্মের চক্ষে দেখিতেছি। আমরা ইহাকে একদিনের ব্যাপার মনে করিতেছি না। যেমন উভয় নদী পথিমধ্যে মিলিত হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, কাহারো নীল জল, কাহারো লাল জল, উভয় জল মিলিত হইয়া এক আকার ধারণ করে, উভয় স্রোতের শক্তি মিলিয়া দুর্জ্জয় বেগ ধারণ করে, সেইরূপ তোমাদের দুই জীবনের শক্তি মিলিয়া প্রবল বেগে সেই মহান্ পরমেশ্বরের সেবার দিকে ছুটিবে, আমরা এই আশা করিতেছি। তোমরা উভয়েই সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের চরণাশ্রিত বিশ্বাসী, বিনয়ী ও ধর্ম্মানুরাগী মানুষ,

তোমাদের উভয় জীবনের সম্মিলন বিধাতার বিশেষ বিধান, ইহা আজ তোমরা দর্শন করো। তোমরা কি ভাবে চলিবে, কি ভাবে কাজ করিবে, কিভাবে পরস্পরের সহায় হইবে, কি ভাবে নরসেবাতে উভয়ের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। মোটের উপরে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের অনুসরণ করিয়া দুইটি কথা বলিতেছি, স্মরণে রাখিয়ো। প্রথম উপদেশ এই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন :—

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং ॥

যে গৃহে পতি পত্নীর প্রতি এবং পত্নী পতির প্রতি নিরন্তর সন্তুষ্ট সে গৃহে নিরন্তর কল্যাণ।

অতএব যে প্রেমে আবদ্ধ হইয়া অদ্য তোমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছ, সেই প্রেমে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন থাকিয়ো, ও পরস্পরকে সুখী করিবার প্রয়াস পাইয়ো।

দ্বিতীয় উপদেশ শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, যে কোনও কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে অর্পণ করিবেন।

অতএব তোমরা সেই মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের শ্রবণ মননের উপর আপনাদের গৃহধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিবে। এইরূপ দাম্পত্য-সম্বন্ধকে ভগবদ্ভক্তি লাভের উপায় স্বরূপ করিবে। যে কোনও কর্ম্ম করো, তাঁহার আদেশে করিবে এবং তাহার ফলাফল তাঁহার চরণে রাখিবে।

শচীন্দ্রপ্রসাদ! তুমি বহুদিন হইতে উৎসাহের সহিত নরসেবাতে আপনাকে দিয়াছ, তোমার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে বহুজনের কল্যাণ হইতেছে; তুমি বিনয়ে ভগবানের চরণে সর্ব্বদা নত আছ, তোমাকে ইহার অধিক উপদেশ আর কি দিব? তুমি আজ ভগবানকে ধন্যবাদ কর, যে তিনি তোমাকে একজন সঙ্গের সঙ্গিনী দিতেছেন, তিনি তোমার ধর্ম্মসাধনে, তোমার আত্মোন্নতি বিধানে, তোমার নরসেবাতে তোমার সাহায্যকারিণী হইবেন। ঈশ্বর করুন যেন তাহাই হয়।

কুমুদিনি! তুমি জ্ঞানে ও শিক্ষাতে অগ্রসর হইয়া ভাল কাজে

আপনাকে দিয়া সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছ। আমরা পশ্চাতে থাকিয়া তোমার উন্নত জীবনের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ করিয়া আসিতেছি। আজ তুমি উপযুক্ত পতিলাভ করিয়া জীবনের নূতন পথে পা দিতে যাইতেছ। ঐ পথে তোমার জীবন আরও উন্নত ও কর্ম্মক্ষম হইবে, আমরা এই আশা করিতেছি। ঈশ্বর করুন যেন তাহাই হয়। তোমার স্বর্গীয় মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তোমার গুণাবলি দেখিয়া তোমাকে কুমারীরত্ন নাম দিয়াছিলেন, সেই নামেই তোমাকে সম্বোধন করিতেন; তুমি আমাদের নিকট কুমারীরত্ন বলিয়াই পরিচিত। জগদীশ্বর করুন, এই দাম্পত্য সম্বন্ধ তোমার জীবন ও হৃদয়কে এরূপ উন্নত করুক যে, অতঃপর লোকে তোমাকে রমণীরত্ন বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকুক।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

(গল্প)

"থাকুল বালি দাব—অবি থাকুল খাব!" এমন সময় ছেলের মা একখানা ফটো লইয়া সেই ঘরে ঢুকিলেন— বলিলেন,—"ও—কি খাবে?"

ছেলের বাপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার পেটুক ছেলে এবার এক মজার জিনিস খেতে চেয়েছে!"

"কি, রিপুকর্ম্ম নাকি?—সেদিন যে ও জুতোব্রুস্ খাবার জন্যে একটা মুচিকে ডেকে এনেছিল!"

"না—ও-সব নয়—এবার কিছু উঁচু দরের জিনিস—রবি বাবুকে!"

"রবিবাবুকে!—তাঁকে আবার কেউ ফিরি করে বেড়াচ্চে নাকি?"

"না, তা নয়। আজ এইমাত্র 'সোনারবাংলা' গানটি পড়ে' হরেনবাবু-টাবু ঠাকুর-বাড়ির কথা তুলে রবিবাবুর সুখ্যাতি করছিলেন, তাই শুনে তোমার ছেলে ভাবলে ঠাকুর-বাড়ি আর রবিবাবু রসগোল্লা-গোছের অমনি একটা কি হবে তাই বায়না ধরেচে—"থাকুল বালি দাব, অবি থাকুল খাব!"

মা হাসিয়া ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"দূর পাগলা!"

কিন্তু ছেলে ছাড়িবার পাত্র নয়—সে কাঁদিতে সুরু করিল। ছেলের মা সুকুমারী দেখিলেন তাঁর কাজের কথা পাড়িতে দেরি হইয়া যাইতেছে, আবার হয় তো এখনি একদল বন্ধু আসিয়া জুটিবে আর তাঁর কাজের কথা বলা হইয়া উঠিবে না, তখন এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার মতলব করিয়া ক্রন্দনোন্মত্ত পুত্রকে ভুলাইবার ছলে বলিলেন— "এই ত্থাখ্ দেখি কেমন তোর সুন্দর বউদি হবে।" সুকুমারীর উদ্দেশ্য সফল হইল—ছেলে, হাসিল, ছেলের বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ও ?"

"তুমি তো তোমার ফ্রেণ্ড-ট্রেণ্ড আর স্পীচ নিয়ে থাকবে, ছেলের বে' দেবার তো চাড় নেই ; তা' আমি আমাদের নরেনের জন্যে একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছি—এই সেই মেয়েটির ফটো—মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী আর—"ছেলের বাপ অবিনাশ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—"তা নরেনের বে'র জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ?"—

"কেন এখনো বে' দেবার সময় হয় নি ? বুড়ো করে বে' দেবে নাকি ?"

অবিনাশ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"মেয়ে দেখে বুঝি ভুলে গেছ—তাই বউ করবার লোভ সামলাতে পারচো না ?"

"তা ভুলবো না ? ক'জনের ভাগ্যে এমন পরীর মত বউ জোটে ? মেয়ের যেমন রূপ—মেয়ের বাপের তেমনি ধন-দৌলত ! আমার নরেন যেমন—বউটিও তেমনি হবে !"

অবিনাশ বাবু যেন অন্ধকার হইতে আলোয় আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন— "ও, এতক্ষণে বুঝেছি তোমার এত জেদ কেন—শুধু রূপের জন্য নয়—তার সঙ্গে টাকার গন্ধও আছে !"

"তা টাকার গন্ধ আবার কি ? তারা বড় মানুষ তারা কি মেয়ের হাতে শুধু সুতো বেঁধে বে' দেবে ?"

তখন অবিনাশ বাবু পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,— "সুকুমারি, আমরা সেদিন জন্মভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করে' কি অঙ্গীকার করেছি তা কি শোনো নি ?—তোমার কি মনে নেই সে দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম— এখন হ'তে আমরা আমাদের সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে যথাসম্ভব ব্যয়-সংক্ষেপ কোরবো এবং বিবাহে পণ-গ্রহণ-প্রথা ত্যাগ কোরবো ?—আর এক কথা— আমি নরেনের বিবাহ-সম্বন্ধে উদাসীন নই, তার পাত্রী অনেক দিন হ'তেই ঠিক করে রেখেছি।"

"কোথায়—কার মেয়ে ?"

"তুমি বোধ হয় চেনো—ঐ শ্রীনাথ বাবুর মেয়ে—আহা সে বেচারীর বড় কষ্ট! একে মাহিনার পঁচিশটি টাকায় সংসার খরচ কুলিয়ে ওঠে না, তার উপর গলায় বিবাহযোগ্য একটি মেয়ে !"

সুকুমারী চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তুমি তার মেয়ের সঙ্গে নরেনের বে' দেবে !"

"কেন তাতে দোষ কি ?—সে গরীব—এই জন্য ? ধনীর গরীব হ'তে কতক্ষণ লাগে সুকুমারী ?—ধনের অহঙ্কার কোরো না।"

"ওমা !—তুমি একজন রায় বাহাদুর হ'য়ে একটা পঁচিশ টাকা মাহিনার কেরাণীর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে' দেবে ?—লজ্জা করবে না ?"

"রায় বাহাদুর !—হুঃ !! সুকুমারী, আর লজ্জা দিয়ো না।"

সুকুমারী তখন সে কথা চাপা দিয়া ফটোর মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —"তা নয় এদের বলা যাবে যে আমরা কিছু নোবো না—শুধু মেয়েটিকে বউ কোরবো।"—মনে মনে বলিলেন—"তা তারা অত বড় মানুষ তারা কি আর সত্যি সত্যি কিছু দেবে না !"

"হাঁ তা হ'তে পারতো। কিন্তু যখন একজনকে একবার কথা দিয়েছি, তখন আর তা' বদলাতে পারবো না। কথার উল্টো কাজ করে করেই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে।"

সুকুমারী তখন অপমানে অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

২

"নরেন, এ 'সত্যমেব জয়তে' লেখাটা কবে বাঁধিয়ে আনলি ? আমার এই ফটোখানা বাঁধিয়ে এনে দিতে পারিস ?" এই বলিয়া সুকুমারী সেই ফটোখানি নরেনের হাতে দিলেন।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল—"এ কার ফটো মা ?"

"মেয়েটি দেখ্তে কেমন বল দেখি ?"

"হ্যাঁ ফটোতে যেমন দেখাচ্ছে তা'তে বেশ সুন্দর বলেই তো বোধ হয়।"

"বাছা এইটিকে বউ কর্‌বার সাধ ছিল, কিন্তু ও'র জন্যে দেখচি—"

নরেন তখন ও-বিয়ের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া নিজের পড়ায় মন দিতে চেষ্টা করিল।

সুকুমারী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যখন দেখিলেন যে নরেন ও-বিষয়ের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিল, তখন তিনি নিজে আবার আরম্ভ করিলেন—"নরেন !"—

"কি মা !"

"নরেন, আমি তোর মা—আমার একটা কথা রাখ্‌বি, বল ?"

"কি ?"

"উনি এক গরীবের মেয়ের সঙ্গে তোর বে' দেবার জোগাড় কচ্ছেন !"

"তা—কি কোর্‌বো মা ?"

"তুই বল, 'আমি ওখানে বে' কর্‌বো না' ।"

"মা, তুমি কি পাগল হয়েছ ? তোমার মত না থাকে, তুমি বাবাকে বলো ; আমি কোন্ লজ্জায় গিয়ে বাবাকে বোল্‌বো—'ওখানে আমি বে' কোরবো না ?"

"এই পোড়া মিন্সেদের সঙ্গে মিশে আর এই ছাই স্বদেশী আন্দোলনে ঢুকে ওঁর এ রকম মতি-গতি হয়েচে। ওমা ! কোত্থেকে একটা ভিখিরীর মেয়েকে বউ করতে হবে !"

"তা এতে মিন্সেদের আর স্বদেশীর কি দোষ দেখ্‌লে ?"

"ঐ মিন্সেরাই তো এসে ওঁর কাছ থেকে দিব্যি করিয়ে নিয়েচে যে, বে-থাতে বা কোনো কাজ কর্ম্মে কোনো রকম বেশী খরচ-পত্র করা হবে না, আর গরীব-গুরোর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে' দিতে হবে !"

"তা সেটা কি খারাপ ? গরীব বলে' সে কি মানুষ নয় ? আর, বে'-থাতে খরচ করতে গিয়ে আমাদের সমাজের কত লোককে যে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'য়েছে, তা' কি তুমি দেখ নি ? তা, বে'-থাতে টাকা দেওয়া-নেওয়াটা উঠে গেলে কি ভালো নয় ? ওঁরা তো ভালোই করেছেন।"

স্বামীর কাছে নিরাশ হইয়া পরে পুত্রের নিকট এইরূপ উত্তর পাইয়া সুকুমারীর সর্ব্বশরীর জলিয়া গেল ; আর ক্ষণমাত্র তথায় অবস্থান না করিয়া তিনি গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

৩

একদিন কলিকাতার এক বিবাহ-বাটীতে শত আনন্দ-উৎসবের অন্তরালে একটি ক্ষুদ্র প্রাণ নীরবে কাঁদিতেছিল। তাহা সরলার। সরলারই বিবাহ। সরলার মা নাই।

নরেনের সহিত সেই দীন পিতার কন্যা সরলার বিবাহ হইয়া গেল—দেখিতে দেখিতে রাত কাটিয়া গেল, দিন আসিল। আজ সরলা শ্বশুর-বাটী যাইবে, সরলার চোখে জল দেখা দিল। সকলেই কাঁদিল, অথচ সকলেই বলিল, "সরলা কাঁদ কেন? আবার তো আসবে!" সরলা কাঁদিতেছে কেন?—কে না কাঁদে? যেখানে বারো বৎসর ধরিয়া প্রাণের শিকড় বসিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে তাহা ছিঁড়িতে কার না প্রাণ কাঁদে? সরলা আবার আসিবে কিন্তু কত নূতন ভাবে! আপনার স্নেহের রাজ্যে পরের মত দু'দিনের জন্য শুধু!

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়িতে উঠিল,—কাঁদিতে কাঁদিতে সরলার পিতা গাড়ির নিকট আসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না, শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। শেষে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

শ্বশুর-বাটী আসিতেই সরলার একটি সঙ্গী জুটিল। তাহার নাম শচীন্দ্র, বয়স আট বৎসর হইবে। সম্পর্কে সে ভাগিনেয়। সরলার আসা অবধি শচীন্দ্র তাহার কাছ-ছাড়া হইত না—গল্পের মধ্যে ফেলিয়া সরলার মনটিকে প্রফুল্ল রাখিতে সে চেষ্টা করিল। সরলা অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিত—"এ আমাকে এমন করে কেন?" একদিন সরলা শুনিল যে, শচীন্দ্রেরও মা নাই। সেই জন্য কি সে ব্যথার ব্যথী সরলার নিকট বসিতে এত ভালোবাসে? দুঃখীই দুঃখ বোঝে—শচীন্দ্রের উপর সরলার স্নেহ জন্মিতে লাগিল।

সরলা শ্বশুর-বাড়িতে কি করে? সরলা খায় অতি অল্প; ঘুমায়—তাও অতি অল্প! নির্জ্জন হইলে কাঁদে, আর বাকী সময়টা শচীন্দ্রের সঙ্গে ছাদে বসিয়া থাকে। সরলা ছাদে বসিয়া কি করে? আলিসার ধারে গিয়া বাপের বাড়ির দিকে একদৃষ্টে সে চাহিয়া থাকে!

ঐযে দূরে গাছগুলা দেখা যাইতেছে ও-গুলা বহুদূরে? সরলার বাপের বাড়ি ও-গুলার কত দূরে? বোধ হয় বেশী নয়। ঐ যে একটা কাক ঐ দিক হইতে উড়িয়া আসিতেছে, ওটা কোথা হইতে আসিতেছে? সরলার বাপের বাড়ির দিক হইতে না? হয় তো ওটা সরলার বাপের বাড়ির চিলের ছাদে বসিয়াছিল, সেইখান থেকে উড়িয়া আসিতেছে! ঐ যে একটা কাক এ-দিক হইতে উড়িয়া যাইতেছে, ওটা কোথায় যাইতেছে?—হয় তো ওটা সরলাদের পেয়ারা গাছে গিয়া বসিবে। সরলা যদি কাক হইত!

সরলা আবার ভাবিত—"কাক না হই,— মেয়ে হলাম কেন? পুরুষ হলাম

না কেন ?" পুরুষ হইলে সরলা কি করিত ? সরলা যেখানকার সেইখানেই থাকিতে পাইত—স্নেহের শিকড়ে টান পড়িত না !

সরলা আবার ভাবিত, তার ভাই যখন বড় হবে, তার যখন বিয়ে হবে, সে তখন তার বাপের হাতে-পায়ে ধরিয়া ভ্রাতৃবধূকে বাপের বাড়ি হইতে ছিঁড়িয়া আনিতে দিবে না, কিন্তু যদি ভাই রাগ করে ? কেন রাগ করিবে ? সরলার আসিবার সময় তার ভাই তো কত কাঁদিয়াছিল ! তবে সে পরের ব্যথা কেন না বুঝিবে ? ভাবিতে ভাবিতে সরলা কাঁদিয়া ফেলিত। শচীন্দ্রেরও চক্ষু ছল ছল করিত। সে তাহাকে কত কি প্রশ্ন করিত ! এইরূপে বিবাহের আট দিন কাটিয়া গেলে সরলা আবার পিত্রালয়ে গেল।

সরলা যে দিন পিত্রালয়ে গেল, সেই দিনই বিকালে নরেন সরলার পত্র পাইবার আশায় ডাকঘরে তিনবার খবর লইল—কিন্তু ভাঙা ভাঙা বাঁকা অক্ষর বানান অশুদ্ধ একখানিও চিঠি পাইল না।

তখন নরেন্দ্রনাথ কলেজের নোট লেখা ছাড়িয়া সরলাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি যথাসময়ে সরলার নিকট পৌঁছিল। পড়িয়া সরলা লজ্জায় মরিয়া গেল এবং তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবার পূর্ব্বে একবার তার 'সই'কে দেখাইল। 'সই'এর পরামর্শমত সরলা সে পত্রের উত্তর দিল—পাইয়া নরেন্দ্রনাথের প্রাণ শীতল হইল। আর এদিকে শাশুড়ী সুকুমারী নব-বধূকে বেহায়া ভাবিয়া মনে-মনে গর্জ্জিয়া উঠিলেন !

৪

"নরেন ! তুই নাকি—এবার একজামিন দিবি নি ?"

"শুধু এবার কেন—আর কোনো বারই দোবো না।"

"এ আবার তোর কি ছেলেমানুষি ?"

"ছেলেমানুষি আমার কি দেখলে—একজামিন দিয়ে কি হবে ?"

শুনিয়া সুকুমারী রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"একজামিন দিয়ে কি হবে ?—আমার মাথা হবে ! লেখা পড়া শিখে মানুষ সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়—এই তো জানি। তা' তুই এত বড় ছেলে, একজামিন দিয়ে কি হবে তা তুই বুঝিস নে ?"

"লেখা পড়া শিখবো না কে বলেচে ?"

"তবে আবার বলচিস্ কেন যে, একজামিন দিবি নি ?"

"লেখা পড়া শেখা আর একজামিন দেওয়া তো এক নয় !"

"একজামিন না দিলে পাস্ করবি কেমন করে ?"

"পাস করে কি হবে ?"

"তা' না করলে সরকারী চাকরি-টাকরী পাবি কি করে' ?"

"হুঁ—এতক্ষণে তোমার মনের কথা বলেচ ! চাকরি পাওয়াই যদি লেখাপড়া শেখার চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে তাকে লেখা পড়া না বলে' গোলামী শেখা বলাই উচিত। আমি লেখা পড়া শিখতে চাই—গোলামী শিখ্‌তে চাই নে—সুতরাং আমার পক্ষে একজামিন দেওয়া না দেওয়া দুই-ই সমান।"

শুনিয়া সুকুমারী ভাবিলেন, তাঁহার মন্দ বরাতের পালা পড়িয়াছে, নহিলে স্বামী কেন অমন সুন্দর মেয়ে, অত টাকা, অমন বড় মানুষের ঘর ছাড়িয়া কোথা হইতে একটা গরীবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিল ; আর ছেলেই বা কেন চাকরিতে ঘৃণা করিয়া—ভবিষ্যৎ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একজামিন দিতে অসম্মত হইবে ! তখন সুকুমারী এ অনিষ্ট দু'টির মূল কোথায় তাহা খুঁজিতে লাগিলেন। দেখিলেন—'স্বদেশী আন্দোলন'। সুকুমারী 'স্বদেশী আন্দোলনে'র উপর হাড়ে-হাড়ে চটিয়া রহিলেন।

সুকুমারী বধূর উপর সন্তুষ্ট নন—দু'টি কারণে। প্রথমটার ঠিক একটা নাম দিতে তিনি পারেন নাই। তবে কথাটা এই যে, তিনি সরলার জন্য অমন সুন্দরী মেয়ে বউ করিতে পারিলেন না। সরলা কি সুন্দরী নহে ?—হাঁ সুন্দর। কে বেশী ? সরলা—না, ফটোর মেয়ে ? সরলার দিকে চাহিয়া বল দেখি কে বেশী সুন্দরী ? সরলা। আবার ফটো দেখ—কে সুন্দরী ? ফটোর মেয়ে। দুই জনের ফটো এক জায়গায় রাখিয়া বল দেখি কে অধিক সুন্দরী ? উত্তর দেওয়া কঠিন ! কিন্তু তবু ফটোর মেয়ে সুকুমারীর নিকট বেশী সুন্দরী— কেন ? কারণ আছে। সরলা বলিলে—শুধু সরলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটি সুকুমারীর মনে পড়ে, কিন্তু ফটোর মেয়ে বলিলে—শুধু তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটি সুকুমারীর মনে আসে না, তৎসঙ্গে আরো কিছু তাঁহার মনে আসে।—'ফটোর মেয়ে' বলিলে—শুধু তার নিশীথ-নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশের কথা মনে পড়ে না ; সেই সঙ্গে বহুমূল্য কনক-মুকুটটিও মনে আসে ;—শুধু তার বাঁশীর মত নাসিকাটি মনে পড়ে না, তার সহিত বহুমূল্য মুক্তার নোলকটিও মনে পড়ে। শুধু তার কণ্ঠ মনে পড়ে না,—সে কণ্ঠের হীরক-জড়িত হিরণ্ময় হারটিও মনে আসে ;—শুধু তার মৃণাল-ভুজদ্বয় মনে হয় না ; তৎসঙ্গে হীরক বলয় প্রভৃতি অনেক শ্রীঅঙ্গ-শোভন অলঙ্কারও মনে পড়ে—তাই ফটোর মেয়ে সুকুমারীর নিকট বেশী সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় কারণ, সরলা বড়ই স্বামী-সেবা-পরায়ণা! হউক একাল—তবু এতটা বেহায়াপনা যে একান্ত অশোভন! তবে সরলা কার না সেবা করে? কিন্তু সুকুমারী বলেন যে, সে কেবল তার স্বভাবের সামঞ্জস্য দেখাবার জন্য! এই দুই কারণে সুকুমারী সরলার উপর সন্তুষ্ট নহেন। ইহার উপর আর একটি অসন্তোষের কারণ আসিয়া জুটিল।

সুকুমারী দেখিলেন, নরেন্দ্র বিবাহ করিয়াই কয়েক মাস পরেই পড়াশুনা ছাড়িয়া কলিকাতার বুকের উপর এক দোকান খুলিয়া বসিল। এই সমস্ত দেখিয়া তিনি সরলাকে অলুক্ষণে না মনে করিয়া কি থাকিতে পারেন?

সুকুমারী সরলাকে প্রথমাবধি গরীবের মেয়ে বলিয়া ঘৃণা করিতেন। পুত্রের লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবার পর হইতে তিনি বধূকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। সরলার উপর নীরব-নির্য্যাতন চলিতে লাগিল--সরলাও তাহা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

৫

এমন ভাবেই দিন যায়। একদিন সরলা সুকুমারীর রোগ-শয্যায় বসিয়া তাঁর সেবা করিতেছিল। সুকুমারী ঘুমাইতেছিলেন—হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন,—বলিলেন—"সরো! মা,—এখনো শুতে যাও নি? কত রাত্তির এখন?" সরলা কহিল—"আর রাত নেই মা!— সকাল হয়েছে।"

সুকুমারী বলিলেন—"এই সমস্ত রাতটাই বসে! মা, তোমাকে আমি কত কষ্ট দিয়েছি, আর তুমি যে যত্নটা করচো—তা পেটের মেয়েও তত করে না।"

সরলার দুই চোখে জল দেখা দিল—বলিল—"ছোট বেলা হ'তে 'মা' কেমন তা' আমি জানি নে—তোমাকে আমি 'মা' বলে জানি।" সেই দিন দ্বিপ্রহরে এক প্রতিবাসিনী বালিকা সুকুমারীকে দেখিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া সুকুমারী বলিলেন,—"তোমরা কবে এলে?"

"কাল।"

"তোমার দিদিমার অসুখের জন্যে বুঝি?"

কমল বলিল—"হ্যাঁ,—দিদিমার এমন অসুখ দেখেও মামীমা তাঁর ভা'য়ের বে'তে চলে গেলেন, তাই শুনে আমরা এসেছি।"

প্রতিবাসিনীর বধূর ব্যবহার শুনিয়া তখন তাঁর সরলার যত্নের কথা আরো বেশী করিয়া মনে হইতে লাগিল। আরো তাঁর মনে পড়িল, প্রতিবাসিনীর বধূ ধনীর কন্যা, আর তাঁহার সরলা গরীবের মেয়ে। তখন তিনি সরলার

হাতখানি ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সরলা—মা, তোমাকে কত রকমে জ্বালিয়েছি—গরীবের মেয়ে বলে' কত ঘেন্না করেছি—লক্ষ্মী মা আমার, বলো —আজ থেকে তোমার শাশুড়ীর সব দোষ ভুলে যাবে?" সরলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল—সে বলিল,—"আমার মা নেই—তুমিই আমার মা, আর আমি তো তোমারি মেয়ে মা।" *

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

সূর্য্য-ঘড়ি (Sundial)

গোবরডাঙ্গার স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যানুরাগী জমিদার বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও যত্নে তাঁহার 'প্রসন্ন-ভবনে'র সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহামান্য উড্রো সাহেবের উপদেশ (Design) ও তত্ত্বাবধানে ১৮৬৮ সালে প্রস্তুত একটি সূর্য্য ঘড়ি আছে।

যে স্থানে অট্টালিকা বা বৃক্ষাদির কোনরূপে ছায়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই এরূপ উন্মুক্ত স্থানে এই ঘড়ি নির্ম্মিত হয়। ইহার সম্মুখভাগ ঠিক দক্ষিণদিকে (Magnetic south) অবস্থিত থাকে।

সূর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) জানিতে হয়। (Protracter) নামক যন্ত্র দ্বারা ইহা মাপিয়া ঠিক করা হয়। গোবরডাঙ্গার অক্ষাংশ প্রায় ২২ ডিগ্রী।

সূর্য্য ঘড়িতে ইষ্টক নির্ম্মিত চারিটি দেয়াল আছে। ২১।৷৹ সাড়ে একুশ ফুট লম্বা একটি দেওয়াল ভূমির উপর সমান্তরালভাবে (Horizontally) প্রস্তুত। এই দেওয়ালের উভয় প্রান্ত হইতে ৫।৹ সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ও ৪৷৷৹ সাড়ে চারি ফুট খাড়াই দুইটি দেওয়াল লম্বোভাবে (Perpendicularly) উঠিয়াছে। ঠিক মধ্যভাগ হইতে আর একটি দেওয়াল ঐ ভাবে দণ্ডায়মান আছে। ইহার মাপ অপেক্ষাকৃত বড় এবং ১৩।৹ সওয়া তের ফুট লম্বা ও ৪ ফুট উচ্চ। সব দেওয়াল গুলিই দক্ষিণে বিলক্ষণ ঢালু (Slope) দেওয়ালের অবস্থান। উচ্চতা ও ঢালের উপর ছায়ার আকার নির্ভর করে। এই দেয়ালের উপর সাধারণ ঘড়ির

---

* শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নূতন মাসিক পত্র "শান্তি" (বৈশাখ, ১৩২১) হইতে উদ্ধৃত।

স্থায় ঘণ্টা ও মিনিটের অঙ্কপাত আছে। দেয়ালের ছায়া দিবাভাগে অঙ্কের উপর পতিত হইয়া সময় নির্দ্দেশ করে। সূর্য্য পূর্ব্ব আকাশের তলদেশ (Horizon) হইতে উদিত হইয়া ক্রমে ক্রমে আকাশ পথ (Orbit) বহিয়া মধ্যাহ্নকালে প্রায় আমাদের মস্তকোপরি উঠে। এবং দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নগামী হইয়া পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়।* সূর্য্যের আকাশ-পথ ঠিক আমাদের মাথার উপর দিয়া যায় না—মাথার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ঘেঁষিয়া যায়।

প্রাতঃকালে ছায়ার আকার বড় থাকে ও পশ্চিমে পড়ে। মধ্যাহ্নকাল যত সন্নিকট হয়, উহা ততই ছোট হইয়া ক্রমে ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে (অর্থাৎ সূর্য্য যখন meridium এ উঠে) ক্ষুদ্রতম হইয়া থাকে। আবার যত পশ্চিম আকাশে সূর্য্য নামিতে আরম্ভ হয়, ততই ছায়ার আকার বড় হয়। বৈকালে ছায়া পূর্ব্বদিকে পড়ে।

এই নিয়মের (Principle) উপর নির্ভর করিয়া সূর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত হয়। সূর্য্য প্রত্যহ আকাশের একস্থান হইতে উদিত হয় না বা একই স্থানে অস্ত যায় না। পৌষ মাসের প্রথম হইতে আষাঢ়ের প্রথম পর্য্যন্ত, সূর্য্য পূর্ব্ব আকাশের উত্তরে সরিয়া সরিয়া উদয় হয়, ও পশ্চিম আকাশের উত্তরে সরিয়া সরিয়া অস্ত যায়। ঐ সময়ের পর হইতে পৌষের প্রথম পর্য্যন্ত উহা পূর্ব্ব আকাশে দক্ষিণে সরিয়া সরিয়া উদয় হয় ও পশ্চিম আকাশে দক্ষিণে সরিয়া সরিয়া অস্ত যায়। ইহার ফলে সারা বৎসর সূর্য্য ঘড়ির দেয়ালের ছায়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট চিহ্নিত অঙ্কের উপর পতিত হয় না ; অল্প কম বেশী হয়। কোন্ সময় কত কম বেশী হয় তাহাও অঙ্কের দ্বারা স্থির হইয়াছে।

মহামতি উড্রো সাহেব দ্বারা প্রস্তর ফলকে লিখিত একটি তালিকা এই ঘড়িতে সংযুক্ত আছে। ইহার সহিত মিলাইয়া লইলে পথিকগণ অনায়াসে সময় জানিতে পারেন।

ইহা অঙ্কশাস্ত্রাচার্য্য উড্রো সাহেবের অক্ষয় কীর্ত্তি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র।

---

* সূর্য্য আকাশের পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে চলিয়া যায় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্য চলে না, আমাদের পৃথিবীই চলিয়া থাকে। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের (Axis) চারিধারে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া থাকে (Rotation) তাহাতেই মনে হয় সূর্য্য চলিতেছে। (লেখক)

স্মৃতি

—ঃ*ঃ—

ভুলে থাকি যতক্ষণ
সেই ভালো সেই ভালো ;
স্মৃতির এ হলাহলে
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ আলো !
সুখ ফুরাইয়ে গেছে
রেখে গেছে দাগ তার ;
সে ক্ষত আরোগ্য হবে
সে ওষধি কোথা আর !
ফুল তো ঝরিয়া গেছে
পুণ্য বৃন্ত কাঁদি চায় ;
সাজাইয়া স্তরে স্তরে
কে তাদের আনে হায় !
বসন্তের শ্যাম ছবি
মুছে গেছে বহুদিন,
শুষ্ক কাননের মাঝে
বাজে কার ভাঙা বীণ !
ফাঁকি দিয়ে গেছে আশা
রেখে গেছে শুধু ছাই ;
বাতাসে যেন না ওড়ে
পূর্ণ থাক্ রিক্ত ঠাঁই ।
প্রেম গেছে !—সেকি কথা !
সে তো গো যাবার নয়,
লুপ্ত হোক বিশ্ব-ছবি
সে যে চির প্রাণময়।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

সরমা

—•—

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হৃষিকেশ—হরিদ্বারের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে, সূর্য্যকুণ্ড। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তধারা। সপ্তধারার সাত ক্রোশ উপরে হিমালয়-অঙ্কে পবিত্র হৃষীকেশ তীর্থ। গঙ্গা এখানে কল-কল রবে তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া ভীম বেগে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছেন। সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ মোহিত হইয়া যায়; হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়। এই স্থানটি গভীর অরণ্য প্রদেশ। এখানে সকলেই মুক্ত স্বাধীন। এখানে সংসারের জন-কোলাহল, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস নাই; এখানে রোগীর মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি নাই; এখানে দ্বেষহিংসা পরশ্রীকাতরতা নাই। এখানে সকলই সুন্দর পূত পবিত্র শান্তিপূর্ণ! এখানে প্রেমের বিনিময় হয়—ভালোবাসার প্রতিদান আছে। সংসারের দারুণ দৈন্য এখনো এই বনস্পতির নগ্ন সন্তানদের কুসুম-পেলব অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। ইহাদের মনে সঙ্কোচ দ্বিধা কপটতা নাই—শিশুর ন্যায় সরল। ফলে ফুলে শোভিত চিরসুন্দর মনোহর। এখানে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা, ঘন পল্লব-শোভিত শ্যামস্নিগ্ধ তরুতলে রচিত কমলার এক ক্ষুদ্র কুটীর—আর সেই তরু শাখায় মুক্ত বিহঙ্গমের কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার! নির্ঝরের ঝরঝর রব! এখানে হারমোনিয়াম নাই, বৈদ্যুতিক আলোপাখা নাই; আছে শুধু মেঘ-মুক্ত আকাশের দীপ্ত শশীকর, দিকহারা সান্ধ্য সমীরণ, বন ফুলের সুরভি-সঞ্চার, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, পুণ্যতোয়া কল্লোলিনীর প্রেমপূর্ণ কল-ধ্বনি, আর জ্যোৎস্নার দিব্য হাসিটুকু! এই শান্তিময় কুটীরে কমলা থাকে।

কমলা তাহার কুটীর-সংলগ্ন একখানি শিলাখণ্ডে বসিয়া আছে। উপরে কোটী তারা-খচিত মেঘ-মুক্ত অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে রূপালি জ্যোৎস্নার তরল তরঙ্গে ধরাখানি ভাসিয়া যাইতেছে! চারিদিকে নিবিড় অরণ্যানী-মণ্ডিত পর্ব্বত-শ্রেণী হিরণ্ময় কিরীট পরিয়া স্তরে স্তরে উঠিয়াছে পার্শ্বে পূতসলিলা ভাগীরথী তরঙ্গে তরঙ্গে রজত-ধারা বিকীর্ণ করিয়া পাহাড় হইতে হরিদ্বারের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিতেছে। রজনী স্তব্ধ! কী মহান সৌম্য ভাব! কী পবিত্র এ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য! কমলা এই অগাধ সৌন্দর্য্যের ভিতর আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া মুগ্ধচিত্তে বসিয়া আছে।

যে সাধু পুরুষ কমলাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি আজ কয়েক দিবস হইল তাহাকে তাঁহার গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া লক্ষ্মণঝোলায় নিজ আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। কমলা এই মহর্ষির নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছে। মহর্ষির তেজপুঞ্জ দেহ ও গম্ভীর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির স্রোত উছলিয়া উঠে; মস্তক তাঁহার পদে লুটাইবার জন্য অধীর হইয়া পড়ে। ইঁহার বয়স কত হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহারা এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহারা তাঁহাকে এই অবস্থাতেই দেখিয়া আসিতেছে। কমলা শুনিয়াছে, এই মহর্ষি কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া বহুদিবস কাটাইতে পারেন! নাম তাঁহার ব্রহ্মানন্দ স্বামী। এই স্থানটি ঋষিদিগের পুণ্যক্ষেত্র। এই পবিত্র ধামে স্থানে স্থানে তাঁহাদের পুণ্যাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজি এতক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া একস্থানে বসিয়াছিলেন। এইবার সমাধি ভঙ্গে ডাকিলেন—"মা ?"

কমলা শিলাখণ্ড হইতে উঠিয়া আসিয়া স্বামীজির পদ-প্রান্তে প্রণাম করিয়া কহিল—"বাবা !"

"এখনো তোমার কিছু খাওয়া হয় নি মা—আশ্রমেও খাবার কিছু নেই——"

স্বামীজির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কমলা কহিল—"যে অমৃত আমাকে খাইয়েছেন, তাতেই আমার প্রাণ ভোরপুর হয়ে আছে, খাবারের আর দরকার কি বাবা ?"

স্বামীজি স্নেহসিক্ত স্বরে কহিলেন—"থাম্ বেটী থাম্। আগে প্রাণটাকে রাখতে হবে তারপর সাধনা।"

স্বামীজি কয়েক মিনিটের জন্য ধ্যানস্থ হইলেন, পরে কহিলেন—"ভগবানের রাজ্যে কেহই উপবাসী থাকে না। খাবার তিনি পাঠিয়েছেন—ঐ আসছে।"

কমলা বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিল,—অদূরে জঙ্গলের ভিতর অনেকগুলি আলোক-রেখা! পরক্ষণেই শুনিল জন-কোলাহল! তারপর দেখিল, চারিজন ভারবাহক যথেষ্ট খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া স্বামীজির পদতলে রাখিল। সঙ্গে মশাল-হস্তে চারিজন সশস্ত্র রক্ষক আসিয়াছিল। উহারা সকলে স্বামীজির পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খাদ্যগুলি একজন স্থানীয় জমিদার তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি পূজা-উপলক্ষ্যে পাঠাইয়াছিলেন। রক্ষি ও বাহকগণ বিদায় হইলে কমলা গুরুদেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিল।

এইবার স্বামীজি কহিলেন—"যাও মা আশ্রমে যাও রাত অনেক হয়েচে।"

কমলা কহিল—"বাবা আমি আশ্রমে যাব না—আপনি ধ্যানস্থ হউন—আমি আপনার পায়ের তলায় বসে থাকবো।"

"না মা তুমি ভয় পাবে কুটীরে যাও।"

"বাবার কাছে মেয়ের কিসের ভয়? আমি এইখানে থাকবো।"

স্বামীজি কমলার মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা থাক মা।" সে স্পর্শে কমলার প্রাণের মধ্যে যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার হইল, তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন একটা আকস্মিক নাড়া পাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল! তাহার প্রতি অঙ্গে যেন একটা নব শক্তি পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। সে উদ্বেলিত-হৃদয়ে তাহার গুরুদেবের পদধূলি লইয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিল।

স্বামীজি কহিলেন—"কেমন মা তোমার মনটা এখন একটু স্থির হয়েছে কি? সাধনার দিকে লাগাতে পারবে?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে মনকে অনেকটা বেঁধে ফেলেছি কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ পারি নি এখনো সংসারের দিকে ছুটে যায় চলে আসে—মাণিককে এখনো মনে পড়ে।"

"বেশ তো মাণিক তোমার সব চেয়ে ভালোবাসার জিনিস। তোমার সাধনার ভিতর দিয়ে মাণিককে ডাকো, তাহার ধ্যানে মগ্ন থাকো, দেখবে তাহারই মধ্যে তোমার হৃদয়-দেবতা বিরাজিত।"

এই সময় পশ্চাতে একটা গভীর গর্জ্জন শুনিয়া কমলা কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই দেখিল একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—কমলার বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করিতেছিল—তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল! কমলার অবস্থা দেখিয়া স্বামীজি কহিলেন—"ভয় নেই মা স্থির হও।" এবং ব্যাঘ্রটির প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"বইঠ্ বেটা বইঠ্।" ব্যাঘ্রটি সেইখানে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া লাঙ্গুলটি পাহাড়ের উপর আছড়াইতে লাগিল। কমলা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

স্বামীজি কহিলেন—"এরা বনের পশু, আমরাও তাই, সেই জন্যে এদের সঙ্গে আমাদের একটা সন্ধি হয়ে গেছে।"

স্বামীজি উঠিয়া ব্যাঘ্রটির গায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন—"যাও বেটা যাও।"

ব্যাঘ্রটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া হেলিতে দুলিতে একদিকে চলিয়া গেল।

স্বামিজী কহিলেন—"এ স্থানটি তোমার কেমন লাগে তুমি কি এখানে থেকে এই কঠোর ব্রত সাধন করতে পারবে ?"

"এই স্থানটিকে আমার স্বর্গ বলে বোধ হয়, আমি এখানে বেশ থাকতে পারবো। ব্রত যতই কঠোর হোক না কেন—আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে কিছুতেই আটকাবে না।"

"দেখ আমাদের এ তপস্যা অতি কঠোর, স্ত্রীলোকের জন্য নয়। আমি মনে করেছি তোমাকে একটা লুপ্ত বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে সংসারে ফিরে পাঠাবো, তোমার দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হবে। কেমন যাবে তো ?"

"সংসারে ফিরে যেতে আমার আর ইচ্ছে নেই বাবা—তবে আপনার আদেশ——"

"হাঁ, আমার আদেশ তোমাকে যেতে হবে—তবে এখনি নয়, এখন সাধনার দিকে অগ্রসর হও, তোমার শরীরে নূতন বল সঞ্চারিত হোক, মন স্থির হয়ে আসুক, তারপর সে কথা।"

কমলা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—ভাবিল আবার সংসার! গুরুদেব কমলার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সস্নেহবচনে কহিলেন—"যতদিন না আমি তোমাকে সংসারের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারবো—যত দিন না তুমি তোমার মনকে জয় করতে পারবে ততদিন তুমি এখানেই থাকবে। যাও মা এখন আশ্রমে যাও।"

কমলা গুরুদেবের পদধুলি লইয়া কুটীরে আসিয়া শয়ন করিল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিপদ যখন আসে তখন একলা আসে না—সে তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গকে সঙ্গে লইয়া আসে। প্রফুল্লর অসুখের পর সরমা মাতৃহীন হইয়াছে, তারপর আজ কয়েক দিবস হইল সে তাহার ছোট ছেলেটিকে যমের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু সে ভাঙিয়া পড়ে নাই। সে যেমন ভাবে প্রফুল্লর সেবা-শুশ্রূষা করিত তেমনি ভাবেই করিতে লাগিল, যেন তাহার কিছুই হয় নাই! তাহার চক্ষে জল নাই, মুখে হা-হুতাশ, দীর্ঘ শ্বাস নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে তুষের আগুন জ্বলিতেছিল না তাহা কে বলিতে পারে ?

সরমার পিতা কিন্তু পত্নী-বিয়োগে একেবারে মুসড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বাটীতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ ছিল না। সরমাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার

স্থল। সরমার অমৃত বাণীতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি পার্থিব সুখ, কামনা ভুলিয়া যাইতেন, এবং আপনাকে সংযত করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতেন। কিন্তু সরমার নিকট প্রত্যহ যাতায়াত করা তাঁহার কষ্টকর হইয়া পড়িল তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন যে কন্যা ও জামাতাকে আপনার বাটীতে আনিয়া প্রফুল্লর রীতিমত চিকিৎসা করাইবেন। সে প্রস্তাব কিন্তু টি'কিল না। সরমা তাহার পিতাকে বুঝাইয়া দিল, তাহা হইতে পারে না, সেখানে লইয়া গেলে তাঁহার বন্ধু বান্ধব অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন—দেখিয়া হয় তো নাকে কাপড় দিয়া মুখ শিট্‌কাইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাতে তাহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিবে।

সেই সময় সরমাদের বাটী-সংলগ্ন একখানি দ্বিতল বাটী খালি ছিল—সরমার পিতা উহা ভাড়া লইলেন। উভয় বাটীতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভিতর দিয়া একটি পথ ছিল। সুতরাং স্বামীসেবা ও পিতৃ সেবার সমবায়ে কোনো ব্যাঘাত হইল না। এই সময় যে দিন সরমা তাহার সন্তানটিকে হারাইল, সেই দিন তাহার পিতা মনে করিয়াছিলেন যে, কন্যাকে আর সে ভাবে দেখিতে পাইবে না।

এ কল্পনা তাঁহার ব্যর্থ হইয়া গেল। সরমা যেমন ছিল তেমনই রহিল। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় না যে তাহার উপর এত অশান্তির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তাহার মুখখানি যেন এখনো শান্তিপূর্ণ।

তখন সান্ধ্য গগনে দুটি একটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতেছে, সরমা এক হস্তে একবাটি গরম দুগ্ধ ও অপর হস্তে কতকগুলি ঔষধ লইয়া প্রফুল্লর নিকট আসিল।

প্রফুল্ল কহিল—"হাতে ও কি?"

"দুধ এনেছি, ফকিরের ওষুধটা যে দুধের সঙ্গে খেতে হয়।"

"দুধ এনেছ রাখো—খানিকটা আফিং এনে দিতে পার!"

সরমা বিস্মিত ভাবে কহিল—"অ্যাঁ আফিং কি হবে?"

"খাব।"

"কেন?"

"সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, আর যে পারি নে সরমা।"

"ওকি কথা, কেন, ফকিরের ওষুধটাতে তোমার তো বেশ উপকার হয়েছে, ঘা-টা গুলো অনেকটা শুকিয়ে আসছে—এত অধীর হও কেন?"

"ঘা-টা গুলো শুকিয়ে আসচে বটে—কিন্তু তাতে কি হয়, প্রাণ যে জ্বলে গেল সরমা! চোখের সাম্‌নে যমের দূত এসে কচি ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেল—দু'দিনের 'জ্বরে সে কোথায় চলে গেল, চোখে কানে দেখতে দিলে না—ভালো করে' তার চিকিৎসা হ'ল না। আর আমি মরণের পথে এগিয়ে রয়েছি—অন্ধ মরণ আমাকে দেখতে পেলে না—ভগবানের এ কী অবিচার!"

"ভগবানের অবিচার কে বলে, আমরা ভগবানের দাস, তাঁর খেলার পুতুল, আমরা তাঁর বিরাট বিশ্বে দু'দণ্ডের তরে একটা খেলাঘর পেতে বসে আছি মাত্র; আমরা সম্পূর্ণ তাঁর আজ্ঞাধীন, কখন তিনি কাকে ডাকবেন, কাকে তাঁর দরকার হবে কার খেলা কখন সাঙ্গ হবে, কে বলতে পারে—অনিলকে তাঁর দরকার হয়েছিল—তাই তিনি ডেকেছিলেন, সেও সেই ডাকের সাড়া পেয়ে তাঁর কাছে চলে গেছে—তিনি একটিকে নিয়েছেন, সেই যায়গায় যে আর একটিকে পাঠান নি, তা কে বলতে পারে? যখন তোমাকে আমাকে তাঁর দরকার হবে, তখন আমাদের এ খেলা ফুরিয়ে যাবে, তখন আমরা চলে যাব। আমাদের জায়গায় তিনি নতুন মানুষ গড়ে পাঠিয়ে দেবেন। এই নিয়মে বিশ্ব চলবে এই তাঁর খেলা। তাঁর দোষ গুণ বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়?"

"তোমার ও সব তত্ত্ব-কথা আমার ভালো লাগে না—ছেলেটার জন্যে তোমার প্রাণটা কি একবারও হু হু করে ওঠে না?"

"ওঠে বৈ কি, মানুষ তো আমি! তবে যদি একবার চক্ষু বুজে স্থির হয়ে ভেবে দেখো তো বুঝতে পারবে, তাকে একজন আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল—এখন তিনি তাঁর জিনিষ চেয়ে নিয়েছেন। আমাদের কাছে দু'দিন থাকার দরুণ তার উপর যে একটা মায়া মমতা পড়েছিল সেইটেই আমাদের কাঁদিয়ে তোলে। কিন্তু দু'দিন পরে সে মায়াব বেগ আপনিই কমে আসে। ছেলের মৃত্যুতে ক'জন বাপ মা মরবার জন্যে বিষ খেয়েছে বল দেখি? সে সঙ্কল্প ছাড়ো—যখন সময় হবে তখন সকলকেই যেতে হবে।"

"আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারবো না—ওষুধ আমি আর খাব না——"

"যতক্ষণ আছ ততক্ষণ খেতে হবে—নাও আর দেরি কোরো না আমি ভাত চড়িয়ে এসেছি ভাতগুলো বুঝি ধরে গেল" বলিয়া সরমা ঔষধ-মিশ্রিত দুগ্ধের বাটি প্রফুল্লর মুখের নিকট ধরিল। প্রফুল্ল তখন শিশুটির মতো বিনাবাক্যব্যয়ে সমস্ত দুগ্ধ পান করিয়া ফেলিল।

সরমাকে এখন সংসারের সকল কাজই করিতে হয়। রন্ধন কার্য্যটা যোলো

আনাই তাহাকে করিতে হয়। সরমার শ্বশুর মহাশয় অপর লোকের হস্তের অন্ন গ্রহণ করেন না, কাজেই সরমাকে দু' বেলা রাঁধিতে হয়, ইহাতে সে ক্ষুণ্ণ না হইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এখন উভয় বৈবাহিক এক সঙ্গেই আহার করেন! সরমা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করে। তাঁহারা একত্রে গল্প-গুজব করিয়া অনেকটা সময় স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দেন। সরমাকে দায়ে পড়িয়া এখন গৃহিণী হইতে হইয়াছে প্রফুল্লর পিতা সংসারের বিষয় কিছুই দেখেন না। খরচ-পত্র সমস্তই সরমার হাতে। সরমা এমনি হিসাব করিয়া সংসার চালাইতে শিখিয়াছে যে কখনো কোনো জিনিষের অপ্রতুল হয় না—ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারে সুখী। সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়া অক্লান্ত-হৃদয়ে সে স্বামী-সেবা করে—একদিনের জন্যও ক্লান্তি বোধ করে না।

সরমার পিতা অজস্র অর্থব্যয়ে প্রফুল্লর চিকিৎসা করাইতেছিলেন। যেখানে যে ভালো ডাক্তার কবিরাজ, হাকিম, ফকির আছেন শুনিতেছেন অমনি সেইখান হইতে তাঁহাকে আনাইয়া চিকিৎসা করাইতেছেন, অর্থের দিকে তাহার দৃক্‌পাত নাই। এই সকল কৃতবিদ্য লোকের চিকিৎসার ফলে প্রফুল্ল কখনো কখনো বেশ সুস্থ হইয়া উঠে। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আবার রোগ সমূলে দেখা দেয়। আবার ঔষধের গুণে রোগটা একটু চাপা পড়ে। এইরূপে প্রফুল্লর জীবনের দিনগুলি দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া একটি একটি করিয়া কাটিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে যে ট্রেণখানি কানপুর অভিমুখে আসিতেছিল, সেই ট্রেণের গার্ড দেখিল, লাইনের পার্শ্বে রুধিরাক্ত দেহে একটি লোক খোয়ার উপর পড়িয়া আছে! সে ভাবিল হয় তো গত রাত্রে লোকটা রেলে কাটা পড়িয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ সেইখানে ট্রেণ থামাইয়া লোকটিকে দেখিতে আসিল। দেখিল লোকটি বাস্তবিক কাটা পড়ে নাই। পরীক্ষা করিয়া বুঝিল এখনো সে জীবিত আছে; কিন্তু অজ্ঞান-অচৈতন্য! খোয়ার উপর পড়িয়া সে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। খোয়ার সংঘর্ষে তাহার মস্তক ও দেহের স্থানে স্থানে বিষমরূপে কাটিয়া গিয়াছে। এবং ঐ সকল ক্ষতস্থান হইতে রুধির নির্গত হইয়া খোয়ার সহিত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। গার্ড সাহেব অতি যত্নের সহিত তাহাকে তুলিয়া আনিয়া আপনার গাড়িতে শোয়াইয়া দিল। ট্রেণখানি কানপুরে থামিবামাত্র গার্ড সাহেব সেই আহত লোকটিকে কোথায় কিরূপ ভাবে পাইয়াছে তাহার

একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া তথাকার ট্রাফিক ম্যানেজারের হস্তে সমর্পণ করিল। সদাশয় ট্রাফিক ম্যানেজারের যত্নে সে সেইখানেই সাহেব ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে লাগিল। তিন দিন পরে যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে বুঝিতে পারিল তাহার অবস্থা কী! এবং কোথায় সে রহিয়াছে!

এই সময় ট্রাফিক ম্যানেজার মহোদয়ের প্রশ্নে সে কহিল—"আমার নাম তারানাথ রায় চৌধুরী। পিতার নাম কালীশঙ্কর রায় চৌধুরী। নিবাস বিলাসপুর। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার বন্ধু বিনয় আমাকে চলন্ত ট্রেণ থেকে ফেলে দিয়ে আমার টাকা কড়ি সমস্ত নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা আগ্রায় তাজ দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম।"

ট্রাফিক ম্যানেজার মহোদয় সেই দিনই বিলাসপুরে তাহার পিতাকে তারানাথের অবস্থা জানাইয়া শীঘ্র আসিবার জন্য এক টেলিগ্রাম করিলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া অনতিবিলম্বে কালীশঙ্কর বাবু সস্ত্রীক কানপুরে আসিলেন এবং পুত্রের অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তখন তাহার মস্তকে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে রীতিমত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। উঠিয়া বসিতে একেবারে নিষেধ।

পিতামাতার অকাতর শুশ্রূষার ফলে তারানাথের সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় একমাস সময় লাগিল। ট্রাফিক ম্যানেজারকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া এবং যে সদাশয় গার্ড সাহেব তারানাথকে তুলিয়া আনিয়াছিল তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া কালীশঙ্কর বাবু তারানাথকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু ফিরিবার সময় তিনি ট্রাফিক ম্যানেজারের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, যে দেশে গিয়াই বিনয়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করিবেন। তাহাই হইল। কালীশঙ্কর বাবু দেশে আসিয়াই বিনয়ের অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। পরে তাহার উপর অনেকগুলি চার্জ্জ দিয়া বিলাসপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক মোকর্দ্দমা রুজু করা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিনয়কে ধৃত করিবার জন্য পুলিসের উপর এক পরোয়ানা জারি করিলেন।

বহু পরিশ্রম করিয়াও পুলিস তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিল না। কিন্তু পুলিসের এই অনুসন্ধানের ফলে বিনয়ের উপর আর একটি নূতন চার্জ্জ আসিল। সেটি এই যে, রুগ্ন মাতুলের মৃত্যুর অপেক্ষা তাহার সহিতে ছিল না। মাতুলের বিষয়টা আশু হস্তগত করিবার লোভ তাহার এতই প্রবল হইয়াছিল যে, একদিন সে খাদ্যদ্রব্যের সহিত তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিল এবং উহাতেই তাঁহার মৃত্যু

হইল। কেমিকেল examinationএ তাহা ধরা পড়িল, এবং সেই দিন হইতেই সে ফেরার হইল। পুলিস যখন কিছুতেই তাহার সন্ধান করিতে পারিল না চৌধুরী মহাশয় তখন সরলের অনুরোধে বিনয়কে ধরিবার জন্য কিছু পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে ডিটেক্‌টিভ ডিপার্ট-মেণ্টের একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী জ্ঞানদাস বাবাজী নামধারী মুণ্ডিতমস্তক বৈষ্ণব-চূড়ামণি বিনয়কে পুরীর রামদাস গোঁসায়ের আখড়া হইতে গ্রেপ্তার করিল। কিন্তু রাধামতীকে পাওয়া গেল না, সে বিনয়ের সহিত কলিকাতায় আসিয়া অপর একটি যুবককে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বিচারের দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল—সকলেই ভাবিয়াছিল যে বিনয় কোনো কথাই স্বীকার করিবে না—কিন্তু বিচারের সময় এমনই তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল, এমনই তাহার জীবনে ধিক্কার লাগিল—যে, সমস্ত দোষগুলি আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইল—তারানাথের গায় আঁচটি লাগিতে দিল না। অপরাধ স্বীকার করিয়া সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ফাঁসির হুকুম প্রার্থনা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ কেসটি সেসনে পাঠাইলেন। সেসনে জজ ও জুরির বিচারে বিনয় দোষী সাব্যস্থ হইল। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাহার ফাঁসির হুকুম না হইয়া আজীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা প্রচারিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ধরা*

বাংলা ভাষাতে কতকগুলি ক্রিয়াপদ আছে, যাহারা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন ধরা, খাওয়া, পড়া ইত্যাদি। অদ্য ধরাই আমাদিগের বক্তব্য। "ধরা" এই ক্রিয়াপদটি দুই ভাবে ব্যবহৃত হয় যথা ;—

(১) নিজেই বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে।

(২) আর একটি শব্দের সহিত বসিয়া, উভয়ে মিলিয়া একটি নূতন অর্থে; —যেমন পায়ে ধরা। এস্থলে পায়ে ও ধরা উভয় শব্দই নিজেদের সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মিলিত অর্থ মিনতি করা।

কথোপকথন-ছলে আমি ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিব।

* মিরাট সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

(কতিপয় বন্ধু আসীন)

বিনয়। ওহে অতুল একটা গান ধর না।

অতুল। না ভাই আজ পারছি না। কাল মাছ ধরতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে গলাটা বড় ধরে গেছে।

বিনয়। যা হয় একটা গাও, সময়টা তো কাটানো চাই।

অতুল। না ভাই থাক, মাথাটাও বড় ধরেছে।

বিনয়। গাওনা হে। এ তো আর মজলিসে গাইছ না?

নরেন। থাকই না কেন, বেচারা পারছে না।

বিনয়। যাও তোমাকে আর ধামা ধরতে হবে না।

অতুল। তাস খেল না, কি বল নরেন?

নরেন। যে ছকা পাঞ্জা আজ তুমি সকালে ধরেছ ও আর তিন দিনের মধ্যে তাস ধরছে না।

বিনয়। না গাইলে তো বয়ে গেল। জানলে বুঝি গুমর করতে হয়? কিহে শরৎ, চায়ের কতদূর?

শরৎ। উনন ধরাচ্ছে দেখে এসেছি। কি হ'ল অতুল গান গাইলে না?

বিনয়। না ওঁর গুমর হয়েছে, এবার দেখছি পায়ে ধরতে হবে।

শরৎ। গাও না হে, ও এত করে ধরেছে।

অতুল। আচ্ছা গাচ্ছি, কি গাইব বল?

যতীন। গাও যা তোমার খুসী।

অতুল। (গান ধরিল) "রাধে ধৈর্য্যং ধর—"

বিনয়। আঃ কী ও গান!

অতুল। তবে কি গাইব? (ভাবিয়া)

"ধর ধর রে ললিতে নটবরে এখন,
নাহি যেন করে পলায়ন।"

বিনয়। ছাই গান, ও তোমার গাইতে হবে না।

অতুল। এও পছন্দ হ'ল না? তবে কি গাই? আচ্ছা—

"সখি আমায় ধর ধর;
কেন কেন সখি এভাব নিরখি
কেন কেন তুমি অমন কর?"

নরেন। এই ভরা-সন্ধ্যে বেলা বেহাগ ধরলে বুঝি।

অতুল। ভারি মুস্কিল দেখছি, যা গাইব তাই পছন্দ হবে না। প্রতি কথায় এমন ধরলে কি গান গাওয়া যায়?

যতীন। চলহে একটু বাইরে যাই, বসে বসে পায়ে যে ঝেঁজি ধরে গেল।

বিনয়। শরৎ, চা'য়ের কি হ'ল হে?

শরৎ। আন্‌চি। (প্রস্থান করিল)

অতুল। সুরেনের ছেলেটা কেমন আছে?

যতীন। বড় ভালো না। কোনো অষুধই ধরছে না। বোধ হয় ডাক্তার রোগ ধরতে পারে নি।

অতুল। তাই তো বড় দুঃখের কথা।

(শরতের চা আনয়ন)

শরৎ। ধরহে (সকলকে এক এক পেয়ালা প্রদান)।

নরেন। আমায় দিয়ো না—আমি খাব না।

শরৎ। কেন?

নরেন। আজ ওল খেয়েছিলুম। কি জানি কোথাকার বুনো ওল, ভারি গলা ধরেছিল। এখনো গলাটায় ব্যথা রয়েছে।

শরৎ। গরম চা খেলে সেরে যাবে।

নরেন। তবে আমি এ পেয়ালাটা নেব না। তোমার এটাতে ঠিক আধ সের চা ধরে।

অতুল। চা'টা বিশ্রী লাগছে, দুধটা ধরে গেছলো।

বিনয়। ফিষ্টের কি ঠিক হ'ল? শরৎ, এই সময় ফর্দ্দটা ধর না।

শরৎ। তোমাদের ক'জন লোক তাই আগে ঠিক হোক।

যতীন। লোক তো ঠিকই আছে। এই ধর,—আমরা পাঁচজন, আপিসের ছ'জন এই এগারো জন, আর চাকর-বাকর সব ধরে ১৪।১৫ জন হবে।

অতুল। বাপরে এত লোকের মেও ধরবে কে?

শরৎ। কবে যাওয়া ঠিক হ'ল?

নরেন। সে এই শনিবার ঠিক হবে।

শরৎ। তবে সেইদিন ফর্দ্দ ঠিক করা যাবে। কতক্ষণের কাজ?

(চাকরের তামাকু লইয়া প্রবেশ)

নরেন। নাও হে যতীন।

যতীন। না না তুমি নাও আমি আগে নিচ্ছি না।

নরেন (চাকরের প্রতি) হাঁরে তামাকটা ধরেছে?

চাকর। আজ্ঞে হাঁ বাবু।

অতুল। নরেন তামাক ধরলে কবে? আমি তো আগে দেখি নি!

শরৎ। দেখাচ্ছে দেখ না, যেন চারা গাছে ফল ধরেছে।

বিনয়। চল হে বৃষ্টি ধরেছে এবার বাড়ী যাওয়া যাক।

যতীন। কেন হে এত তাড়াতাড়ি কেন? বাড়ী গিয়ে খুকীকে কি ধরতে হবে নাকি, তবে তোমার বাড়ীর লোক কাজ করবে?

বিনয়। না হে তা নয়। ভাইটার পড়াটা একবার ধরতে হয়, নইলে সে কিছু করে না। (প্রস্থান)

অতুল। একলা যাচ্ছ যাও মোদ্দা "ছেলে ধরার" ভয় হয়েছে।

নরেন। (উচ্চৈস্বরে বলিল) দাঁড়াও হে, আমরাও যাব।

যতীন। যাক না ও পাড়া পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ওকে আমরা ধরে ফেলবো।

শরৎ। যাচ্ছে দেখ না যেন ট্রেন ধরবে।

অতুল। চল তবে আমরাও উঠি।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীবিমলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

বাবু চুণীলাল মিত্র সম্বন্ধে

প্রথম কথা

বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের আহিরিটোলার বাটীতে তিনি, তাঁহার মামাতুয়া বিধবা ভগিনী, এবং বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশের কুমারী কন্যা স্নেহলতা তখন থাকিতেন। আমার ভগিনীও তথায় রহিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে আসিতাম আবার খাঁটুরায় ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া থাকিতাম।

ক্ষেত্রবাবুদিগের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় ও দৈনিক উপাসনায় যোগ দিয়া তখন অত্যন্ত আনন্দ হইত। উপাসনার সময় আমি ২।১টি ব্রহ্ম সঙ্গীত করিতাম।

একদিন ক্ষেত্র বাবু আমাকে বলেন, "যোগীন্দ্র! তোমার কণ্ঠ বেশ মিষ্ট ও সতেজ দেখিতেছি, তুমি যদি প্রণালীমত সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পার তবে ভালই হয়। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত করিবার লোকের খুব অভাব এবং সঙ্গীতের জন্য বড় আদর হয়।"

আমি বলিলাম, "তেমন লোক কে আছেন যিনি আমাকে যত্ন করিয়া সঙ্গীত শিখাইতে পারেন।"

ক্ষেত্র বাবু বলিলেন, "আমাদের একটি বন্ধু আছেন তাঁহার নাম বাবু চুণীলাল মিত্র; নন্দরাম সেনের গলিতে তিনি থাকেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, তিনি বোধ হয় তোমাকে খুব যত্নের সহিত গান শিখাইবেন।"

তারপর একদিন ক্ষেত্র বাবু বলিলেন, "আমি চুণী বাবুকে বলিয়াছি, তিনি তোমাকে যাইতে বলিয়াছেন। তুমি শোভাবাজার ৬নং নন্দরাম সেনের গলিতে পতিরাম রক্ষিতের বাড়িতে গেলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে।

আমি যখন চুণী বাবুর নিকট গেলাম, তখন বেলা অপরাহ্ণ। তিনি নিকটেই বাবু মণীন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে বাবু ভগবতীচরণ দেব নামক একটি ভদ্র লোককে হারমোনিয়ম-যোগে গান শিক্ষা দিতে ছিলেন।

চুণী বাবু অন্ধ, * তিনি আমার কথা শুনিয়াই বলিলেন, "হাঁ আসুন, আমি আপনার কথা শুনিয়াছি।" তারপর সঙ্গীত-সম্বন্ধে আমাদের কিছু কথা বার্ত্তা হইল, তিনি আমাকে একটি গান শুনাইলেন। তারপর আমাকে লইয়া তাঁহার বাসায় আসিলেন।

---

* এই খানে চুণী বাবুর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমি তাঁহার নিজমুখে যেমন শুনিয়া ছিলাম সেই ভাব স্মরণ করিয়া বলিতেছি। কলিকাতার নন্দরাম সেনের গলিতে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা তথায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার মৃত্যুর পর বালক চুণী বাবু ও তাহার মাতা এবং ভগিনিগণ অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তারপর প্রায় ষোলো বৎসর বয়সে তিনি একটি এ্যাসিডের বোতল খুলিতে গিয়া তাহা তাঁহার দুই চক্ষুতে লাগে। তজ্জন্য তিনি অনেক কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া জন্মের মতো অন্ধ হইয়া যান। ইহার পর এক সময় তিনি দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। এই সময় তিনি ভগবানের নিষেধ শুনিতে পাইয়া সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বর কি বস্তু, ধর্ম্মের মর্ম্ম কিসে অবগত হওয়া যায়, সাধন করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে অত্যন্ত সন্দেহের মধ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। এমন সময় সহসা এক মহাত্মার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার ২।৪ টি কথায় চুণীবাবুর বিবেক জাগ্রত হইয়া উঠে। উক্ত মহাত্মা তাঁহাকে কয়েকটি সার কথা বলিয়া চলিয়া যান। তার পর তিনি

বাসায় আসিয়া আমাদের আবার কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল। দুই এক কথার পর তিনি আমাকে বলিলেন "আপনার তো হৃদয়াকাশ বেশ পরিষ্কার দেখিতেছি, কিন্তু ঐ এক কোণে অল্প মেঘাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে কেন? আপনি কথা কহিতেছেন বেশ, কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা কি কাতর স্বরের রেশ বাহির হইতেছে। আপনার মনের মধ্যে যেন এখনো কি একটা গভীর বিষাদ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।—বলো তো ভাই, কথাটি কি? আমাকে বলো, তাহাতে তোমার ভালোই হইবে।"

আমি তাঁহার এই কথায় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিলাম,— "ক্ষেত্র বাবু কি আমার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন, "ক্ষেত্র বাবু আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যে আপনি ধনীর পুত্র-পৌত্র ছিলেন, তারপর নিজেও চিনির কারবারে প্রবৃত্ত হইয়া অবস্থার উন্নতি করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা আপনার বিবেক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া, এখন আপনি ধর্ম্মের জন্য বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপস্থিত আপনাকে সঙ্গীত শিক্ষাদিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যাহা জানি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু সাহায্য যেন করি।"

আমি বলিলাম,—"তবে আপনি আমার মনের ভিতর কি আছে, কি হইতেছে তাহা জানিলেন কিরূপে?"

"ঐ যে, আপনার গন্ধে আপনার শব্দে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। আপনিই বলুন না আপনার মনের মধ্যে কিছু আছে কি না? খুলিয়া বলুন না আপনার সে বিষয়টা কি?"

আমি তখন স্থিরচিত্তে বলিলাম,—"আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন; আমি উপস্থিত সময়ে বড়ই একটা মনোকষ্টের মধ্যে পড়িয়া আছি, তাহা আপনাকে আজ বলিব। আপনি আমার প্রথম অবস্থার কথা কিছু শুনিয়াছেন। তারপর আমি যখন দোকানের কাজে কর্ম্মে লিপ্ত ছিলাম, তখন কুশিক্ষায়—কুসঙ্গে মিশিয়া আমার চরিত্র দূষিত হইতে আরম্ভ হয়। বারো বৎসর বয়সে,

---

সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া কখন কখন ধর্ম্ম-বন্ধু সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম্মালোচনা ও জন-সেবার কার্য্যাদি করিতেন। কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ধর্ম্ম-তত্ত্বের উপদেশ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতেন। এক সময় তিনি সঙ্গীত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া সুবিখ্যাত মদনমোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কিছু দিন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় এখনো তিনি জীবিত আছেন, বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হইয়াছে। (দাস)

এক সাত বৎসরের বালিকার সহিত আমার বিবাহ হয়। আঠারো বৎসর বয়সে আমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর আমার স্ত্রী পক্ষাঘাৎ রোগে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া এখন তিনি তাঁহার পিত্রালয়ে বরাহনগরে আছেন। আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার এক আত্মীয়ার প্ররোচনায় পুনরায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে অন্তরে ভগবানের নিষেধ শুনিয়া বুঝিলাম যে ইহা অন্যায় আচরণ। এই উপলক্ষে আমার মনের একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তারপর হইতে আমি স্থির করিয়াছি, আর বিবাহ করিব না, এক স্ত্রী সত্বে বিবাহ করা যে অতীব অধর্ম্ম কার্য্য ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। অতঃপর আমি পীড়িত হইলে আমার স্ত্রী আমার প্রতি যেমন ব্যবহার করিতেন এখন আমিও তদ্রূপ করিব। আমি নিজ হাতে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিব। তাঁহার মন ভালো আছে তাঁহার সঙ্গে আমার এখন আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের দিন আসিয়াছে। ইহা আমার পক্ষে ভগবান্ ভালোই করিয়াছেন। ইহা এখন আমার সৌভাগ্যের হেতু-স্বরূপ হইবে। এই কল্পনাতেও আমি অতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছি। কিন্তু এখন শ্বশুরালয়ে গিয়া অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। কি এক বিকট অভিমান ও লজ্জা আসিয়া যেন বাধা দিতেছে। পূর্ব্বে কল্পনায় যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা হারাইয়া এখন একপ্রকার গূঢ় অপ্রসন্নতা অনুভব করিতেছি।"

আমার এই সকল কথা শুনিয়া চুণী বাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপনার শ্বশুরালয় বরাহনগর এখান হইতে তো অধিক দূর নয়, আপনি কি এখন সেখানে যাইতে পারেন না?"

আমি বলিলাম,—"পারি।"

"তবে এখনই চলে যান। দেখিবেন কি আনন্দ পান। আমি রাত্রি ৯টা, ১০টা পর্য্যন্ত এই খানেই থাকিব। সেখানকার খবর আমাকে দিয়া যাইবেন।"

আমি বরাহনগর গেলাম। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির নিকটে গিয়া আর যাইতে পারিলাম না। কেমন যেন হইল! আস্তে আস্তে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। চুণী বাবুর সঙ্গে আর দেখা করিতেও পারিলাম না। তখন বলরাম দের ষ্ট্রীটে বাসা ছিল। বাসায় গিয়া, সমস্ত রাত্রি মৃতপ্রায় অবস্থায় অবসান হইল। কিন্তু প্রাতে কোথা দিয়া পূর্ব্বাকাশের সমুজ্জ্বল কিরণের সঙ্গে সঙ্গে

যেন আমার মনেও এক নব আলোক আসিয়া মন প্রস্তুত হইয়া গেল। আজ নিশ্চয়ই যাইব, সমস্ত অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া সকল অপরাধের শান্তি করিব।

যথানিয়মে স্নান আহার এবং অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি সমাপন করিয়া বেলা অপরাহ্নের পূর্ব্বেই বরাহনগর গেলাম। তাহার পর যাহা হইল তাহা আমার প্রাণে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যিনি এত দিন আমার ভ্রান্তির জন্য এত কষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, আমার সেই বিকলাঙ্গিনী পত্নী একবার আমার দর্শনে ও অনুতাপ বাক্য শ্রবণে সকল কষ্ট ভুলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর নিকটও বলিলাম,—"এখন আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমি গত সময়ে যাহা করিয়াছি তাহা অত্যন্ত ভুল করিয়াছি, তজ্জন্য এখন আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আপনারা আমার গত অপরাধ সকল ক্ষমা করুন। আমি শীঘ্রই আপনাদের কন্যাকে বাটী লইয়া যাইব এবং যথাসাধ্য তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিব।" শাশুড়ী মাতা আর কি বলিবেন, তিনি নীরবে প্রসন্নতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় সাক্ষাতে কোনরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। বোধ হইল, তিনি যে শুনিয়াছিলেন আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছি, তাই এ আবার কি একটা ভাব হইয়াছে বুঝি। এইরূপ কিছু মনে করিলেন। যাহা হোক সে দিন ফিরিয়া আসিয়া চুণীবাবুকে সমস্ত সংবাদ দিলাম। এই ঘটনায় তাঁহার সঙ্গে আমি একটা বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

একসিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার রায় ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এইবার যমুনা নদী সার্ভের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই নদী সংস্কার হইলে কত দূরের লোক উপকৃত হইবে ও কত দূরের জল নিকাশ হইবে (Cat Chent basin) জানিবার জন্য ইহার উভয় কূল মাপ হইতেছে। ঐ নদীর জলের হ্রাস বৃদ্ধি জানিবার জন্য গঙ্গা, বাঘের খাল ও টিপীর মুখে তিনটি গেজ (Gauze) বসান হইয়াছে। বোধ হয় ইঞ্জিনিয়ার বাবু আগামী আগষ্ট মাসে

তাঁহার রিপোর্ট সদরে পেশ করিবেন। এই রিপোর্টের উপর যমুনা সংস্কার নির্ভর করিতেছে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বালি উত্তরপাড়া-নিবাসী, কলিকাতা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট-প্রবাসী, গোবরডাঙ্গার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় জামাতা ছোট আদালতের উকিল বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে হাতের অঙ্গুলিতে একটি ব্রণে অস্ত্র হইয়া তিনি কয়েক মাস অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। উক্ত দিবসে নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণান্তে বাটীর নিকট আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের বিকৃতি হয় এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। হরিমোহন বাবু বাল্যকালে কষ্টে সৃষ্টে লেখা পড়া শিখিয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে পর পর সাংসারিক অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। কখন বিলাসিতার দিকে তাঁহার মন যায় নাই। ওকালতি পথেও আমরা কতবার দেখিয়াছি তিনি আগে বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যদি আপোষে মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। তিনি মিথ্যা মকর্দ্দমার পক্ষাবলম্বন কখন করিতেন না। ভিতরে ভিতরে জ্ঞান-চর্চ্চা করা তাঁহার একটি চির অভ্যাস ছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত কখন গাড়ি ঘোড়া করেন নাই। প্রতিদিন দুই বেলা ভ্রমণ নির্ম্মল বায়ু সেবন এবং প্রাতে গঙ্গাস্নান করিতেন। পান ভোজনাদি সকল বিষয়ে তিনি মিতাচারী হইয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, কোনো দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না। তাঁহার পুত্র দুইটি এখনো নাবালক, আমরা তজ্জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অনাথের নাথ দীনবন্ধু এই পরিবারের সহায় হউন এবং স্বর্গীয় আত্মার শান্তি বিধান করুন ইহাই ভগবানের চরণে আমরা একান্ত কামনা করি।

এবার গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষার্থে ৬ টি ছাত্র পাঠানো হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩ টি পাস হইয়াছে ;—যথা—প্রথমবিভাগ, ঘোষপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ নীরোদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইছাপুর-নিবাসী ৺পতিরাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বিভাগে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীমান্ ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী।

দাসের নিবেদন

ক্রমশ "কুশদহ"র আকার বৃদ্ধি, ছাপা, কাগজ, ছবি সকল বিষয়েই ব্যয় বাহুল্য হইয়া আসিতেছে অথচ সাধারণ বার্ষিক চাঁদার হার সেই ১৲ এক টাকাই রাখিতে হইয়াছে। কেন না মূল্য বৃদ্ধি করিলে সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে। এই জন্য প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া দেনা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমি আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই ৬ ছয় বৎসরে পর পরই "কুশদহ" কুশদহবাসীর আদরের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও এ পর্য্যন্ত আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষের এক কালীন অধিক অর্থ সাহায্য পাই নাই, তবে যাঁহারা মধ্যবিত্ত এমন ব্যক্তিগণের সাহায্যে তবু এ পর্য্যন্ত "কুশদহ" চলিয়া আসিতেছে! এই জন্য আমি আশা করি আমার নিবেদন কুশদহবাসির নিকট ব্যর্থ হইবে না। আমার নিবেদন এই যে, সম্প্রতি অনেক দিনের পর ছাপাখানার সঙ্গে একটি হিসাব পরিষ্কার হইয়া ১৫১৲ টাকা "কুশদহে"র দেনা হইয়াছে। "কুশদহ" নিরাপদে চালাইতে হইলে এই দেনাটি যত শীঘ্র হয় পরিশোধ করিতে হইবে। আমার মনে হয়—"কুশদহর" যে প্রকার মূল্য সুলভ করা হইয়াছে তাহাতে কুশদহবাসিগণ যদি ইহার প্রকৃত মূল্য বার্ষিক মাত্র ২৲ টাকা মনে করিয়া সাধারণ দেয় ১৲ টাকা ছাড়া আর একটি করিয়া টাকা দান করেন, তবে অচিরাৎ এই দেনা পরিশোধ হইতে পারে। আমার শরীর দিন দিন ভাঙ্গিতেছে, দেশবাসী দয়া করিয়া আমাকে ঋণ-মুক্ত করিবেন না কি? যাঁহারা অতিরিক্ত সাহায্য দান করিতেছেন তাহা প্রতি মাসে প্রাপ্তি স্বীকার করা হইতেছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

বৈশাখ মাসে প্রাপ্তি স্বীকার বাদে, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত

শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রক্ষিত ২৲
,, শিবদাস কুণ্ডু ২৲
,, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ২৲
,, নীরোদলাল চট্টোপাধ্যায় ২৲
,, ডাঃ সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (চারঘাট) ২৲
,, শরৎচন্দ্র রক্ষিত ৩৲

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲
,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রামমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদক) ২৲
,, শিখরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সুপাঃ হয়দাদপুর কাছারী ২৲
,, যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (হাটখোলা) ৫৲

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস, কলিকাতা

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২১ | চতুর্থ সংখ্যা

সঙ্গীত

ভৈরবী মিশ্র—ঝাঁপতাল

আমায় রাখিয়ো সাথে।
ঘোরা যামিনী হ'তে নব প্রভাতে।
অসার কল্পনা—বৃথা মোহ হ'তে,
রাখিয়ো জাগা'য়ে সত্যের সুপথে,
সঞ্চার শকতি বহিতে নিয়ত
তোমার আদেশ লইয়া মাথে।
অনন্ত জীবন ব্যাপিয়া আমায়
তব মঙ্গল রাজে,
সব সুখ দুঃখে মোহ পরমাদে
তুমি রহ হৃদি-মাঝে ;—
প্রেমে নাশ-নীচ স্বার্থের বাঁধন,
নিয়ম-নিগড়ে রাখিয়ো শাসন ;
ধৌত করি' সব কালিমার দাগ,
লও তব চির সুখ শোভাতে॥

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সংঘ

পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ বিগত চিকাগো মহাধর্ম্ম সভায় (রিলিজিয়ান অব পার্লামেণ্ট) মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। ঐ প্রথম অধিবেশনের পর ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে (১৩১৫, চৈত্র) কলিকাতার টাউন হলে আর এক অধিবেশন হয়। তৎপরে য়ুরোপের জেনিভা নগরে আর এক অধিবেশন হইয়াছিল। আগামী শীত ঋতুতে আর একটি বিরাট অধিবেশনের আয়োজন হইতেছে। এবার একযোগে য়ুরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার চীন, জাপান প্রভৃতি সমগ্র ভূখণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আলোচনা উক্ত সম্মিলনীতে হইবে। আমেরিকা য়ুরোপ এবং এশিয়ার চীন জাপান পারস্য প্রভৃতি স্থানের বহু সংখ্যক প্রতিনিধিগণ আসিয়া, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সহিত মিলিত হইবেন। ভারতের মধ্যে আবার ৪টি কেন্দ্র স্থির হইয়াছে যথা,—কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ও লাহোর। ভারতবর্ষে আসিবার পথে লণ্ডন, বুডাপেষ্ট, কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল, এথেন্স, কাইরো এবং কলম্বোতে প্রতিনিধিগণ সভা করিবেন।

বোষ্টন সহরের রেঃ চার্লস ডবলিউ ওয়েণ্ডেণ্ট সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী ও বাবু হেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, ভারতীয় বিভাগের সেক্রেটারী হইবেন।

ভারতের নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ মহাসভার কার্য্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করিবেন।

সার আর, জি, ভাণ্ডারকর; সার এন, জি, চন্দ্রভারকর; মিঃ ডি, আর, সিন্ধে; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিচারপতি হোসেন ইমাম; বিচারপতি এ, চৌধুরী; মিঃ এ, রসুল ব্যারিষ্টার; ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী; স্বামী সারদানন্দ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী; প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র; বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; রেঃ প্রমথলাল সেন; রেঃ সি, এফ, এন্‌ড্রুস; প্রিন্সিপাল ভেঙ্কট রত্নম; সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মেজর বি, ডি, বসু এবং প্রিন্সিপাল টি, এল, ভাস্বয়ানী।

জগতের উদারনৈতিক সম্প্রদায় আজ ধর্ম্ম-জগতের এই মহামিলন-বার্ত্তা শ্রবণে মহা উল্লসিত। এই ধর্ম্ম সঙ্ঘের মূল কারণ, বর্ত্তমান উদ্দেশ্য, এবং

পরিণতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমরা দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, আমাদের সম্মুখে কোন্ শুভদিন আসিতেছে। অন্যথা সময়ের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া এখনো যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের প্রচারিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, তাঁহাদের বিশ্বাস কেমন ভ্রান্ত! তবে আমরা এ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে, পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিদ্যমান, সমস্তই একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। কেন না ঐতিহাসিক হিসাবে জগতে সকলেরই চিহ্ন থাকিবে, দ্বিতীয়, প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মূলেই একটি করিয়া মৌলিকতা আছে তজ্জন্য দেখা যায়, কোথাও জ্ঞান, কোথাও যোগ, কোথাও ভক্তি, কোথাও কর্ম্ম প্রধান রূপে এক এক সম্প্রদায়ে বিদ্যমান। ঐ বিশেষত্ব লইয়াই তাহাদের অভ্যুদয়। তবে তাহার অপরাংশে সঙ্কীর্ণতা দোষও আছে। এজন্য সকল মৌলিক ভাবগুলির সমবায়ে যথাসময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম গঠনের প্রয়োজন ছিল। এখন পৃথিবীতে সেই দিন আসিয়াছে। যুগধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছে, এ যুগ মিলনের যুগ। এখন চারিদিকে সমন্বয়ের ভাবই চলিয়াছে। এখন সমগ্র পৃথিবী লইয়া ধর্ম্মের একটি সাধারণ ভূমিও প্রস্তুত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে আর ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ থাকিবে না। সাধারণভাবে একই ধর্ম্ম সকলে বিশ্বাস করিবে, এবং একতার ভূমিতে মিলিয়া জগদ্‌বাসী একত্রে জগদ্‌বাসীর সেবা করিবে।

দ্বিতীয় কথা—জগতে জ্ঞান সভ্যতার বিস্তারে এখন দেশের সঙ্গে দেশ, জাতির সঙ্গে জাতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদান-প্রদান ও ভালোবাসার যতই বিনিময় হইতেছে, ক্রমে ততই মানুষের মন উদার হইতেছে। প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষ মানুষকে আর দূরে রাখিতে চাহিতেছে না। ধর্ম্ম-দৃষ্টিও উদার হইয়া এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের চরিত্র ও তৎতৎ ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে এই একতা-সম্পাদনের প্রবৃত্তি মানব-হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন সাধারণের মনে এমন একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে যে, সকল প্রকার ভেদ সত্ত্বেও মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলনাভিলাষী হইয়া উঠিতেছে। চিন্তাশীল, ধর্ম্ম-বিশ্বাসী মণ্ডলী এই ভূমি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যে ভেদ, তাহা তো চিরকালই থাকিবে, অথচ মিলনের ভূমিও আছে। ভেদ এবং অভেদ এই মহা রহস্য জগতের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই সাম্য-তত্ত্ব, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উন্নত সাধকগণের মনকে

অধিকার করিয়াছে। তাই এই মহা চেষ্টা, মহা আয়োজন চলিয়াছে। জগতে এক মহামিলনের শুভ দিন আসিতেছে।

এখন শেষ কথা, ইহার মূল কোথায়? আমাদের বিশ্বাস ইহাই বিধাতার বিধান। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, সেই অনাদিকাল হইতে যত ধর্ম্ম-প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে সকলই সেই একেরই প্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমম্বের যে বিভিন্ন রূপ সে কেবল দেশ কাল পাত্র-ভেদ-জনিত। ফলত কাহারো সঙ্গে কাহারো মূলে ভেদ নাই। সমস্তরই মূল এক। তবে তাহার বাহ্যিক বিষয়ে দেশাচার বা ভাবশূন্য ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্মের ম্লান অবস্থার চিহ্নস্বরূপ কুসংস্কারসকল প্রবিষ্ট হইয়া আরো ভেদ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ঐ সকল কারণেই যুগে যুগে ধর্ম্ম-সংস্কারের আয়োজন। যুগাবতার ধর্ম্ম-সংস্কারক-গণও আবার কিছু নূতনত্ব লইয়া আসেন, তদ্দ্বারাই ধর্ম্মের অঙ্গ পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে একই ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গের দিকে চলিয়া আসি-তেছে। ধর্ম্মচক্র এখন এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত, যেখানে যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম বিভিন্ন অঙ্গের মিলনে ধর্ম্মের একটি সার্ব্বভৌমিক ভূমি প্রস্তুত না হইয়া আর চলে না। এই মিলন যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে সম্ভব হইয়াছে, তেমন সামাজিক বিষয়েও একটা দিক আছে। সে বিস্তৃত আলোচনার এ স্থান নহে। এখনো যাঁহারা বিশ্বাস করেন এই টুকু আমাদের হিন্দুধর্ম্ম, এই টুকু আমাদের খৃষ্টধর্ম্ম, পৃথিবীতে তাহারই শেষ জয় হইবে, আর সকল ধর্ম্ম কালে শূন্যে উড়িয়া যাইবে, তাঁহাদিগকে আমরা আর কী বলিব! কেবল আনন্দের সহিত এই ধর্ম্ম-সত্য-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বলিতে চাই,—ভাই, একবার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ভুলিয়া পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি কর। গতি কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা বুঝিয়া বল, পৃথিবীর ভবিষ্যদ্বংশ কোন্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের আকার কিরূপ হইবে?

লোকাচার ও বাল্যবিবাহ

আমার কোনো উচ্চশিক্ষিত বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুকে বাল্যবিবাহের বিরোধী বলিয়া জানিতাম। সম্প্রতি তিনি তাঁহার ১২ বৎসরের খর্ব্বকায় কন্যার (যাহাকে আরো ২।৩ বৎসর অবিবাহিতা রাখিলে গোঁড়া হিন্দুও আপত্তি করিতেন না)

পাত্রের সন্ধান করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। তিনি দক্ষিণকুল তন্তুবায়-সমাজ-ভুক্ত এবং এই সহরবাসী।

আমার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারই মান্য, যাহা দশজনে করিয়া আসিতেছে আমিও তাহাই করিতেছি। আমি বাল্য-বিবাহের দোষ বুঝি, কিন্তু একলা কি করিব? সমাজের (?) মধ্যে শতকরা ৯৫জন অশিক্ষিত, এরূপ অবস্থায় ২।১ জনে কিরূপে সংস্কারের কাজ করিবে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হইলে মেয়েদের ৮ বৎসরে বিবাহ হইত, এখন ১২।১৩ বৎসরে হইতেছে; সময়ের গুণে ক্রমে মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িবে।"

আমি বলি,—সময়ে আপনা-আপনি সংস্কার হয় না, আপনি বাড়াইবেন, আমি বাড়াইব এইরূপেই বিবাহের বয়স বাড়িবে। আপনি কখনো বাড়িবে না।

বন্ধু। মেয়ের বারো বছর বয়স, এখনই পাত্র পাওয়া যাইতেছে না, তা বেশী বয়স হইলে মেয়ের বিবাহই হইবে না।

আমি। কেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনাদের সমাজে কন্যার আঠারো বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে কোনো গোলমাল হয় নাই, আপনার মেয়েকে ১৬ বছর পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন। আপনি কি সমাজচ্যুতির ভয় করিতেছেন?

বন্ধু। দুই একটা অধিক বয়সে বিবাহে কিছু যায় আসে না, আমি সমাজকে ভয় করিতেছি না, বেশী বয়সে পাত্র পাওয়া দুষ্কর।

আমি। আজকাল ছেলেরা বয়স্থা কন্যাই পছন্দ করে। কেবল পাত্রের অভিভাবকদিগকে ধরিলে হইবে না, পাত্রকে ধরিতে হইবে; লেখা পড়া শেষ করিয়া উপার্জ্জন করিতে শিখিতেই যুবকদের বয়স হইয়া পড়ে, তাহারা নাবালিকা কন্যা চাহে না।

বন্ধু। তুমি কি বলিতে চাও, পুত্রগণ পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া বিবাহ করিবে? আমরা এতদিন তাহাদিগকে ভরণ পোষণ ও শিক্ষাদান করিলাম, শেষে তাহারা আমাদের অবাধ্য হইবে?

আমি। আমাদের মহাপণ্ডিত চাণক্যদেব বলিয়াছেন, ১৬ বৎসরের পর পুত্রের প্রতি মিত্রের ন্যায় আচরণ করিবে। পুত্রগণের কার্য্যে স্বাধীনতা থাকিবে, তবে তাহারা পিতামাতার পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ করিবে।

বন্ধু। আমাদের সমাজে Courtship নাই; পাত্রগণের উপর পাত্রী নির্ব্বাচন-ভার রাখা উচিত নহে।

আমি। কেন পাত্র বয়স্ক হইলে অনেক সময় নিজে ও তাহার বন্ধুরা পাত্রীকে দেখিয়া যায়। কোনো কোনো বয়স্ক পাত্র বিবাহের পূর্ব্বে লজ্জা বশত কোনো মতামত প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু বিবাহের পর অল্পবয়স্কা দেখিয়া বা অন্য কারণে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে। ২৫ বৎসরের যুবক ১০।১১ বছরের বালিকাকে লইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে কি? তজ্জন্য কথনো কথনো বিসদৃশ ঘটনাসকল ঘটিয়া থাকে। অভিভাবকগণের পাত্রী-নির্ব্বাচনের সময়ে যুবকের মতামত গ্রহণ করা উচিত। তাঁহারা কতিপয় পাত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া যুবকের নিকট তাহাদের স্বভাব, স্বাস্থ্য, বয়স, বিদ্যা, রূপ প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত করিবেন, যুবক তন্মধ্যে যে কয়েকটি পাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিতে চাহে, তাহাদিগকে দেখানো উচিত। বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখ যাহাকে আজীবন ভুগিতে হইবে, তাহার উপর কন্যা-নির্ব্বাচনের ভার থাকা উচিত। তবে যুবকেরা রূপজ-মোহে আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারে, তজ্জন্য প্রথমে অভিভাবক বা প্রধান বন্ধুগণ কন্যা নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবেন, এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কিন্তু যুবকের হাতে থাকা উচিত।

বন্ধু। এখনই কলিকাতায় আমার মেয়ের পাত্র জুটিতেছে না, তজ্জন্য চন্দননগরে পাত্রের সন্ধান দেখিতেছি। মেয়ের বেশী বয়স হইলে আদবেই পাত্র জুটিবে না।

আমি। বলেন কি? এইবারের সেন্সাসে প্রকাশ, বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে ২৬ লক্ষ রমণী বিধবা। পাত্র জোটে না, তাহার অন্য কারণ থাকিতে পারে। আমি আপনাদের সমাজের অনেকগুলি অবিবাহিত যুবককে জানি, যাহাদের বয়স ২৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তাহারা অর্থ-উপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিও যখন ১১।১২ বছরের মেয়েকে পার করিতে ব্যস্ত, তখন বয়স্ক পাত্রদিগের জন্য বয়স্থা পাত্রী মিলিবে কোথায়? সম্প্রতি একটি ত্রিশ বছরের যুবককে বাধ্য হইয়া একটি ১১ বছরের বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছে। আপনিও পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যতদিন আমার পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিতে না শিখে, ততদিন তাহার বিবাহ দিব না; এখন আপনার কথাব সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে ১২।১৩ বৎসরের কন্যারও বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। আপনার বিশ্বাস কন্যার বেশী বয়স হইলে পাত্র জুটিবে না, তা ২।৩ বৎসর চেষ্টার পর যদি সুপাত্র না জোটে তখন অপাত্রেও দিতে রাজী আছেন কি?

বন্ধু। তা নিশ্চয়! পার করিতেই তো হইবে।

আমি। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সমাজের মধ্যে অধিকাংশ লোক শিক্ষিত হইলে বিবাহ-সংস্কার আপনি হইবে, তাহার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে না। কলিকাতার মধ্যে অধিকাংশই তো শিক্ষিত।

বন্ধু। যে শিক্ষা আজকাল লোকে পাচ্ছে, তাহা শিক্ষাই নয়, চরিত্র গঠিত হইতেছে না কেন? মুখে এক কাজে অন্যরূপ। (সজোরে) এইতো পণ-প্রথা নিবারণ করিবার জন্য বড় বড় সভা হইল, তথায় সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দেখান দেখি, কয়জন বিবাহে পণ গ্রহণ করে নাই?

আমি নীরব রহিলাম, সময়াভাবে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, বন্ধুটির কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইবে, তজ্জন্য পণও দিতে হইবে, সুতরাং তিনি পণ প্রদান রূপ সামাজিক রীতিকে শতধিক্কার দিতেছেন। হিন্দু সমাজে আদ্য ঋতুর পূর্ব্বে কন্যাদিগকে বিবাহ দিবার রীতি। তিনি এই রীতির বিরুদ্ধে কাজ করিতে সাহস করেন না, কাজেই সকল যুক্তি সকল মত বিসর্জ্জন দিয়া অম্লান বদনে লোকাচারের বশীভূত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্মত, তা কন্যার কপালে সুপাত্রই জুটুক বা কুপাত্রই জুটুক। এদিকে তাঁহার পুত্র ২।৩ বৎসরের মধ্যে গৃহলক্ষ্মী আনিবেন। তখন বন্ধু নিশ্চয়ই পণ-প্রথার গুণ শতমুখে কীর্ত্তন করিবেন।

আমরা পুরুষকে বিচার করিবার সময় তাহার পশ্চাতে শক্তিরূপিণী নারী মূর্ত্তিটিকে ভুলিয়া যাই। ঐ লজ্জাশীলা আবৃত-নয়না নারী পশ্চাতে থাকিয়া পুরুষকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। শিক্ষিত পুরুষ বাল্যবিবাহের দোষ বোঝেন ও স্বীকারও করেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মস্তিষ্কে কোনো যুক্তি তর্ক প্রবেশ করিতেছে না দেখিয়া পুরুষ অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে সহধর্ম্মিণীর মতেই আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। উচ্চশিক্ষিত পুরুষ যখনই সমাজের দোহাই দিয়া কোনো অকল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখনই বুঝিতে হইবে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ভয়ে বা আব্দারে করিতেছেন। বিবাহের পূর্ব্বে আদ্য ঋতু হইলে মহাপাতক হয়, ইহা শিক্ষিত পুরুষে কখনো বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ঐ সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই মাতা উদ্বিগ্ন হইতে থাকেন,—কাজেই পাত্রান্বেষণে পিতার উদ্বেগ বৃদ্ধি না হইয়া পারে না। তখন সকল যুক্তি তর্ক বিচার—এমন কি, স্থলবিশেষে সুপাত্র কুপাত্র বুঝিবার জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে হয়।

মানুষ ও ইতর জন্তুর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। মানুষ সদসৎ হিতাহিত

ন্যায়ান্যায় বুঝিতে পারে, কিন্তু জন্তুরা তাহা পারে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিবেকই মনুষ্যের বিশেষত্ব। বিবেক-বৰ্জ্জিত মনুষ্য পশুর তুল্য,—পশু পোষ মানিলে পর তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা চালিত করা যায়। কিছুতেই সে আপত্তি করে না। যে ব্যক্তি বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অনিষ্টকর দেশাচারের নিকট আত্মবিক্রয় করেন, তিনি যে অন্য ক্ষেত্রে সদসৎ, হিতাহিত বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন, তাহা আশা করা যায় না।

পণ প্রথা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগকে বিপদগ্রস্থ করিয়াছে, ইহা সাধারণত সমাজের ঘোর অকল্যাণকর, ইহা জানিয়াও লোকে পুত্রের বিবাহের সময় পণ লইতে পশ্চাৎপদ হয় না, আর কন্যার বিবাহেও তাহারা অনিচ্ছাসত্বেও পণ দিতে বাধ্য হয়। ইহা কি একটা দেশব্যাপী ঘোর মোহ নয়?

আমরা কি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত, কি সমাজ-সংক্রান্ত প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই ভালো করিয়া ন্যায় অন্যায় আবশুক অনাবশুক বিচার করি না, তাই বিবেকবাণী না শুনিয়া জড়ের ন্যায় লোকাচার শিরোধার্য্য করিয়া চলি। ইহা কিন্তু মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে। বিবেক হারাইয়া সমাজ এখন গতানুগতিকের পথেই চলিয়াছে, এ বিষয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিতের বেশী প্রভেদ দেখা যায় না।

আমার উল্লিখিত বন্ধুটির শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, কেবল লোকাচার মানিয়া চলিতেছেন, তিনি বাল্যবিবাহের অপকারিতা বোঝেন, বাল্যবিবাহে যে অকাল-মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে তাহাও তিনি জানেন, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীর কথা অমান্য করিয়া কন্যার যৌবন-বিবাহ দিবেন এরূপ মনের বল তাঁহার নাই। যাহা সত্য, যাহা মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা করিবই করিব, তাহাতে যত নির্য্যাতন সহিতে হয় সহিব, এরূপ সৎ সাহস ও বীর্য্য তাঁহার নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তিনি যদি কন্যার বিবাহ ১৬ বৎসর বয়সে দেন, তিনি সমাজচ্যুত হইতে পারেন। তদুত্তরে বলা যায় তাঁহারই সমাজে ১৮ বছরের কন্যার বিবাহ বিনা আপত্তিতে হইয়া গিয়াছে। তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে তাঁহার সমাজচ্যুতির কোনো আশঙ্কা নাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতে পারে, কন্যার বেশী বয়স হইলে পাত্র জুটিবে না। কেন? অনেক যুবক এখন বুঝিয়াছেন অর্থোপার্জ্জনের পূর্ব্বে বিবাহ অনুচিত। এখন সকল সমাজেই ২৩।২৪ বৎসরের কমে অনেক যুবক বিবাহে অসম্মত, অথচ বারোর উপরে যাইতে অনেক কন্যার পিতা বিশেষত মাতা নিতান্তই অনিচ্ছুক। আসল কথা, কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিলে স্ত্রী ও

আত্মীয়বর্গের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। যাঁহারা কোনো সৎকার্য্যের অগ্রণী হন, তাঁহাদিগকেই অনেক নির্য্যাতন সহিতে হয়। মনের সাহসের অভাবে আমরা সত্য পথ—মঙ্গলময় পথ অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমরা কি প্রকৃতই কন্যাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,—না তাহাদিগকে লোকাচারের নিকট বলিপ্রদান করিয়া থাকি। এমন শোনা গিয়াছে, আন্ত ঋতুর সময় নিকট দেখিয়া অভিভাবক এমন প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই কন্যাকে পাত্রস্থ করিব। তখন যে পাত্র স্থির হয় তাহার গুণাগুণ দেখিবার অবসর থাকে না, তাহার ফলে অনেক সময় কন্যা কুপাত্রের হস্তগত হয়। ইতি পূর্ব্বে একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ হইল, পাত্রটি অল্প শিক্ষিত। বিবাহের পর জানিতে পারা গেল, পাত্রটি নির্ব্বোধ এবং ক্ষয়কাশগ্রস্ত। ডাক্তারের আদেশমত বালিকাটিকে পিত্রালয়েই বাস করিতে হইতেছে।

আদ্য ঋতুর পূর্ব্বে কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জিদে অনেক সময় কন্যা ব্যভিচারী সুরাপায়ী পাত্রের কবলে পড়ে,—কখনো কখনো পাত্র মূর্খ অলস ও উপার্জ্জনাক্ষম হইয়া থাকে। অথচ বহু সন্তানের জন্মদাতা হইয়া শ্বশুর মহাশয়ের গলগ্রহ হয়। সোজা কথায় মেয়ে পার করিতে গিয়া অনেক সময় জলে ফেলা হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া অনেক স্থানে হইয়াছে।

কন্যাদের বিবাহের একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু পুত্রদের বিবাহের বয়সের সেরূপ বাঁধাবাঁধি নাই, ইহার ফলে অনেক ঘরে বয়স্ক পুত্র বিদ্যমান, অন্যদিকে কিন্তু বয়স্কা কন্যার অভাব। তাহার কারণ সামাজিক প্রথা। এখন কথা হইতেছে যে, উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা উপযুক্ত পাত্রী পাইবে কিরূপে? তাহারাও কি বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিয়া লোকাচারের অনুসরণ করিবে? তবে আর সমাজ উন্নত হইবে কিরূপে? উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর সম্মিলনেই সংসার এবং সমাজ উন্নত হয়। ইহার অভাবে যে আমাদের উচ্চ শিক্ষিতেরা কথায় কাজে সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছেন না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

হে আর্য্য পিতামাতাগণ! আপনারা কি প্রকৃতই পুত্র কন্যার মঙ্গল চাহেন? —না লোকাচারের দাস হইয়া শান্তিতে (?) সংগ্রামহীন জড়ের ন্যায় জীবন কাটাইতে চাহেন?

শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দে।

অমরধামে

মানবের মৃত্যুর পর কোথায় গিয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়, এ সম্বন্ধে নানা মত-বৈচিত্র্য দেখা যায়। সুতরাং যিনি যাহা বলেন, তাহা তাঁহার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মতানুযায়ী মনে করিয়া; অন্যে তাহাতে কখনো কখনো উদাসীনতা প্রকাশ করেন। ফলত ধর্ম্ম-জগতে পরোলোক-তত্ত্বের ন্যায় কঠিন বিষয় আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। এই অবস্থাটি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার কোনো উপায় নাই, যিনি যাহা বালিয়াছেন, সমস্তই বিশ্বাস যুক্তি বা অনুমান-সাপেক্ষ। যাহা হউক আজ আমরা আমাদের দেশের কয়েকটি স্বনামধন্য সাধারণের বরণ্যে বাঙালীর মৃত্যু-উপলক্ষ্যে এই অমরধামের কথা উল্লেখ করিতেছি।

এই দেহত্যাগের নামই যে মৃত্যু, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দেহের নাশে আত্মার কখনো বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে অমরধামের যাত্রী বা অমরধামগামী বলা অসঙ্গত নহে। বিশেষত যাঁহারা জন-সমাজের হিতসাধন করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন, ইহা স্বাভাবিক। আত্ম-প্রসাদ আত্মাতেই আনন্দরূপে প্রকাশ পায়। আত্মা যদি অমর হয় তবে তাহার আনন্দও যে নিত্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আজ আমরা আমাদের দেশের গৌরব স্যার রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের আত্মা, নিষ্ঠাবান আদর্শ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণের আত্মা, শান্ত বিনয়ী সাহিত্য সেবক শৈলেশ চন্দ্রের আত্মাকে অমরধামের যাত্রী বা অমরধামগামী বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতে পারি না। ভগবান্ করুন তাঁহারা যেন অমরধামে তাঁহারই শ্রীচরণে চিরশান্তি-লাভ করেন।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ধনী স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বর্ত্তমান যুগে বিবিধ বিষয়ের সংস্কারার্থে বাঙালীর ঘরে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গ-সঙ্গীতবিদ্যার সংস্কারার্থে সৌরীন্দ্রমোহনের আগমন। যিনি যে কার্য্যের জন্য আসেন, ভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপ শক্তি দিয়াই পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহার জীবনের পন্থা তাঁহার সম্মুখে তদ্রূপ উপকরণ লইয়াই উপস্থিত হয়। ইহাই বিধাতার বিধান। তাই সৌরীন্দ্রমোহনের জীবনে ১৭ বৎসর বয়সেই সঙ্গীত বিদ্যার বিকাশ আরম্ভ। যথাসময়ে উপযুক্ত শিক্ষকও তিনি প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁহার প্রথম গুরু। উপযুক্ত-রূপে ক্রমেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়। লুপ্তপ্রায় হিন্দু-সঙ্গীতকলা দেশের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রাধন লক্ষ্য ছিল। সারাজীবন তিনি দীর্ঘ অধ্যবসায়ের সহিত ঐ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং সাধনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে হিন্দু সঙ্গীত-বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কি অসাধারণ ছিল। সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে এ দেশে ও বিদেশে যে সকল বড় বড় গ্রন্থ আছে তিনি তাহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল মিউজিক ইস্কুল" ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উভয় বিদ্যালয়ই তাঁহার ব্যয়ে এবং তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। তিনি এজন্য সারাজীবনে কত অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন এখনো তাহার সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। তিনি নিজেও সঙ্গীত তত্ত্ব ও সঙ্গীত বিষয়ে অনেকগুলি সারবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে "জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ে প্রস্তাব" "যন্ত্র ক্ষেত্রদীপিকা" "মৃদঙ্গ মঞ্জরী" "একতান" "যন্ত্র-কোষ" প্রভৃতি। সঙ্গীত সার সংগ্রহ নামে পুস্তকখানি তাঁহার সংগ্রহ সম্বন্ধে অক্ষয় কীর্ত্তি।

তিনি বিভিন্ন দেশের সভা সমিতি হইতে যথেষ্ঠ সম্মান ও উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দেশহিত-ব্রত সাধন দ্বারা বিধাতার ইচ্ছা পালন করিয়া, যে গৌরব-মণ্ডিত হইয়া গেলেন, তাহার নিকট পার্থিব সম্মানের মূল্য তত অধিক নহে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ প্রদ্যোৎকুমারকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌরীন্দ্র-মোহনের আর দুই পুত্র। কুমার শ্যামকুমার ও কুমার শিবকুমার।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—আমাদের অদ্যকার আলোচ্য অমরধামের যাত্রী আর একটি বঙ্গসন্তান—বর্ত্তমান "বঙ্গদর্শন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। শৈলেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পুনরায় প্রচার করিয়া মাসিক সাহিত্যের সম্পাদক-শ্রেণীর এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ছোট গল্প রচনায় তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার রচিত "চিত্র-বিচিত্র" পুস্তকখানি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির ও কোমলহৃদয় মিষ্টস্বভাব ছিলেন।

স্বনামধন্য বটকৃষ্ণ পাল—তৎপরে কলিকাতা সহরে বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান-ঔষধ-বিক্রেতা স্বনামধন্য নিষ্ঠাবান, ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগ করিয়াছেন বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় গন্ধবণিক জাতির যে কি পর্য্যন্ত গৌরব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা সামান্য কথায় আর কি বলিব। ব্যবসায়ী অনেকে হন, ব্যবসাও অনেকে করেন, কিন্তু ইঁহার মতো ব্যবসায়ী বাঙালীর মধ্যে কয়জনে করিতে পারিয়াছেন। ইনি কি কেবল বুদ্ধি আর কৌশলেই এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন! কখনই নহে। তবে তাঁহাতে আর কি জিনিষ ছিল তাহা সকলে অনুসন্ধান করুন। কেমন করিয়া দৃঢ়তা, ন্যায়পরতা, নিষ্ঠা এবং মিতাচার, মিতব্যয় ও সহৃদয়তার সহিত অল্পে অল্পে বিষয়কর্ম্মে উন্নতির পথে যাইতে হয়, তদ্বিষয়ে পাল মহাশয়ের জীবন বাঙালীর ব্যবসায়-পথের এক উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া রহিল। তাঁহার বিস্তৃত জীবন-কাহিনী বর্ত্তমান বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে আলোচিত হইতেছে, সুতরাং আমরা তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদানে ক্ষান্ত থাকিয়া একমাত্র তাঁহার আদর্শের কথাই উল্লেখ করিলাম মাত্র।

আক্ষেপ

ভাগীরথী-তীরে, ধীরে ধীরে ধীরে
বহিছে পবন মনের উল্লাসে,
বহিছে তটিনী কুলু কুলু স্বরে ;
ধাইছে তরণী মৃদুল বাতাসে।
উঠিছে তরঙ্গ,—যেতেছে মিশিয়া,
জাহ্নবীর নীরে নাচিয়া নাচিয়া
আবার উঠিছে মনের সুখে।

ধীরে ধীরে ধীরে মলয় সমীরে
গায়ের বসন দিতেছে উড়ায়ে ;
নাচিয়ে নাচিয়ে জুড়ায় শরীর ;—
জুড়ায় জীবন শীকর বুলায়ে !
জুড়াইছে কায়া,—জুড়াইছে হিয়া,
সকলেই সুখী, প্রমোদে মাতিয়া ;
শুধু এ হৃদয় কাঁদেরে দুখে !

শ্রীননীবালা দেবী।

মালিকা

(গল্প)

উপর্য্যুপরি দুইবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় মা স্বরস্বতীর সহিত রাধানাথের একটা বিষম বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। বিচ্ছেদ ক্রমে এমনই ঘনাইয়া উঠিল, যে মাতা-পুত্রে শেষে মুখ দেখা-দেখিরও সম্ভাবনা উঠিয়া গেল। রাধানাথ বিদ্যামন্দিরের কঠোর গণ্ডী কাটাইয়া বাহিরে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই শুভ সুযোগে তাকের মাথা হইতে সে তাহার বহুদিনের পরিত্যক্ত বেহালাখানি পাড়িয়া ধূলা ঝাড়িয়া পরিস্কার করিল এবং উহাতে এক চড়ন তার পরাইয়া নূতন করিয়া সা-রে-গা-মা সাধিতে সুরু করিয়া দিল।

লেখা পড়ায় ইস্তাফা দিলেও রাধানাথের গৌরব করিবার যে কিছু ছিল না এমন নহে, সেটি তাহার কুলের গৌরব ; সে কুল সকল কুলের সেরা বল্লালীকুল! উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় তাহার মানস-মন্দিরে এই কুল-গৌরব ঝলমল করিত। রাধানাথের পিতা এমন নিখুঁত নিকষ কুলীন হইয়াও যে একটির অধিক বিবাহ করেন নাই তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথম তিনি একটু নব্য তন্ত্রের লোক ছিলেন, দ্বিতীয় তাঁহার "সবে ধন নীলমণি" রাধানাথকে রাখিয়া অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে জীবনের পরিচ্ছেদে দাঁড়ি টানিয়া দিতে হইয়াছিল। আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কুলীন কুমারীদের কৌমার্য্য মোচনে উদাসীন থাকিতেন কিনা সে কথা বলা দুঃসাধ্য।

রাধানাথের বাটী হইতে অশোকপুর সাত ক্রোশের ব্যবধান। এই গ্রামে তারকব্রহ্ম শর্ম্মার বাস। তিনি একজন নির্ভাঁজ কুলীন, তাঁহার কন্যা মালিকা "ডাকসাইটে" সুন্দরী। অতরূপ এ তল্লাটে কাহারো ছিল না। তবে পরীর মতো কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না, কারণ চর্ম্মচক্ষে পরীর দর্শন লাভ কখনো কাহারো অদৃষ্টে ঘটে নাই। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে যে বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত মালিকার সে বয়স বহুদিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই বলিয়া যে মালিকার পিতা কন্যার বিবাহের বিষয়ে একান্ত উদাসীন ছিলেন, তাহা নহে। তবে কুলে শীলে ঠিক যোগ্য পাত্রটি পাওয়া যাইতেছিল না, তাই যা বিলম্ব! আর যাই হোক কন্যাটির হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে পারেন না ত!

যেদিন ব্রাহ্মণ রাধানাথের কুলের পরিচয় পাইলেন, সেই দিনই তিনি রাধানাথের বাটীতে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন, এবং রাধানাথের রুগ্না মাতাকে

বৈবাহিকা সম্বন্ধে ভূষিতা করিয়া নানা সাধ্য সাধনায় আপনার কন্যাটিকে সেবা-দাসীরূপে গ্রহণ করিতে বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিলেন! রাধানাথের মাতা ব্রাহ্মণের এই কাতর অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না।

দেখিয়া শুনিয়া এক শুভ লগ্নে রাধানাথের বিবাহ হইয়া গেল। বধূ আসিয়া ঘর আলো করিয়া তুলিল। এমন লজ্জানম্র, এমন শান্ত রূপসী বধূ পূর্ব্বে কেহ কখনো চক্ষে দেখে নাই। বধূ পাইয়া রাধানাথ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। সে আপনাকে মালিকার চরণে বিকাইয়া দিল—প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা যাহা লইয়া মানুষের হৃদয় গঠিত, সে আপনার সেই পরিপূর্ণ হৃদয়-খানিকে আজ মালিকার হাতে সঁপিয়া দিল। মালিকা রাধানাথের হৃদয়খানি কাড়িয়া লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল—রাধানাথ শুইয়া পড়িয়া দিন গণিতে লাগিল, কবে আবার মালিকা ফিরিয়া আসিবে! এক বৎসর পরে—ও সে যে তিন শো পঁয়ষট্টি দিন! রাধানাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

দুঃখে কষ্টে এক বৎসর কিন্তু দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। রাধানাথ সাজিয়া গুজিয়া মালিকাকে আনিবার জন্য শ্বশুর-মন্দিরে যাত্রা করিল। শ্বশুর-বাড়ি আসিয়া সে যখন শুনিল—মালিকা সেখানে নাই, তাহার মাসীর বাড়ি গিয়াছে, তখন কিন্তু তাহার বুক একেবারে ভাঙিয়া গেল। তাহার এত আশা, এত উদ্যম সব যেন কর্ম্মনাশার বিপুল স্রোতে ভাসিয়া গেল। মর্ম্মাহত রাধানাথ সেই দিনই গৃহে ফিরিল। আসিবার সময় তাহার শ্বশুর বলিলেন, "বাবাজীকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, আমি কাল তাকে তার মাসীর বাড়ি থেকে এনে নিজেই গিয়ে রেখে আসবো।" ইহার কয়েক দিন পরে রাধানাথের শ্বশুরের নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল "মালিকা আমাদের কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহার মাসীর বাড়িতে বিসূচিকা রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন তাহার জ্ঞান ছিল না। আর অধিক কি লিখিব ইতি—"

চিঠি পড়িয়া রাধানাথ শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত দিনেও একবার উঠিল না। মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এমন হয়ে আজ সারাদিন বিছানায় পড়ে আছিস কেন রে? কিছু অসুখ করেছে কি?"

একটা রুদ্ধ বেদনা রাধানাথের প্রাণের মধ্যে গুমরাইয়া উঠিতেছিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখে কথাটা ফুটিল না। কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে

চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রাধানাথের মাতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "কি হয়েছে বাবা? অমন করছিস কেন?"

রাধানাথ পত্রখানি তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

পত্র পাঠ করিয়া রাধানাথের মাতা আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কে যেন তাঁহার রুগ্ন শরীরে বিষের ছুরি বসাইয়া দিল। তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন কিন্তু সে শয্যা হইতে আর উঠিলেন না। এই প্রচণ্ড শোকটা তাঁহার ভাঙা-চোরা হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি জীবনে ইস্তাফা দিয়া চলিয়া গেলেন।

মাতার মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই রাধানাথ বাড়ি ঘর, জমী জেরাত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সাধের বেহালাখানি লইয়া হঠাৎ একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

এই ঘটনার দশ বৎসর পরে কলিকাতা সহরে রাধানাথের একদিন আবির্ভাব হইল। এই সহরেই এক দরিদ্র পল্লীতে একখানি খোলার ঘরে সে বাস করে। তাহাকে দেখিলে পূর্ব্বের রাধানাথ বলিয়া সহসা আর চেনা যায় না। দেহ কৃশ হইয়া পড়িয়াছে; শ্মশ্রু গুম্ফে পরিপূর্ণ মুখখানা নিতান্তই মলিন শ্রীহীন!

এই সময় কলিকাতায় মতীবাইএর নাম সকলের মুখে-মুখে ফিরিতেছিল; এবং সে তখন ছোট-বড় সকলের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তাহার নাচ গান ও রূপের প্রশংসায় সহরের লোক মুখর হইয়া উঠিল। যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে, তাহারা তো তারিপ করিতই, কিন্তু যাহারা দেখে নাই তাহারাও করিত। মতীবাই চিৎপুর রোডের উপর একখানি দ্বিতল সজ্জিত বাটীতে বাস করে। যখন সে বীণা-নিন্দিত-কণ্ঠে গান ধরিত তখন ফুটপাথে লোক-চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম হইত। সকলে কান খাড়া করিয়া মতীবাইএর কক্ষের দিকে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া থাকিত! সে সুরে কী একটা মাদকতা ছিল! সে কণ্ঠে কী এক সুধা ঝরিত! পথের লোক বিভোর হইয়া গান শুনিতে দাঁড়াইত। রাধানাথও পথে দাঁড়াইয়া গান শুনিত, কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইত না। তাহার সাধ হইত একবার সে মতীবাইএর সম্মুখে বসিয়া তাহার গান শুনে। অনেকবার সে মতীবাইএর বাটীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে,—কিন্তু দ্বারবানের সেই বিশাল গালপাট্টা জোড়াটি বেচারীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

ইলেক্‌ট্রিক্‌ ফ্যানের তলায় মখমল-মণ্ডিত কোমল সোফায় বসিয়া মতীবাই ভাবিতেছিল, "গোলাপ যখন ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার সৌন্দর্য্য-সম্পদে চারিদিক ভরিয়া যায়—তাহার অঙ্গের সুবাস মাখিয়া মৃদু সমীর ঘুরিয়া বেড়ায়, লোকে তখন তাহাকে পাইবার জন্য লালায়িত হয়—কেহ বা তাহার ঘ্রাণটুকু লইয়া আনন্দ উপভোগ করে, কেহ বা তাহাকে বৃন্ত-চ্যুত করিয়া বক্ষে ধারণ করে, তখন তাহার আদরের আর সীমা থাকে না। তারপর যখন সে বাসি হইয়া মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তাহার সুন্দর কোমল পাপড়িগুলি যখন একে একে ঝরিয়া পড়ে—তখন তাহার কী দশা হয়? তখন লোকে তাহাকে পথে ফেলিয়া দেয়। সে তখন শত জনের পদদলিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন ধূলি-ধূসরিত-দেহে পথের মাঝে কাঁদিয়া বলে "ওগো তোমরা একবার আমায় দেখ।" কিন্তু তখন তাহার কাতর ক্রন্দনে কাহারো হৃদয় টলে না—কেহ তাহার পানে ফিরিয়াও চাহে না! নিষ্ঠুর ঝড়ুদার ঝাঁটাইয়া তাহাকে ময়লার গাড়িতে তুলিয়া ধাপার মাঠে চালান দেয়, সেইখানে তাহার সমাধি হয়! সেই বাসি ঝরা-ফুলের মতো আমাকে একদিন কাঁদিতে হইবে। আমার এ রূপ-যৌবন কিছুই চিরকালের জন্য নয়! আজ যাহারা আমায় দেখিয়া মুগ্ধ, কাল তাহারাই আমায় পায়ে দলিবে! হা ভগবান্‌! কেন আমাকে এ পথে আনিলে? আমার স্বামী—সে আমাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছিল—কিন্তু তখন আমি নববিবাহিতা বালিকা—লজ্জায় সে ভালোবাসার একবিন্দু প্রতিদান দিতে পারি নাই! যাহার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া আমাকে এ পথে আসিতে হইয়াছে—সেই দুর্ব্বৃত্ত জমীদার-পুত্র কালীকুমার—সে আজ কোথায়? তারপর বিদ্যুৎকুমার, চম্পকলাল তাহারাও ফতুর হইয়া বিদায় লইয়াছে। আমি শিখিয়াছি কী? অর্থ!—আর চটুল নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষ—প্রাণের বেদনা চাপিয়া রাখিয়া মুখে হাসির তরঙ্গ তুলিতে! আর না—কাহার জন্যই বা এ অর্থ! এ অর্থে কি হইবে!" সোফায় মুখ গুঁজিয়া সে ভাবিতেছিল "প্রাণটা যাহার জন্য থাকিয়া থাকিয়া এখনো কাঁদিয়া উঠে একবার যদি তাহাকে পাই! বৃথা আশা! মূঢ় এ কল্পনা!" মতীবাই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাকের উপর হইতে এক খানি ক্ষুদ্র ফটো আনিয়া নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিল। তারপর উহা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অলস ভাবে সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল।

দারবান আসিয়া সংবাদ দিল, জমিদার হরেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন।

মতীবাই রুক্ষস্বরে কহিল, "যানে বোলো—ফুরসুত নেই।"

দ্বারবান মতী বাইএর মুখে এমন কথা পূর্ব্বে কখনো শুনে নাই ; বিস্মিত-ভাবে সে বলিল, "জমিদার বাবু!"

মতীবাই বিরক্তভাবে কহিল—"জমিদার বাবুকো যানে বোলো।"

দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহাতে জমিদার বাবু ক্ষুণ্ণ হইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

একঘণ্টা পরে দ্বারবান আসিয়া একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের আগমন সংবাদ জানাইল। মতীবাই কি ভাবিয়া তাহাকে আনিতে আদেশ দিল।

ভদ্রলোকটি মতীবাইএর কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মতীবাই ভাবিল, কে এ জংলা লোকটা—আদব কায়দা কিছুই জানে না। বিরক্তির সহিত সে কহিল, "আপনি এখানে কাকে চান্?—কি মনে করে এসেচেন?"

"আমি আপনার কাছেই এসেছি—কেবল দুটো গান শুনতে।"

বিস্মিতভাবে মতীবাই কহিল—"অ্যাঁ, গান শুন্‌তে! আমার গানের যে দাম ঢের, আপনি কি তা দিতে পারবেন?"

"আজ্ঞে না—আমি বড় গরীব—রোজ এই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমি আপনার গান শুনে মোহিত হয়ে যাই—আজ অনেক চেষ্টা করে' আপনার সামনে বসে দুটো গান শুন্‌তে এসেছি।"

"অ্যাঁ, গরীব—গরীবের এখানে আশা কেন?"

"তবে যাই!"

মতীবাই দেখিল লোকটা নিতান্ত সাদা-সিধা ধরণের। মনে কোনো কোর-কাপ নাই, ভাবিল বেচারা বড় আশা করিয়া দুইটা গান শুনিতে আসিয়াছে! আহা! ইহাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। সে বলিল "না আর যেতে হবে না, এখানে বসুন, আপনি কি গান-টানের চর্চ্চা করেন?"

রাধানাথ একখানি সোফার এক কোণে কোনোমতে একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া বলিল, "ছেলে বেলায় গান বাজনার সখ্ ছিল বটে।"

"তা বেশ—আমি এই হারমোনিয়মে সুর দিই, আপনি একটা গান। আমি না হয় তার পরে গাইব।"

"তা কি হয়? আমি কী গাইব! আমার গলা—"

"তাতে কি—আপনাকে একটা গাইতেই হবে—না গাইলে আমিও গাইব না।"

"আচ্ছা আগে আপনি একটা গান্—তারপর আমি—"

মতীবাই আর কথা কাটা-কাটি না করিয়া একটা গান ধরিল। রাধানাথ কেবলই ভাবিতে লাগিল, আজ যদি সে তাহার বেহালাখানি আনিত—তাহা হইলে সে আপনার কেরামতি দেখাইয়া মতীবাইকে বিস্মিত করিয়া দিত! হায়, আজ তাহার জীবনের এমন দিনটা এক বেহালার অভাবে বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। মতীবাইএর গানের সুরে আজ যদি সে বেহালার সুর মিলাইয়া দিতে পারিত!

রাধানাথ ঘরের চারিদিকে চাহিতে লাগিল যদি সে একখানা বেহালা পায়!

মতীবাই গান শেষ করিয়া রাধানাথের প্রতি চাহিল—রাধানাথ সলজ্জ ভাবে জড়-সড় হইয়া বসিল।

মতীবাই রাধানাথের হাবভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"আমি ওসব শুন্‌চি না—একটা গাইতেই হবে।"

রাধানাথ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া দুইবার ঢোক গিলিয়া একবার কাসিয়া গান ধরিল ;—

আমার দুখের কথা কেউ শুনো না গো,
ব্যথা পাবে দুঃখ-অজানা প্রাণে
আজ তারা লয়ে সব সরে যারে নিশি
নহিলে অন্ধ হবি আমার এ আঁধার গানে।
বুকে বুকে মুখ গলে গল বাঁধি
বিহগ বিহগী ঘুমরে আজ,
বন ভুম ছায়া রাখ গো লুকায়ে
তরু-লতাগুলি হৃদয়-মাঝ।
নিশি-জাগা চাঁদ আজি অভিসারে
এস না, এ নীল গগনে ধেয়ে।
জগতের তরে যে যাতনা আছে
ফেল গো আমার জীবন ছেয়ে।

রাধানাথের গলা যাহাই হউক, গানটি সে প্রাণ দিয়া গাহিতে লাগিল। গানের সুর করুণ হইতে করুণতর হইয়া মতীবাইএর প্রাণের তারে গিয়া আঘাত করিতেছিল। মতীবাই চঞ্চল হইয়া উঠিল—বেদনা-ভরা হৃদয়ের

কী কাতর করুণ ক্রন্দন—নৈরাশ্যের কী ভীষণ দাহ! মতিবাই এ সুর যে এক দিন শুনিয়াছিল—কিন্তু কবে—কোথায়—তাহা তাহার কিছুই মনে পড়ে না। গান শেষ হইলে মতীবাই গানের ও সুরের অনেক প্রশংসা করিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়ের নিবাস কোথায়, কি নাম, জান্‌তে পারি কি?"

"আমার নাম শ্রীরাধানাথ শর্ম্মা—নিবাস মুক্তাগাছি—এখন কলিকাতা।"

রাধানাথ! নামটা শুনিয়া মতীবাই কাঁপিয়া উঠিল। মুক্তাগাছি! তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তখনি আপনাকে সংযত করিয়া সে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অপরাধ নেবেন না—আপনি কি বিবাহিত?"

বিস্ময়-সূচক স্বরে রাধানাথ কহিল,—"বিবাহ! বিবাহ আমার হ'য়েছিল বটে কিন্তু—"

রাধানাথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মতীবাই কহিল "কিন্তু কি—কোথায় বিবাহ হ'য়েছিল?"

"আমার বিবাহ হয়েছিল অশোকপুরে—রূপে গুণে লক্ষ্মী—নাম ছিল তার মালিকা—কিন্তু আমার ভাগ্যে সে সুখ সৈবে কেন?"

কে যেন মতীবাইএর অন্তরে সূচিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল, তাহার প্রাণের মধ্যে কে যেন সপাৎ করিয়া চাবুক বসাইয়া দিল। তাহার মাথার মধ্য দিয়া যেন অগ্নিকণা ছুটিতে লাগিল। তবুও সে আপনাকে হারাইল না। চোখে মুখে একটু জল দিয়া বলিল—"তারপর?"

রাধানাথ একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তারপর আর কি শুনবেন—এক বৎসর পরে এক দিন আমি তাকে আন্‌তে অশোকপুরে গেলুম—সেখানে গিয়ে শুনলুম, সে তার মাসীর বাড়ি গেছে—শ্বশুরমশাই বল্‌লেন পরদিন সকালেই তিনি তাকে আন্‌তে যাবেন—এনেই আমার বাড়িতে রেখে যাবেন; কাজেই আমি চলে এলুম—এক সপ্তাহ পরে শ্বশুর মহাশয়ের একখানা চিঠি এল, চিঠিখানা খুলে দেখি—" রাধানাথ আর বলিতে পারিল না, তাহার স্বর জড়াইয়া আসিল—সে মস্তক নত করিয়া রহিল।

মতীবাই রাধানাথের অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া বলিল,—"চিঠিতে কি লেখা ছিল?"

রাধানাথ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল,—"চিঠিতে লেখা ছিল মালিকা তার মাসীর বাড়িতে কলেরায় মারা গেছে।"

মতীবাই দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া নির্ব্বাক নিস্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল "তার পর আপনি কি করলেন ?"

"আমার এ দুঃখের কাহিনী আপনাকে বলে—আপনার সরল প্রাণে ব্যথা দিতে আমার আর ইচ্ছা নেই ।"

"না না আমার শুনতে বড় সাধ হচ্চে, বলুন না, দুঃখের কথা অপরকে বল্‌লে প্রাণটাও অনেকটা হাল্কা হয় ।"

"তা হয় বটে—তবে শুনুন—ঘরে আমার রুগ্না মা ছিলেন, এ সংবাদে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। তার পর ঘর বাড়ি বেচে আমি একদিকে চলে গেলুম।"

মতীবাইএর প্রাণটা হু-হু করিয়া উঠিল—সে তাহার বক্ষ সবলে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নিতান্ত এলো-মেলোভাবে গৃহ-মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিল, পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "আপনি কেন আর বিবাহ কর্‌লেন না?"

রাধানাথ বিরক্তির স্বরে কহিল—"বিবাহ? আবার বিবাহ! যদিও মালিকা আমার কাছে আট দিন মাত্র ছিল—সেই আট দিনেই আমি তাকে আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলুম—কে জানতো এমন হবে! সেও আমাকে ভালোবেসেছিল, যাবার সময় আমার ফটোখানিকে সে চোখের জলে ধুয়ে বুকে ক রে নিয়ে গেল। সেই পবিত্র অশ্রু-কণার মধ্যে আবার মিলনের একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আবেগ যেন উজ্জ্বল-মধুরভাবে ফুটে উঠেছিল। তাই বলি যার স্মৃতি আজ আমার হৃদয়-মন্দিরে জাগ্রত দেবীর ন্যায় স্থির অচঞ্চলভাবে পূর্ণ করে রেখেছে—আজ কি না আবার একটা বিবাহ করে, যে ভালোবাসা একবার দান করেছি সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে এনে তাকে উপহার দেব—আর আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সিংহাসন-চ্যুত করবো—না, তা পারবো না, স্বপ্নেও তা মনে হয় না—আমি বেশ আছি।"

মতীবাইএর বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ ক্রন্দন ফাটিয়া বাহির হইবার জন্য তাহার প্রাণের দ্বারে বার বার সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল যে সে একবার রাধানাথের পায়ের তলায় কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িয়া বলে, "ওগো আমার প্রাণের দেবতা, একবার বল তুমি আমায় ঘৃণা করবে না—আমিই তোমার সেই মালিকা—চিরকাল তোমার দাসী হয়ে থাক্‌বো।" কিন্তু মুখে কোনো কথাই সে বলিতে পারিল না—পাছে সে ঘৃণা করে—পাছে ঘৃণায় সে সরিয়া যায়। বাঁধ ভাঙিয়া নদীর জল যখন

ছুটিয়া আসে, তখন যেমন তাহার সম্মুখে যাহা কিছু পড়ে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়; তেমনি হঠাৎ মতীবাইএর মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেল এবং সম্মুখে যাহা কিছু পড়িল খরস্রোতে সব ভাসিয়া গেল—সে আর মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিল না, চঞ্চল-পদে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। তখন প্রবল বন্যার ন্যায় দুই চক্ষু গণ্ড ও বক্ষ বহিয়া অজস্র অশ্রুবারি ঝরিয়া পড়িতেছিল। বালিশে মুখ লুকাইয়া সে প্রাণভরিয়া খানিকটা কাঁদিয়া লইল। রাধানাথ কিছুই বুঝিল না, সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মতীবাই ফিরিয়া আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "আপনি কলকেতায় কি কাজ করেন?"

"একটা ছাপাখানায় সামান্য কাজ করি।"

"আজ থেকে আপনি আমার গান শেখাবার ওস্তাদ হলেন। এই এক মাসের মাইনে আগাম নিন। কাল ঠিক এমনি সময় দয়া করে আসবেন।"

"আপনি বলেন কি! আমি আপনাকে গান শেখাব! দয়া করে যদি অনুমতি করেন, তাহলে মাঝে মাঝে এসে বরং আপনার গান শুনে যাব।"

"না না সে কথা আমি শুনব না" বলিয়া মতীবাই রাধানাথের হাতে এক তাড়া নোট গুঁজিয়া দিল।

রাধানাথ নোটের তাড়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; "ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি যা পাই, তাতেই আমার বেশ চলে যায়। কোনো অভাব থাকে না!"

মতীবাই বুঝিল সে দেবতা, পতিতা রমণীর টাকা সে লইবে কেন? সে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে কহিল—"দয়া করে কাল একবার আসবেন।" তাহার মুখ নিতান্ত মলিন—বিবর্ণ!

রাধানাথ সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

মতীবাই তখন তাহার পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, যেন সে গুপ্ত ভাবে রাধানাথের অনুগমন করিয়া এখনই তাহার বাটীর সন্ধান লইয়া আসে।

রাধানাথ সত্য-পালনে ত্রুটি করিল না। যথা নিয়মে মতীবাইএর বাটীতে গান শুনিবার জন্য পদার্পণ করিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন রাধানাথ আসিল না। মতীবাই অস্থির হইয়া উঠিল। একটা অনিশ্চিৎ দুর্ভাবনায় তাহার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কেন সে আসিল না? সে কি তবে তাহাকে মালিকা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে? তাহাও কি সম্ভব! না, তাহা হইতেই পারে না। তবে কি তাহার কিছু হইয়াছে, সে আর ভাবিতে

পারিল না। শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে কেবলই তোলা-পাড়া হইতেছিল, কেন একবার মুখ ফুটিয়া সে বলিল না, ওগো তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার সেই মালিকা, আমাকে দাসী বলিয়া তোমার চরণে একটু স্থান দাও। আমাকে এ দাহের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ কর।

প্রভাতে উঠিয়াই মতীবাই রাধানাথের খবর আনিতে দাসীকে পাঠাইয়াছিল। ঘণ্টা দুই পরে দাসী ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"দিদিমণি, লোকটার বড় অসুখ দেখে এলুম।"

দাসীর মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিতভাবে মতীবাই কহিল "আঁা, অসুখ! বলিস কি সৈরভী? কি হয়েছে তার?"

"বসন্ত হয়েছে গো। সেগুলো আবার ভালো করে বেরোয় নি—যাতনায় কাটা ছাগলের মতো সে ছটফট্ করছে—কাছে জনপ্রাণী নেই—সে ত্রিসীমা অবধি কেউ মাড়ায় না। আহা, বেচারির কেউ নেই গো—কেউ নেই! ওগুলো যদি ভালো হয়ে না বেরোয় তা হলে আর বাঁচতে হবে না। শিবের অসাধ্য রোগ।" মতীবাই ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর সৈরী—আর বকতে হবে না।" মতীবাই বুকের মধ্যে রুদ্ধ বেদনা চাপিয়া রাখিয়া কোচম্যানকে গাড়ি জুতিবার আদেশ দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে একখানা জুড়ী-গাড়ি আসিয়া রাধানাথের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে মতীবাইকে অবতরণ করিতে দেখিয়া পাড়ার লোক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল—তার পর যখন সে দাসীর সহিত রাধানাথের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন এক বর্ষিয়সী রমণী আসিয়া কহিল "ও ঘরে যাবেন না, মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে।"

মতীবাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া উদ্বেলিত-হৃদয়ে রাধানাথের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দাসীকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। সে মতীবাইএর ইঙ্গিতে দরজাটি টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মলিন শয্যায় পড়িয়া যাতনায় রাধানাথ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সহসা মতীবাইকে সম্মুখে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরে সে ধীরে ধীরে কহিল "আপনি! আপনি এখানে কেন এসেছেন? এই অভাগার কুটীরে কেন এলেন? কাল থেকে সকলে আমায় ত্যাগ করেছে—আমার কেউ নেই।" রাধানাথের চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল, সে মতীবাইএর মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মতীবাইএর প্রাণের দর্পণে রাধানাথের সেই কাতর চাহনির প্রতিবিম্ব পড়িতেছিল। রুদ্ধ আবেগ তখন শ্রাবণের ভরা নদীর ন্যায় দু'কুল ছাপাইয়া উথলিয়া উঠিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া রাধানাথের মস্তক আপনার কোলে টানিয়া লইয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিল "কেন! কেন তোমার কেহ থাকবে না—এই যে আমি রয়েছি।"

"আপনি আর-জন্মে আমার কে ছিলেন," বলিয়া রাধানাথ একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিল।

"আর জন্মে কে ছিলাম জানি না, তবে এ জন্মে—"মতীবাইএর স্বর বাধিয়া গেল- সে একবার ঢোক গিলিয়া একটু পরে আবার কহিল "এ জন্মে আমি তোমার স্ত্রী—তোমার মালিকা—অভাগিনী পতিতা মালিকা—আমি মরি নি—বেঁচে আছি। আমাকে কি তোমার চরণে একটু স্থান দেবে না?" মালিকা রাধানাথকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিল। অজস্র অশ্রুপাতের মধ্যে, সে আজ যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিল, তাহা সে সারা জীবনে কখনো খুঁজিয়া পায় নাই। সহস্র চাটু স্তুতি, লক্ষ আদর সোহাগ, অর্থ ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও এমন সুখ কখনো মিলে নাই!

রাধানাথ মালিকার মুখের পানে চাহিয়া বলিল,- "অ্যাঁ, তুমিই আমার মালিকা—আমার প্রাণের মালিকা—" তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল!

"হাঁ আমিই তোমার মালিকা—এই দেখ তোমার সেই ফটো, এ ফটো কখনো ছাড়তে পারিনি" বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া সে রাধানাথের হস্তে দিল।

রাধানাথ ফটোখানির প্রতি একবার ক্ষীণ দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল।

তিন দিন কোনোরূপে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিনে সন্ধ্যার সময় রাধানাথ মালিকার কোলে মাথা রাখিয়া সংসারের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। তখন চারিধারে আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল।

* * * * *

এই ঘটনার পর মতীবাইকে আর কেহ কখনো দেখে নাই, তাহার কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

কুশদহের ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুশদহ যে অতি প্রাচীন স্থান, এক সময়ে অনেক সিদ্ধ পুরুষ এখানে বাস করিতেন তাহা যে কেবল প্রবাদেই পাওয়া যায় এরূপ নহে। তিন শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে পাটনায় বিজ্জন দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবরণীতে টাকী ও কুশদহের অনেক কথা পাওয়া যায় এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সে পুঁথি আমরা দেখি নাই। সুতরাং মতামত প্রকাশে সমর্থ নহি। কিন্তু কুশদহের কৃষ্ণ সিদ্ধান্তকে যে প্রতাপাদিত্য গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে। প্রবাদ-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রতাপের গুরু ছিলেন। যথা—

যশোহর পুরী কাশী দীর্ঘিকা মনিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কাল ভৈরবঃ॥

কুশদহের অন্তর্গত ইছাপুরের হড় চৌধুরী বংশের—আদিপুরুষ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রতাপপুর নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে গুরু-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ও রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ অভিন্ন ব্যক্তি কি না—আমরা পরে আলোচনা করিব। আধুনিক চব্বিশ পরগণা ও যশোহর জেলার ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে কুশদহের প্রাচীন প্রবাদ সংগ্রহ যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ আমরা কুশদহের বংশগুলির কতকটা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

কুশদহ মুসলমান রাজত্বকালেও ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান ছিল। যশোহর ও চব্বিশ পরগণার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ব্রাহ্মণগণের স্থান অতি উচ্চে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বেনাপোল ও ব্রাহ্মণনগরের (লাউজানীর) গুড় বংশ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণনগর ধ্বংসের পর তাঁহারা নানা স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বেনাপোল ধ্বংসের পর গুড় বংশীয় কেহ কেহ

কুশদহে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কুশদহের অন্তর্গত বনগ্রামের প্রাণনাথ রায় গুড় বংশীয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কুশদহের গুড় বংশের বংশলোপ ঘটিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোহর জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে গুড় বংশীয়েরা অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইছামতী-তীর হইতে ভৈরব নদ পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থানেই তাঁহাদের প্রভুত্ব ছিল। সুতরাং নবাব খাঁ জাহান আলি ও তাঁহার উজির মহম্মদ তাহের তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। মহম্মদ তাহের ব্রাহ্মণের পুত্র। মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নবাব খাঁ জাহান আলির উজির হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে গুড়-বংশের জয়দেব ও কামদেব চৌধুরী চাকরী করিতেন। প্রবাদ আছে রোজার সময় একটি নেবু লইয়া মহম্মদ তাহের আঘ্রাণ লইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ জয়দেব তাহাতে "ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। কাজেই মহম্মদ তাহের মনে মনে প্রতিশোধ লইবার অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল, রোজার পর ইদ। ইদের সময় বহু মুসলমানকে ভোজন করানো হইয়া থাকে। নবাব-বাটীতে তাহার আয়োজন হইল। এবং সেই দিন সর্ব্বসাধারণ প্রজা আহ্বান করিয়া একটি দরবার করিবার আদেশ করা হইল। আহুত ব্যক্তিগণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অমেধ্য রন্ধনের ঘ্রাণ পাইয়া পলায়ন করিলেন। রাজকর্ম্মচারী জয়দেব কামদেব সভাস্থলে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। তখন কূটবুদ্ধি মহম্মদ তাহের তাঁহাদের নাকে হাত দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন বলিয়া প্রতিশোধ লইলেন। সেই দিন জয়দেব কামদেব মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাদের নাম কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ চৌধুরী হইল। ঘটকের পুঁথিতে দেখা যায়—

খান্ জাহান্ মহামান পাদশা নফর।
যশোরে সনন্দ ল'য়ে করিল সফর॥
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির॥
পূর্ব্বেত আছিল সেও কুলীনের নাতি।
মুসলমানী-রূপে মজে হারাইল জাতি॥
পীর আলী নাম ধরে পিরল্যাগ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হল সর্ব্বনাশ॥

সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজির।
চেঙ্গুটিয়া পরগণায় ছাড়িল জিগীর॥
গুড়বংশ-অবতংশ রায় রাঁয়ে ভাতি।
অর্থলোভে কর্ম্মদোষে মিলিল সংহতি॥
ধনবলে কৈল ভ্রম হৈল উচ্চ মাথা।
নানাজনে রটাইল নানা কুৎসা কথা॥
আঙিনায় বসে আছে উজির তাহির।
কত প্রজা লয়ে ভেট করিছে হাজির॥
রোজার সেদিন পীর উপবাসী ছিল।
হেনকালে একজন নেবু এনে দিল॥
গন্ধামোদে চারিদিক ভরপুর হইল।
বাহবা বাহবা বলি নাকেতে ধরিল॥
কামদেব জয়দেব পাত্র দুই জন।
বসে ছিল সেই খানে বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে।
ঘ্রাণেতে অর্দ্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে॥
কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির।
গোঁড়ামী ভাঙিতে দোঁহের মনে কৈল স্থির॥
দিন পরে মজলীশ্ করিল তাহির।
জয়দেব কামদেব হইল হাজির॥
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন।
শতশত বকৃরি আর গোমাংস রন্ধন॥
পোলাও লশুন গন্ধে সভা ভরপূর।
সেই সভায় ছিল আরো ব্রাহ্মণ প্রচুর॥
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
ফাঁকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল॥
কামদেবে জয়দেবে করি সম্বোধন।
হাসিয়া কহিল ধূর্ত্ত তাহির তখন॥
জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে।
ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে॥

নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি ত চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা॥
উপায় না ভাবিয়া দোঁহে প্রমাদ গণিল।
হিতে বিপরীত দেখি মরমে মরিল॥
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীর।
থতমত হয়ে দোহে হইল অস্থির॥
দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত।
পিরালী হইল তারা হইল জাতিভ্রষ্ট॥
কামাল জামাল নাম হইল দোঁহার।
ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ে গেল হাহাকার॥
তখন ডাকিয়া দোঁহে আলী খাঁ জাহান্।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান॥
সেই গোলে গুড়বাসে বিধিবিড়ম্বনা।
শত্রুগণে জাতি নাশে করিল জল্পনা॥
পিরালী অখ্যাতি দিল ঘ্রাণ মাত্র দোষ।
সর্ব্বদেশে রাষ্ট্র হল কুগ্রহের রোষ॥
সংসর্গে পড়িল যারা তারাও মজিল।
গুড় পিড়ালী দোষ বলি ঘটকে বুঝিল॥
কিছুকাল পরে তারা মার্জ্জিত হইল।
ঘটকের করুণায় সুঘর মিলিল॥
ধনে মানে হয়ে হীন কুটুম্ব স্বঘর।
সমাজে রহিল ঠেলা সেই বরাবর॥
পিরালী রহিল পড়ি কুলাচার্য্য ঘোষে।
রচিল পিরালী কথা নীলকান্ত শেষে॥”

যশোহর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে অনেক গুড়চৌধুরীর বাস। তাঁহারা এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এখনও তাঁহাদের অনেকের জমিদারী আছে। আয়ের লাঘব হইলেও দেশের মধ্যে তাঁহাদের মান সম্ভ্রম যথেষ্ট আছে। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রভাব তাদৃশ বিস্তৃত না হওয়ায় তাঁহারা এ পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অনেক সৎকুলীন এই গুড়বংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু যখন এই চৌধুরী মহাশয়েরা আপনাদিগকে জয়দেবের

সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তখন তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে বজায় আছে বুঝিতে পারা যায় না। যদি এরূপ মনে করা যায় যে জয়দেব চৌধুরী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে, তাঁহার যে সকল পুত্র হইয়াছিল তাহারা পিতার সহিত মুসলমান হন নাই, তাহাও বলা যায় না। সিঙ্গি নামক মহাল জায়গীর পাইয়া জয়দেব ও কামদেব গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব বাটী হইতে আপন আপন পরিবার ও সন্তানাদি আনাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। জয়দেবের ভ্রাতা শুকদেব ভিন্ন আর কেহ স্বধর্ম্মে ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় না। তাঁহাকেও সংস্রব দোষের জন্য অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনিও পিরালী থাকের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং জয়দেব চৌধুরীর কোন পুত্র বাটীতে থাকিলে তিনিও পিরালী থাকে পড়িয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই কারণে সৎকুলীনগণ গুড়বংশে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। ঘটক ও কুলীনদিগকে পরে অর্থে বশীভূত করিয়া অথবা ভূমিদানে বাধ্য করিয়া চৌধুরী মহাশয়েরা আপনাদের পিরালী দোষ মার্জ্জিত করিয়া লইয়া থাকিবেন। অথবা চৌধুরী মহাশয়েরা জয়দেব চৌধুরীর সন্তান না হইয়া তাঁহার অপর কোন ভ্রাতার সন্তান হইবেন। কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? যখন ঘটকের পুঁথিতে তাঁহাদিগকে জয়দেবের সন্তান বলা হইয়াছে তখন সেরূপ অনুমান সঙ্গত হইতে পারে না।

যাহা হউক নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে জয়দেবের সন্তান কেহ মুসলমান না হইয়া থাকিলেও তিনি পিরালী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে কুলীন ও ঘটকগণের অনুগ্রহে তাঁহার উত্তর পুরুষেরা মার্জ্জিত হইয়া থাকিবেন। বোধ হয় এই জন্য কোন কুলীন সহজে গুড় দোষ স্বীকার করিতে চাহেন না। এবং সুব্রাহ্মণও গুড়গৃহে জলগ্রহণে ইতস্ততঃ করেন। যাহা হউক এক সময়ে যে গুড় চৌধুরীগণ যশোহরের রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল তারকা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সরমা

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার প্রায় দশবৎসর পরে একদিন সকাল বেলা একটি শাদা ঘোড়ায় চড়িয়া একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার আসিয়া ডাক্তারখানা খুলিবার জন্য একটি বাটীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তেমন সুবিধাজনক রাস্তার উপর খালি বাটী কোথায় পাইলেন না, অবশেষে হরিপদর বাটীর সম্মুখে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বিষণ্নমনে কি ভাবিতেছিলেন। বাটীতে চাবি বন্ধ দেখিয়া নিকটস্থ একটি ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "মশাই এ বাড়িটি কার ?"

"আপনার প্রয়োজন কি ?"

"আমার প্রয়োজন আছে—আমি বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে' দেশে এসেছি, বিলেতের হাঁসপাতালে অনেক দিন কাজ করেছি। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, এবং আমেরিকাতেও কিছুদিন ছিলাম, সেখান থেকে ডাক্তারি সম্বন্ধে অনেক নতুন তত্ত্বও শিখে এসেছি, সম্প্রতি কলকেতায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। কিন্তু কলকেতায় ডাক্তারের বিশেষ অভাব নেই, সেই জন্যে আমি সহরতলীতে থেকে একটি ভালো ডাক্তারখানা খুলতে মনস্থ করেছি।"

"বেশ আপনার উদ্দেশ্য খুবই ভালো, আপনার মতো একজন পারদর্শী ডাক্তারের এখানে বিশেষ অভাব আছে—অপনার পশার বৃদ্ধি শীগ্‌গির হ'বে।"

"সে আপনাদের অনুগ্রহ। এই বাড়িটার কিছু খবর বলতে পারেন কি ?"

"আপনি কি ঐ বাড়িতে ডাক্তারখানা খুলতে ইচ্ছা করেন ?"

"মন্দ হয় না, রাস্তার ধারে বাড়ি—আমার এই রকম একটা বাড়ি হলেই চলবে। এ বাড়িটি কার বলতে পারেন কি ?"

"পারি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি, বলুন না।"

"দেখুন আমি ভদ্রলোক, মুখে এক কথা আর পেটে এক কথা রাখি না—আপনাকে বিপদগ্রস্ত কর্‌তে আমার ইচ্ছে নেই।"

"ব্যাপারটা কি একটু ভালো করেই বলুন না।"

"ব্যাপারটা কি জানেন মশাই, তবে খুলে বলি, মনে কোরবেন না যে আমি

ভাংচি দিচ্চি, ঐ বাড়িটা ভয়ানক ভূতুড়ে বাড়ি, ঐ বাড়ির জ্বালায় আমরা শশব্যস্ত ; রাত্রে বাইরে বেরুতে ভয় হয়।”

ডাক্তার সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—“সেকি মশাই ভূতটুত আমরা বিশ্বাস করি নে—এরি জন্যে এত কিন্তু কচ্ছিলেন।”

“আপনি কি মনে করেন যে, আপনি ঐ বাড়িতে থাকতে পারবেন।”

“থাকতে না পারবার তো কোনো কারণ দেখি না, ভূতে আমার বিশ্বাস নেই।”

“আচ্ছা তবে বলি,—দেখুন ঐ বাড়িটা হচ্ছে হরিপদ শর্ম্মার—সে বর্ম্মায় চাকরি করতো বারো তেরো বৎসর পূর্ব্বে শোনা যায়, সে পরিবার নিয়ে চাকরি-স্থলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অবধি আর ফেরে নি, কোনো খবরও পাওয়া যায় নি ; বোধ হয় জাহাজ-ডুবি হয়ে মরে গিয়ে ভূত হয়ে এখানে এসেছে। তার মা ভূতের উপদ্রবে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এ বাড়ির ত্রিসীমায় আর কেউ যায় না। দেখচেন না বাড়িটির অবস্থা—ছাদে অশত্থ গাছ বসেছে, উঠানে এক গলা বন হয়েছে। আর রাত্রে ভূতে নেত্য করে। বাবা, ওবাড়িতে মানুষ থাকতে পারে! বাড়ি যেন হাঁ হাঁ খাঁ খাঁ কচ্চে।”

ডাক্তার একটি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“বাড়িটা অবশ্য মেরামত করাতে হবে—বন জঙ্গল কাটাতে হবে—আর আপনি যা ভূতের কথা বলচেন তার ওষুদ আমি জানি—সে যত বড়ই ভূত হোক না কেন দুদিনে পালাবে।”

যদি আপনি “ভূত তাড়াতে পারেন, তাহলে আমাদেরও বিশেষ উপকার করা হয়। এই ভূতের জন্য রাত্রিতে আমরা বাড়ির বার হতে পারি নে।”

ঘোড়ায় চড়িয়া একজন সাহেব ভদ্রলোকের সহিত বাংলায় কথা কহিতেছে শুনিয়া যাহারা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল তাহারা ঐখানে দাঁড়াইল। এই বিলেত-ফেরত যুবকটিকে দেখিলেই সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। ইঁহার হ্যাট, কোট, ঘড়ী, চেন, চশমা, নেকটাই দস্তানা সমস্তই ছিল। সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কথা-প্রসঙ্গে সকলেই বুঝিল ইনি একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তার, এই ভূতুড়ে বাড়িটাতে ডাক্তারখানা খুলিতে ইচ্ছা করেন।

সকলেই আগ্রহ সহকারে বলিল,—“আপনার মতো একজন ডাক্তার আমাদের পল্লীতে থাকেন ইহা সকলেরই একান্ত প্রার্থনীয়।” একজন কহিল,—“হরিপদর মা এই বাড়িটা বিক্রী করবার জন্যে কতই না চেষ্টা করেছিল কিন্তু কেউ এই বাড়ি নিতে সম্মত হয়নি। তা দেখুন যদি আপনি এই বাড়িটাকে বাসোপযোগী করতে

পারেন তাহলে ভালোই হয়। এই বাড়িটি আমাদের একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমরা পাঁচজন থেকে না হয় দরজা খুলে দিচ্চি, আপনি মেরামত করান, বন জঙ্গল কাটান, দু'চার দিন বাস করে দেখুন—যদি থাক্‌তে পারবেন বিবেচনা করেন, তা হলে হরিপদর মার সঙ্গে দেখা করে একটা বন্দোবস্ত করে নিলেই হবে। সেও এই বৃদ্ধবয়সে কিছু টাকা পেলে পরম আপ্যায়িত হবে।

ডাক্তার একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল,—"জানিলাম আপনারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এই বাড়ির দরজায় এখনো তালা চাবি বন্ধ। তালা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করা অসঙ্গত ও আইনের চক্ষে অনধিকার-প্রবেশ। অন্তত যাঁর বাড়ি তাঁর একবার মত নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত। হরিপদবাবুর মা এখন কোথায় থাকেন আপনারা কেউ কিছু বলতে পারেন কি?"

একজন বলিল "আমি ফুলীর মার নিকট শুনেছিলুম—তিনি নাকি গোপালপুরে বামুনদিদির (তাঁহার এক সম্পর্কে বোন) বাড়ি থাক্‌তেন—সে আজ অনেক দিনের কথা।"

"কত দিন?"

"আন্দাজ ন' দশ বৎসর।"

রাস্তায় ক্রমশ ভিড় হইতেছে দেখিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহাকে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন।

ডাক্তার সাহেব আসিয়া বসিলেন, সঙ্গে কতিপয় ভদ্রলোকও আসিল, ঘোড়াটি একজন ধরিয়া রহিল।

ডাক্তার সাহেবকে বৈঠকখানায় বসাইয়া ভদ্রলোকটি কহিলেন "আপনি তামাক ইচ্ছা করেন কি?"

"আজ্ঞে না মশায়, আমি ও-রসে বঞ্চিত।"

"আপনি কি তবে গোপালপুর যেতে ইচ্ছা করেন?"

"মনে কর্‌চি কাল সকালে যাব, যদি খবরটা পাই।"

"তা বেশ যাবেন। মশায়ের নামটি জান্‌তে পারি কি?"

ডাক্তার একটু কি যেন ভাবিয়া বলিলেন,—"আমাকে সকলে ডক্‌টর বোনার্জি বলে' ডাকে।"

"ওঃ, ডাক্তার বেনার্জি? আপনার নাম তো কাগজে প্রায়ই দেখে থাকি, আপনি অস্ত্রচিকিৎসায় একজন অসাধারণ। আপনার speechটা কাগজে ছেপে বেরিয়েছিল আমরা পড়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।"

"কোন্‌টা বলুন তো ?"

"সেই যেটায় আপনি বলেছিলেন, একজনের মস্তিষ্ক তুলে নিয়ে অপর একজনের মস্তিষ্কে বসিয়ে দিয়ে ছুটি মানুষকে একেবারে বদলে দেওয়া যায়। কী অদ্ভুত! সত্যিই কি এরকম হয় মশাই ?"

"হয় বৈকি, আমেরিকায় এরকম অনেক case হয়ে গেছে।" "ডাক্তারি সায়েন্সের খুব improvement হয়েছে বলতে হবে।"

"সে কথা একশবার। ও সব যায়গায় অনেক চিন্তাশীল লোক আছেন যাঁহারা মাথা ঘামিয়ে পরীক্ষা করে অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আর আমরা নকল-নবিস, আমরা খালি সেইগুলি নকল করতে চেষ্টা করি, তাও সব caseএ successfull হতে পারি না।"

"ঠিক বলেছেন, আমাদের দেশের লোকের মাথাও নেই আর মাথা ঘামাবার শক্তিও নেই, যে কিছু নতুন জিনিস বার করে। এখন কিছু শিখতে হলেই ইংলণ্ড আমেরিকা জাপান ছাড়া আর গতি নেই।"

"সে কথা ঠিক, ওরা এখন আমাদের গুরুমশাই, ওদের কাছে শেখা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।"

"যাক্ সে কথা, আপনার পসারতো ইতিমধ্যেই বেশ জমে উঠেচে আপনার ভিজিট কত করেছেন ? আমরা কি আপনাকে কল দিতে পারব ?"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"আমার ভিজিট যদিও ষোলো টাকা কিন্তু আমি অসমর্থ পক্ষে অমনিই রোগী দেখে থাকি।"

"আপনি মহৎ লোক। আমার নাতনীটি আজ ক'দিন ধরে একজ্বরি হয়ে পড়ে রয়েছে যদি দয়া করে——"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি কহিল,—"সেকি কথা, দেখব বৈকি ; আগে কেউ দেখে ছিল কি ?"

"দেখছিল ঐ ক্ষুদিরামের ভাই নকু, সে দিনকতক ক্যাম্বেল কলেজে পড়ে এখন পাড়াতেই একটি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা খুলেছে। তেমন তো সঙ্গতি নেই যে ভালো ডাক্তার আনি।"

"তবে চলুন দেখে আসি।"

"ওরে গদা, বাড়িতে খবর দে, সাহেব ডাক্তার এসেচেন দেখতে যাবেন।"

দুই মুহূর্ত্ত পরে ভৃত্য গদাধর চন্দর ফিরিয়া আসিয়া বিনীতভাবে কহিল, "ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আসুন, খুকিকে দালানে এনে সোয়ানো হয়েছে।"

ডাক্তার আসিয়া টেরিস্কোপ দিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"এর ব্রোঙ্কোনিউমোনিয়া হয়েছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। সর্দ্দিটা উঠে গেলেই জরটা ছেড়ে যাবে। আমি এই দুটো ওষুধ লিখে দিচ্চি" বলিয়া নোট বুকের পাতা ছিঁড়িয়া একখানি প্রেসক্রপসন লিখিলেন এবং পুনরায় কহিলেন, "দেখুন এই উপরের ওষুধটা তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে, আর নীচের ওষুধটা বুকে-পিটে বেশ করে মালিস করে তূলো দিয়ে বেঁধে রাখবেন। কাল পরশু নাগাত আমি আবার এসে দেখে যাব।"

ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া প্রেসক্রপসন-হস্তে ভদ্র লোকটি বাহিরে আসিয়া কহিল, "মশাই আপনার দয়ার কথা আমরা ভুলতে পারব না।" ডাক্তার তাড়াতাড়ি কহিলেন, "সেকি কথা আমার দ্বারা মানবের এই উপকারটুকু যদি না হবে তবে আর ডাক্তারী শিখলুম কি করতে!"

" আপনার যেমন মন ভগবান তেমনি আপনার ভালো করবেন।"

" আমার প্রতি আপনাদের একটু স্নেহ-দৃষ্টি থাকলেই হবে।"

" যাতে আপনার এখানে আসা হয় সে বিষয়ে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব। আপনি এখন থাকেন কোথায়?"

"কলকেতায় আমার একটি বিলেত-ফেরত বন্ধুর বাড়িতে। বিলেতে আমরা এক বাসাতেই থাকতুম। ইনি সিভিল সার্ভিস্ পাস করে এসেছেন।"

ডাক্তারের গালে একটা কাটা দাগ দেখিয়া ভদ্রলোকটি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, " আচ্ছা আপানার বাঁদিকের গালে অত বড় ক্ষত চিহ্নটা কিসের?"

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন "ওটা আমার ডাক্তারি শিক্ষার একটা স্মৃতি চিহ্ন।"

" সে কি রকম।"

" বিলেতে আমি একটা প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় appear হই তাতে একটা ভালো prize ছিল আমার কতিপয় ইংরাজ সহপাঠী স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল যে ঐ prizeটা আমিই পাব তাদের ঈর্ষানল ক্রমে খুব জ্বলে উঠল আমি বাঙালী হয়ে এত বড় prizeটা পাব, আর তা'রা দেখবে তাদের সহ্য হল না। একদিন ষড়যন্ত্র করে কথাবার্ত্তা হতে হতে একজন হঠাৎ আমার গালে সজোরে ছুরি বসাইয়া দিল। এর ফলে আমাকে কিছু দিন হাঁসপাতালে থাকতে হল। আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। তা'রাও পরীক্ষা দিতে পারলে না।

একজনকে commecttee grevious hurt অপরাধে জেল খাটতে হ'ল বাকি কয়েক জনকে কলেজ থেকে রাষ্টিকেট করা হ'ল।"

"লেখা পড়াতেও এত বিপদ।"

"আমার অদৃষ্ট।"

ঘড়িতে টং টং করিয়া ৯টা বাজিল।

ডাক্তার কহিলেন, "মশাই আজ আসি, অনেক বেলা হ'ল ; আপনার সঙ্গে এরকম কথা-বার্ত্তা প্রায়ই হবে। মহাশয়ের নাম ?"

"আমার নাম অবিনাশচন্দ্র বসু।"

"মহশায়ের বিষয় কার্য্য কি করা হয় ?"

"পুর্ব্ববঙ্গে এক জমীদারের নায়েবী করে আজ পঁচিশ বৎসর কাটিয়ে দিলুম এখন এই বুড় বয়সে কার্য্য থেকে অবসর নিয়ে বছর পাঁচেক হ'ল এখানে এসেছি।"

অবিনাশ বাবুর মাথাটি এখন শাদা হইয়া গিয়াছে। একহারা ছিপছিপে মানুষটি দেখিলেই মনে হয় সর্ব্বদা মনের মধ্যে প্যাঁচ আটিতেছেন। সার্থসিদ্ধিই যেন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

ডাক্তার অবিনাশবাবুর নিকট বিদায় লইয়া যে লোকটি ঘোড়াটা ধরিয়াছিল তাহাকে কিছু দিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন ; এই সময় একজন লোক ডাক্তারকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "আপনার দয়ার সীমা নেই।"

ডাক্তার একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"কি করতে হবে বলুন।"

"আমার স্ত্রীটি আজ সতেরো দিন জ্বরে ভুগছেন, আপনাকে ডাকবার ক্ষমতা আমার নেই যদি দয়া করে———"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার কহিলেন "তার আর কি চলুন।"

আর এক জন কহিলেন,—"মশাই আমার একটি নিবেদন আছে, আমার ভাইটি আজ———"

ডাক্তার ব্যাপার বুঝিয়া তখনই কহিলেন—"হবে, তার জন্যে আর চিন্তা কি, আসুন আমার সঙ্গে।" কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন এইরূপে ডাক্তারি করিতে হইলেই অল্প দিনেই তাহার হাড়ে দূর্ব্বা গজাইয়া যাইবে।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

দ্বিতীয় পরীক্ষা

ত্রৈলোক্যকে ক্ষেত্র বাবুদিগের বাসায় রাখিয়া কয়েক দিন পরেই দেখা গেল, সে সেখানে থাকিতে অনিচ্ছুক। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ত্রৈলোক্য প্রথমে কোন স্পষ্ট উত্তর দেয় না; শেষে বোঝা গেল, এখানে তাহার মন বসিতেছে না। সে চিরদিন যে সকল কুসংস্কারের মধ্যে গঠিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই পরিবারের উচ্চ ভাবের সহিত সে সহসা মিশিতে পারিতেছে না। তাঁহারা যে সকল বিষয়ে প্রফুল্লতার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, ত্রৈলোক্য তাহাতে যোগ দিতে পারে না, তাঁহাদের সহিত মন খুলিয়া মিশিতেও পারে না। সুতরাং সে সর্ব্বদা একলা একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আপনার বিষাদিত অন্তর লইয়া কাটায়। কোন উচ্চ বিষয়ে তাহার তেমন ধারণাও নাই, আকাঙ্খাও নাই, বরং গত সংসারের চিন্তাতেই তাহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই ঘটনায় আমি এক মহা-পরীক্ষায় পতিত হইলাম। ত্রৈলোক্যকে তবে এখন কোথায় রাখিব। কিসে তাহার মনে ভাল ভাব হইবে, ভাল বিষয়ের জন্য আকাঙ্খা হইবে, এবং নিরাপদে সে জীবনের উন্নতি পথে চলিতে পারিবে। তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহই বা কিরূপে হইবে। আমি তো অর্থ উপার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া দিয়াছি। নিজের অন্ন জলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু ত্রৈলোক্যর মনের অবস্থাতো সেরূপ নহে। তাহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে, অবশ্য সে জন্য ও আমাকে সেই ভগবানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। এখন কোন্ পথে ইহাকে কোথায় লইয়া যাই।

ত্রৈলোক্য আমাকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, সে এখানে আর কিছুতেই থাকিতে পারিতেছেনা। আমি তখন বুঝিলাম মানুষকে ঈশ্বরের পথে ডাকা বা আনা খুবই ভাল উদ্দেশ্য, কিন্তু মানুষ গড়া কাজটা বড় সহজ নহে। মানুষের সম্মুখে ভাল বিষয় ধরিতে হইবে বটে, কিন্তু ধরিলেই যে সে গ্রহণ করিতে পারিবে তাহাতো নহে! তাহার অন্তরে তেমন ভাব বা ইচ্ছা আকাঙ্খা হওয়া আবশ্যক। নচেৎ সে ভালকে বুঝিতেই পারিবে না। যাহা হউক এই পরীক্ষা আমার পক্ষে তখন বড়ই গুরুতর বোধ হইল। আমার

অভ্যাস তখন তেমন ধৈর্য্য সহিষ্ণুতায় দৃঢ় হয় নাই; প্রথমে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের ভাবে বিমল আনন্দ পাইয়া, তাহার পর এ আবার কি অশান্তি; মনে হয় আমার জীবনের এই আর একটি গুরুতর শিক্ষার অধ্যায়, এই ঘটনায় আরম্ভ হইল। কেবল আনন্দে হর্ষে সুখে সচ্ছন্দে ধর্ম্ম জীবন গড়ে না, জীবনে দুঃখের পরীক্ষাও মধ্যে মধ্যে থাকা চাই। জীবন যজ্ঞে অশান্তি রূপ ঘৃতাহুতি দিবার আবশ্যক আছে। তাই বুঝি ভগবান্ আমাকে এই ঘটনায় ফেলিয়া গড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ইহাতে মনে বড়ই আঘাৎ লাগিল, কারণ ক্ষেত্র বাবু দিগের সঙ্গে মিশিয়া আমি এমন আনন্দ পাই, আর আমার ভগিনী যাহাকে ইহাঁরা অত্যান্ত যত্ন করেন, অথচ এখানে সে থাকিতে চাহে না! ইহা অপেক্ষা আর তো আমার কোন ব্রাহ্ম-বন্ধু-পরিবার দেখিনা যেখানে আমি তাহাকে রাখি; তবে কেথায় লইয়া যাই, কি করি এই ভাবনায় পড়িলাম।

কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কয়েক দিনের জন্য আমার নির্জ্জন-সাধন-ক্ষেত্র খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে ত্রৈলোক্যকে আনিলাম। সেখানে বেশীদিন তাহাকে রাখা সুবিধা জনক নহে। ইতি মধ্যে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ, ত্রৈলোক্যকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার পরিবার মধ্যে তাহার থাকার ভাবনা হইল না। শেষে আবার খাঁটুরায় আনিলাম। তারপরই মাঘোৎসব আসিল—সেই উপলক্ষে আমরা কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন উৎসবের আনন্দে কাটাইলাম। যখনই ত্রৈলোক্যের জন্য অত্যন্ত ভাবনায় পড়িতে লাগিলাম, তখন একমাত্র উপায় জানিয়া, ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইতাম।

উৎসব অন্তে একদিন মফস্বলের একটি ব্রাহ্ম বন্ধু আমার এই অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন, বরাহনগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা আশ্রম করিয়াছেন। আপনি সেখানে আপনার ভগিনীকে রাখিতে পারেন! তিনি সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর মধ্যে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যাহাতে নিজের ভার নিজেই বহনে সমর্থ হইবেন। সেখানে ধর্ম্মভাব বিকাশ হইতে পারে—সাধারণ ভাবে এমন ব্যবস্থাও আছে!

বন্ধুমুখে, এই সংবাদ শুনিয়া পর দিনই বরাহনগরে শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিলাম। তাঁহার আশ্রমের নিয়মাদির বিষয় জানিয়া এবং তৎকালীন আশ্রমে প্রায় ৪০টি বিধবা আছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত

আশান্বিত হইলাম। কিন্তু আশ্রমে থাকা খাওয়া ইত্যাদিতে ব্যয় মাসিক ১০৲ দশটাকা করিয়া দিতে হয়। আমার তখন কোন সংস্থান নাই কিন্তু কি করি, তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধে আমি কি প্রার্থনা করিব? তবে একটু জানাইলাম যে, আমার সেরূপ অবস্থা নহে, অথচ ভগিনীটিকে যেমন করিয়াই হউক এখানে রাখিতেই হইবে। ইহাতে তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন আশ্রমের নিয়ম এই, তবে এজন্য আমি নিজে মাসিক দুইটাকা সাহার্য্য করিব। ৮৲ টাকার হিসাবে তোমাকে দিতে হইবে। আমি তাহাই স্বীকার করিয়া আসিয়া, ভগিনীকে বুঝাইয়া বলিলাম, এখানে থাকিলে তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি যাহাতে কিছু লেখাপড়া শিখিতে পার তাহার চেষ্টা কর, নচেৎ তোমার জন্য আমাকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে।

ত্রৈলোক্যকে শশীপদ বাবুর বিধবাশ্রমে রাখিয়া আমি খাঁটুরায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম একমাস পরে ৮৲ আট টাকা পাঠাইতে হইবে।

কয়েকদিন পরে একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য লিখিয়াছে, দাদা! আপনি আমার জন্য নিশ্চিন্ত হউন, আপনাকে এখানে কিছুই দিতে হইবে না। বাবা (শশিপদ বাবু) প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, আপনি খাঁটুরা ব্রাহ্ম-সমাজে থাকেন; ক্ষেত্রবাবু লক্ষ্মণবাবু অর্থশালী ব্যক্তি; অবশ্য আপনার জন্য তাঁহারা অর্থ দিবেন। কিন্তু তিনি আমার নিকট শুনিলেন যে আপনি কোনরূপ বন্দোবস্তের মধ্যে না থাকিয়া কেবল ভগবানের জন্য—ভগবানের দ্বারের ভিখারী হইয়াছেন। আপনার প্রকৃত অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি আমাকে এই পত্র লিখিতে বলিলেন।

এই পত্র পাইয়া বিধাতা-পুরুষ ভগবানকে ধন্যবাদ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে আপন লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ঘটনায় দেশমান্য সুবিখ্যাত সেবাব্রত—আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ হিতৈষী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার একটা বিশেষ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। অতঃপর তাঁহার সহিত আত্ম-কথার যে সকল সম্বন্ধ আছে, তাহা যথা স্থানে বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা রহিল। সেবাব্রত মহাশয়ের কর্ম্মময় সুদীর্ঘ জীবনী নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। "বর্ত্তমান দেবালয়" তাঁহার জীবনের এক অক্ষয়কীর্ত্তি। তাহার সম্বন্ধে আগামীবারে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অভ্যাস তখন তেমন ধৈর্য্য সহিষ্ণুতায় দৃঢ় হয় নাই ; প্রথমে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের ভাবে বিমল আনন্দ পাইয়া, তাহার পর এ আবার কি অশান্তি ; মনে হয় আমার জীবনের এই আর একটি গুরুতর শিক্ষার অধ্যায়, এই ঘটনায় আরম্ভ হইল। কেবল আনন্দে হর্ষে সুখে সচ্ছন্দে ধর্ম্ম জীবন গড়ে না, জীবনে দুঃখের পরীক্ষাও মধ্যে মধ্যে থাকা চাই। জীবন যজ্ঞে অশান্তি রূপ ঘৃতাহুতি দিবার আবশ্যক আছে। তাই বুঝি ভগবান্ আমাকে এই ঘটনায় ফেলিয়া গড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ইহাতে মনে বড়ই আঘাৎ লাগিল, কারণ ক্ষেত্র বাবু দিগের সঙ্গে মিশিয়া আমি এমন আনন্দ পাই, আর আমার ভগিনী যাহাকে ইহাঁরা অত্যন্ত যত্ন করেন, অথচ এখানে সে থাকিতে চাহে না ! ইহা অপেক্ষা আর তো আমার কোন ব্রাহ্ম-বন্ধু-পরিবার দেখিনা যেখানে আমি তাহাকে রাখি ; তবে কোথায় লইয়া যাই, কি করি এই ভাবনায় পড়িলাম।

কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কয়েক দিনের জন্য আমার নির্জ্জন-সাধন-ক্ষেত্র খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে ত্রৈলোক্যকে আনিলাম। সেখানে বেশীদিন তাহাকে রাখা সুবিধা জনক নহে। ইতি মধ্যে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ, ত্রৈলোক্যকে মধুগঞ্জে লইয়া গেলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার পরিবার মধ্যে তাহার থাকার সুবিধা হইল না। শেষে আবার খাঁটুরায় আনিলাম। তারপরই মাঘোৎসব আসিল সেই উপলক্ষে আমরা কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন উৎসবের আনন্দে কাটাইলাম। যখনই ত্রৈলোক্যের জন্য অত্যন্ত ভাবনায় পড়িতে লাগিলাম, তখন একমাত্র উপায় জানিয়া, ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইতাম।

উৎসব অন্তে একদিন মফস্বলের একটি ব্রাহ্ম বন্ধু আমার এই অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন, বরাহনগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা আশ্রম করিয়াছেন। আপনি সেখানে আপনার ভগিনীকে রাখিতে পারেন ! তিনি সেখানে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর মধ্যে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যাহাতে নিজের ভার নিজেই বহনে সমর্থ হইবেন। সেখানে ধর্ম্মভাব বিকাশ হইতে পারে—সাধারণ ভাবে এমন ব্যবস্থাও আছে !

বন্ধুমুখে, এই সংবাদ শুনিয়া পর দিনই বরাহনগরে শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিলাম। তাঁহার আশ্রমের নিয়মাদির বিষয় জানিয়া এবং তৎকালীন আশ্রমে প্রায় ৪০টি বিধবা আছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত

আশান্বিত হইলাম। কিন্তু আশ্রমে থাকা খাওয়া ইত্যাদিতে ব্যয় মাসিক ১০৲ দশটাকা করিয়া দিতে হয়। আমার তখন কোন সংস্থান নাই কিন্তু কি করি, তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধে আমি কি প্রার্থনা করিব? তবে একটু জানাইলাম যে, আমার সেরূপ অবস্থা নহে, অথচ ভগিনীটিকে যেমন করিয়াই হউক এখানে রাখিতেই হইবে। ইহাতে তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন আশ্রমের নিয়ম এই, তবে এজন্য আমি নিজে মাসিক দুইটাকা সাহার্য্য করিব। ৮৲ টাকার হিসাবে তোমাকে দিতে হইবে। আমি তাহাই স্বীকার করিয়া আসিয়া, ভগিনীকে বুঝাইয়া বলিলাম, এখানে থাকিলে তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি যাহাতে কিছু লেখাপড়া শিখিতে পার তাহার চেষ্টা কর, নচেৎ তোমার জন্য আমাকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে।

ত্রৈলোক্যকে শশীপদ বাবুর বিধবাশ্রমে রাখিয়া আমি খাঁটুরায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম একমাস পরে ৮৲ আট টাকা পাঠাইতে হইবে।

কয়েকদিন পরে একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য লিখিয়াছে, দাদা! আপনি আমার জন্য নিশ্চিন্ত হউন, আপনাকে এখানে কিছুই দিতে হইবে না। বাবা (শশিপদ বাবু) প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, আপনি খাঁটুরা ব্রাহ্ম-সমাজে থাকেন; ক্ষেত্রবাবু লক্ষ্মণবাবু অর্থশালী ব্যক্তি; অবশ্য আপনার জন্য তাঁহারা অর্থ দিবেন। কিন্তু তিনি আমার নিকট শুনিলেন যে আপনি কোনরূপ বন্দোবস্তের মধ্যে না থাকিয়া কেবল ভগবানের জন্য—ভগবানের দ্বারের ভিখারী হইয়াছেন। আপনার প্রকৃত অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি আমাকে এই পত্র লিখিতে বলিলেন।

এই পত্র পাইয়া বিধাতা-পুরুষ ভগবানকে ধন্যবাদ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে আপন লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ঘটনায় দেশমান্য সুবিখ্যাত সেবাব্রত—আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ হিতৈষী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার একটা বিশেষ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। অতঃপর তাঁহার সহিত আত্ম-কথার যে সকল সম্বন্ধ আছে, তাহা যথা স্থানে বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা রহিল। সেবাব্রত মহাশয়ের কর্ম্মময় সুদীর্ঘ জীবনী নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। "বর্ত্তমান দেবালয়" তাঁহার জীবনের এক অক্ষয়কীর্ত্তি। তাহার সম্বন্ধে আগামীবারে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

কেশব জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্ম-কথা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর বি, এ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডিপুটী কালেক্টর কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। যোগেন্দ্র বাবু কেশব-পরিবারের সহিত সম্বন্ধ। শ্বশ্রু-পিতামহী দেবী সারদা সুন্দরীর নিজ মুখে শুনিয়া শুনিয়া এই পুস্তিকাখানির উপাদান এত দিন তাঁহার সংগৃহীত ছিল, এক্ষণে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যোগেন্দ্র বাবু কেবল বাঙালীর নিকট নহে জগতের নিকট ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। কেন না, প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের জননীগণের পুণ্য জীবন কাহিনীতে যেমন একদিকে ভাবভক্তি সম্বন্ধে অনেক সুমিষ্ট বিষয়গুলি থাকে, তেমন আর একদিকে জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে। মহাত্মা কেশব-জননীর আত্মকথার মধ্যে তাহারই জলন্ত পরিচয় পাইয়া আমরা বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমরা স্থানাভাবে এই পুস্তিকার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না। কেবল ইহার সূচী পত্রের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাতেই সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে বিষয় গুলি কেমন চিত্তাকর্ষক।

জন্ম, বাপের বাড়ি, পিতা, ভাই, বোন, বিবাহ, বাল্যাবস্থা ও শ্বশুর বাড়ি।

শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেন।

স্বামীর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মত ও সারদাসুন্দরীর শিক্ষা।

বিধবাবস্থার দুঃখের কথা। ধর্ম্মমত। গঙ্গাসাগর যাত্রা।

নৌকায় শিশু কৃষ্ণবিহারীর দুর্ঘটনা।

বড় ও মেজ মেয়ের বিবাহ। শাশুড়ী, ননদ বিন্দু ও বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরীর মৃত্যু। বড় ছেলে নবীনের বিবাহ। সেজ মেয়ে চুণী ও ছোট মেয়ে পান্নার বিবাহ। মেজ ছেলে কেশবের বিবাহ।

কাশী প্রায়াগ বৃন্দাবন, মথুরা ও বিন্ধ্যাচল ভ্রমণ। কাশীতে রোগ, উটের গাড়ীতে দুর্ঘটনা। তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য। কুরুক্ষেত্র হইতে কাশীরপথে বিপদ ও অপরিচিত একটি ব্রাহ্মণ শিশুর অযাচিত রূপে আশ্চর্য্য সাহায্য।

জয়পুরে গোবিন্দজী দর্শন ও আশ্চর্য্য ঘটনা এবং সারদা সুন্দরীর ধর্ম্মমত। পুত্রকন্যা—প্রথম ছেলে নবীন। তৃতীয় সন্তান (দ্বিতীয় পুত্র) কেশব। কেশবের মূর্চ্ছা রোগ। কেশবের ভাই ভগ্নীও শিশু সেবা।

কেশবের রোগ যন্ত্রণা ও সারদাসুন্দরী আদেশ ও দৃষ্টি। ইত্যাদি।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমাদের প্রতিবাসী ভ্রাতা, বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীবিয়োগ সংবাদ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত পত্রস্থ করিতেছি। তাঁহার উপর সম্পাদকীয় গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত, এই অবস্থায় কয়েকটি শিশু সন্তান লইয়া তাঁহাকে বড়ই পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের বলিবার কি আছে? আমরা তো সাংসারিক সুখ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে চাই। ভগবান্ কিন্তু আমাদিগকে সে ভাবে চিরদিন থাকিতে দেন না, তাই বুঝি তাঁহার এই কঠিন বিধি বিধান। দুঃখে ফেলিয়াও তিনি আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস উজ্জ্বল করুন।

গত ৫ই বৈশাখ গোবরডাঙ্গা জমিদার বাটিতে বাবু সতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে যে এক সাধারণ সভা হইয়াছিল। তাহা যথা সময়ে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎপরে গত ৩রা মে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপাল হলে বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আর এক কার্য্যকরি ওয়ার্ড কমিটী গঠিত হয়। স্থানাভাবে আমরা কমিটীর মেম্বরগণের তালিকা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই কমিটীতে স্থির হয়, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কেবল মিউনিসিপালিটীর উপর ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এ কার্য্যে সাধারণেরও উদ্‌যোগ ও সহায়তার আবশ্যক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ইতিমধ্যে কতিপয় সভ্য, জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবাভরাট ও পয়ঃপ্রণালী সংস্কারে মনযোগ দিয়াছেন। অতঃপর কমিটীর কার্য্যতৎপরতা দেখিতে আমরা আশা করি।

খাঁটুরা দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহে খাঁটুরা পাঠাগার নামে এক সদনুষ্ঠান প্রায় বৎসরাধিক-কাল চলিয়া আসিতেছে, এ সংবাদও আমরা পূর্ব্বে দুইবার প্রকাশ করিয়াছি। যদিও এই পাঠাগারে অধিক পাঠক হয় না, তথাপি দেশের পক্ষে এমন একটি স্থানের প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি পাঠাগারের সম্পাদক বাবু অশোকচন্দ্র রক্ষিত জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান শ্রাবণ মাস হইতে এই পাঠাগারে একটি পুস্তক বিভাগ খোলা হইবে। ইহাকে সাধারণের সাহায্যে সাধারণ পাঠাগার করা হইবে। কেননা ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা এরূপ কাজ সুচারুরূপে চলিতে পারে না। দেশবাসীর সাহায্যেই ইহাকে পুষ্ট করিতে হইবে। এজন্য অর্থ বা পুস্তক পত্রিকাদি যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা খাঁটুরা দত্ত-বাটী বাবু প্রমথনাথ দত্তের নিকট অথবা ৫ নং কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা, সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রাপ্তি স্বীকৃত হইবে। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে ইতিমধ্যে প্রমথ বাবু গত হরিশ্চন্দ্র পুস্তকালয়ের দরুন ১৫০ খণ্ড পুস্তক এই পাঠাগারে দান করিয়াছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহের আয় ব্যয়

গতবারে কুশদহের ঋণের কথা সাধারণকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, ইহাত মনে হয় কুশদহের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা বর্ত্তমান মোটা মুটী হিসাব প্রকাশ করিলাম।

আয়	বার্ষিক
গ্রাহকের সাধারণ চাঁদা	৪০০৲
অতিরিক্ত সাহায্য প্রাপ্তি	২৫০৲
বিজ্ঞাপন	২৫৲
মোট	৯০০৲

মাসিক এক হাজার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়

কাগজ		২৫৲
৫ রিম	১৲	
বিজ্ঞাপন ফর্ম্মার ২ রিম	৩৷৷	
ছবির জন্য	২৵০	
কভার	২৷৵০	
	২৫৲	
ছাপা		৩২৲
৫ ফর্ম্মা	২০৲	
বিজ্ঞাপন	৬৲	
কভার	৩৲	
ছবি	৩৲	
	৩২৲	
বাণ্ডিং দপ্তরী	৩৲	
ডাক টিকিট	৫৲	
ব্লক (গড়)	৫৲	
বাজে খরচ যাতায়াত গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি	২৲	
আফিস ঘর ভাড়া	৩৲	
	৭৫৲	
মোট বার্ষিক	৯০০৲	

উপরোক্ত ব্যয়ের সহিত কর্ম্মচারীর পারিশ্রমিক কিছুই ধরা হয় নাই। যদি সামান্য ভাবে একজনের পারিশ্রমিক, মাসিক ২০৲ ২২৲ টাকা করিয়া ধরা যায়, তবে বৎসরে ২৫০৲ টাকা হয়। এই পাঁচ বৎসরে কত হয় দেখুন। কিন্তু ৫ বৎসরে প্রেসের দেনা ১৫১৲ টাকা, সর্ব্বসহ ২০০৲ টাকা দেনা হইয়াছে, ইহা আর অধিক কি? এখন বোধ হয় কুশদহ চালাইয়া সম্পাদকের আর্থিক অবস্থার বিষয় সকলকেই বুঝিতে পারিবেন। গত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যেমন আয় কম হইয়াছে, তেমন ব্যয়ও কিছু কিছু কম হইয়াছে।

সাহায্য প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত ভূজেশ্বর শ্রীমানি, এ্যাটর্ণি ২৲
" নীরেদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এল ২৲
" গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ২৲
" সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, টাকী ২৲
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় গৈপুর ২৲
স্নেহলতা দত্ত ২৲
" গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক জমিদার ২৲

মাননীয়া বড়লাট পত্নী লেডি হার্ডিং।

U. RAY & SONS,
100, Gurpar Road, Calcutta

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২১ | পঞ্চম সংখ্যা

ঋণ শোধ

মাতঃ বসুন্ধরে, হে মানব পরিবার,
তব ঋণভারে আমি ক্লান্ত অতিশয়;
কি দিয়ে শুধিব এবে বল ঋণভার,
স্মরণে কৃতজ্ঞ রসে উথলে হৃদয়।
এসে ছিনু একা হেথা সম্বল বিহীন,
পথিক বিদেশী যথা কাঙ্গাল সুদীন।

তব অঙ্গীভূত আমি নাহি স্বতন্তর,
আপন বলিয়া তাই করিলে পালন;
খাওয়াইলে পরাইলে দিলে বাড়ী ঘর,
শিখাইলে লেখাপড়া গুরুর মতন।
যা কিছু আমার বলি সকলি তোমার,
আসে নাই, যাইবে না সঙ্গে এ সংসার।

না পারিনু দিতে কিছু লইনু কেবল,
আমি স্বার্থপর নর ভ্রান্ত মূঢ়মতি ;
সেবায় পরম সুখ, জীবন সফল,
সেবকের হয় স্বশরীরে স্বর্গে গতি।
আপনার লাগি সদা করিনু ভ্রমণ,
হায় কি আসার এই মানব জীবন।

লহ মাতঃ কিছু মোর সেবা উপহার,
সার্থক হউক জন্ম, তোমার সেবায় ;
দিয়েছ মা কিছু তুমি খুলিয়া ভাণ্ডার,
নিষ্কাম অন্তরে ফিরে দিই পুনরায়।
এসেছিনু একা আমি যাইব একাকী,
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার ফাঁকি।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।
(পথের সম্বল)

ব্রহ্ম পরিচয়

হে অনন্ত রহস্য, দুরারাধ্য, অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মন্! তুমি স্বরূপতঃ কিরূপ তাহা কোন কালে কেহ ভালরূপে জানিতে পারে না। অথচ তোমাতে ভক্ত বিশ্বাসী মহাজনেরা চিরদিন বিমুগ্ধ হইয়া তোমা কর্ত্তৃক পরিচালিত হন। আমিও সেই পথের পথিক এবং সেই ভাবের ভাবুক। যখন যাহা চাইতে ইচ্ছা হয়, এবং যাহা বলিতে ভাল লাগে, তোমার নামে তাই চাই আর তাই বলি। তুমি আমার কাছে আছ; আমাকে তুমি বেশ জান, চেন, এবং ভাল বাস' দয়া কর ইহাই আমার প্রাণের গভীর সান্ত্বনা। ইহার মধ্যে যেটী যেটী আমার অভবোচিত প্রার্থনা, যাহা না হইলে আমার জীবন রক্ষা পাইবে না তাহা তুমি মোচন করিয়াছ, করিতেছ এবং করিবে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তদ্ভিন্ন তুমি কিরূপ কি বৃত্তান্ত সে সব তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার আমার কি প্রয়োজন ? তুমি খুব ভাল, খুব বড়, তুমি দীনবৎসল দয়ালু প্রেমিক, তাহা ছাড়া আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, আমি তোমার পর নই অতিশয় আপনার অন্তরঙ্গ, এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি তোমার দ্বারে নিত্য নিত্য ভিক্ষা চাইতে আসি। তুমি ত আমার প্রতি কখন উদাসীন নও; আমিও কিছু যে তোমার সঙ্গে

টেনে বুনে সম্বন্ধ পাতাইয়াছি তাহাও নয়, তবে আর কেন আমি তোমায় মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণের কথা, মনের ব্যথা সব জানাইব না? যদিও সব তুমি জানছ দেখছ, বুঝছ, তথাপি আমি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? যেরূপ মিষ্ট এবং ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, আর তোমার যে প্রকার স্নেহ মমতা, তাতে স্বভাবতঃই নানা কথা বলিতে ইচ্ছা করে। তোমার অগাধ ধৈর্য্য, অনন্ত উদার করুণা, আমার আবেদন নিবেদনে তোমাকে কখনই বিরক্ত করিতে পারিবে না। তোমার মাতৃ-প্রকৃতি আমাকে সকল বিষয়ে অভয় দান করিয়াছে, তাই আমার এত সাহস ভরসা। ভাল করিয়া তোমায় চিনি বা না চিনি, বুঝি বা না বুঝি, তাহাতে কিছুই যায় আসে না, আমি শূন্যে আকাশে বা অরণ্যে ক্রন্দন করি না, এ বিশ্বাস আমার আছে। গভীর রহস্যে আবৃত থাকিয়া মৃদুস্বরে প্রসন্ন বদনে আমায় তুমি আশীর্ব্বাদ প্রসাদ দিবার জন্য ডাকিতেছ; ইহা শুনিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে ইহা দাও উহা দাও বলিয়া আমি শত শত প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমায় যত দিবে ততই আরো চাহিব। যত দেখা দিবে তত আরো দেখিবার জন্য কাঁদিব। এই তোমার সঙ্গে আমার চিরদিনের সম্পর্ক। নিজ ব্যবহার আচরণ দ্বারা তুমি এইরূপে আমার নিকট আত্মপরিচয় দান করিয়াছ। এই মধুর সম্বন্ধের কথা যেন আমি কখন না ভুলি এমন আশীর্ব্বাদ কর। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

(পথের সম্বল)

মুক্ত

মুক্ত কি করিলে মোরে ভেঙে ফেলি সোনার শৃঙ্খল!
মুক্তি যদি দিলে বন্ধু দাও দাও এ চরণে বল।
নিখিলের দীর্ঘ দিন পথ-হারা ঘুরে মরি কত—
জীবন-জলধি-তীরে আজি হায় ক্লান্ত তনু নত
অবসন্ন, দীর্ণ হৃদি রক্তধারা পড়িতেছে ঝরি';
কণ্টকে চরণ-তল শত ক্ষতে গিয়াছে গো ভরি!
অস্তমিত দীপ্ত রবি চিতানলে সন্ধ্যাকাশ ছায়,
মরণের মহালীলা এ জীবন-মণিকর্ণিকায়!
নিভাইয়ে দাও বহ্নি শ্রান্ত পদে দাও আসি' বল!
তোমার মন্দির-পানে ছুটে যাই—মুছি অশ্রুজল।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

সরমা

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

বেলা সাতটা বাজিয়াছে। ডাক্তার বোনার্জি হেমন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে ঘোড়ায় চড়িয়া এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গোপালপুর-অভিমুখে যাইতেছেন। দুধারে চারু শোভায় শোভিত বহুদূর-বিস্তৃত শ্যামল শস্যপূর্ণ কৃষিক্ষেত্র! অদূরে কৃষি-পল্লী দেখা যাইতেছে। স্থানে স্থানে জলাশয়সমূহে কত লাল শাদা শালুক ফুটিয়াছে, কত বক হংস তাহাতে বিচরণ করিতেছে, কত কৃষক বধূ কলসী-কক্ষে জল লইতে আসিতেছে উপরে বাঁশ গাছের ডগায় বসিয়া একটা হলদে পাখী "বৌ কথা কও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কৃষক-কুললক্ষ্মীরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জলাশয়-অভিমুখে চলিতে লাগিল। কিন্তু কী দুর্দ্দৈব! সম্মুখে সাহেব দেখিয়া তাহারা কলস ফেলিয়া পলাইয়া গেল। সেই পথ দিয়া কয়েকটি কৃষক ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে আসিতেছিল; তাহারা কিয়দ্দূরে ঘোড়ার উপর সাহেব দেখিয়া একজন অপরকে কহিল ;—

১ম। ওরে বাবা ঐযে ঘোড়ার উপর সাহেব রে!

দ্বি। ও নিশ্চয় মেজেষ্টার হবে।

তৃ। দেখচিস না ওয়ারিণ হাতে!

১ম। পলাই চ' আর খেতে গিয়ে কাজ নেই—ধরলে বলে।

যাঁহাতক বলা তাঁহাতক দৌড়। তিন জনে প্রাণ হাতে করিয়া দৌড়িতে লাগিল।

ডাক্তার বলিলেন,—"ভয় নেই আমি ধরতে আসি নে।"

কে বা শুনে—তাহারা প্রাণ-ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল—পথে যাহারা আসিতেছিল তাহারা তাহাদিগকে বলিল, "পালা পালা মেজেষ্টের সাহেব ওয়ারিণ নিয়ে আস্‌চে ধরলে—ধরলে।"

যাহারা আসিতেছিল তাহারা অদূরে ঘোড়ার উপর সাহেব দেখিয়া 'পালা পালা ধরলে ধরলে' বলিয়া উহাদের সহিত ছুটিতে লাগিল। কেহ পালাইয়া গাছের উপর উঠিল, কেহ গোলার নীচে লুকাইল, কেহ অন্য গ্রামে চলিয়া গেল! ক্ষুদ্র কৃষক-পল্লীতে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! সকলেই যেন লুকাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল!

ডাক্তার একটু দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া একজনের অনুসরণ করিয়া মনে করিলেন তাহাকে ধরিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া উহাদের এত ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই, সে ম্যাজিষ্ট্রেট্ নহে এবং ওয়ারেণ্ট লইয়া কাহাকেও ধরিতে আসেন নাই।

ডাক্তার যতই বলিলেন,—"তোমার ভয় নেই, তুমি দাঁড়াও, আমি তোমাকে ধরতে আসি নি" সে লোকটা ততই ছুটিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। সে একটা পুষ্করিণীর পাড়ের উপর আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অবিবেচক ডাক্তার ঘোড়া লইয়া তাহার নিকটে আসিলেন। সে একবার নিরুপায় হইয়া ঝপাং করিয়া পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিল। ডাক্তার হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় আসিয়া দেখেন আর জন মানুষেরও চিহ্ন নাই। ডাক্তার অতিকষ্টে একটা বাঁশবন অতিক্রম করিয়া কৃষি-পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি একেবারে একটি কৃষকের উঠানে আসিয়া দেখিলেন একটি উনানে ধান সিদ্ধ হইতেছে—রাশীকৃত সিদ্ধ ধান্য রৌদ্রে শুকাইতেছে। ঘরের দাবার খুঁটির সহিত সংলগ্ন কোমরে দড়ি-বাঁধা একটি ছোট ছেলে মা মা করিয়া কাঁদিতেছে। দুইটি ঘরের দরজা বন্ধ।

ডাক্তার উঠানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু মরাইয়ের ভিতর পড়িল—দেখিলেন একটি লোক বসিয়া আছে। তাহাকে বলিলেন,—"তুমি বেরিয়ে এসো আমি তোমাকে ধোরবো না।"

কৃষক যোড়হস্তে ক্রন্দনস্বরে বলিল,—"হুজুর আপনি আমার মা বাপ, আমি কিছুই জানি নে।"

"তোমার কোনো ভয় নেই, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্ নই, তোমাদের কর্ত্তাকে আমি ধরতে আসি নি—আমি বাঙালী, গোপালপুর যাবার পথটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার ?" "হুজুর যদি অভয় দেন তো নেবে গিয়ে আপনাকে পথটা দেখিয়ে দিই।"

"তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি নেমে এসো।"

কৃষক মরাই হইতে নামিয়া আসিল।

"ডাক্তার বলিলেন আমার বড় পিপাসা পেয়েছে তোমাদের এখানে কি ডাব পাওয়া যায় ?"

কৃষক ডাকিল,—"ওরে পয়জেরে শীগ্গির দোর খোল।"

কৃষকপুত্র পয়জার শিশুটিকে রাখিয়া সস্ত্রীক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল—পিতার কথায় দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সাহেবকে দুই হস্তে সেলাম করিল।

পয়জারের পিতা কহিল,—"শীগ্‌গির ঐ রাঙা গাছের এক কাঁদি ডাব পেড়ে নিয়ে আয়।" পয়জার ছুটিল—এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে কয়েকটি ডাব আনিয়া হাজির করিল। দুইটি ডাব কাটিয়া ডাক্তারের হস্তে দিল। ডাক্তার জল পান করিয়া সুস্থ হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ডাক্তার বাহির হইলেন, কৃষক গোপালপুরের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য নিজে তাঁহার সঙ্গে আসিল।

ডাক্তার বলিলেন,—"তোমরা আমাকে দেখে এত ভয় পেয়েছিলে কেন?"

"সকলেই যখন মেজেষ্টর ওয়ারিণ নিয়ে আস্‌চে বলে পালাতে লাগল, কাজেই আমরাও সব ভয়ে লুকিয়ে পড়লুম্।"

"তা তোমরা যখন দুষি নও তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে এত ভয় কেন?"

"ওঃ বাবারে—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—উনি একবার যারে ধরবেন তার ভিটে মাটি চাটি হয়ে যাবে।"

"তবে লুকিয়েই বা তাঁর হাত থেকে কী কোরে পার পাবে? আর তুমি তো মরায়ের ভিতর লুকিয়েছিলে, যদি আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হতুম তা হলে তো তোমার চুলের টিকি ধরে বার করে' নিয়ে আস্‌তুম।"

"তা নয় হুজুর—যদি আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হতেন তা'হলে যখনি আমাকে বল্‌তেন নিকাল সুয়ার, তখনি আমি আপনাকে (দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাইয়া) কলা দেখাতুম।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলে,—"তুমি কি করে আমাকে কলা দেখাতে? আমি তো তোমার মরায়ের নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিলুম।"

"ঐ মরায়ের নীচে এক জায়গায় কাটা ছিল, বেগতিক দেখলেই সেই ফাঁক দিয়ে নেমে পড়তুম। আর মরায়ের পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যেতুম। আপনি কিছুই দেখ্‌তে পেতেন না।"

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে কৃষকের সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কৃষক একটু লজ্জিত হইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐযে পগারের ধারে দুটো তাল গাছ দেখ্‌ছেন ওর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েচে ঐটে গোপালপুরের রাস্তা। আজ রবিবার গোপালপুরের হাট। ঐ রাস্তাটা ধরে খানিকটা গেলেই অনেক লোক জন, মস্ত হাট দেখ্‌তে পাবেন। আমি এখন আসি," বলিয়া কৃষক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নির্দ্দিষ্ট পথে আসিয়া গোপালপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বায়ু সেবন করিতে করিতে ডাক্তার গোপালপুরের হাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন প্রায় বিঘাখানেক যায়গার উপর অনেক ছোট ছোট চালা বাঁধা রহিয়াছে, ও উহার মধ্যে কেনা-বেচা হইতেছে। রাস্তার উপর কয়েকখানি চিরস্থায়ী দোকান—তাহার মধ্যে একখানি খাবারের ও অপরগুলি চাল, ডাল, তেল, নুন, মসলা ইত্যাদির—তাহারি অনতিদূরে তাড়িখানা।

ডাক্তারকে কোনো রাজ-কর্ম্মচারী মনে করিয়া সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ডাক্তার ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়াটাকে একটা বাঁশের খুঁটিতে বাঁধিয়া হাটের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হাটের গোমস্তা যোড়-হস্তে তাহার অনুসরণ করিল।

ডাক্তার দেখিলেন এটি একটি প্রকাণ্ড হাট—তরি-তরকারি মৎস্য ও অপরাপর দ্রব্যাদির জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান রহিয়াছে। একস্থানে কতকগুলো কৃষক বলদ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার দেখিলেন তাহারা বলদের পৃষ্ঠে থলিয়ার মধ্যে চাল্ ধান্ কলাই ইত্যাদি লইয়া বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে। ডাক্তার হাটের অবস্থা দেখিয়া গ্রামেরও অবস্থা বুঝিয়া লইলেন।

ডাক্তার গোমস্তাকে বলিলেন,—"এ হাট হপ্তায় ক'দিন হয় ?"

"হুজুর রবিবার ও বুধবার।"

"এ হাট কার ?"

"জমিদার বাবুদের।"

"গোপালপুরের জমিদার ?"

"হাঁ হুজুর।"

ডাক্তার মনে মনে হাসিয়া গোপালপুর গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথ। পথের দুই পার্শ্বে বাব্‌লা বৃক্ষ তারপর শস্য-ক্ষেত্র। এই পথের উপর অনবরত গো-শকট চলায় প্লীহা-রোগীর ন্যায় ইহার উপর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে ও দুই প্রান্তে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার ঐ স্ফীত উদরের উপর দিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে দুই চারিটি দেবালয় দৃষ্টিগোচর হইল—মাঝে মাঝে ইষ্টক-নির্ম্মিত একতল দ্বিতল গৃহও দেখিতে পাইলেন—ফল ফুলে শোভিত স্নিগ্ধ ছায়া-বিশিষ্ট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন গ্রামখানিকে বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইল।

গ্রামে ঘোড়ায় চড়িয়া সাহেব আসিয়াছে শুনিয়া বহুলোক ছুটিয়া আসিল।

এক দল বালক-বালিকা আসিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"সাহেব সেলাম—বিবির গোলাম।"

ডাক্তার ইহাদের অপরিস্ফুট মধুর বচনে রাগের পরিবর্ত্তে প্রীত হইয়া ঘোড়া হইতে নামিলেন। তাহাদের মধ্যে একটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া, একটিকে ঘোড়ার উপর বসাইলেন,—ও স্নেহভরে আদর করিয়া বলিলেন,—"আমি সাহেব নই আমার বিবি নেই।"

তাহারা কিন্তু শুনিল না,"সাহেব সেলাম বিবির গোলাম" বলিয়া নাচিতে লাগিল।

ডাক্তার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। অগ্রে ও পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র জনতা আসিতে লাগিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য দুই একটি ভদ্রলোকও আসিয়া জুটিল।

ডাক্তার একটি প্রাচীন ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মশায়ের নিবাস কি এইখানে?"

"আজ্ঞা হেঁ, আপনার কি প্রয়োজন?"

"দেখুন আপনি বলতে পারেন কি এখানে বামুনদিদি নামে কোনো স্ত্রীলোক থাকতেন?"

"বামুনদিদি সে তো অনেক দিন সর্পাঘাতে মারা গিয়েছে!"

"তা হবে, তাঁর বাড়িতে এখন কোনো বিধবা স্ত্রীলোক আছেন কিনা বলতে পারেন?"

"তা আমি এখন ঠিক বলতে পারি নে, তবে শুনেছিলুম তার কোন্ ভগ্নী এসে থাকতো।"

"তাঁর বাড়িটা কোথায় আমাকে বলে দিতে পারেন কি?"

"আপনার কি সেখানে কোনো প্রয়োজন আছে?"

"আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

ভদ্র লোকটি বলিলেন,—"দেখ ভিমে সেই কলুর ডেঙায় যে বামুনদিদি থাক্‌তো মনে পড়ে কি?"

"হেঁ ঠাকুর মশাই, মনে পড়ে।"

"তার ঘরখানা এই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে আয়। যান মশাই ওর সঙ্গে যান বড় বেশি দূর যেতে হবে না।"

ডাক্তার ঐ ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ দিয়া ভিমের সহিত অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে কিন্তু অনেকগুলি লোক আসিল।

ক্রমে এই দলটি বামুনদিদির জর্ণ কুটীরের নিকট আসিয়া থামিল। এই গোলমালে চন্দর বাহির হইয়া আসিল।

বাটীর নিকটে ঘোড়ার উপর সাহেব দেখিয়া চন্দরের যেন ভ্যাবা-চাকা লাগিয়া গেল ; সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

চন্দরের মা ডাকিল,—"চন্দর পালিয়ে আয়।"

সাহেব চন্দরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"দেখ তুমি বলতে পার এ-বাড়িতে কে থাকে ?"

"ছোট মাসিমা।"

"কে তিনি ?"

"বামুনদিদির বোন।"

"তিনি কি এখন এখানে আছেন ?"

"আজ্ঞে হেঁ আছেন।"

"তাঁকে বলগে আমি তাঁর সহিত দেখা করতে চাই, তাঁর বাড়ি-সংক্রান্ত কোনো কাজ আছে।"

"তিনি কি সাহেবের সঙ্গ—"

ডাক্তার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমি সাহেব নই—বাঙালী।"

চন্দর আসিয়া বলিল,—"ছোট মাসিমা, সাহেবের মতন কে একটি লোক তোমার বাড়ি-সম্বন্ধে কথা বলবার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আনবো কি ?"

"তা' নিয়ে এসো,"—বৃদ্ধা যেন একটু অধীর হইল ; তাহার বুকের ভিতর কেমন একটা ছাঁৎ করিয়া লাগিল ! মনে করিল আমার হরিপদই বা হবে।

চন্দর ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আপনি ভিতরে আসুন।"

ডাক্তার ঘোড়াটিকে একটি বৃক্ষে বাঁধিয়া বামুনদিদির উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হরিপদর মা একটি লাঠির উপর ভর দিয়া ঘরের ভিতর হইতে দাবাতে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শরীরের মাংস সমস্ত লোল হইয়া আসিয়াছে, তাঁহার কোমর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না। একটি চোখে একেবারেই দেখিতে পান না, অপর চোখে ঝাপসা ঝাপসা দেখিতে পান, কর্ণে ভালো শুনিতে পান না, তাঁহার জীর্ণ দেহখানি সর্ব্বদাই কাঁপিতেছে !

কি জানি কেন ডাক্তার এই বৃদ্ধাকে দেখিয়া দুইটি তপ্ত নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল ! রুমালে চোখ মুছিলেন।

উঠানে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার ঐ বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া কহিলেন,— "দেখুন আপনার একখানা বাড়ি আছে, লোকে বলে সেটা ভূতুড়ে বাড়ি তা' আপনি কি সে বাড়িটা আমাকে বেচতে পারেন ?"

বৃদ্ধা অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন,—"ঐ দেখ সব ভুল, মনে করলুম এক, আর হলো আর।"

"কি মনে করলেন ?"

"মনে করলুম বুঝি আমার হরিপদ এসেছে !"

বৃদ্ধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

বৃদ্ধার নিশ্বাসে কি যেন একটা মোহিনী শক্তি ছিল উহা ডাক্তারের প্রাণে আসিয়া বিঁধিয়া গেল !

তিনি যেন একটা ভারী বোঝা বুকে চাপিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"হরিপদ আপনার কে ?"

"হরিপদ আমার ছেলে, আজ বারো তেরো বৎসর হ'ল বিদেশে চাকরি করতে গিয়েছিল আর ফিরলো না। বুঝি সে আর নেই।" তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল।

ডাক্তারের প্রাণটা যেন হাঁক্ পাঁক্ করিতে লাগিল ! তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন,—"আস্‌বে বৈ কি, আস্‌বে বৈ কি।" "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা, যেন মরবার আগে তাকে একবার দেখতে পাই।" "তা' পাবেন বৈকি" বলিয়া ডাক্তার কাঁদিয়া ফেলিলেন—সে অশ্রু বৃদ্ধা দেখিতে পাইলেন না— তাঁহার প্রাণটা যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল !

বৃদ্ধা একটু সংযত হইয়া কহিলেন,—"কি বলছিলে বাবা—বাড়িখানা—ও বাড়িতে কি তুমি তিষ্টুতে পারবে ?"

"আমি পারবো—আপনাকে কি দিতে হ'বে ?"

"আমি আর টাকা নিয়ে কি কোর্‌বো—তবে যে-ক'টা দিন বাঁচ্‌তে হ'বে সে-ক'টা দিন যদি কাশীতে একটু থাকবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারো তা'হলেই আমার গতি হয়, আর এক কথা—যদি আমার হরিপদ ফিরে আসে তা'হলে ও-বাড়ি তাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

একটা রুদ্ধ বেদনা প্রাণের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া ডাক্তার কহিলেন,— "তা বেশ, আমি আপনাকে কাশীতে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবো—আর

আপনার হরিপদ ফিরে এলে তাকে ঐ বাড়ি প্রত্যর্পণ কোরবো। এই মর্ম্মে একখানা দলিল আনি—আর কাল আপনাকে পাল্কী করে রেজেষ্টারি আপিসে নিয়ে যাবো কি বলেন ?"

"যা ভালো হয় তাই কর বাবা, আমি আর কি বোলবো।"

"তবে আমি এখন আসি।"

"এসো বাবা।"

ডাক্তার ঘোড়ায় চড়িয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন।

বৃদ্ধা ভাবিলেন,—বুঝি ভগবান আমার উপর একটু সদয় হইলেন—যদি কাশীতে গিয়ে মর্‌তে পারি তা'হলেও একটা গতি হবে।

যথাসময়ে দলিল রেজেষ্টারি হইয়া গেল।

ডাক্তার বৃদ্ধাকে স্বয়ং কাশীতে লইয়া গেলেন ও কোনো পরিচিত ভদ্রলোকের বাটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধার খরচ পত্রের জন্য ৫০০৲ টাকা জমা রাখিলেন। বৃদ্ধার জন্য একটি ব্রাহ্মণ চাকর নিযুক্ত করা হইল, সে তাঁহার হস্ত ধরিয়া প্রত্যহ দেবালয়ে লইয়া যাইবে, গঙ্গাস্নান করাইবে ইত্যাদি। ডাক্তার বলিয়া রাখিলেন যেন অর্থাভাবে বৃদ্ধা কোনো দান-ব্রতাদিতে বঞ্চিত না হন—টাকার দরকার হইলে পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

আরো বলিয়া দিলেন যে, এ বৃদ্ধার কোনো অসুখ বিসুখ হইলেই যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তারে জানানো হয়, কারণ তিনি নিজে আসিয়া তাঁহার চিকিৎসাদি করিবেন।

একদিন সকাল বেলা ডাক্তার আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত অবিনাশবাবুর সহিত দেখা করিলেন। অবিনাশবাবু ইংরাজী ধরণে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতে আহ্বান করিলেন। ডাক্তার একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন।

অবিনাশবাবু কহিলেন,—"আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? হরিপদর মায়ের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ হয়েছিল, তিনি বাড়িটা আমাকে লেখাপড়া করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে সঙ্গে করে' নিয়ে গিয়ে কাশীতে রেখে এসেছি, সেখানে তাঁর থাকবারও বেশ সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছি। সেই জন্যে আপনার সহিত দেখা করতে কিছু বিলম্ব হ'ল।"

"তা ভালোই হয়েছে, তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সে যে তাঁকে কাশীতে থাকবার

বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন খুব ভালো কাজই করেছেন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"তাঁর একান্ত বাসনা যে জীবনের শেষ দিন ক'টি তিনি বিশ্বেশ্বরের সেবা করেই কাটান।"

"আপনি তাঁর পুত্রের কাজ করলেন। আহা তার আর আপনার বল্‌তে কেউ নেই। তা লেখা-পড়াটা কি রকম হ'ল?"

"বাড়িটা তিনি আমায় দানপত্র করে দিলেন; আর ঐ দানপত্রে এইরূপ প্রকাশ রইল যে, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি তাঁর ভরণ পোষণ কোরবো, তাঁর দানব্রতাদি ও দেবসেবার জন্য যা কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে সে সমস্তই আমি দিতে বাধ্য রইলুম। আর যদি কখনো তাঁর পুত্র হরিপদ ফিরে এসে বাড়ির দাবি করে, তা' হলে বিনা ওজর আপত্তিতে আমি তাকে ঐ বাড়ি ফেরত দিতে বাধ্য রইলুম।"

"আপনি এরকম লেখাপড়ায় সম্মত হলেন কেন? যদি হরিপদ বাস্তবিকই ফিরে আসে তা' হ'লে আপনি এই খরচ-পত্র করে যে বাড়ি মেরামত করবেন তা আপনার সমস্তই লোক্‌সান হবে।"

"যদিই হরিপদবাবু ফিরে আসেন তা' হ'লে তাঁকে বঞ্চিত করবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমি কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে আর ঐ বৃদ্ধার কাশীতে থাকবার বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে এরূপ লেখাপড়াতে সম্মত হলুম।"

অবিনাশবাবু মনে মনে বলিলেন, বেটা তো ভারি ফিচেল দেখ্‌চি। কাঁকতালে বাড়িখানা হাতড়ালে—পাছে হরিপদর মাকে কেউ কিছু লাগায়, সেইজন্যে তা'কে একেবারে কাশীতে রেখে এ'ল। ধন্য সাহেবি ফন্দি। হরিপদর মা দানপত্র করে দেবেন তা যদি জান্তে পেতুম তা' হ'লে আমিই যে তাঁ'কে কাশীতে রেখে আসতুম! মিনি পয়সায় বাড়িখানা তো হ'ত, আর সে বুড়ী কতদিনই বা বাঁচত, ৫।৬ টাকা করে মাসে পাঠিয়ে দিলেই তাঁর বেশ চল্‌ত। যা হয়ে গেছে তার তো আর উপায় নেই। তবে ও-বাড়ি বাবা, তোমার ভোগে হচ্চে না, হরিপদ ভূত হয়ে বাড়ি কাম্‌ড়ে পড়ে আছে—তোমার ঘাড় মট্‌কাবেই মট্‌কাবে।

অবিনাশবাবুকে চিন্তিত দেখিয়া ডাক্তার কহিলেন,—"আপনি কি ভাবচেন?"

"না কিছু ভাবি নি, তবে আপনি হরিপদর মাকে ক'টাকা করে মাসে পাঠাবেন স্থির করেছেন ?"

"আমি তাঁর জন্যে কোনো মাসহারা স্থির করি নি, তবে আমি আপাতত তাঁর খরচের জন্যে ৫০০৲ টাকা জমা দিয়ে এসেছি। আর যেমন দরকার হবে তেমনি পাঠিয়ে দেবো।"

অবিনাশবাবু মনে মনে বলিলেন,—"পাঁচ শো টাকা—একেবারে সব মিথ্যে কথা।" মুখে বলিলেন—"বেশ বেশ ৫০০৲ টাকায় কাশীতে খুব সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁর জীবনটা কেটে যাবে। তা বাড়িটা মেরামতের কি স্থির করলেন ?"

"আমি মনে কর্‌চি সেই ভারটা আপনাকে নিতে হবে, টাকাকড়ি যেমন খরচ হবে তেমনি আপনাকে দিয়ে যাবো।"

"দোহাই ডাক্তার বাবু, সে কাজটি আমি পারবো না, ও ভূতুড়ে বাড়ির ভিতর আমি কোনো রকমেই যেতে পারবো না।" অবিনাশবাবু মনে মনে বলিলেন,—তুমি বেটা ভারি চালাক, ভূতের হাতে আমাকে ফেলে তুমি তোমার কাজ উদ্ধার করে নেবে,—আর ভূতে আমার ঘাড় মটকায় তুমি তফাৎ থেকে মজা দেখ—সেটি হচ্চে না বাবা !

"আপনার এত ভূতের ভয় ! ভূত কি মানুষের কিছু করতে পারে ? আসুন বাড়ির দরজাটা খুলে একবার বাড়িটা ভালো করে দেখে আসা যাক্, কোথায় কি রকম মেরামত দরকার ?"

"না মশাই মাপ করবেন—আপনি যান আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি।"

অগত্যা ডাক্তার দরজার তালা ভাঙিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবিনাশবাবু ও অপর তিন চারিটি লোক দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, কেহই ডাক্তারের সহিত যাইতে সাহস করিল না।

ডাক্তার বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, চারিদিকে জঙ্গল হইয়াছে, প্রাচীরে ও ছাতে অনেক গাছপালা বসিয়াছে, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া ডাক্তার অন্দরের উঠানে আসিয়া দেখিলেন চার পাঁচটি শৃগাল দালানে শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে।

দালানটি তাহাদের মল-মূত্রে পরিপূর্ণ। ডাক্তারের পদশব্দে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ডাক্তার একটি লগুড়-হস্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা হঠাৎ মহাবিপদ দেখিয়া বাগানের দিকে পলাইয়া গেল। ডাক্তার

দেখিলেন দুইটি ঘর শৃঙ্খলাবদ্ধ, আর একটি ঘরে তালা-বন্ধ। শৃঙ্খল খুলিয়া দেখিলেন গৃহমধ্যে কিছুই নাই। পরে ডাক্তার মরিচাধরা তালাটি ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, উহা ক্রমে ভাঙিয়া পড়িল—ডাক্তার দরজা খুলিয়া দেখিলেন, পালঙের উপর এখনো শয্যা পাতা রহিয়াছে একপার্শ্বে একটি গ্লাসকেসে নানাবিধ খেলনা সাজানো রহিয়াছে—একধারে একটি আলমারি ও তাহার পার্শ্বে একটি কাঠের আল্‌না, উহাতে কয়েকখানি সাড়ী এখনো সাজানো রহিয়াছে—ব্রাকেটের উপর ঘড়িটি যেন চলিতে চলিতে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে—ছবিগুলি, ফুলদানগুলি মলিন হইয়া পড়িয়াছে—যেখানে যা সাজানো ছিল সব ঠিক সেই ভাবেই সাজানো রহিয়াছে। সাজানো রহিয়াছে বটে, কিন্তু এরূপভাবে কীটদষ্ট হইয়াছে যে স্পর্শমাত্রেই ঝরিয়া পড়ে। ডাক্তার সমস্তই দেখিলেন,—দেখিলেন বটে কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না—তাঁহার বুকের ভিতর কি যেন একটা ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল, তিনি অস্থির হইয়া দ্বারে শৃঙ্খল লাগাইয়া বাহিরে আসিয়া সজোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া খিড়কির দরজার নিকট আসিয়া দেখিলেন যে দুটি শৃগাল বাড়ির ভিতর আসিবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। বোধ হয় তাহাদের লগুড়-হস্ত প্রভু চলিয়া গিয়াছে কি না তাহার সন্ধান লইতে তাহারা আসিয়াছিল, তাহারা ডাক্তারকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

ডাক্তার পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া দেখিলেন পুকুরটি ঝাঁজিপানা ও কল্‌মির দামে মজিয়া গিয়াছে, চতুষ্পার্শের বাগান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। যাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল তাহারা ডাক্তারের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহার মুণ্ডপাত সাব্যস্থ করিয়া লইল। কিন্তু একটু পরে তাহাকে সমুণ্ড আসিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। অবিনাশবাবু বলিলেন,—"কেমন মশাই কিছু দেখলেন কি ?"

"দেখলুম অনেক যায়গা ভেঙেচুরে গেছে অনেক বন জঙ্গল বসেচে মেরামত করাতে কিছু খরচ হবে।"

"আহা তা নয় ভূতটুত কিছু দেখলেন কি ?"

"হ্যাঁ তাও একটা দেখলুম বটে।"

"দিনের বেলা বলে' তাই বেঁচে এলেন—কেমন ?"

"তা নয় আমি ভূতের ওষুধ জানি।"

"আচ্ছা দেখা যাবে আপনার ওষুধের গুণ।"

"এখানে মজুর পাওয়া যায় না ?"

"কেন ?"

"এই জঙ্গলগুলা সব কাটিয়ে ফেলি।"

"সে আশা ছেড়ে দিন—এখানকার কোনো লোক ওবাড়ির ভিতর যাবে না।"

"তবে উপায় ?"

"বাইরে থেকে লোক আনাতে হবে।"

"আচ্ছা তাই চেষ্টা করা যাবে। এখন আসি তবে, আবার তিন চার দিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

ডাক্তার বিদায় হইলেন।　　(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

পল্লী-সংস্কার

পল্লীগুলি একদিনে বা এক বৎসরে জঙ্গলে ভরিয়া উঠে নাই। পথ-ঘাটগুলি এক দিনের বা এক বৎসরের সংস্কার-অভাবে দুর্গম হইয়া উঠে নাই। আজ পল্লীগ্রামগুলি যে কলেরা ম্যালেরিয়ার বিহারভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা পল্লীবাসীর বহু বৎসরের উপেক্ষা ও নিশ্চেষ্টতার ফল, ইহা কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন ?

তোমার বাড়ির কাছে জঙ্গল, তুমি কাটাইয়া পরিষ্কার না করিলে ভিন্নগ্রামবাসীর তাহাতে স্বার্থ কি ? তোমার গ্রামের পুকুর হাজিয়া মজিয়া গেলে অন্যের তাহাতে দায় কি ? তোমার গ্রামের পথ সংস্কার-অভাবে দুর্গম হইলে, অন্যের তাহাতে অসুবিধা কি ?

তোমার খিড়কিতে জঙ্গল—তোমার চলিবার পথ বর্ষার জলে কর্দ্দমাক্ত—সুতরাং দুর্গম ; তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিবে না,—প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই

করিবে না। তোমার স্নান পানের পুষ্করিণীর প্রতি তোমার দৃষ্টি না থাকিলে তোমাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। তবে তুমি নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন ?

কেবল আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হয় হইবে না। কোমর বাঁধিয়া পল্লীর সংস্কারের জন্য অগ্রসর হও। আপনারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাও, তবে ফল পাইবে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে,—

Heaven helps those who help themselves.

কথাটি খুবই সত্য। পুরুষকার ভিন্ন সিদ্ধি নাই—সাধনা ভিন্ন সাধ্য বস্তু লাভের উপায়ান্তর নাই। এ জগতের নিয়মই এই। নিশ্চেষ্টতা, আলস্যের পরিণাম। পল্লীবাসীরা এখন তাহাই ভোগ করিতেছেন।

অনেক পল্লীগ্রামেই পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই অব্যবহার্য্য—তাহাদের জল অপেয়। কিন্তু হইলে কি হয় পুষ্করিণীর অধিকারী স্বীয় স্বচ্ছল অবস্থা সত্ত্বও উহাদের সংস্কারে মনযোগী নহেন। তাঁহারা চাহেন গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সংস্কার হউক—অথচ উহার কোনো সত্বই তাঁহারা ত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে পুষ্করিণী ব্যবহার্য্য করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ান; এরূপ স্বার্থপরতার পরিচয় সর্ব্বত্র না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

তাই বলিতেছি, গ্রামবাসীগণ স্ব স্ব গ্রামের সংস্কারে হাতে-কলমে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সাধু সংকল্পের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। নচেৎ প্রত্যেক কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে—এবং তাহা সম্ভবপরও নহে। আর হইতেছেও যে তাহাই।

অধিকাংশ গ্রাম দলাদলিতে পূর্ণ। গ্রামের উন্নতির জন্য গ্রামের দুরাবস্থা মোচনের জন্য কাহারো আন্তরিক কামনা বা চেষ্টা নাই। এ অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইয়া প্রতিকার-প্রার্থী হইলে কি হইবে? সেরূপ প্রতিকার গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নহে।

আপনারা স্বহস্তে অন্তত প্রত্যেক গৃহস্থ আপন বাসস্থানের সমীপবর্ত্তী জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করুন। সে-ভার গবর্ণমেণ্টের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। পথে দুই কোদালী মাটী প্রত্যেকে তুলিয়া দিলে, লোকাল বোর্ডের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। এইরূপে পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য গ্রাম

হইতে চাঁদা তুলিয়া এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কিছু সাহায্য লইয়া সম্পন্ন হইতে পারে। একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, গ্রামের সংস্কার হইবে না; পল্লীবাসীর দুঃখও ঘুচিবে না। এ কথাগুলি গ্রামবাসিগণ মনে রাখিলে ভাল হয়।   (বার্ত্তাবহ,— গৃহস্থ হইতে গৃহীত)

আদর্শ গ্রাম

বাংলা দেশের গ্রামসকলের উন্নতির জন্য নানাবিধ প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা; মানুষের স্নানের জন্য জলাশয়ের ব্যবস্থা এবং তাহাতে স্ত্রীলোক ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র ঘাট; গবাদি পশুর জন্য স্বতন্ত্র জলাশয়; বৃষ্টির জল এবং মানুষের ব্যবহৃত ময়লা জল নিঃসরণের জন্য ভালো নর্দ্দমা; নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও ময়লা গ্রামের মাঠে ফেলিবার ব্যবস্থা; ময়লা জলপূর্ণ অনিষ্টকর খানা-ডোবা বুজাইবার বন্দোবস্ত; আগাছার জঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া ফেলিয়া গ্রামে বায়ু-চলাচলের ও গ্রামকে শুষ্ক রাখিবার বন্দোবস্ত; গ্রামে চলাফেরার জন্য ভাল রাস্তা; গ্রামের সমুদয় বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য শিক্ষালয়, নিঃস্ব ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল; ঔষধালয়, একটি পাঠাগার ও লাইব্রেরী; খেলা ও ব্যায়ামের জায়গা; গোচারণের মাঠ; চাষের জন্য উৎকৃষ্ট বীজ যোগাইবার বন্দোবস্ত; মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান, বহি ও কাগজ কলম-আদির দোকান, কিম্বা সকলপ্রকার জিনিষের একটি মাত্র সম্মিলিত দোকান, গ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইলে একটি ডাকঘর; গ্রামবাসীদের সমবেত ঋণদান-সমিতি; কথকতা, যাত্রা, বক্তৃতাদির স্থান, গ্রামের এক বা একাধিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দেবমন্দির বা ভজনালয় ইত্যাদি।   (প্রবাসী)

দাদাভাই নৌরজির উপদেশ

দাদাভাই বলিয়াছেন, যদি দীর্ঘজীবী হইতে চাও, তবে সাদা-সিধে পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিয়ো, প্রতিদিন অন্যূন এক ঘণ্টা বাহিরে নির্ম্মল বাতাসে ব্যায়াম করিয়ো, প্রতিদিন মানসিক শ্রম করিয়ো, ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাইয়ো, জীবনের লক্ষ্য উচ্চ রাখিয়ো। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য পবিত্র রাখিয়ো। মদ্য স্পর্শ করিয়ো না, তামাক খাইয়ো না, কোন কু-অভ্যাস করিয়ো না। সাধ্যমত উত্তম কর্ম্ম

করিয়ো এবং ফল যাহাহউক তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়ো। কথনো উদ্বিগ্ন বা চিন্তাকুল হইয়ো না। (সঞ্জীবনী)

সাহিত্য-সঙ্গত

গতপূর্ব্ব রবিবার বালীগঞ্জে নাটোরের মহারাজার প্রমোদ-উদ্যানে সুপ্রসিদ্ধ "মানসী" পত্রিকার পঞ্চম বার্ষিক আনন্দ-সম্মিলন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী এই সম্মিলনের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে "মানসী"-সম্পাদক মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সৌজন্য ও আপ্যায়ন সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। সমবেত ব্যক্তিবর্গের চিত্তরঞ্জনের ও ভোজনের ব্যাপারও উত্তম হইয়াছিল। আবার গত শনিবার অপরাহ্ণে সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিডনষ্ট্রীটস্থ ভবনে "সাহিত্য-সঙ্গতে"র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সে দিনকার সঙ্গতেও সহরের প্রায় গণ্যমান্য সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন। প্রমথবাবু সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যক সুলেখক ও নিরহঙ্কার। তাঁহার গৃহে আদর-আপ্যায়ন জলযোগ চিত্ত-বিনোদন প্রভৃতির যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। যাহা হউক, কমলার কৃপা-ভাজনগণ যে বঙ্গবাণীর জীর্ণ -মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য লইয়া দুঃস্থ, ভাগ্যহীন সাহিত্যসেবীদিগের সহিত এক পংক্তিতে দাঁড়াইতে চাহিতেছেন,—ইহা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শুভসূচক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (বসুমতী)

লেডি হার্ডিং

মাননীয়া বড়লাট-পত্নী লেডি হার্ডিং মহোদয়ার প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আন্তরিক। তিনি ভারতবাসীকে ভালো বাসিতেন, ভারতবাসীর হিত কামনা করিয়াছিলেন, তার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সহসা মৃত্যুতে ভারতবাসী বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে শান্তি-ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

ইউরোপে মহাযুদ্ধ

জর্ম্মণী এবার যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প। ইংলণ্ডে অলষ্টার লইয়া অন্তর্যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে; ফরাসীদের টাকা নাই, কামান নাই, সৈন্যদের জুতা নাই; রুষিয়ায় ভীষণ অন্তর্ব্বিপ্লব উপস্থিত; জর্ম্মণী ইহা সুসময় মনে করিয়া ইউরোপের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদানত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। জর্ম্মণীকে বাণিজ্যে,

ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করাই সম্রাটের সঙ্কল্প, সুতরাং জর্ম্মণীর হিতাহিত, ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার অবসর নাই।

ইংরেজ-প্রকৃতি

ইংলণ্ডের শত শত নারী রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার জন্য রাজার ভয় করে নাই, পুলিসকে মানে নাই, জেলের ভয়ে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় নাই। স্বদেশের বিপদ দেখিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, যতদিন বিপদ কাটিয়া না যাইবে, ততদিন তাঁহারা স্বাধিকার লাভের জন্য কোনো চেষ্টা করিবেন না। ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণ ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাহারা জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা বন্ধ করিয়াছিল; বাণিজ্যতরীসকল ঘাটে আটকাইয়া রাখিয়াছিল; তাহারা ইংলণ্ডের ব্যবসায়-বাণিজ্য বিকল করিয়াছিল। জন্মভূমির মহা বিপদ দেখিয়া তাহারা ঘোষণা করিয়াছে, যতকাল বিপদ কাটিয়া না যাইবে, ততদিন তাহারা কোনো আন্দোলন করিবে না।

যুদ্ধ ও ভারতের শিল্পবাণিজ্য

ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং ইউরোপ হইতে যে সমুদয় দ্রব্য ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে, তাহার আমদানী একেবারে বন্ধ না হইলেও অনেক হ্রাস হইবে। ভারতবর্ষে হাটে বাজারে স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। দেশী কাপড়ের কলওয়ালাগণ এই সময় দিন রাত্রি কল চালাইয়া প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন করুন এবং ভারতের সর্ব্বত্র তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। ভারতের প্রত্যেক হাটে বাজারে একবার তাহা প্রবেশ করিলে ভবিষ্যতে তাহা দূর করা সহজ হইবে না। বিদেশ হইতে প্রচুর পশমী ও রেশমী বস্ত্র, মোজা গঞ্জির আমদানী হয়। ভারতজাত ঐ সকল দ্রব্য বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না, সুতরাং অনেক কলকারখানা বন্ধ হইয়াছিল। আমরা ভারতের মোজা গঞ্জির কলওয়ালাদিগকে মহা উদ্যমের সহিত কল চালাইতে অনুরোধ করি।

যাঁহাদের জুতার কারখানা আছে, তাঁহাদের অবিলম্বে মূলধন বৃদ্ধি করিয়া ভারতবর্ষের অভাব মোচনের চেষ্টা করা উচিত। ভারত-জাত জুতা একবার যে ঘরে প্রবেশ করিবে, সে-ঘরে তাহা চিরদিনই আদৃত হইবে।

ভারতবর্ষে কাগজ, ছুরি কাঁচি, চীনামাটীর জিনিষ, বোতাম চিরুণী, বাল্‌তি, সুগন্ধি দ্রব্য, ঔষধ, দিয়াশালাই পেন্‌সিল, নিব্, কালী প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য

তৈয়ারী হইতেছে। বিদেশী দ্রব্যের প্রচুর আমদানী হওয়াতে স্বদেশী দ্রব্যের তেমন কাটতি হইত না সুতরাং ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইতে না পারিয়া ক্রমে নিরাশ হইতেছিলেন। আমরা তাঁহাদিগকে মহোৎসাহের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। স্বদেশী বস্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগ কেহ হারাইয়ো না। (সঞ্জীবনী)

অনাথ বিদ্যালয়

সাধারণের মধ্যে জাতিনির্ব্বিশেষে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া ও অনাথ দুঃস্থের সেবা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় আনুকূল্যে ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। মহাশয়গণ দয়া করিয়া দরিদ্ররূপী নারায়ণগণের শিক্ষা ও সেবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

শিক্ষা-বিবরণী

নিম্নলিখিত বিভাগানুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(১) কোচিং বিভাগ।—সকাল ৬—৩০ হইতে ৯—৩০ পর্য্যন্ত। যে-সকল ছাত্র গৃহশিক্ষক রাখিয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে না তাহাদের জন্য।

(২) সাধারণের শিক্ষাবিভাগ :—বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত। মধ্য ইংরেজী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) নৈশবিদ্যালয় বিভাগ। সন্ধ্যা ৬—৩০ হইতে ৯—৩০ পর্য্যন্ত শ্রমজীবি ছাত্রগণের জন্য।

অনাথ বিদ্যালয়।
২৪ আমহার্ষ্ট রো,
কলিকাতা।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।
সম্পাদক।

মন্তব্য—নিজেদের জীবিকার জন্য অন্য কাজে কিঞ্চিৎ সময় বাদে ব্রহ্মচারীর ন্যায় দুইটি যুবককে এই কাজে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। দেশের শত শত শিক্ষিত যুবক যদি এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন তবে শীঘ্রই দেশের মুখশ্রী ফিরিতে পারে।

—— • • ——

জন্মভূমি

শ্যামল হরিৎ মণ্ডিত ছবি জননী জন্মভূমি গো।
অয়ি! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী তোমায় নমি গো।
শতেক পুণ্যসলিলা তটিনী ধৌতবক্ষা জননী।
সুজলা সুফলা সুখদা শীতলা নন্দন-শোভা শালিনী।
তব তটিনীর সলিলে নিহিত শান্তি মুক্তি মহিমা।
পবিত্রতার তুমি মা আধার তুমি মা আমার গরিমা।
নিখিল বিশ্বে অতুলিতা তুমি জননী জন্মভূমি গো।
অয়ি! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী তোমায় নমি গো।
ভক্তি মুক্তি শৌর্য্যবীর্য্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সবি ত।
পাপ ও পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার চরণে নিহিত।
অম্বরভেদী পর্ব্বত-রাজি নন্দন উপত্যকা।
সুদূর ব্যাপ্ত কত অরণ্য তোমারই বক্ষে আঁকা।
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগ-কণ্ঠে অযুত মধুর তান।
সৌম্য ঋষির পুণ্যকণ্ঠে শান্ত সামাদি গান।
ফুল্ল পুষ্প-সুরভি ব্যাপ্ত সুন্দর তপোবনে মা,
করিছে তোমার মহিমা ব্যক্ত, তোমার চরণে নমি মা।

বীরের জননী বীর-প্রসবিনী ধন্য তোমার মহিমা।
স্তব্ধ জগৎ মুগ্ধনেত্রে হেরিছে তোমার গরিমা।
পৃথ্বী প্রতাপ কুমার বাদল আর কত নাম লব মা।
স্মরিয়া তাঁদেরে গত গৌরবে হৃদয় নাচিয়া উঠে মা।
শান্ত কঠোর মূরতি তোমার কঠিন-কোমলে জড়িত।
সন্তান সুখে পালিত কোথাও অরাতি-চরণে দলিত।
তুমি পল্লী ভবনে কৃষক-জননী পল্লীর বধূ মধুরা।
তোমার বক্ষে লভিয়া জন্ম ধন্য মানি গো আমরা!
তুমি নহ মা শুধুই লক্ষ্মীরূপিনী রত্ন-প্রসূতি জননী
কবি-চূড়ামণি কতশত জানি পূজিলা চরণ দুখানি।
বাল্মীকি ব্যাস সেই কালিদাস ভবভূতি আদি কবি মা।
কবি কথনে জয়দেব দাশু গাহিয়াছে তব মহিমা।
বুদ্ধ কপিল শঙ্করমাতা কতই দিব মা, উপমা।
স্মরিয়া তাঁদেরে হয় বক্ষ স্ফীত হৃদয়ে পূরে মা গরিমা।
কবির জননী তুমি একাধারে লক্ষ্মী ও বাণী ভারতী;
লহ মা দীনের দীন অর্ঘ্য—এনেছে দিতে মা আরতি।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্ধু

(গল্প)

বহুদিন বহুচিকিৎসার পর চিকিৎসকগণের পরামর্শে যেদিন প্রকৃতির শোভা সম্পদপূর্ণ গ্রামের উন্মুক্ত বায়ুতে কিছুদিন বাস করা স্থির হইল, তাহার সপ্তাহ পরেই জগৎবাবু তাঁহার পীড়িতা পত্নী ইন্দুমতীকে লইয়া বঙ্গদেশের এক নদীতীরবর্ত্তী গ্রামে আসিয়া নয়ন-মনোহর বৃক্ষলতাদি-শোভিত একটি উদ্যান-বাটিকায় আশ্রয় লইলেন। সঙ্গে রহিল তাঁহার বালিকা-ভাগিনেয়ী নির্ম্মলনলিনী আর হিন্দুস্থানী পাচক ও পরিচারক পরিচারিকাদ্বয়।

হরিদ্বর্ণের শস্যক্ষেত্রগুলি পার্শ্বে রাখিয়া কৃষকপল্লীর মধ্য দিয়া একখানি মোটর গাড়ি যখন নির্ম্মল ও তাহার মাতুল-মাতুলানীকে লইয়া নদীর ধারের

বাগানবাড়ি-অভিমুখে ছুটিয়া গেল, কলসী কক্ষে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃতা পল্লীবধূদের কৌতূহলী দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটি ধূলা-কাদা মাখা সুন্দরী বালিকার অপূর্ব্ব বিস্ময়-পুলকপূর্ণ দৃষ্টি গাড়িখানির উপর পতিত হইল।

"কত বড় একখানা হাওয়া-গাড়ি যাচ্চে রে ভাই দেখ্‌বি আয়"—বলিয়া পরস্পরের দাদা দিদিকে ডাকিতে, একদল বালক বালিকাকে পথের ধারে ছুটিয়া আসিতে দেখা গেল। চতুর্দ্দিকের বিবিধ সুদৃশ্যের সহিত এ দৃশ্যটিও নির্ম্মলকে আনন্দাভিভূত করিল।

নূতন বাড়িতে আসার পর যেদিন নির্ম্মল তাহার মামাবাবুর সঙ্গে প্রথম ভ্রমণে বাহির হইল, বিশেষভাবে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল,—একদল ক্রীড়ারত পল্লী-শিশুর মাঝে সেই সুস্থ সবল গৌরাঙ্গিনী বালিকা।

প্রাতে দাসী সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে গিয়াও স্নানার্থী রমণীগণের সহিত নির্ম্মল বালিকাকে দেখিল। সে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইলে, বালিকা হাস্যমুখে একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, নির্ম্মলকে তাহার সহিত আলাপের অবসর না দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। নির্ম্মল তাহার ব্যবহারে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সে বুঝিল বাহিরে রাস্তার উপর, নদীতীরে, পুষ্পোদ্যানে বা শস্যক্ষেত্রে এই অপরিচিতা বালিকা ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করে, অথচ তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র বৃক্ষলতাদির অন্তরালে লুকাইয়া পড়ে।

নির্ম্মলের মামীমা তাহার অনুরোধক্রমে সন্ধান লইয়া জানিলেন, বালিকা তাঁহাদের প্রতিবাসী-কন্যা, তাহাদেরই স্বজাতি, নাম শান্তমণি, কিন্তু আচরণ তাহার রূপ ও নামের সম্পূর্ণ বিপরীত, সহস্র কৃষকপল্লী তাহার দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত।

ক্রমে সুযোগ মত বালিকার সহিত নির্ম্মলের আলাপ হইল। আলাপ শেষে বন্ধুত্বে পরিণত হইল। কিছুদিনের মধ্যে নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিল, সভ্যসমাজে আদব-কায়দায় অনভ্যস্ত, অপরিচ্ছন্ন, কলহনিপুণা শান্ত হইল—নির্ম্মলের মত শান্ত শিষ্ট ও নীতিদুরস্ত মেয়েটির বন্ধু।

(২)

নির্ম্মলের সুন্দর সুবৃহৎ উদ্যান-ভবনের পার্শ্বেই শান্তর পিতার অনতিক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরখানি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর, মৃত্তিকাময় ও তৃণাচ্ছাদিত হইলেও সুনির্ম্মিত, সুতরাং সুদৃশ্য এবং শান্তর লক্ষ্মীস্বরূপিনী জননীর নিপুণ

হস্তে প্রত্যেক স্থানের প্রতি সামান্য দ্রব্যটিও সুশৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত ও সুপরিষ্কৃত।

গৃহে শান্তর পিতা মাতা ভিন্ন, পিসিমা, দুটি ভগিনী, দুটি শিশু সহোদর ও একটি জ্ঞাতি-ভ্রাতা। শান্তর পিতার অবস্থা বড় স্বচ্ছল নয়, গ্রামে পৌরহিত্যে করিয়া, কোনো প্রকারে তিনি পরিবারের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করেন। গ্রামে পুরোহিতের আধিক্য এবং হিন্দু-গৃহে বারোমাসে তেরো পার্ব্বণের অভাব না থাকিলেও, এই দরিদ্র কৃষক-প্রধান গ্রামে পৌরহিত্য করায়, কোনো দিন তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় নাই। কিন্তু স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে তাঁহার আয় নিতান্ত অল্প হইলেও, পৃথিবীর সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য যাহার অভাবে ব্যর্থ হয়, রাজ-ভাণ্ডারের বিনিময়েও যাহা পাওয়া যায় না, সেই ধনীর প্রার্থনীয় নরপতিরও লোভনীয় শান্তিসুখ ও সন্তোষ এই দরিদ্র পরিবারের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান।

ভট্টাচার্য্য দম্পতী নিজের শান্তি সুখেই তৃপ্ত নহেন, পরকেও এই সুখের ভাগী করিতে ইঁহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ তাহাদের পুরোহিত ঠাকুরের নিকটে ধর্ম্মকথা শুনিয়া ধন্য হয়, কৃষকগণ তাহাদের বিপদাপদে সুপরামর্শের নিমিত্ত ইঁহার নিকটে ছুটিয়া আসে গ্রামবাসিনীরা শান্তর জননীর নিকটে আসিয়া আপনাপন সুখ দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া শোকে সান্ত্বনা, দুঃখ সুখে সহানুভূতি লাভ করে। আপনাদের মধুর প্রকৃতি ও সদাচরণের গুণে ইঁহারা সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

আচরণ দোষে একা শান্তই কেবল গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে অপ্রীতি ও অনাদর পাইয়া আসিতেছিল, এখন কোমলহৃদয়া প্রিয়বাদিনী বুদ্ধিমতী কুমারী নির্ম্মলনলিনীর বন্ধুত্ব লাভে, সেই শান্তর অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল; অব্যবস্থিতচিত্ত শান্ত ক্রমে শিষ্ট, শান্ত, লোকপ্রিয় ও সুভাষিণী হইল, দিবসের অধিকাংশ কাল নির্ম্মলের নিকট থাকিতে থাকিতে ক্রমে সে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হইল, নিন্দার পরিবর্ত্তে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে প্রশংসা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। নির্ম্মলের সহিত বন্ধুত্বে শান্তর আশাতীত পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বুঝিল, স্পর্শমণির স্পর্শে মৃত্তিকা এইরূপেই সুবর্ণে পরিণত হয়।

(৩)

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে একদিন আমতলায় বন-ভোজনের আয়োজন করিতে করিতে নির্ম্মল শুনিল, তাহার বন্ধুর বর আসিয়াছে। শান্ত খুব উৎসাহের

সহিত এই আমোদে যোগ দিয়াছিল, অকস্মাৎ এসংবাদ তাহাকে উৎসাহহীন করিল, আজিকার চড়াইভাতিতে তাহার কোনো যোগ নাই এই ভাবে, সকল উদ্যোগের বাহিরে গিয়া, ম্লানমুখে সে একস্থানে বসিয়া রহিল। শত চেষ্টাতেও নির্ম্মল আর তাহাকে প্রফুল্ল করিতে পারিল না।

দুধে দাঁত ভাঙিবার পরই শান্তর বিবাহ হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বারতিনেক সে শ্বশুরবাড়ির দেশটা দেখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু শ্বশুরালয়ের সহিত পরিচিত হইলেও স্বামীর সহিত তাহার এখন পর্য্যন্ত পরিচয় হয় নাই। বংশমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তি দেখিয়া, শান্তর পিতা গৌরীশঙ্করকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, পাত্রের বয়সের প্রতি লক্ষ্য করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। ফলে, বিবাহ শান্তর নিতান্ত অসুখের কারণ হইয়াছিল। তাহার পিতামহ-সম বৃদ্ধ পতিকে দেখিলে বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। গৌরীশঙ্কর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া, যে কয়দিন শ্বশুরালয়ে থাকিতেন, সে অস্বচ্ছন্দ-চিত্তে প্রতিবাসীগণের ধানের মরাইয়ে, ঢেঁকিসেলের কোণে, গোয়ালঘরের বেড়ার পাশে, লাউমাচার আড়ে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইত। বিবাহের পর, কত সকাল-সন্ধ্যা এইরূপে সে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়া দিত, বহু অনুসন্ধানের পর কেহ না কেহ কোনো না কোনো স্থানে সন্ধান পাইয়া গৃহে লইয়া যাইত। কখনো বা গৌরীশঙ্করকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি হইতে বিদায় করিবার জন্য, পিতামাতাকে বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়াও সফলকাম হইতে না পারিয়া, অবশেষে কান্নাকাটি জুড়িয়া দিত।

গৌরীশঙ্কর তাঁহার তৃতীয় পক্ষের এই নবপরিণীতা পত্নীর অহেতুকী ভয় দেখিয়া, সুযোগ পাইলেই তাহাকে বিবিধপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু “চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।” উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ উন্নতকায় গৌরীশঙ্করের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন হইতে বহুকষ্টে নিজেকে মুক্ত করিয়া গৌরাঙ্গিনী বালিকা, তাহার সুবর্ণ পুষ্পপাত্রে নীল নলিনীবৎ নয়নদুটি চম্পকাঙ্গুলির দ্বারা আবৃত করিয়া সমীরণান্দোলিত গোলাপ-পাপ্‌ড়ির মত ঠোঁট দুখানি কাঁপাইয়া বলিত—“ওগো তুমি চলে যাও; আর এসো না; আমাদের বাড়ি আর এসো না।”

গৌরীশঙ্কর তাহার এই অনুচিত ব্যবহারে রুষ্ট না হইয়া, তাহার দেবী প্রতিমার মত অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তিখানি দূর হইতে দেখিবেন, কি তাহার মধুরস্পর্শে সদ্য পত্নীশোক-সন্তপ্ত বক্ষ শীতল করিবেন, ঠিক করিতে

পারিতেন না। তাঁহার মোহের ঘোর কাটিবার পূর্ব্বেই শান্ত তাহাদের কুটীরের বাহিরে আসিয়া চঞ্চল-গতিতে ধান্যক্ষেত্র পার হইয়া কৃষকগৃহে আশ্রয় লইত। দৈবাৎ মা অথবা পিসিমার সম্মুখে পড়িলেই নির্দ্দয় চপেটাঘাতে তাহার পৃষ্ঠদেশ পাঁচ পাঁচটি অঙ্গুলির চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া তাঁহারা তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতেন। পল্লীরমণীদের কৌতুক বাড়াইয়া, প্রহার-জর্জ্জরিত পৃষ্ঠের যাতনায় চীৎকার-স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শান্ত যখন গৃহে ফিরিত, গৌরীশঙ্কর লজ্জিত ও দুঃখিত-চিত্তে ভাবিতেন যতদিন না ওর বুদ্ধি হয়, আর শ্বশুরবাড়ি আসিব না। কিন্তু বাড়ি ফিরিবার সময়, স্বয়ং শ্বশুর মহাশয় যখন নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত বলিয়া দিতেন—"আগামী পার্ব্বণ-উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ-পত্র গেলে একটু কষ্ট স্বীকার করে এসো বাবা, অন্যথা ক'র না,"—তখন শ্বশুর অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ জামাতা বাধ্য পুত্রটির মত বিনীতভাবে, "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিতেন। আর গৌরীশঙ্কর তাহাদের গ্রাম পার হইতেই দ্বিগুণ উৎসাহে শান্ত আবার ছুটাছুটি লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিত। এলোচুলে অপরিচ্ছন্ন বেশে কাদামাটি লইয়া দিব্য মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইত। তাই জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে গৌরীশঙ্করের আগমন আজ সদা-হাস্যময়ী বালিকার বিষণ্ণতার কারণ।

আজিকার বনভোজনের আয়োজনটা খুব বেশী রকমেরই হইয়াছিল। নির্ম্মল ও শান্তর আগ্রহে এ-আমোদে যোগ দিবার জন্য গ্রামের প্রায় সকল বালিকাই পুষ্করিণী-তীরে ফলভারে অবনত আম্রবৃক্ষটির সুবিস্তীর্ণ ছায়ায় একত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু শান্ত না থাকিলে নির্ম্মলের সকল আমোদ নষ্ট হইবে সুতরাং বহু সাধ্য-সাধনা, মান-অভিমানের পর নির্ম্মল শান্তকে ফিরাইয়া আনিল।

সারা দিবসব্যাপী হাস্যামোদের মধ্যে বালিকাগণের বন-ভোজন ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল, কেবল পতি-আগমন-বার্ত্তায় উদ্বিগ্ন শান্ত এবং বন্ধুর হঠাৎ বিষণ্ণতায় ক্ষুণ্নমনা নির্ম্মল আজি পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পাইল না।

৪

পরদিন নির্ম্মল তাহার বন্ধুর বরকে দেখিতে আসিয়াছিল; বন্ধুর ভগিনী স্নানান্তে ইষ্টদেবের পূজারত গৌরীশঙ্করকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলে—অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত নির্ম্মল সহসা বলিয়া ফেলিল,—"বাঃ ও বুঝি বর, ও তো বুড়ো।"

তাহার উক্তি শুনিয়া গৃহস্থ সকলে হাসিল, আর গৌরীশঙ্কর সরলান্তরে তাহার সহিত আলাপ করিবেন ভাবিয়া, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে একনজর দেখিয়া লইলেন। ঘরশুদ্ধ লোকের হাসিতে লজ্জা পাইয়া নির্ম্মল ছুটিয়া পলাইল। বিস্মিতা বালিকার উক্তি গৌরীশঙ্করের কানে ও প্রাণে মিষ্টস্বরে বাজিতে লাগিল।

পরদিন তিনি শান্তর ছোট বোনের দ্বারা নির্ম্মলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নির্ম্মল আসিল। বন্ধুর অনুরোধে পড়িয়া সেইসঙ্গে শান্তও আসিল।

দুই চারিদিনের মধ্যেই বন্ধুর বরের সহিত নির্ম্মলের বন্ধুত্ব হইল। নির্ম্মল নিকটে থাকায় শান্ত এবার কান্নাকাটি করিল না, কিন্তু পুরাতন ছাড়িয়া নূতন সুর ধরিল। সে সুবিধা পাইলেই গৌরীশঙ্করের নস্যাধার হইতে নস্য ফেলিয়া চূণ সুরকিতে পূর্ণ করিয়া,—কামিজের বোতাম খুলিয়া আমবাগানে ফেলিয়া দিয়া,—কুঞ্চিত উড়ানিখানিতে বচুর আঠা লাগাইয়া,—খাপ হইতে চুপি চুপি চসমাখানি বাহির করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া,—বিবিধমত প্রকারে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; নির্ম্মল তাহার শিক্ষায় উৎসাহিত হইয়া চূণ বালি দ্বারা সাজা পান খাওয়াইয়া, জলের গ্লাসে লবণ মিশ্রিত করিয়া, ধ্যানমগ্ন গৌরীশঙ্করের সম্মুখ হইতে ফুল গঙ্গাজল সরাইয়া লইয়া বন্ধুর বিশেষ সাহায্য করিল।

গৌরীশঙ্কর বালিকাদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া বরং প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাধের গৃহলক্ষ্মীটি এবার তাঁহাকে জুজুর মত ভয় না করিয়া বরং বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে দেখিয়া কতকটা আশস্ত হইলেন।

নির্ম্মলের মধ্যস্থতায় শান্তর একটু ভয় ভাঙিল, সুতরাং পরমানন্দে বৃদ্ধ গৌরীশঙ্করও বালিকা নির্ম্মলনলিনীর অকৃত্রিম বন্ধু হইলেন। মহাহর্ষে নির্ম্মলের দিন কাটিতে লাগিল। পল্লীগ্রামে আসিয়া নির্ম্মলের লাভ হইল,—অপ্রত্যাশিত দুটি বন্ধু ও মাসীমা ইন্দুমতীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্য।

ইহার পূর্ব্বে আর কখনো নির্ম্মল পল্লীগ্রামে আসে নাই; সুতরাং এখানকার সকলই তাহার চক্ষে নূতন, সুন্দর, বিস্ময়কর। জন্মাবধি দেখিয়া শুনিয়া যাহার মধ্যে শোভা বা বিস্ময়ের কিছু নাই ভাবিয়াছিল, সে সকলেই বন্ধুর অসীম প্রীতি দেখিয়া শান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কি দেখাইয়া শুনাইয়া বেড়ায়, নিশিদিন বন্ধুর চিত্তবিনোদন করিতে কতই না চেষ্টা করে। প্রতিদানে নির্ম্মল

কলিকাতা বেড়াইতে যাইবার দিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সার্কাস, বায়স্কোপ প্রভৃতি এক একবার এক এক রকম দেখাইয়া পুলক-বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়।

মামাবাবু ও মামিমার নিকট নির্ম্মল যখন নিয়মিত পাঠানুশীলন বা গীতবাদ্য শিক্ষা করে, প্রশংসমান দৃষ্টিতে শান্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া নিজের বর্ণপরিচয়খানি হাতে লইয়া বসিয়া থাকে, ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবে আমি কিছুতেই বন্ধুর যোগ্য নই। কোনোদিকে কোনো প্রকারে বন্ধুর যোগ্য নয়, তবু তাহার বন্ধু তাহাকে কত ভালবাসে ভাবিয়া নির্ম্মলের প্রতি তাহার ভালবাসা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, আর প্রাণপণে সে বন্ধুর যোগ্য হইবার চেষ্টা করে।

৫

আজন্মের বাসভূমি ও সঙ্গিনীদের ছাড়িয়া আসিয়াও যাহার সঙ্গ ও সৌহার্দ্দগুণে নির্ম্মল এতদিন অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর হইয়াছিল, সেই শান্ত একদিন তাহার কাছে বিদায় প্রার্থনা করিল!

বর্ণপরিচয়খানি শেষ হইবার পূর্ব্বেই শান্তর শ্বশুরবাড়ি হইতে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। অনেক কান্নাকাটির পর নিতান্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে শান্ত পাল্কীতে উঠিল। শান্তর নিকট বহু প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া রোরুদ্যমানা নির্ম্মল বড় অনিচ্ছায় বন্ধুকে বিদায় দিল।

এই অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদে দুটি কোমল প্রাণে কতখানি ব্যথা লাগিল সাংসারিক মানব তাহা বুঝিল না। নির্ম্মলের হর্ষরঞ্জিত মুখখানিতে বিষাদছায়া আঁকিয়া এই শোভাসম্পদপূর্ণ আনন্দময় গ্রামখানির সুখ, শান্তর সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলের নিকট কেমন ধীরে ধীরে বিদায় লইল কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

এদিকে শান্তর অভাবে নির্ম্মলের যেমন অশান্তি বোধ হইল, ওদিকে শান্তও বন্ধুর জন্য নিশিদিন ছটফট করিতে লাগিল। শ্বশুরালয়ে শত স্নেহাদরেও তাহার মনে তৃপ্তি আসে না। সে কারাবদ্ধা বন্দিনীর মত কেবল উদ্ধারের নানা উপায় চিন্তা করে। চারিদিক ঢাকা প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানা তাহার খাঁচার মত মনে হয়, একস্থানে শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে, মনে দারুণ অশান্তি আসে। জনহীন ঘরের মধ্যে সে অনাবশ্যক ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদে।

গৌরীশঙ্কর তাহাকে প্রফুল্ল করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও হতাশ হন, তাঁহার আদর যত্নের প্রতিদানে সে কেবল কয়েকবিন্দু অশ্রু উপহার দিয়া তাঁহাকে

ব্যথিত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। গৌরীশঙ্কর বুঝিতে পারেন বনের হরিণী বনে বনে মনের আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতে পাইলে সুখী হয়, স্বর্ণপিঞ্জরে মণিময় শৃঙ্খলে সে বদ্ধ থাকিতে চায় না।

*   *   *   *   *   *

ক্রমে জগৎবাবুর অবসরকালের অবসান হইয়া আসিল, তখনো শান্ত শ্বশুরালয় হইতে আসিল না। শান্তকে এখন আর তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। শান্ত এখন বড় সংসারের বউ, তাহার স্বামী বাড়ির কর্ত্তা ; বহু পরিজনের প্রতিপালক গৃহে শাশুড়ী নাই, ননদ ক্রমেই বৃদ্ধা হইতেছেন ; তাঁহার ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসিনী হইয়া একান্তমনে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া শান্তকে তিনি এই বৃহৎ সংসারের উপযুক্ত গৃহিণীপনা শিখাইয়া দেন। এখন হইতে নিজের কাছে না রাখিলে তাঁহার এ আশা পূর্ণ হয় না, সুতরাং শান্তর পিতা কন্যাকে আনিতে গিয়া দুইবার ফিরিয়া আসিলেন।

গৌরীশঙ্কর জ্যেষ্ঠ ভগিনীর মতের উপর অন্যমত প্রকাশ করিতে না পারিয়া, পরে নিজে সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবেন বলিয়া শান্তকে আশ্বাস দিলেন ; গৌরীশঙ্করের সহানুভূতি-সূচক বাক্যে শান্ত কতক পরিমাণে আশ্বস্তা হইল, সে দেখিল, যাঁহাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিলে সে গৃহ হইতে পলায়ন করিত যাঁহাকে সে দুচক্ষের বিষ দেখিত, এখন এই কারাগারে তাহার দুঃখে সহানুভূতি-শূন্য চারিদিকের এই অচেনা অজানাদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর বরং তাহার আপনার,—তাহার দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী।

৬

বন্ধুর আসার আশায় হতাশ হইয়া নির্ম্মল যখন ভাবিয়াছে,—তবে বুঝি বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হইল না,—সেই সময় সহসা একদিন শান্ত আসিয়া তাহার স্নেহালিঙ্গনে ধরা দিয়া তাহাকে আশাতীত আনন্দ দান করিল।

সে শুনিল, শান্তর করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া গৌরীশঙ্কর নিজেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। কৃতজ্ঞ-অন্তরে সহাস্যমুখে নির্ম্মল বন্ধুর বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছুটিল।

শান্ত আসিল, কিন্তু নির্ম্মলদের তখন গ্রামত্যাগের আর অর্দ্ধসপ্তাহ মাত্র বাকি! কত আকাঙ্ক্ষার পর প্রার্থিত দিন আসিল কিন্তু এমন অসময়ে! শান্ত তো কাঁদিয়াই আকুল ; সে পাগলী মেয়ে বলিয়া বসিল,—

"আর সকলে যান, বন্ধুকে আমি যেতে দেবো না; আমিও আর শ্বশুরবাড়ি যাবো না।"

এক একটা দিন এক এক নিমেষের মত কাটাইয়া নির্ম্মল শান্তর নিকট বিদায় চাহিল—

আবার সেই মোটর-গাড়ি একখানা বাগানের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার আর বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে নয়—অশ্রুজলে দৃষ্টিহারা হইয়া শান্ত ও নির্ম্মল পরস্পরের নিকট বিদায় লইল। এক শো' মাথার দিব্য দিয়া শান্ত বলিয়া দিল,—"এসো বন্ধু আর একটিবার এসো ভুলো না।"

বিদেশী লোক বিদেশে চলিয়া গেল, ইহাতে আর কাহারো বড় এল গেল না, বালিকা শান্তই একা বন্ধুর বিচ্ছেদ-বেদনায় ব্যথিত হইতে লাগিল। তাহাদের কুটীর-পার্শ্বের শূন্য বাগান-বাড়িটা, সারা গ্রামখানা শতবার শতরূপে বিদেশিনী বন্ধুর স্মৃতি জাগাইয়া যেন বলিতে লাগিল—নাই গো নাই, আজ সে নাই। শান্তর মনে হইতে লাগিল, এই বুঝি শেষ; জীবনে আর বুঝি সে তাহার বন্ধুর দেখা পাইবে না, সে হাসি সে গান সে মধুমাখা কথা আর সে শুনিতে পাইবে না। শান্ত যত ভাবে ততই তাহার প্রাণ ব্যাকুল হয়, নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠে, সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় আর গোপনে চোখের জল মুছে।

প্রবাসী জগৎবাবু নির্ম্মলকে কলিকাতায় রাখিয়া স্বাস্থ্যলাভে হৃষ্ট ইন্দুমতীকে লইয়া কর্ম্মস্থান মিরাটে ফিরিয়া গেলেন। বিদ্যালাভাশায় নির্ম্মল আত্মীয়বন্ধু হইতে দূরে শিক্ষয়িত্রীদিগের তত্ত্বাবধানে ছাত্রী-আবাসে থাকিয়া ছাত্রী জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে আরম্ভ করিল।

দীর্ঘ ছুটি বৎসর অনুক্ষণ যাহারা পরস্পরের সাথী হইয়াছিল, সেই বন্ধুদ্বয়ের মাঝে নদী, বন, গ্রাম নগরের ব্যবধান পড়িল। ভবিষ্যতে কখন এই স্মৃতি মধুর গ্রামখানিতে বেড়াইতে আসিয়া শান্তর পিত্রালয়ে সাক্ষাৎ পাওয়া ভিন্ন লিখনানভিজ্ঞা শান্তর নিকট হইতে নির্ম্মলের একখানি পত্রেরও আশা রহিল না।

নির্ম্মল শৈশবে মাতৃহীনা। পিতা জীবিত আছেন কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানাদি লইয়াই ব্যস্ত, নির্ম্মলের সংবাদ রাখিবার তাঁহার অবসর বা আবশ্যক হয় না। নির্ম্মল অতি শৈশবে মাতার মৃত্যুশয্যায় একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিল মাত্র, পিতার যত্নাদর পাওয়া কোনোদিন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু জন্মাবধি মাতুলের যত্নাদর যে পরিমাণে সে পাইয়া আসিতেছিল; মামীমার নিকট যে অতুল মাতৃস্নেহ উপভোগ করিতেছিল তাহাতেই সে তৃপ্ত ছিল, পিতামাতার

অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। মামা-মামি নির্ম্মলের পিতামাতার ও নির্ম্মল তাঁহাদের সন্তানের স্থান অধিকার করিয়াছিল, কাহারো মনে অভাব-জনিত কিছু ক্লেশ—কোনো ক্ষোভ ছিল না। এখানে আবার শান্তর মত অকৃত্রিম বন্ধু তাহার ভগিনীর স্থান পূর্ণ করিয়াছিল। তাই শান্তর বিচ্ছেদ অনেকটা মামা মামীর বিচ্ছেদের মতই নির্ম্মলকে অশান্ত ব্যথিত করিতে লাগিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

প্রয়াগ-প্রবাসিনী।

দাসের আত্ম-কথা

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যখন প্রথমবারে প্রিয়বন্ধু ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শশিপদ বাবুর বাড়ি গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ভাবে আলাপ হয় নাই। সে ১২৯২ সালের কথা। * তারপর ২।৩ বৎসরের মধ্যে শশিপদবাবু কর্ম্মময় জীবনে ক্রমশ অগ্রসর হইয়াছেন। যখন তাঁহার বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের কার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিতেছিল, তখন আমার ভগ্নীকে সেখানে রাখা সূত্রে তাঁহার সহিত আমার প্রথম ও একটু বিশেষ পরিচয় হইল। সে কথা আমি গতবারে বলিয়াছি। এখন তাঁহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

যে ঘটনা-সূত্রে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় তাহার মধ্যেই আমি তাঁহার স্বভাবে একটি বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সেটি কঠিন এবং কোমল ভাবের আশ্চর্য্য সমাবেশ। আমার ভগ্নীকে তাঁহার আশ্রমে রাখা সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে কর্ত্তব্যানুরূপ সাধারণ নিয়মেই ঠিক কার্য্য করিলেন। আবার যখন শুনিলেন আমি ধর্ম্মার্থে সম্বলহীন, তখন আমাকে আর্থিক দায়িত্ব হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া দিলেন।

প্রথম পরিচয় কালে আমি তাঁহার প্রকৃতির যে বিশেষত্ব দেখিয়াছিলাম, তারপর যত রকমে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সংস্পর্শে গিয়াছি, আগাগোড়া তাঁহার ঐ মৌলিক স্বভাবেরই পরিচয় পাইয়াছি। তিনি কর্ত্তব্য-পথে অত্যন্ত

---

* ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "কুশদহ"র ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কঠিন, দৃঢ়নিষ্ঠ—কখনো কাহারো কথায় চলিবার নহেন, তা ছাড়া নিন্দা, নির্য্যাতন ক্ষতি—যত বাধাই আসুক না কেন, কিছুতেই তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবার নন। তিনি কর্ত্তব্যের বাহিরে একটি পয়সাও ব্যয় অন্যায় মনে করেন, আবার কর্ত্তব্যের পথে উদার—মুক্তহস্ত।
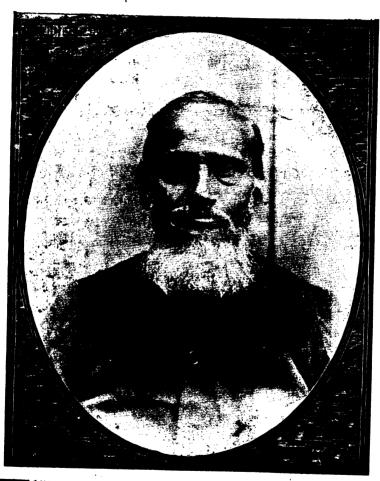
শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতার উত্তর বরাহনগর গ্রামে ১২৪৬ সালের মাঘ মাসে ইংরাজী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি) শশিপদবাবুর জন্ম। * ইঁহার পিতা স্বর্গীয়

* বর্ত্তমানে ইঁহার বয়ক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছে। ইনি এখনো কর্ম্ম করিতেছেন।

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা গঙ্গামণি দেবী। ইঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাস বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে। শশিপদবাবুর উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ আকিঞ্চন ব্রহ্মচারী নামা জনৈক ধর্ম্মশীল মহাত্মা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বরাহনগর গঙ্গাতীরে থাকিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ক্রিয়ার কথা প্রচলিত আছে। যাহাহউক তিনি যে একজন যোগীপুরুষ ছিলেন, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। এখনো তাঁহার সেই কুটীরের স্থান বরাহনগর অধিবাসিগণ সসম্মানে নির্দ্দেশ করেন। মহাত্মা অকিঞ্চন ব্রহ্মচারীর ভ্রাতৃপুত্র রামরাম বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একবার গঙ্গাস্নান-উপলক্ষ্যে বরাহনগর আগমন করেন। এবং কোনো কারণে এই হইতে তিনি বরাহনগরের অধিবাসী হইয়াছিলেন।

শশিপদবাবু পাঁচবৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তিনি প্রথমে পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পারিবারিক অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ৮৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

প্রথমাবস্থা হইতেই তাঁহার মনে একটি সত্যের ভাব—ন্যায়ের ভাব প্রকাশ পায়। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, বিবাহে পণ-গ্রহণ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ কথা কিন্তু সে ষষ্ঠতিতম বর্ষ পূর্ব্বের কথা—আজ যে পণ-প্রথা নিবারণের জন্য কত চেষ্টা চলিয়াছে, তিনি সহজ জ্ঞানে এই অন্যায় কার্য্য নিজের জীবনে হইতে দেন নাই। অবশ্য তাঁহার বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়াছিল।

বিবাহের কিছুদিন পরেই তিনি বুঝিলেন, তাঁহার বালিকা স্ত্রীকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। জীবনের যাবতীয় মহত্তর কার্য্যে—যাবতীয় উন্নত আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে সঙ্গিনী করিতে হইলে বিদ্যাহীন অবস্থায় তাহা সম্ভবে না। সে সময়ে সম্মিলিত পরিবারে স্ত্রীর সহিত স্বামীর দিবসে সাক্ষাৎ হওয়াই নিন্দার কথা ছিল। তাহার উপর স্ত্রীকে স্বামী নিজে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত উপহাসের বিষয় ছিল। তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এমন কি স্ত্রীকে কেবল লেখা-পড়ায় নয়, এতদূর উন্নতমনা করিয়াছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে যখন ইংলণ্ডে গমন করেন তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করেন। তখন তাঁহার মধ্যম পুত্র (ঐ একমাত্র পুত্রই এখন বর্ত্তমান) এ্যালবিয়ান রাজকুমার, যিনি সিবিলিয়ান হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে কোচিন রাজ্যের দেওয়ান পর্য্যন্ত হইয়াছেন তিনি

ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বিধাতার বিধানে শশিপদবাবুর এই প্রথম পত্নী অল্প কালেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

শশিপদ বাবুর কর্ম্মময় জীবনে বুঝি একাকী চলা বিধাতার ইচ্ছা নয়, তাই তিনি আর এক ধর্ম্মশীলা সেবাপরায়ণা সুশিক্ষিতা নারীকে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ছয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যমা বনলতা দেবী "অন্তঃপুর" মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। তাঁহার সকল কন্যাগুলিই গুণবতী আদর্শচরিতা হইয়াছিলেন। এ-সকলই শশিপদ বাবুর শিক্ষার ফল। তাঁহার দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিনী, বিধবাশ্রমের কত বিভিন্ন প্রকৃতির অগঠিতমনা নানা শ্রেণীর বিধবা এবং সধবাগণ—কাহারো কাহারো সঙ্গে ২।১টি সন্তান থাকিত। এই প্রকার অবস্থায় নিজের মেয়েদের লইয়া সমানভাবে সকলের মাতৃবৎ হইয়া ঠিক এক পরিবারভুক্ত সন্তান-সন্ততির ন্যায় সকলকে পরিচালনা করিতেন। আমার ভগ্নীকে দেখিতে গিয়া কতদিন আশ্রমের প্রতি তাঁহার কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। আজ তিনি পরলোকে—কিন্তু তাঁহার দেবী প্রকৃতির কথা আজো আমার মনে জাগরূক আছে। কন্যাগণের মধ্যে দুইটিমাত্র জীবিতা, আর সকলেই পরলোকে। ইন্দুবালা নাম্নী একটি কুমারীকন্যার জীবনে অল্প বয়সেই আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।

শশিপদ বাবু জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনই বিচলিত হন নাই। তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেবাব্রতে চির অটল থাকিয়া শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন। কোনো বিষয়ের জন্য কখনো কেহ তাঁহাকে অবসন্ন হইতে দেখেন নাই। শশিপদ বাবুর জীবনে আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, যিনি একদিন দৈন্যের পীড়নে শিক্ষা ত্যাগ করিয়া ৮৲ টাকা বেতনের কার্য্যে বাধ্য হন, তিনি সেই সামান্য অবস্থা হইতে পর জীবনে লক্ষাধিক মুদ্রা কেমন করিয়া সেবাকার্য্যে ব্যয় করিয়া আসিলেন! ইহাকেই বলে যোগবল! অবশ্য তিনি দীর্ঘকাল গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে চাকরীও করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তো অনেকেই করেন, কিন্তু এরূপ মিতাচারী মিতব্যয়ী সংযমী সৎকর্ম্মশীল কয়জন হইয়াছেন?

শশিপদ বাবুর জীবনের আর একটি বিশেষ কাজ শ্রমজীবী গরীব জনসাধারণের উন্নতি সাধন করা। এসম্বন্ধে তিনি আজীবন যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে।

এক সময় সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার সুফল এখনো বরাহনগর অঞ্চলের অধিবাসিগণ ভোগ করিতেছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে—সেই কোন্ সময় বালিকা স্ত্রীর শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিধবাশ্রম পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী জাতির দুঃখ মোচনের জন্যও তাঁহার আজীবন চেষ্টা চলিয়াছে।

তারপর তাঁহার জনসেবার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি এক অখণ্ড প্রেমের চক্ষে সকলকে দর্শন করিয়া সকলেরই সেবা করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে অতি নীচ ব্যক্তি বলিয়া যাহারা সমাজে গণনীয় তিনি তাহাদিগের প্রতিও কর্ত্তব্য পালনে কুণ্ঠিত হন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার অনুষ্ঠিত একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি,—ফুলঝারি নামক একজন মেথর ও তাহার স্ত্রী শশিপদবাবুর বাটীতে কাজ করিত। এই মেথর-দম্পতি বড়ই ভালো লোক ছিল। তাহারা কখনো উচ্চৈস্বরে কথা পর্য্যন্ত কহিত না। এক সময় ফুলঝারী অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহারা মেথরদিগের ব্যারাকে বাস করিত। শশিপদবাবু তাহার অসুখের কথা শুনিয়া মনে করিলেন, আমার কোনো বন্ধুর অসুখ হইলে আমি তাহাকে দেখিতে যাইতাম। এই মেথর আমার যেরূপ সেবা করে সেরূপ সেবা আর কেহই করিতে পারে না। তাহার এই অসুখের সময় তাহার প্রতি কি আমার কোনো কর্ত্তব্য নাই? দুই দিন এই চিন্তা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তৃতীয় দিনে তিনি পোষাক পরিয়া কলিকাতায় আসিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে কে যেন আঘাত করিয়া বলিল, "কৈ তুমি তো গেলে না," শশিপদবাবু সেই বেশেই ব্যারাকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মেথরেরা শশিপদ বাবুকে দেখিয়া একেবারে চমকিত ও বিস্মিত হইয়া উঠিল। তিনি ফুলঝারির বিছানার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ও অর্থ সাহায্য করিয়া আসিলেন।

এইবার তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করিব। কারণ তাঁহার সুবিস্তৃত কর্ম্মময় ও নিগূঢ় ধর্ম্ম-জীবনের বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। বিশেষত ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বহুতর সংবাদপত্রে ও পুস্তকে স্বদেশ ও বিদেশগত বহু মনস্বী জনের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও প্রকৃতপ্রস্তাবে এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-চরিত লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু কতকগুলি গ্রন্থে প্রসঙ্গ-ক্রমে তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ,

ভাগবতরত্ন মহাশয় "নবযুগের সাধনা" নামক গ্রন্থে শশিপদবাবুর জীবনাদর্শ যে প্রকার চিত্রিত করিয়াছেন, হয় তো তাহা বর্ত্তমানে সকলের মতের সহিত সকল কথা অনুমোদিত নাও হইতে পারে, সে কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—তবে এই গ্রন্থ যে দেশের হিতার্থে শশিপদ বাবুর জীবনাদর্শ অবলম্বনে লিখিত, অন্ততঃ সে জন্যও শিক্ষিত এবং ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধাই ব্যক্তিমাত্রেরই একবার পাঠ করা উচিত।

শশিপদ বাবুর ধর্ম্মভাবের প্রথম কথা প্রার্থনা, তিনি একমাত্র প্রার্থনার দ্বারাই সকল কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লন্, যখন যে অভাব হয়—প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল। দ্বিতীয় ভাব উদারতা। বর্ত্তমান যুগে প্রাচীনের সহিত নব আদর্শের সংঘর্ষে যে সকল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে; তাহার সংস্পর্শে তাঁহার মনকে যে অনেক সময় প্রবুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই আদর্শ রাজর্ষি রামমোহন হইতে যে সকল প্রধান প্রধান স্বাধীন চিত্ত মহাত্মা-গণের ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া আসিয়াছে, মনে হয়, শশিপদ বাবুর ধর্ম্মভাবও সেই নব আদর্শের একটি অভিনব অংশবিশেষ।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শশিপদবাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া বরাহনগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনায় তাঁহার আত্মিয় স্বজন পরিবারবর্গের মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। এজন্য তিনি সমাজচ্যুত ও ছয় পুরুষের বসতবাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট চিরদিন প্রিয় হইয়া আসিয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ তিনি উচ্চ ভাবেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি মৌলিক আদর্শও তাঁহার অন্তরে জাগরূক হইয়া আসিয়াছে, সেই আদর্শে কোনো দিন সংকীর্ণতার লেশমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি যেমন ব্রাহ্মসমাজকে দেখিয়াছেন তেমনই হিন্দুসমাজ, খৃষ্টীয়সমাজ, মুসলমানসমাজ প্রভৃতি সকল সমাজের এবং সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে মৌলিক সত্য আছে, এই বিশ্বাসটিই যেন তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাই তিনি ১২৮১ সনে বরাহনগরে একটি "সাধারণ সভা" স্থাপন করেন। এই ধর্ম্ম সভায় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বসিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবেন, কিন্তু কেহ অপর ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারিবেন না। কত দিন পরে, আমেরিকার মহাধর্ম্ম সম্মিলন সভা (রিলিযান অব পার্লামেণ্ট) এই ভাবেরই পরিচায়ক। শশিপদবাবুর এই ভাবের পরিণতি শেষ জীবনে "দেবালয়"। সর্ব্বধর্ম্ম সম্মিলনের স্থল দেবালয় সমিতির কার্য্য কিরূপ সফলতা

লাভ করিয়াছে তাহা আজ জগৎ সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান যুগ সম্মিলনের যুগ। সেই আজ সকল বিভাগেই সম্মিলনের ভাব দেখা যাইতেছে। কিন্তু সকল সম্মিলনের মূল ধর্ম্ম সম্মিলন। রাজারামমোহন ধর্ম্ম সম্মিলনের মূল একটী দেখাইলেন। সকল ধর্ম্মের মূলে সেই একই সত্য রহিয়াছে। তারপর সেই ধর্ম্ম সমন্বয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের চরিত্রে প্রকাশ হইল। সমন্বয়ের চরিত্র বুঝিতে হইলে কেশবের দিকে তাকাইতে হইবে। সমন্বয়ের চরিত্র লাভ করিতে হইলে ঐ আদর্শ-বীজ ধারণ করিতে হইবে। সমন্বয় চরিত্র কেবল নিজের জীবনে নয়, কেশবচন্দ্র জগতের জন্য তাহার একটি নমুনাও প্রস্তুত করিয়া গেলেন, ইহাই তাঁহার "নববিধান মণ্ডলী"। শশিপদবাবুর জীবনে সেই সমন্বয়ের আর একটি পূর্ণতার বীজ প্রথম হইতে ছিল, যাহার প্রকাশ ধর্ম্ম "সাধারণ ধর্ম্মসভা" নামে প্রথমেই সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তখন সে ভাব জন সাধারণে প্রকাশের সময় না হওয়ায় এবং সেবাব্রত মহাশয়ের কর্ম্মময় জীবনের অন্যান্য কার্য্যাবলী সংসিদ্ধ হইবে বলিয়াই যেমন তাহার প্রকাশ প্রচ্ছন্ন ছিল। যথা সময়ে „দেবালয়" রূপে তাহার প্রকাশ হইল। এই কার্য্যে তিনি একেবারেই আত্ম নিয়োগ করিলেন। তাই প্রথমেই নিজের একখানি চৌতল বাটী ও তাহার সমস্ত আয় দেবালয় সমিতির জন্য উৎসর্গ করিয়া জগত সমক্ষে এই "মহামিলন মন্দিরের" দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। এখানে কেবল সমন্বয়ের চরিত্রেই নয়—পুরাতন যত যত বিভিন্ন চরিত্র আজো পৃথিবীতে এক একটি সম্প্রদায়রূপে কাজ করিতেছেন সকলেই একাসনে বসিয়া আপন আপন মূলসূত্রের কথা বলিবেন এবং শুনিবেন। তাহার ফল কি হইল? ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভ্রম কুসংস্কার দূরের একটি পথ হইল। মানুষ বুঝিল ধর্ম্মে ধর্ম্মে তো কোন ভেদ নাই? সকলের মূলেই তো সত্য রহিয়াছে। দেবালয় সমিতি শশিপদ বাবুর জীবনের উদার ধর্ম্মাদর্শের আর এক অভিনব প্রকাশ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মনে হয় এখন জগদ্বাসী এই মহামিলন মন্ত্রেরই অনুসরণ করিবেন। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভট্টপল্লি পণ্ডিত মণ্ডলী "সেবাব্রত" উপাধীদান করিয়াছিলেন।

আমি এমন মহাত্মার সহিত পরিচিত হইয়া ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম জীবনে প্রভূত উপকৃত হইয়াছি, ইহা আমি আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তি বোধ করিতেছি।

হল্‌দিঘাট

পবিত্র ভীষণ মূর্ত্তি তোমার সে দিন,
প্রতাপের পদরজঃ ধরিলে উরসে
যে দিন হল্‌দিঘাট!—বীররক্ত-রসে
পিচ্ছিল হইল তব উরস কঠিন!—
স্বর্গ হ'তে রণচণ্ডী আইলা যে দিন,
ল'য়ে সঙ্গে শত শত শৃগালে বায়সে!
সিংহনাদে, ভেরীনাদে, মুক্ত বিহায়সে,
তব বক্ষে প্রতাপের পতাকা উড্ডীন!
গেছে দিন গেছে ছবি পবিত্র ভীষণ!
কিন্তু সে দিনের স্মৃতি এখনো পড়িয়ে
রেণুতে রেণুতে তব, মাতায় জীবন!
কালের কঠিন চক্রে যদিও পড়িয়ে
গুঁড়া হ'য়ে যাও, শৈল সমর প্রাঙ্গণ,
রবে তীর্থরূপে তুমি স্মৃতিতে জড়িয়ে!

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পথের সম্বল—প্রথম ভাগ। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত। এস্ ব্যানার্জ্জি দ্বারা ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট ইম্পিরিএল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৷০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার নববিধান প্রচারক, এবং ভক্ত সাধক ব্যক্তি। ইঁহার প্রণীত বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। "পথের সম্বল" তাঁহার সুমধুর লেখনী প্রসূত শেষ ফল। ৬৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তক খানিতে মানব জীবনের যত প্রকার অবস্থা হওয়া সম্ভব, ঈশ্বর বিশ্বাসীর পক্ষে কোন্ অবস্থায় কি ভাব হওয়া উচিত তাহার একটি সুন্দর আদর্শ ধরিয়া ছোট ছোট কবিতা ও প্রার্থনা দ্বারা সেই সকল ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি

গীতা, ভাগবতের ন্যায় গৃহস্থ ব্যক্তির নিত্য পাঠ্য। বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের কোমল প্রাণে ভগবৎ ভক্তির বীজ রোপণ করিতে বিশেষ সহায় হইবে। আমরা ইহার একটি কবিতা ও একটি প্রার্থনা এবার "কুশদহ"র প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পুস্তকখানি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওরায় উহার মূল্য অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গোবরডাঙ্গা গৈপুর হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র (এল, এম, এস) "বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বর নামক একটি সারগর্ভ গবেষণা পুর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; তাহাতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি কাল এবং তাহার ধারাবাহিক প্রশার ও প্রকোপ বিবরণ ও তন্নিবারণার্থে গভর্ণমেণ্টের বিবিধ চেষ্টা প্রধান প্রধান সম্বন্ধে ইংরাজ চিকিৎসগণের ম্যালেরিয়া সর্ব্বজ্ঞ অনু-স্বান ফল ও বিভিন্ন মতামতের সমাবেশে প্রবন্ধটী সুপাঠ্য হইয়াছ। দুঃখের বিষয় কুশদহে স্থানাভাবে ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারা গেল না। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার ইতিহাস প্রকাশের মত প্রয়োজন না হউক, তাহার প্রতিকারে জন সাধারণের উদাসীনতা কিসে দূর হইতে পারে সেই বিষয় বলিবার লিখিবার, ভাটিবার, সবমধিক প্রয়োজন হইয়াছে। লেখক প্রবন্ধের শেষে সার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা এই,—ম্যালেরিয়ার নিদান সম্বন্ধে মনীষীগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হইলেও যাহাতে প্রতিগ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায়, জল নিকাশের ব্যবস্থা হয়, পুরাতন পয়ঃ-প্রবাহগুলি সুসংস্কৃত হয়, অর্দ্ধ মৃত নদ নদীগুলি অপেক্ষাকৃত সুপ্রসর ও স্রোতস্বিনী হয়, ঘন বন জঙ্গল মসকের আবাস ভুমি পরিস্কৃত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

সাহায্য-প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ ঘোষ, মহাশয় কুশদহ বাসী নহেন। "কুশদহ"র একজন সাধারণ গ্রাহক মাত্র। তিনি "কুশদহ" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া এবং সম্পাদকের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ "কুশদহ"র ঋণ শোধার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া ১০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এ সময় তাঁহার এই দানের মধ্যে ভগবানের করুণা দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি তিনি দাতার প্রাণে আরো সদ্ভাব বৃদ্ধি করুন।

৩২শে আষাঢ় হইতে ৩২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সাহায্য-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র কুণ্ডু	গোবরডাঙ্গা	২৲
,, যোগীন্দ্রনাথ দত্ত	খাঁটুরা দত্তবাটী	২৲
,, প্রমথনাথ বসু	রাঁচি	২৲
,, পতিরাম চট্টোপাধ্যায়	এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার, কাশ্মীর	৫৲
,, সচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	জমিদার, গোবরডাঙ্গা	২৲
,, খগেন্দ্রনাথ পাল	বাগবাজার	২৲
,, রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর		২৲
,, নিমাইচরণ ঘোষ	২৭, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট	১০৲
,, কালিদাস কুণ্ডু	গোবরডাঙ্গা	২৲

ভ্রম সংশোধন

—:০:—

শ্রাবণ মাসের "কুশদহে" ১৪২ পৃষ্ঠার তৃতীয় প্যারার ১ম লাইনে "বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অল্প." ইহার স্থলে বঙ্গদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

পৃথিবীর নৃপতিবৃন্দ

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস, কলিকাতা

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ	আশ্বিন, ১৩২১	ষষ্ঠ সংখ্যা

ভিক্ষা

হে মাতঃ জগত জননী! আদিকালে সাধকগণ তোমাকে অগ্নিতে জলেতে শক্তিরূপে দর্শন করিয়া বলিলেন, "যোদেবোগ্নৌ যোঽপস্থু যোবিশ্বং ভুবন-মাবিবেশ" অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইত্যাদি। তারপর আত্মাতে পরমাত্মা সনাতন পুরুষরূপে ঋষিরা তোমাকে দেখিয়া বলিলেন "ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" তারপর তুমি তোমার মানব সন্তানের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ট ভাব প্রকাশ করিবার জন্য সন্তানত্ব দান করিয়া এমন একজনকে পাঠাইলে যিনি তোমাকে পিতা বলিয়া মুগ্ধ হইলেন। তোমার ইচ্ছা জানিয়া আত্ম বলিদান করিয়া বাধ্যপুত্রের অদ্ভুত দৃষ্টান্তে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় চরিত্র স্থাপন করিলেন। তাহার পূর্ব্বে সাধকগণ তোমাকে যে পিতা বলিয়া ডাকেন নাই তাহা নহে ;—ঋষিরা বলিয়াছিলেন, "ওঁ পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা। কিন্তু তখন এমন করিয়া পুত্রত্ব প্রকাশ পায় নাই। তারপর দাসের ভাব—মধুরভাব আরো কতই ভাবে তুমি তোমার স্বপ্রকাশ রূপ প্রকাশ করিলে। এখন আমরা তোমাকে মা বলিয়া জননী বলিয়া ডাকিতেছি, সত্যই তুমি আমাদের মা।

আমরা তোমার আদেশ জানিয়া তোমারই ঈঙ্গিতে কার্য্য করিতেছি, এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে পৃথিবীর উত্তপ্ত বায়ুতে আমাদের শরীরের চর্ম্ম উষ্ণ হইয়া উঠে। চারিদিকের অবিশ্বাসের প্রবল

ঝটিকায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসে। অনেক সময় মন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু মা, যখন তোমার চরণতলে গিয়া পরিশ্রান্ত প্রাণ শান্তিলাভ করে—তোমার অমৃতধারায় প্রাণ অভিষিক্ত হয়, তখন তোমার জগতের দিকে আবার সপ্রেম দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। তখন জগদ্বাসি নরনারীর দুঃখ দুর্গতির ছবি হৃদয়ে সমুদিত হইয়া প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশানুভব হয়। তখন দিব্য চক্ষে দেখি, মা আমারা সককেই যে, তোমারই সন্তান, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কেন দূরে যাইতেছি।

জননী আজ উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়া তোমাতে বিশ্বাসী তোমার সন্তান সন্ততিগণের সঙ্গে বসিয়া তোমার চরণ পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া একি দৃশ্য দেখিতেছি।*

কয়েকদিন হইতে বর্ত্তমান ভীষণ যুদ্ধের কথা ভাবিতেছিলাম। নরশোনীতে আবার পৃথিবী প্লাবিত হইবে জানিয়া প্রাণ চঞ্চল হইতেছিল। অল্পে অল্পে যে আভাস আসিতেছিল, আজ সে দৃশ্য একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। মা, একি দৃশ্য! অসংখ্য নরশোনীতে আজ ধরণীর ধূলা কর্দ্দমাক্ত হইবে? কি ভীষণ দৃশ্য! কত বালক বালিকা রমণী অনাথ হইবে। কত পিতা মাতা আজ পুত্র হারা হইবে, কি ভয়ঙ্কর এই রণস্থল।

জননী আর একদিকে তোমার মধ্যে আমরা কি দেখিতেছি, এই তো তোমার প্রেম-রাজ্য, মহা মিলনের রাজ্য; এ রাজ্য কি মিথ্যা! কল্পনা? পৃথিবীর অহঙ্কার দম্ভ, হিংসা স্বার্থপরতার রাজ্যই কি সত্য? কোন্ রাজ্য লাভ করিলে মানুষের মন তৃপ্ত হয়? সে আভাস কি তুমি পৃথিবীকে দাও নাই, তুমি কি তোমার স্বর্গ রাজ্যের ঘোষণা নরনারীর নিকট কর নাই? জ্ঞান সভ্যতায় মানুষের সম্পূর্ণ উন্নতি হইল না, এখনো জগতের পূর্ণ সভ্যতা লাভ হয় নাই, মনুষ্যত্ব এবং পশুত্বের সংগ্রাম এখনো চলিয়াছে। কিন্তু জননী তোমার প্রেম রাজ্যই সত্য। তাহারই জয় হইবেই হইবে। জননী, আজ এই লক্ষ লক্ষ প্রাণীহত্যার দৃশ্য অন্তর-চক্ষে দর্শন করিয়া প্রাণ বড়ই কাতর হইতেছে। এ কাতরতা কেবল তুমিই দেখিতেছ। তুমি ইহার প্রতিবিধান কর। জানি আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ কণ্ঠের রব কত মৃদু। তবুও তোমার চরণতলে একবিন্দু অশ্রুর মূল্য সামান্য নহে। আজ যে এই জন্য আমাদের প্রাণ সহজেই কাতর হইতেছে, তাহাতে আমরাও কৃতার্থ হইলাম, এবং সেই ভরসাতেই

* ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৬ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনার মধ্যে প্রকাশিত ভাব অবলম্বনে লিখিত।

তোমার চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি ; যদি সম্ভব হয় তুমি এই সমরানল শীঘ্রই নির্ব্বাপিত কর। জননী, আমাদের এ বিশ্বাসও আছে যে, এই বিবাদের পরিণাম ফল মহামিলনের দিকেই লইয়া যাইবে। তোমার প্রেমের জয় হইবেই।

মা

আবার বৎসর পরে,　　বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে,
মা নাম মধুর স্বরে গায় নরনারী ;
আহা কি মধুর নাম,　　শান্তিপ্রদ প্রাণারাম
শুনিলে যুড়ায় প্রাণ চক্ষে বহে বারি।

জলন্ত বাসনানলে,　　দিবা নিশি হিয়া জ্বলে,
অনন্ত শান্তির জলে কর গো নির্ব্বাণ ;
ভকতজন বাঞ্ছিত,　　তোমার চরণামৃত,
তারি তরে পিপাসিত আমার পরাণ।

মাতৃহীন শিশুপ্রায়,　　কত দিন হায় হায়,
করিব গো, যাতনায় তব অদর্শনে ;
তোমার প্রসন্ন মুখ,　　নিরখি পাসরি দুঃখ
সশরীরে স্বর্গসুখ পায় ভক্তগণে।

তোমা লাগি কত জন,　　করে কত আয়োজন,
তবু কেহ দরশন না পায় তোমার ;
কিছুতে নাহিক হয়,　　রিপু ছয় পরাজয়,
পাষাণ সমান রয় হৃদয় অসাড়।

কি ফল লভিনু তবে,　　পূজি দেবী তোমা সবে,
চির দিন যদি ভবে এই ভাবে যায় ;
মহাশক্তি ভগবতী,　　দয়াময়ী মহাসতী,
কাতরে করি মিনতি রাখ রাঙ্গাপায়।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।
(পথের সম্বল)

কুশদহের ইতিহাস

রত্নমালার বিবাহ

পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যভাগে কামদেব ও জয়দেব স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত গুড়বংশীয়েরা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ষোড়শশতাব্দের প্রথমার্দ্ধে লাউজানি ও বেনাপোল ধ্বংসের সহিত গুড়বংশীয়গণের প্রভুত্বলোপ ঘটে। হিন্দুরাজত্বের শেষ সময়ে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে গুড়বংশীয়েরা প্রবল হইয়াছিলেন। রাঢ় মুসলমান হস্তে পতিত হইলে অনেক উচ্চবংশীয় হিন্দু গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সরকার সপ্তগ্রাম ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাগে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দের প্রথমভাগে মুসলমানেরা অধিকার করেন। কিন্তু ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে—তাঁহারা চতুর্দ্দশ শতাব্দের—প্রথমভাগের পূর্ব্বে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১৩০৭ শতাব্দে তাঁহারা গঙ্গায় পূর্ব্বধারে লাউপালা সিমহাট গ্রামে যে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, ইহাই বোধ হয় এতদঞ্চলে অধিকার স্থাপনের প্রথম নিদর্শন। প্রবাদ আছে গুড়বংশে ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাগে রঘুপতি আচার্য্য—(কনকদন্তী) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার যোগবল ছিল। তৎপ্রভাবে তিনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা বোধ হয় যে, এতদঞ্চলের বিরলবসতি ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থা দেখিয়া মুসলমানেরা জয়ের যোগ্য মনে করেন নাই। সে যাহা হউক যতদিন নবাব খাঁ জাহান আলীর আবির্ভাব না হইয়াছিল ততদিন হিন্দুগণ সুখে ছিলেন। নবাব সাহেব ও তাঁহার উজিরের অত্যাচারে ব্রাহ্মণ-সমাজ নিতান্ত বিপন্ন হইল। কেবল যে জয়দেব ও কামদেব মুসলমান হইলেন তাহা নহে। সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ আলোড়িত হইতে লাগিল। অবশ্য তখন কুলীন-ব্রাহ্মণেরা বিক্রমপুর ও বাকলা প্রভৃতি স্থানে ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আসিয়া গঙ্গাতীরে বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ শেষ হিন্দুরাজার হস্তচ্যুত হইলে কনোজীয় কুলীন ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইচ্ছামতী ও ভৈরবের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তৎকালে তাঁহাদের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। এতদঞ্চলে শ্রোত্রিয় ও বংশজগণের অধিক বসতি

ছিল। তাঁহারা মহম্মদ তাহেরের অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইলেন ও কিরূপে হিন্দুয়ানী রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কামদেব ও জয়দেব পৃথক বাটীতে বাস করিতে মনস্থ করিয়া মাগুরা গ্রামে বাসভবন প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। পৈতৃক বাটীতে তাঁহাদের আর দুই ভ্রাতা রতিদেব ও শুকদেব বাস করিতেন। তাঁহাদের একটি অবিবাহিতা ভগিনীও ছিল। তাহার নাম রত্নমালা। রতিদেব বনের স্বর্ণ বিষয় সম্পত্তি সমস্তই কনিষ্ঠ শুকদেবকে দান করিয়া ভৈরবতীরে যাইয়া সামান্যভাবে বাস করিতে লাগিলেন। পৈতৃক বাটীতে কার্য্যোপলক্ষে জয়দেবকে কখন কখন যাইতে হইত। কাজেই আত্মীয় স্বজন সকলেই—শুকদেবকে সংস্রব দোষে দুষ্ট মনে করিয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিপদ বুঝিয়া কামদেব আ[illegible] নূতন বাটীতে লইয়া আসিলেন। এ সময় রত্নমালা বিবাহযো[illegible]। যদিও সে সময় মেল বন্ধন হয় নাই, বিবাহেরও কড়াকড়ি [illegible], তথাপি কেহই সুন্দরী সর্ব্বগুণান্বিতা রত্নমালাকে বিবাহ করিতে [illegible]। বহু অর্থলোভ দেখাইয়াও শুকদেব কোন ব্রাহ্মণকে ভগিনী গ্রহণে [illegible] রতে পারিলেন না। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি নিতান্ত ঈশ্বর পরায়ণ ছিলেন, এজন্য চেষ্টা ছাড়িয়া ভগবানের নিকট বিপদুদ্ধারের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ভগবানও নিজের দয়াল নামের মহিমা দেখাইবার জন্যই যেন একদিন এক কুলীন ব্রাহ্মণকে তাঁহার গৃহে অতিথিরূপে আনিয়া দিলেন। কামদেব ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে কোন ব্রাহ্মণ এ পর্য্যন্ত শুকদেবের গৃহে অতিথি হয়েন নাই। আজ ব্রাহ্মণ অতিথি আসাতে শুকদেব অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভাগবত ব্যক্তি সকল কার্য্যেই ঈশ্বরের হাত দেখিয়া থাকেন। শুকদেবও অতিথিকে ঈশ্বরপ্রেরিত রত্নমালার বর মনে করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ নিজে আসিয়া অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অতিথির নাম মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বড় কুলীন। ফুলের মুখুটী বিদ্যাশিক্ষার্থে ভুগিলহাটে যাইতেছিলেন। অতিথির প্রতি গৃহকর্ত্তার আদর যত্ন দেখিয়া যুবক মঙ্গলানন্দ গলিয়া গেলেন। তাঁহার মন স্বভাবতই শুকদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইল। শুকদেবও যাহাতে ব্রাহ্মণ প্রাতে চলিয়া যাইতে না পারেন তদ্বিষয়ে দ্বারবানদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া রাখিলেন।

পরদিবস প্রাতে মঙ্গলানন্দ পুষ্করিণী তীরে বসিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে সেই দিন তাঁহার বিবাহ

হইবে। পরিচারিকাদিগের কথার ভাবে তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরে স্বয়ং শুকদেব আসিয়া তাহাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন। তিনিও সুন্দরী বয়স্থা কন্যা ও আড়াই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও অনেক নগদ টাকা পাইয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তিনি পালাইবার পথ না পাইয়া বাধ্য হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাদ অনুসারে তিনি রত্নমালার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়েই শুকদেবের বাটীতে যাইয়া অতিথি হইয়াছিলেন। তবে নিজের দর বাড়াইবার জন্যই প্রথমে অসম্মতি জ্ঞাপন, পরে প্রচুর ভূমিলাভ করিয়া সম্মতিদান করিয়াছিলেন—এ সকল কথার আলোচনায় কোন লাভ নাই। কেননা এতকাল পরে ইহার তথ্য নিরূপণ অসম্ভব। বিশেষতঃ পীরালী সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা নীলকণ্ঠের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত কারিকা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"বাদসা ছিল হোসেন পীর জাতিতে পাঠান।
হিন্দু তার পাত্র মিত্র উজীর দেওয়ান॥
রোজার দিন হাতে কৈরা লৈল ফলের ঘ্রাণ।
ঘ্রাণে হয় অর্দ্ধভোজন কহিল দেওয়ান॥
ঘরের খোপে অন্দরেতে ডাকল দেওয়ানজীরে।
ইসারাতে পাক চড়াইল পথের দুই ধারে॥
কাণ্ড দেখে দেওয়ানের মনে সন্দে হয়।
দেওয়ানে দেখিয়া বাদসা কথায় কথায় কয়॥
যবনের খানার ঘ্রাণ গেল তোমার নাকে।
কেমনে রইল হিন্দুয়ানী কহত আমাকে॥
বাদসার কথায় জব্দ দেওয়ান লোকে পাইল ভান।
সমাজেতে রাষ্ট্র হল খানা খায় দেওয়ান॥
পীরের ধৈইকা পাইল দোষ নাম হল পীরালী।
সংস্রবেতে দোষী পিঠা ভোগের কুশারী॥"

গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন সাহ, খাঁ জাঁহান আলীর প্রায় ৬০ বৎসর পরে গৌড়ে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার সময়ে শ্রীমান্ সনাতন ও রূপ

স্বধর্ম্মচ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বোধ হয় তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই কারিকা রচিত হইয়াছে। যদিও হুসেন সাহ উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া অনেক দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন, তথাপি হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করার কথা কোথাও উল্লিখিত নাই। একমাত্র সুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার পানি দেওয়া ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। সুতরাং সৈয়দ হুসেন সাহকে এ অত্যাচার দায় হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

সৈয়দ হুসেন সাহের বাদসাহ হইবার বহুপূর্ব্বে যে পীরালী দোষ ঘটিয়াছিল অর্থাৎ হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইতেছিল তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে গঙ্গাদাস পণ্ডিত বলিতেছেন যে, যখন তিনি রাত্রিকালে সপরিবারে নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিতেছিলেন সেই সময় গঙ্গাঘাটে আসিয়া খেয়ার নৌকা না পাইয়া তিনি অতিশয় বিপদ গণিলেন। তাঁহার সাক্ষাতে যবন আসিয়া পরিবার স্পর্শ করিবে ভাবিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিতে তাঁহার মন হইল এবং একান্তভাবে জগদীশ্বরের স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান আর না থাকিতে পারিয়া খেয়ারীর রূপে নৌকা লইয়া সেইখানে আসিলেন ও গঙ্গানন্দকে সপরিবারে পরপারে লইয়া গেলেন। এই সূত্রে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ছাড়িয়া উড়িষ্যায় গজপতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন। যখন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে তখন হুসেন সাহ যে এ ক্ষেত্রে দোষী নহেন তাহা আর বলিতে হইবে না। মহাপ্রভুর জন্ম ১৪০৭ শক অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সুতরাং ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে বা তৎপূর্ব্বে পিরল্যা গ্রামের মুসলমানের অত্যাচারে নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাই প্রায় সমসাময়িক চৈতন্য ভাগবত সমর্থন করিতেছেন। হুসেন সাহ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যলাভ ঘটে। কাজেই তাঁহাকে হিন্দুদিগের প্রতি প্রথম অত্যাচারকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তিনি যে প্রজারঞ্জক ছিলেন, তাহাও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। কেননা মহাপ্রভু রামকেলিগ্রামে যাইয়া সংকীর্ত্তন

আরম্ভ করিলে তিনি তাহাতে বাধা না দিয়া বরং বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, হুসেন সাহ বাল্যকালে অতি দুরবস্থায় পড়িয়া বেনাপোলের রামচন্দ্র খাঁর আশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন। যৌবনে ও রাজ্যলাভের পূর্ব্বে গৌড়ের জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী সুবুদ্ধি রায়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। যদিও সুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার জল দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি সুবুদ্ধি রায়কে প্রতিপালক বলিয়া স্বীকার করিতেন! কাজেই পিরালী ব্যাপারে তাঁহার দোষ ছিল না। তাঁহার রাজ্যলাভের অর্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে পিরালী থাকের সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ঘটকেরা কোন্ বিষয় লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাজেই উক্ত কারিকার প্রতি আস্থা স্থাপন করা যায় না। নীলকান্তের কারিকার সহিত প্রচলিত প্রবাদের মিল আছে। পীরালী-গণের পারিবারিক ইতিহাসের সহিতও ঐ কথার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়, সুতরাং তাহাই ধর্ত্তব্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭

স্বভাব ও অধ্যবসায়গুণে নির্ম্মল আত্মোন্নতি এবং বিদ্যালয় ও ছাত্রী আবাসের সকলেরই স্নেহ প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ছাত্রীদের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। এখানেও সে কয়েকটি অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিল কিন্তু এই জ্ঞানে গুণে উন্নত বন্ধু দলের মাঝে, সরলা শান্তর স্মৃতি নিশিদিন তাহার অন্তরে জাগিত ছিল; তাহার বন্ধু বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয় শান্তর দর্শনাশায় উন্মুখ হইয়াছিল, সে তাহার প্রতিজ্ঞামত একবার শান্তর পিত্রালয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সুযোগ ও মাতুলের অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কোনমতেই নির্ম্মল এ সুযোগ করিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমেই যেন অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য্য হারাইতেছিল।

ছাত্রী জীবনের প্রথম চারি বৎসর, মাতুলের আদেশে গ্রীষ্ম ও পূজার। ছুটীতে নির্ম্মলকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়িকার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিশেষ কোনো অনাথালয় ও পীড়িতাশ্রমে গিয়া মনোযোগের সহিত শিশুপালন ও রোগীর শুশ্রূষা করিয়া ঐ দুই বিষয়ে আবশ্যক মত জ্ঞান লাভ করিতে হইল। সে তাহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের অবসর পাইল না। পঞ্চম বৎসরের ছুটীর দিনগুলিতে সে যখন রন্ধন কার্য্য শিক্ষা করিতে আদিষ্ট হইল, সেই সময়ে সে আর পরবর্ত্তী সুযোগের অপেক্ষা না করিয়া, তাহার নূতন শিক্ষা আরম্ভের পূর্ব্বেই, বহু অনুরোধে সম্মত করিয়া, একদিন ছাত্রী-আবাসের তিন চারিজন ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীর সহিত শান্তকে দেখিতে গেল।

আবার নির্ম্মল তাহার বহু স্মৃতি-জড়িত, সেই অপূর্ব্ব শ্যামল শ্রীমণ্ডিত শস্যক্ষেত্র-শোভিত কৃষক-পল্লী-প্রধান গ্রামখানিতে পদার্পণ করিল। সহরের ছাত্রী-আবাসের ছাত্রীরা গ্রামের মধ্য দিয়া প্রাতঃকালীন শোভা দর্শনে নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে বলিয়া, পল্লীর বাহিরে গাড়ি রাখিয়া শিক্ষয়িত্রীর সহিত হাঁটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু শান্তর সহিত সত্বর মিলনের প্রবল আগ্রহ নির্ম্মলকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, মন্থরগতি সঙ্গিনীদের মাঝে তাহার গতি, ক্ষেত্র-পার্শ্বের অরুণালোকোদ্ভাসিত নদীজলেরই মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মনের আনন্দ নয়নের দ্বার দিয়া প্রতিক্ষণে প্রতিমাদর্শনোৎসুক কৃষক-শিশুর মতই ছুটিয়া বাহির হইতেছিল ; তাহার হর্ষ হাসি, প্রভাত-প্রসূনের সুবাসেরই মত নীরবে সঙ্গিনীদের চিত্তে আনন্দানুভূতি জাগাইতেছিল।

আশ্বিন মাস, সপ্তমী পূজার দিন,—শান্ত নিশ্চয়ই পিত্রালয়ে আসিয়াছে ; নির্ম্মল যে আজ আসিবে শান্ত তাহা স্বপ্নেও জানে না। এত বৎসরের পর আজ নির্ম্মল যখন তেমনি আনন্দে, তেমনি আগ্রহে আসিয়া শান্তকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিবে হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত মিলনে শান্তর কতখানি আনন্দ হইবে ; আনন্দের আবেগে সে কি করিবে, কি বলিবে ; তখন বন্ধুর হর্ষরঞ্জিত মুখখানি কত সুন্দর দেখাইবে ; তাহারই স্কুলের এই শিক্ষাভিমানিনী বন্ধুত্রয় অশিক্ষিতা পল্লীবালার বিনয়-নম্র ব্যবহারে কত তৃপ্তি পাইবে, তাহার অকপট সরলতায় কেমন মুগ্ধ হইবে, নির্ম্মল মনে মনে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে কল্পনায় কত আনন্দপ্রদ চিত্র আঁকিতে আঁকিতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

একে একে ক্ষেত্র, মাঠ, উপবন কুটীর পশ্চাতে রাখিয়া,—যেখানে সে তাহার বাল্যজীবনের দুটি সুখময় বর্ষ যাপন করিয়াছে যেখানে সে তাহার বন্ধুর অগাধ স্নেহ প্রীতি লাভ করিয়া ভগিনীর অভাব ভুলিয়াছে, যেখানকার প্রতি স্থানটুকুতে প্রতি বৃক্ষলতাপুষ্পটিতে তাহার শত সুখ-স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে, যেখানকার বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীরা সুধাস্বরে বৃক্ষ লতাদল পুষ্পমুখের মধুর হাস্যে পুরাতন বন্ধু বলিয়া তাহাকে সাদর আহ্বান করিতেছে সেই পরিচিত উদ্যান-ভবনের নিকটস্থ হইল। আর একটু গেলেই উদ্যান-পার্শ্বে রামনাথ ভট্টাচার্য্যের শান্তিকুটীর—শান্তর সুখের পিত্রালয়। নির্ম্মলের বিপুল আনন্দ হৃদয়ের কূল ছাপাইবার উপক্রম করিল, তাহার গতি দ্রুততর হইয়া উঠিল।

উদ্যান পার হইলেই বন্ধুর দর্শন পাইবে—স্বল্প কথায় সঙ্গিনীদের বুঝাইয়া দিয়াই আগ্রহব্যাকুল-কণ্ঠে নির্ম্মল ডাকিল—"বন্ধু"—'ভাই শান্ত'—'বন্ধ মা'—'বন্ধু মা'—!

কিন্তু যে আশায় যে আনন্দে হৃদয় উল্লাসিত, নয়ন সমুজ্জ্বল, গতি দ্রুততর, নির্ম্মলের সে আনন্দ সে আশা পূর্ণ হইল কই?

কোথা বন্ধু? কোথা তাহার সুখের পিত্রালয়, কোথায় বা তাহার বন্ধুর জননীর প্রীতিপ্রফুল্ল আননের মধুর সাদর সম্ভাষণ!

শান্ত! শান্ত! কোথা শান্ত! হায়! বাঞ্ছিত ক্ষণ আসিল বাঞ্ছিতের দর্শন মিলিল কই? নির্ম্মলের সহাস্য মুখ মলিন হইল; কণ্ঠে জড়তা, দেহে অবসন্নতা আসিল। সবিস্ময়ে সবিষাদে নির্ম্মল দেখিল—শান্ত নাই, তাহার পিতার পর্ণকুটীরের চিহ্নমাত্র নাই; প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলময় মৃত্তিকাস্তূপের কাছে শিউলি ফুলের গাছটি কেবল এখনো তখনকার দিনের মত অজস্র পুষ্পবর্ষণ করিয়া শান্তর জন্মভূমিকে চিহ্নিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নির্ম্মল আপন নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না—সত্যই কি তাহার বন্ধু নাই, বন্ধুর আত্মপরিজন উদ্যান কুটীর কিছুই নাই—সকলি গিয়াছে; আছে কেবল বন্ধুর আনন্দময় বাসগৃহের চতুঃসীমা ঘিরিয়া ভীষণ বিজনতা, দারুণ শূন্যতা আর নিরাশার ঘনান্ধকার!

নির্ম্মলের আগমনবার্ত্তা পাইয়া, পরিচিত গ্রামবাসিনীদের মধ্যে কয়েকজন ছুটিয়া আসিল, তাহারাই তাহাকে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহাদের পুরোহিত ঠাকুরের সর্ব্বনাশের কাহিনী শুনাইল।

নির্ম্মল বুঝিল তাহাদের গ্রামত্যাগের কিছুদিন পরেই গ্রামে মড়ক দেখা দেয়, উপযুক্ত চিকিৎসক ও যত্ন শুশ্রূষার অভাবে বহু গ্রামবাসীর সঙ্গে শান্তর পিতা পত্নী ও শিশু পুত্রের সহিত অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, শোকাতুরা বিধবা ভগিনী উপায়ান্তর না দেখিয়া,—ভ্রাতার পুত্র-কন্যাগুলি ও রঘুনাথ দেবের বিগ্রহটি লইয়া আপন শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। তদবধি এ গ্রামের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, তাঁহাদের আর কোনো সংবাদ সন্ধানও তাহারা জানে না।

৮

সুনামের সহিত একে একে নিম্ন পরীক্ষাগুলি পাস করিয়া, যথাসময়ে নির্ম্মল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া য়ুনিভার্সিটির প্রথম বৃত্তি লাভ করিল। তাহার প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রিগণের স্নেহ-যত্নের অবধি রহিল না। বন্ধুদের মধ্যে কেহ তাহাকে এফ-এ পড়িতে উৎসাহিত করিল, কেহ বা ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি হইতে পরামর্শ দিল। মামিমা একখানি সোহাগ-মাখা পত্রে তাহার আদরের 'রাণুমা'র অভিনন্দন করিলেন; মামাবাবু সানন্দে এইবার তাঁহার স্নেহপাত্রী নির্ম্মলনলিনীর যোগ্যপাত্রের অনুসন্ধানে অধিকতর মনোযোগী হইলেন।

শেষে এফ-এ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া কলেজের সকল পরীক্ষাগুলি পাস করিবার পর ভগিনী ডোরা, কুমারী নাইটিঙ্গেল, কুমারী তরুদত্ত অথবা পণ্ডিতা রমাবাইএর মত কোনো একজন হইবার, কোনো একটা কিছু মহাকর্ম্ম সাধিবার উচ্চ আশায় নির্ম্মল যখন উৎফুল্ল; সেই সময় তাহার মামাবাবু তাহাকে সহসা কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সংসারাশ্রমে পাঠাইলেন।

বধূবেশিনী নির্ম্মল শ্বশুর-ভবনে পদার্পণ করিতেই চৌদিকের হর্ষকোলাহলের মধ্যে সহস্র উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে তাহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া পরিচিত কণ্ঠে কে একজন কৌতুক হাস্যের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাই নির্ম্মল চিনতে পার?"

দৃষ্টিমাত্রেই নির্ম্মল তাহার বন্ধু প্রতিভাকে চিনিল। চারিদিকে বহু অজানা অচেনার মাঝে এই পরিচিত মুখখানি দেখিতে পাইয়া স্মিতমুখে সপ্রসন্ন নয়নে সে তাহার দিকে চাহিল। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রতিভা বলিল, "এখন জান আমি কে? আমি তোমার কল্যাণীয়া কনিষ্ঠা ননদিনী আর তুমি আমার পরম পূজনীয়া বড় বধূ ঠাকুরাণী।"

প্রিয়বন্ধু প্রতিভার নূতন পরিচয় পাইয়া নির্ম্মলের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। নির্ম্মল বুঝিল, তাহার নিমিত্ত মামাবাবুর নির্ব্বাচিত বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রে সুন্দর সৎপাত্র আর কেহ নহে—তাহাদের কলেজের অন্যতমা ছাত্রী প্রতিভাকুমারীর জ্যেষ্ঠ সহোদর মুন্সেফ হেমন্তকুমার। ছাত্রী-আবাসে থাকিতে নির্ম্মল প্রতিভার নিকট বহুবার যাঁহার গুণকাহিনী শুনিয়া আনন্দানুভব করিয়াছিল, সেই হেমন্তকুমারকে স্বামী ও প্রিয়বন্ধু প্রতিভাকে স্নেহময়ী ননদিনী জানিয়া নির্ম্মল যেন অনেকটা আশ্বস্তা হইল। তবু শান্ত যে বলিয়াছিল "শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘোমটা দেওয়া সে ভাই এক যন্ত্রণা," নির্ম্মল এখন বুঝিল কথাটা বড় মিথ্যা নয়, বিশেষ তাহার পক্ষে। জীবনের পনেরোটা বৎসর শিশু-সুলভ চাপল্যের সহিত খোলা মাথায় খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া হঠাৎ একেবারে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া গৃহকোণের রুদ্ধ বায়ুতে দিবসের পর দিবস কাটাইয়া লজ্জাশীলা নাম কেনা বড় সহজ কথা নহে, ক্রমে সে আরো বুঝিল ইস্কুলরুম বা বোর্ডিং হাউস হইতেও এখানে তাহার সুনাম অর্জ্জনের জন্য অধিক শিক্ষা সংযম ও সতর্কতার আবশ্যক।

প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে আইন কানুন শিক্ষা ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি অভ্যাসের সময় যতই অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল ততই তাহার মামাবাবুর উপর অভিমানটা গিয়া পড়িতে লাগিল,—কেন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন—চিরকুমারী রাখিয়া তাহাকে কি তাহার আশা ও আদর্শানুযায়ী জীবন লাভ করিতে দিতে পারিতেন না?

যাহা হউক একটা মহৎ আত্মোৎসর্গের কল্পনায় বাধা পাইয়া প্রথমটা একটু খুঁত খুঁত করিয়া অবশেষে আপন মধুর প্রকৃতি ও কর্ম্মদক্ষতা গুণে গুরুজনের স্নেহযত্ন কনিষ্ঠদের প্রীতি শ্রদ্ধা ও সর্ব্বোপরি হেমন্তর অতুল প্রেমাদর লাভ করিয়া নির্ম্মল ভাবিল—সংসারাশ্রমটাও কিন্তু মন্দ নয়!

৯

হেমন্ত কর্ম্মস্থানে যাইবে, নির্ম্মল তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, আয়না, ব্রুস, সাবান এসেন্স ছোট বড় জিনিসগুলি ট্রাঙ্কে গুছাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, আর মৃদুভাবে অনুভব করিতেছিল বিচ্ছেদের পূর্ব্ব হইতেই বিরহের বেদনা। নির্ম্মল মনে মনে নানা যুক্তি তর্ক অনুমান অনুভব দ্বারা তুলনায় শান্তর বিচ্ছেদ, মামা মামির অদর্শনের সহিত ভাবী পতি-বিরহের গুরু লঘুত্বের বিচার করিতেছিল,—এমন সময় একখানি পত্র হস্তে হেমন্ত স্মিতমুখে তথায় উপস্থিত

হইয়া বলিল, "নির্ম্মল, একটা সুখবর আছে; পুরস্কারের আশা পেলে এক নিশ্বাসে বলে ফেলতে পারি।"

নির্ম্মল মস্তকে ঈষৎ অঞ্চল টানিয়া মৃদুহাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"খবরটা কি শুনি?"

হেমন্ত উচ্চারিত বাক্যের প্রতি-শব্দে পুলক ঢালিয়া উত্তর করিল,—"এক সপ্তাহ—নির্ম্মল, আর এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের বিরহের কোনো সম্ভাবনা নাই। এ বসন্তে আরো সাতটি দিন তোমার হেমন্ত তোমার কাছে বন্দী হয়ে থাকবে।"

নির্ম্মল হেমন্তর প্রতি একটি চোরা কটাক্ষ হানিয়া বলিল—"ওঃ এই? আমি বলি আর কি সুখবর!"

হেমন্ত ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল—"কেন? কমটা কি? এর চেয়ে ভালো খবর সম্প্রতি তোমার আমার পক্ষে আর কি হতে পারে? যদিও বেশী নয়—এক সপ্তাহ, তা এই বা পাই কোথা; আজই যাবার কথা, তা না হয়ে তবু সাতটা দিন!"

নির্ম্মল মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কি উত্তর করিতে যাইতেছিল হেমন্তর মুগ্ধ দৃষ্টিতে সঙ্কুচিতা হইয়া কোমল কপোলে গোলাপ আভা ফুটাইয়া সলজ্জ নয়ন নত করিল।

প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে হেমন্ত সে সরম-সঙ্কুচিতাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হস্তস্থিত পত্রখানি তাহাকে দিয়া বলিল—"চিঠিখানা পড়ে যত শীঘ্র পার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক, আমি মাকে আর প্রতিভাকে একটু তাড়া দিয়ে আসি।"

নির্ম্মল পত্রে পাঠ করিল—

প্রিয়তম হেমন্ত!

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, তোমার শুভ পরিণয়োৎসবের সুদীর্ঘ গদ্য পদ্যময় নিমন্ত্রণ-পত্রখানি আমার নির্জ্জন কক্ষে এক পাশে অনাদৃতা সুন্দরীর মত ক্ষুব্ধচিত্তে ধূলি-লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়া আছে। আহা! এমন সুখের দিনে সাধের উৎসবে দুর্ভাগ্য আমি যোগদান করিতে পাইলাম না! কে জানে এতদিন থাকিয়া শেষে আমি যেমন পশ্চিম ভ্রমণে যাইব আর তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া নাত-বৌ ঘরে আনিবে, তা হলে কি এমন সময় ঘরের বাহির হই!

যা হোক্ যে দিন গিয়াছে তাহা তো আর ফিরাইবার নয়; এখন আমার

কাছে তোমার নিমন্ত্রণ, বাসন্তী পূজার দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ আগামী পরশ্ব আমার মা জননী, প্রতিভা দিদিমণি ও আমার নূতন নাতবৌটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার আনন্দ সম্পূর্ণ করিবে। শুধু আমি নয়, স্বয়ং তোমার ছোট ঠাকুমা ও বসন্তে হেমন্তর আগমন-প্রতীক্ষায় আছেন জানিয়া, পত্র পাঠ মাত্র আসিবে—অন্যথা করিবে না। সাক্ষাতে অন্যান্য কথা হইবে। গৃহিণীর নাতির বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে না পারার ক্ষোভটা মিটাইবার জন্য, এবার পূজার ঘটাটা একটু বিশেষ ভাবে আয়োজন করিতে সম্প্রতি আমি বড়ই ব্যস্ত, এ সময়ে তোমার সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়।

আশীর্ব্বাদক—

তোমার ছোট্‌ঠাকুর্দ্দা।

পত্র পাঠান্তে নির্ম্মল ঠাকুর্দ্দার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ঠাকুর্দ্দার পরিচয় দিতে হেমন্তর জিহ্বায় সরস্বতী বসিয়া গেল, চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল, ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমার অন্তরের পরিচয় দিতে গিয়া বলিল "অন্তরটি তাঁর প্রেমের নন্দন, স্নেহের নির্ঝর সে অতুল স্নেহের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আর ঠাকুমা? তিনি তো আর স্বতন্ত্র নহেন, ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমা দুজনে অভিন্নহৃদয়, দুই দেহে একটি প্রাণ, সে আর ব'লে কি জানাব তুমি দেখলেই বুঝবে, ভয় হচ্ছে, তখন ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমাকে পেয়ে তুমি শেষে আমাকেই না ভুলে যাও।"

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

মা বলিলেন,—"হেমন্ত, তুমি একা গেলেই ভালো হ'ত বাছা; এই কলেজে-পড়া বৌ ঝি নিয়ে পল্লীগ্রামের পূজোবাড়িতে যেতে বাপু আমার সাহস হয় না। কত ভুল চুক দোষ ত্রুটি এদের আমি নিত্যি শুধরে নিই, আমি নিই বলে কি সেখানে তা চলবে। সে পূজোবাড়ি রৈ রৈ থৈ থৈ লোক, হিঁদুর ঘরের ক্রিয়াকাণ্ড, সেখানে আচার বিচারে, কাজ কর্ম্মে একটু ভুল চুক হলে চারিদিকে নিন্দের টি টি পড়ে যাবে। তা ছাড়া সে পাঁচটার বাড়ি, সেকেলে ধরণের লোক তাঁরা, সেখানে তোমাদের এখনকার এই নূতন ফ্যাসানের চাল চলন চলবে না, কেউ কিছু বললে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হবে। তুমি একলাই যাও বাবা, আমাদের যাওয়া হবে না। খুড়শ্বশুর খুড়শাশুড়ীকে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, যেতে পাল্লুম না বলে আমাদের যেন অপরাধ নেন না।"

হেমন্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিল—"না মা, তা কোনো মতেই হতে পারে না; ঠাকুর্দ্দার নিমন্ত্রণে যেতেই হবে, অন্যথা করলে চলবে না। তোমার বউ না হয়

নতুন, প্রতিভা আর আমি তো নতুন নই, আমাদের চালচলন ধরণধারণ তাঁদের কাছে ছাপা নেই, সবই তাঁরা জানেন, তাতে কিছু বাধবে না মা।”

মা প্রতিভাকে লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে আপত্তি তুলিলেন; হেমন্ত বলিল “একটু বড় হয়েছে তাতে আর হয়েছে কি, কুলীনের ঘর আমাদের। শুনিচি কুলীন বর খুঁজতে খুঁজতে গৌরীদান রোহিণীদানের ফল লাভ করা তো হয়েই উঠত না, বরং সময়ে সময়ে কনের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে যেত। তা তখনকার কালে কুলীনের সন্ধান করতে যদি বিবাহের বয়স কাটিয়ে বিবাহ দেওয়ায় কোনো দোষ হত না, এখন একটু লেখাপড়া শেখাতে কি সুপাত্র খুঁজতে যদি বারো তেরো না হয়ে পনেরো ষোলই হয়, তাতে এমনি কি লজ্জার কথা, অন্যায়ই বা কি?”

মা হাসিয়া বলিলেন,—“কুলীনবর খুঁজতে দেরী হওয়া, আর কলেজে পড়িয়ে মেয়েকে বুড়ী করে বিয়ে দেওয়া বুঝি এক কথা? যত সৃষ্টি-ছাড়া কথা, অনাসৃষ্টি মতামত সব তোর কাছে।”

মা আরো দু'চারটি আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হেমন্তর কাছে কোনো আপত্তিই খাটিল না, শেষে জননীকে পুত্রের সহিত একমত হইতে হইল। পুত্রবধূকে লইয়া মা পুত্রের সহিত খুড়শ্বশুরের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন। প্রতিভা ঘরেই রহিল, মা কোনো মতেই অতবড় আইবুড় মেয়েকে সমালোচনার সুবিধার্থে গ্রামের স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্মুখীন করিতে সম্মত হইলেন না।

নির্ম্মল শ্বশ্রূর নিকট হইতে নানা আদেশ উপদেশ—পাসের পড়ার মত কণ্ঠস্থ অন্তরস্থ করিয়া এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি কি না পারি ভাবিতে ভাবিতে হাল ফ্যাসানের সাজ-সজ্জাগুলিকে দেরাজের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া হিন্দুগৃহের লজ্জাশীলা নববধূটির শোভনীয় রীতি নীতি বসন ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া শ্বশ্রূর অনুগমন করিল।

বসন্তে গ্রাম তখন নবীন লতাপল্লবে, ফুলমুকুলে সঞ্জীবীত সুরভিত। বিহগ-কাকলীতে ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখরিত। গাড়ির রুদ্ধ দ্বারের ফাঁকে বাহিরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নির্ম্মল এমনি সুবাস-সৌন্দর্য্যভরা আর একখানি গ্রামের কথা ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে বিমনা হইয়া পড়িতেছিল, আর শাশুড়ী তাঁহার ক্ষুণ্নমনা প্রতিভার ম্লান মুখখানি স্মরণ করিয়া অন্তরে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

১০

গাড়ি সিংহদ্বারের সম্মুখে হেমন্তকে নামাইয়া দিয়া খিড়কীতে দিয়া থামিল। একটি হৃষ্ট পুষ্ট প্রিয়দর্শন শিশুকে কোলে করিয়া একজন পরিচারিকা তাঁহাদের গাড়ি হইতে নামাইয়া সঙ্গে করিয়া গৃহিণীর নিকট লইয়া চলিল।

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্বশ্রূর. পূর্ব্বশিক্ষামত পায়ের কাছে প্রণামী রাখিয়া নির্ম্মল দিদিশাশুড়ীর পদধূলি লইল,—দিদিশাশুড়ীও আশীর্ব্বাদের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ আপন কণ্ঠ হইতে স্বর্ণহার খুলিয়া—এই বুঝি হেমন্তর বৌ—আমার সাধের নাত-বৌ? দেখি ভাই দেখি মুখখানি দেখি একবার—বলিয়া বধূর অবগুণ্ঠন উঠাইলেন,—একি! কাহার গলায় হার পরাইতেছেন! হরি! হরি! কে এ? নির্ম্মল ভাবিল কাহার এ মধুময় কণ্ঠস্বর? পুলক-স্পন্দিত হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিল!

অতিমাত্র বিস্ময়ে অভিভূত নির্ম্মল বলিয়া উঠিল—"বন্ধু, তুমি!"

হর্ষ-বিহ্বল অন্তরে শান্ত উত্তর করিল—"হ্যাঁ বন্ধু আমি"—বহির্ব্বাটী হইতে আগত গৌরীশঙ্করের পশ্চাৎস্থিত হেমন্তকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিল—"তোমরা দুটি নাতি নাত-বৌ সুদিনে আজ আমার ঘরে অতিথি!"

গৌরীশঙ্করকে উপস্থিত দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া শ্বশ্রূ খুড়শ্বশুরের চরণধূলি মস্তকে লইয়া বধূকেও অবগুণ্ঠনবতী হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বধূ সহাস্যে বলিল—"ওমা; ওঁকে দেখে আমি ঘোমটা দেব কেন! উনি যে আমার বন্ধুর বর!"

নব-বধূর উত্তর শুনিয়া শাশুড়ী তো অবাক্! আদেশ উপদেশ বা জিজ্ঞাসা বাদের স্থান ও কাল এ নয় বুঝিয়া পরিচারিকার নিকট হইতে শান্তর পুত্রটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি একটু অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অনতিদূরে—শিশির-সিক্ত বসোরা গোলাপের পার্শ্বে বায়ু-হিল্লোলিত শ্বেত শতদলের মত আনন্দাশ্রুলোচনা হাস্যাননা শান্তর আলিঙ্গনে হর্ষচঞ্চলা স্মিতমুখী—নির্ম্মলের মাধুরীমুগ্ধ মিলন এ সময় হ্যাণ্ডক্যামেরাটা হাতে না থাকায় এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের একটা ফটো লইতে পারিলাম না বলিয়া হেমন্ত মনে মনে আপশোষ করিতে লাগিল—আর এক মুহূর্ত্তে ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বন্ধুদ্বয়ের ফুল্লাননের মধুরিমা দর্শনে প্রীত, রহস্যপ্রিয় গৌরীশঙ্কর নির্ম্মলের বহুদিন-কথিত বাক্যটি স্মরণ করিয়া, নির্ম্মলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কি গো বন্ধু! আমাকে দেখে তো তোমার পছন্দ হয় নি, বলেছিলে,—"ও বুঝি বর! ও তো বুড়ো"—তা ভাই

আমি তো না হয় বুড়ো, আমার নাতিটি তো বর? ওকে পছন্দ হ'য়েছে কি?"—আর হেমন্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ওহে বিচারক ভায়া! বন্ধুর মতে আমি হ'লুম বুড়ো, আর তুমি হ'লে বর, কিন্তু এখন বিচার করে বল দেখি, জিতটা হ'ল কার? বরের, না বুড়োর?"

স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া শান্ত ও নির্ম্মল হাসিয়া উঠিল; পরমানন্দে হেমন্তও সে হাসিতে যোগ দিল,—বৃদ্ধের পুলক-প্রভায় সমুজ্জল স্নেহ-দৃষ্টির তলে, তিনটি তরুণ তরুণীর বিমল হাস্য, যেন প্রয়াগ তীর্থে ত্রিবেণী-সঙ্গমের মত মনে হইল।

প্রয়াগ-প্রবাসিনী।

বিবিধ সংগ্রহ ও মন্তব্য

য়ুরোপে মহাযুদ্ধ

সমগ্র য়ুরোপে এখন ছয়টি প্রবল শক্তি। কোন পক্ষ অধিক প্রবল হইলে অপর পক্ষেরও বল সঞ্চয়ে সচেষ্ট হইতে হয়। কিছুকাল হইতে জার্ম্মেণীর লোকসংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, তেমন শিল্পবাণিজ্যবিজ্ঞান আদি সকল বিষয়ে উন্নতির চেষ্টাও চলিয়াছে। "১৮৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সকে হারাইয়া দিবার পর হইতে জার্ম্মেণীর একটা অজেয়তার অহঙ্কারও বাড়িয়া চলিয়াছে। এ দিকে সৈন্য-সংখ্যা কাহার ৫৫ লক্ষ, কাহার ৪৫ লক্ষ, কাহার ৪০ লক্ষ, কাহারো বা ২৫ লক্ষ, এবং তদনুরূপ গোলাগুলি কামান আদি, তখন যুদ্ধ না হইয়া যায় না।" তাই সম্প্রতি জার্ম্মেণী আততায়ী হইয়া ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ডকে নাড়া চাড়া দিতে গিয়া এক প্রকার সকলেরই শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামুদ্রিক শক্তিতে ইংলণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইংলণ্ডের নিকটস্থ উত্তর সাগরে (নর্থ সীতে) এবং ভারতবর্ষে আসিবার পথ ভূমধ্য সাগর নিরাপদ রাখিতে হইলে, যুদ্ধের ইচ্ছা না থাকিলেও ইংলণ্ডকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। সুতরাং ইংলণ্ডের ন্যায়-যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের, বেলজিয়মের জয় হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

বিধাতার বিচিত্র মঙ্গল বিধানে এখন পৃথিবীর রাজ-শক্তি-পুঞ্জের মধ্যে এমন একটা অবস্থা আসিয়াছে যে, কাহারো সর্ব্বতোভাবে অজেয় হইবার সম্ভাবনা নাই; একে প্রবল হইতে চাহিলে অপরদিক হইতে বাধা আসিয়া তাহাকে একটি সামঞ্জস্যের দিকে লইয়া

যাইবে। জগতের যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইবে বিবাদ বিসম্বাদ ততই চলিয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মেণীর আরো কিছু শক্তি ক্ষয় হইলেই শীঘ্রই সন্ধির প্রস্তাব হইবে। যুদ্ধ কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

স্বদেশী দ্রব্য

এতদিন বিদেশী জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় স্বদেশী দ্রব দাঁড়াইতে পারে নাই এখন বিদেশী অনেক জিনিষের আমদানি বন্ধ হইয়াছে ; যাহা বাজারে মৌজুত, তাহার দাম বৃদ্ধি হইতেছে। আবার প্রচুর পরিমানে স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিবার সময় আসিয়াছে। এ সময় দেশের কর্ম্মী উৎসাহী এবং ধনীগণ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। ইহাতে যেমন একদিকে দেশের উপকার হইবে। তেমন ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

গুড় ও চিনি

দেশী খেজুরে গুড় ও চিনি কিম্বা আকের গুড় ও চিনির দর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। এখন যাঁহারা খেজুর গাছ দাদন দিয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারা লাভবান হইবেন। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন, গুড় চিনি যাহাতে উৎপন্ন হয় সকলে তাহার চেষ্টা করুন।

"জার্ম্মেণীও অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে ভারতবর্ষে চিনির আমদানী বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডও, জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রীয়ার চিনির উপর নির্ভর করিত। সেখানকার চিনির আমদানী বন্ধ হওয়াতে জাভার চিনি ইংলণ্ডে প্রেরণ করার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষে জাভার চিনি প্রচুর পরিমাণ আমদানির সম্ভাবনা নাই। বাঙালী যেমন চিনি ভক্ত, ভারতবর্ষের আর কোনো জাতি তেমন নয়। জাভা চিনির আমদানি বন্ধ হইলে বাঙালীর উপায় কি হইবে, গবর্ণমেণ্ট সেই চিন্তা করিতেছেন।

চিনির দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট খেজুরের গুড় যাহাতে প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিতেছেন।" (সঞ্জীবনী)

পাট

"অনেক অদূরদর্শী লোক বাংলার হাটে বাজারে এই কথা প্রচার করিতেছে যে, মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং এই বৎসর পাট বিক্রয় হইবে না। নিরক্ষর কৃষকেরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া অতি অল্প মূল্যে পাট বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে দুই দেশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সে দেশে বাংলার সমস্ত পাট চালান হয় না। গভর্ণমেণ্ট কালেক্টারদের উপর এইরূপ হুকুম দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন চাষাদিগকে বুঝাইয়া দেন পাটের চাষ পরিত্যাগ করিলে তাহাদের খুব অনিষ্ট হইবে, এবং সামান্য মূল্যে পাট বিক্রয় করিয়া তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কালেক্টারগণ গ্রামে গ্রামে এই সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। আমরা আমাদের সমস্ত

পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা হাটে বাজারে যাইয়া প্রচার করুন, পাটের দর শীঘ্র বৃদ্ধি হইবে, চাষীরা পাটের চাষ করিতে যেন নিবৃত্ত না হয়। বাংলা গভর্ণমেণ্ট পাটের কল-ওয়ালাদিগকে ডাকিয়া এক মন্ত্রণাসভা করিয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেল বলিয়াছেন, আমেরিকায় চটের দাম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। জাহাজ যাতায়াতের সুবিধা হইলেই আমেরিকা প্রচুর পরিমাণ চট ক্রয় করিবে। অতএব পাটের কল বন্ধ না করিয়া যথেষ্ট চট তৈয়ার করা কর্ত্তব্য। কলওয়ালাগণ কল বন্ধ করিবেন না, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কলওয়ালাদের উপকার, কুলি মজুরদের উপকার ও পাটের কৃষকদের উপকার হইবে। কলওয়ালাগণ পাট ক্রয় করিবে সুতরাং পাটের দাম কমিবে না।"

(সঞ্জীবনী)

নারী-শিল্প-শিক্ষালয়

আমাদের দেশে নিরাশ্রয়া নারীগণ চিরদিনই আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ভদ্রলোকদের দরিদ্রতা বৃদ্ধি ও দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বামীপুত্রবিহীনা নারীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। এই সঙ্কটকালে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাঁহাদের জীবন ভারবহ হইবে। নারীগণ পরের গলগ্রহ না হইয়া যাহাতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার উপায় করিবার জন্য 'নারী শিল্প-শিক্ষালয়' স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।

বঙ্গদেশের অনেক ভদ্রসন্তান জার্ম্মেণী, জাপান ও আমেরিকা হইতে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের দেশের অসহায়া নারীদের অবস্থা দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁহার কর্ম্মোৎসাহিনী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, মহিলা শিল্পবাজার স্থাপন করিয়া নারীদের হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এই শিক্ষালয়ে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আপনাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

শিল্প শিক্ষালয়ে নিম্নলিখিত বিষয় সকল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে

দর্জ্জির কাজ, বোতাম ও চিরুনী, মাটীর পুতুল ও ফল প্রভৃতি. গাম, কাগজের বাক্স নির্ম্মাণ। টাইপরাইটিং। কৃত্রিম ফুল। মোজা, লেস ও টাই প্রভৃতি কলে বুনন শিক্ষা। মোমবাতি। ধোপার সাবান। সুগন্ধি দ্রব্য। ফল সংরক্ষণ। চাটনী ও জেলী। নিব, ও চুলের কাঁটা। কলে কাপড় ধৌত করা। সিল্কের কাপড় রং করা। আলোয়ান হইতে শাল প্রস্তুত। জরীর কাজ। চিকনের কাজ। ঘড়ী মেরামত শিক্ষা। সাইনবোর্ড লেখা। পুস্তক বাঁধাই। জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত। টুথ ব্রাস ও চুলের ব্রাস।

ক্রেট ওয়ার্কস্। রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি। ফটোগ্রাফি। জুতার ফিতা। কোমরের সুতা।

গত শনিবার ১৫ই আগষ্ট মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ৮৩ সংখ্যক ভবনে নারী-শিল্প-শিক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরলোকগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা মিত্র মহাশয়া শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে মহিলাদিগের মধ্যে শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র, রমা ঘোষ, মনোরমা মজুমদার, কুমুদিনী বসু, বাসন্তী মিত্র, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়ের সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণ ও আরো কতিপয় মহিলা এবং ডাক্তার বেনোয়ারী লাল চৌধুরী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, পূর্ণচন্দ্র রায়, বিনয়ভূষণ বসু, সুবোধচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন বসু, প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এই শিক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। (সঞ্জীবনী)

বাংলা পুস্তকের মূল্য সমস্যা

মালদহর সহযোগী "গম্ভিরা" (ত্রৈমাসিক পত্র) ভাদ্র সংখ্যায়, বাংলা পুস্তকের মূল্য আধিক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বাংলা পুস্তকের মূল্য এত অধিক বলিয়া অনুভব করি যে, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি থাকা সত্বেও অনেক পুস্তক বিশেষত ভাল পুস্তক খরিদ করিবার সৌভাগ্য হইয়া উঠে না। বাঙালীর জীবন সংগ্রামের সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন একথা তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। দেশের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এত দরিদ্র যে নিতান্ত আবশ্যকীয় পুস্তক ব্যতীত অন্য কোনো পুস্তকই খরিদ করিয়া উঠিতে পারেন না; মস্তিকের তৃপ্তি করিবার পূর্ব্বে পেটের তৃপ্তির চিন্তাই তাঁহারা অধিকতর গুরুতর মনে করেন। দেশের ও সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারা নানা উপায়ে দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পুস্তকের মূল্য সম্বন্ধে তাঁহারা যদি একটু চিন্তা করেন, তবে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।"

কথাটি যে একেবারে সত্য নয় তাহা নহে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে পুস্তকের মূল্য বেশী বলিয়া নহে, পাঠানুরাগের অভাবেই বহুলরূপে সাহিত্য প্রচার হইতেছে না। তাই সহযোগী "কাজের লোক" যথার্থই বলিয়াছেন, "বাংলার এখন অসংখ্য ছাপাখানা এবং অগণ্য লেখক। মাঠে ঘাটে বাজারে ভাগা দিয়া শাক মাছের মত পুস্তক পুস্তিকা বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া মনে হয়, বাংলার ছাপা কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এবং পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, বাংলার বাস্তবিকই পাঠকের অভাব, ভাল গ্রন্থকারের পুস্তক অর্দ্ধ সিকি মূল্যে লাট হিসাবে বিক্রয়ও হয় না। অধিকাংশ সংবাদ ও মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য আদায় হয় না। ছয় মাস এক বৎসর কাগজ লইয়া গ্রাহকগণ ভি, পি পাইলে অতি অনায়াসে চক্ষুলজ্জা, কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া ভি-পীতে দেবাক্ষরে

Refused. লিখিয়া ফেরৎ দিতে লজ্জিত হয়েন না—নীতিজ্ঞান এবং প্রকৃত সুশিক্ষার উন্নতি বিধান না করিতে পারিলে জাতীয় অবস্থাই বল, আর জাতীয় সাহিত্যই বল, কোনটারই কিছু হইবার নয়।"

সহযোগী "গম্ভিরা" ঐ প্রবন্ধ মধ্যে আর একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলিয়াছেন ;—

"প্রথমে মাসিক পত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আমাদের নানাবিধ ব্যাধির মধ্যে প্রত্যেক পুস্তক ও মাসিক পত্র সচিত্র করিয়া প্রকাশিত করিবার একটা ব্যাধি জন্মিয়াছে। রচনাকে চিত্র সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য আমরা যতদূর বুঝি, দুইটি। প্রথমত বিষয়টিকে পাঠকের কাছে অধিকতর পরিস্ফুট করা এবং দ্বিতীয়ত চিত্রশিল্পের উৎসাহ প্রদান করা। প্রবাসী-সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুই সম্ভবত সর্ব্ব প্রথম নিয়মিত চিত্র-সংযুক্ত করিয়া মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। চিত্রশিল্পিগণকে উৎসাহ প্রদান জন্য তিনি যে আদর্শে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহার জন্য বাঙালীমাত্রই তাঁহার কাছে ঋণী, কিন্তু আজ সে আদর্শ কতদূর খর্ব্ব হইয়াছে তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। চিত্রশিল্পীকে উৎসাহ দান যেমন কর্ত্তব্য, ঠিক তদনুপাতে অথবা তদপেক্ষা কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ ও আদর্শ-শূন্য অথবা অশ্লীল চিত্র প্রকাশে বাধা প্রদান কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কয়েকখানি মাসিক পত্রিকায় গল্প ও উপন্যাসগুলিকে সচিত্র করিতে গিয়া এমন কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে যাহা পাঠকের চিত্ত প্রফুল্ল করা দূরের কথা একটিবারের জন্য সেগুলির দিকে তাকাইয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ এই প্রকার অসংখ্য ছবি না দিলে পুস্তক ও মাসিকের নাকি আদর হয় না।"

নব প্রকাশিত মাসিক পত্র "সঙ্কল্প"

কিছুদিন হইতে মাসিক সাহিত্যে একটি কঠিন প্রতিযোগীতা চলিয়াছে। প্রত্যেকেই যেন মনে করিতেছেন, আমি এমন কিছু করিব যাহা সকলের উপরে হইবে, কিন্তু তাহা হইতেছে না। আমরা পুর্ব্বে হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম মহাআয়োজনে, সঙ্কল্প (মাসিক পত্র) বাহির হইবে। কাজেই আমরা নব সহযোগীর নিকট কিছু নূতন রকমে উচ্চভাবের পরিচয় পাইতে আশা করিতেছিলাম। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। সহ-যোগীর প্রথম সংখ্যায় মুখপত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্রিবর্ণ বা বহুবর্ণের চিত্রখানি দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি কি সুরে গান গাইবেন, কোন্ রুচির পরিচয় দিবেন। "ঝুলন্ত শ্যামল গৌরী" আহা, ইহা অপেক্ষা আর কোনো উচ্চ ভাব খুঁজিয়া পাইলেন না? তারপর প্রতিবারে যখন ২।৩টি করিয়া গল্প দিতেই হইবে, গল্পের আদর্শ কি পর্য্যন্ত হইবে তাহা "কপোতী" নামক অসার দুর্নীতিমূলক ছোট গল্পেই পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথমেই যখন এমন অপাঠ্য গল্প স্থান পাইয়াছে তখন আর কি?

তামাক

অনেকে মনে করেন তামাক খাইলে বুদ্ধি খেলে ভাল। তামাকে তাম্রকুট বিষ বিদ্যমান। তামাকে কার্ব্বলিক এ্যাসিড এমনিয়া বর্ত্তমান। যাহারা ঘরের বাহিরে কর্ম্ম করে, তামাকের বিষ শীঘ্র তাহাদের দেহ নষ্ট করিতে পারে না কিন্তু যাহারা ঘরে বসিয়া মস্তিষ্ক চালনা করে, তাহাদের অজীর্ণ অনিদ্রা, হৃদকম্পন, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হয়। তামাকসেবীদিগের সন্তানেরা স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। তামাকে দেহের উপকার হইতে পারে এমন কোনো সার বস্তু নাই। বালক ও যুবকেরা যদি তামাক খায় তবে তাহাদের শরীর ও মনের বিকাশে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। (কাজের লোক)

রঙ্গাভিনয়ে কলেজের ছাত্র

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কলেজের ছাত্রদের রঙ্গাভিনয় সম্বন্ধে যে সার্কুলার প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি এই :—

No 6771.

FROM

P. Bruhl Esq. I. S. O. D. Sc.F. C. S. F. G. S.

Registrar, University of Calcutta.

To

The Heads of affiliated Colleges and Recognised Schools.

Dated, Senate House the 26-3-14.

The undersigned has the honour, by direction of the Hon'ble the Vice Chancellor and Syndicate to say that as it has been brought to their notice that theatricals in Schools and Colleges are becoming more frequent and are in some cases proving a source of distraction to students, the Syndicate are anxious to have information as to the number of theatricals held in each institution every year, the kind of plays generally chosen, the Classes of students allowed to take part, and the time needed for preparation. The undersigned is therefore directed to request that the Heads of affiliated Colleges and recognised schools will be so good as to furnish them with the information asked for at an early date.

Sd. P. Bruhl,

Registrar.

কর্ত্তৃপক্ষ রঙ্গাভিনয় ব্যাপার ছাত্রদের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন এবং ছাত্রমহলে রঙ্গাভিনয়ের প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা এই সার্কুলার পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের রঙ্গাভিনয়-প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিলে তাহাদের মহদুপকার সাধন করিবেন। ছাত্রগণ কর্ত্তৃক রঙ্গাভিনয় কখনও সমর্থন যোগ্য নহে। (সঞ্জীবনী)

পৃথিবীর লোক-সংখ্যা

পৃথিবীতে মোট একশত সত্তর কোটী মানবের বাস। তন্মধ্যে

চীন ও ভারত অধিবাসী	৫০ কোটী
ইংলণ্ড দ্বীপপুঞ্জেও	৪ কোটী ৫০ লক্ষ
ফ্রান্সে	৩ কোটী ৮ লক্ষ
জর্ম্মানিতে	৭ কোটী ৬০ লক্ষ
রুষিয়ায়	১৪ কোটী
আফ্রিকার	২ কোটী ৯২ লক্ষ
ইতালীতে	২ কোটী ৫২ লক্ষ
স্পেনে	৯৭ লক্ষ
পর্টুগালে	৫ লক্ষ

সরমা

—:০:—

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার একটি মুসলমান কণ্ট্রাক্টরের হাতে বাড়ি-মেরামতাদি কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, ও তাহার সহিত চুক্তি হইল যে তিন মাসের মধ্যে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দিবে।

যথাসময়ে কার্য্য সমাধা হইয়া আসিলে—ভিতরে তিনটি ঘরের উপর আর তিনটি ঘর উঠিল—বাহিরের ঘর তিনটিতে বড় বড় সার্সিযুক্ত জানালা

দরজা বসান হইল—মেজেতে মার্বেল বসানো হইল—দেয়ালে পেণ্ট করা হইল। এই ঘর তিনটির মধ্যে একটি compounding room, আর একটি aparating room ও মাঝেরটি consulting room করা হইল; অর্থাৎ এই ঘরে বসিয়া ডাক্তার রোগীদিগকে দেখিবেন ও ঔষধের ব্যবস্থাপত্রাদি লিখিবেন। এই ঘরের ভিতরে দুই দিকে দুইটি দরজা আছে, তাহা খুলিয়া রাখিলে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাওয়া যায়। পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার করা হইল। বাগানের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত করা হইল। দুই চারিটি ভালো ভালো গাছ রাখিয়া সমস্ত গাছ-পালা ও জঙ্গল কাটানো হইল। চারি দিকে সুরকির লাল রাস্তা করা হইল এবং তাহার ধারে ধারে নানা জাতীয় পাতাবাহার ও ফুলের গাছ বসানো হইল। মধ্যস্থলে ঘাস বিছাইয়া সুন্দর টেনিস ground করা হইল। ঘরগুলি চেয়ার, টেবিল, টানা পাখা, ছবি, গ্লাসকেস, আলমারি, দেরাজ প্রভৃতিতে সুচারু রূপে সাজানো হইল। কিন্তু ডাক্তার এবাটীতে এখনো বাস করিতে আসিলেন না—এখনো সেই ভূতের ভয়ে! ডাক্তার একটি দ্বারবান রাখিয়া দিয়াছেন সে তাঁহার শিক্ষামতো অপর পাড়ার লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায় এ বাড়িতে কি একটা আছে সে তাহাকে এ-ঘরে সে-ঘরে বেড়াইতে দেখিতে পায়। কত দিন সে তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল, কিন্তু সে নিমিষে কোথায় চলিয়া যায় কিছুতেই ধরিতে পারে না। সে স্পষ্ট একটা মানুষের ছায়া দেখিতে পায় ইত্যাদি। ইহাতে পাড়ার লোকের মনে পুরাতন সংস্কার আরো বদ্ধমূল হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল হরিপদর প্রেতাত্মা এখনো সেই বাড়িতে বাস করিতেছে। সকলেই রাম সিং দ্বারবানকে এ চাকরি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার পরামর্শ দিল—নতুবা এক দিন সে ভূতের হাতে প্রাণ হারাইবে।

রাম সিং সকলকে বুঝাইয়া দিল যে, শীঘ্র সে এ চাকরি ছাড়িয়া দিবে।

এক দিন বেলা পাঁচটায় সময় ডাক্তার আসিয়া অবিনাশবাবুর সহিত দেখা করিলেন। অবিনাশবাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন ও মৃদু হাসিয়া বলিলেন ;—

কি মশাই অত টাকা খরচ করে বাড়ি মেরামত করালেন, সমস্তই বিফল হ'ল, কৈ এক দিনো থাকৃতে পারলেন না। আমি আপনাকে সেই সময়েই বারণ করেছিলুম, এ ভূতুড়ে বাড়ি, এখানে কি মানুষ থাকৃতে পারে? আপনি শুনলেন না; টাকাগুলি জলে গেল। এখন আপনার দারোয়ানটা প্রাণ নিয়ে

পালাতে পারলে বাঁচে। সে বেচারি আমাদের কাছে এসে কাঁন্না-কাটি করে, ও-বাড়িতে আর থাকতে চায় না। সে কত দিন নাকি চাক্ষুষ দেখেছে।”

ডাক্তার বিনীতভাবে কহিলেন,—“বটে, এত করে বাড়িটা মেরামত করালুম কি ভূতের নাচ দেখবার জন্য ?—সেটি হ'বে না, ভূত তাড়াতেই হ'বে। আমি আজ নিজে এ-বাড়িতে থাকবো দেখি সে কেমন ভূত।”

অবিনাশবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন,—“কথাটা ভালো, কিন্তু ঐ বাড়িতে রাত্রি বাস করবার পূর্ব্বে আপনার জীবনটা বিমা করলে ভালো হতো না ?”

“আপনি ঠাট্টা করচেন—মনে করেন কি যে আমি ওখানে থাকতে পারব না ?”

“না আমি ঠাট্টা করব কেন—তবে একটা অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে সকলেই ঐ রকম একটা বিমা করে থাকে—কি জানি কি হয়—কিছু তো বলা যায় না !”

“ওঃ বুঝেছি, আপনি সশরীরে আমাকে যমের দক্ষিণ দ্বারে পাঠাতে চান !”

“সে কি কথা ! আমি আপনাকে যমালয়ে পাঠাবার কে ? আপনার সাহসকে আমি ধন্যবাদ দি।”

“তবে আসুন অবিনাশবাবু, আপনাতে-আমাতে আজ ঐ বাড়িতে রাত্রিবাস করি।”

“দোহাই মশাই মাপ করবেন—আমাকে ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করতে হয়—এ অনুগ্রহ আমার উপর কেন ?”

পরশ্রীকাতর অবিনাশবাবু মনে মনে বলিলেন, “বেটা তুমি বড় সেয়ানা আমাকে শুদ্ধ জড়াতে চাও—সেটি হচ্চে না বাবা। হরিপদর মা'র কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি নে'য়া তোমার ধর্ম্মে সবে না। হরিপদ আজ তোমাকে সাবাড় করবেই করবে।”

অবিনাশবাবুকে চিন্তিত দেখিয়া ডাক্তার কহিলেন,—“আপনি যদি একান্তই না আসেন তা' হলে রাম সিং থাকবে।”

ঈর্ষাপরায়ণ অবিনাশবাবু বলিলেন,—“আপনার যদি এতই সাহস তবে আ'র রাম সিং বেচারিকে কষ্ট দেওয়া কেন ? আপনি একলাই থাকুন না।”

“আচ্ছা তাই হবে” বলিয়া ডাক্তার উঠিলেন।

অবিনাশবাবু বলিলেন—“এখন যাবেন কোথা ?”

“ঐ ভূতুড়ে বাড়িটাতেই যাবো—কোথায় থাকব—কি করব তার একটা বন্দো-বস্ত করে নিইগে।” সেখানে আর যাহারা উপস্থিত ছিল ডাক্তার তাহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা কেহ ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।"

কেহই সেই ভূতুড়ে বাড়ির ভিতর যাইতে সম্মত হইল না—তবে সকলেই ডাক্তারের সহিত তাঁহার বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত আসিল—ডাক্তার সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। সকলেই পাড়ায় প্রচার করিয়া দিল ডাক্তার ঐ বাড়িতে আজ রাত্রিবাস করিবে। অনেকেই ডাক্তারের সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহার পরিণাম ভাবিয়া কাতর হইল। ক্রূরমতি অবিনাশ-বাবু মনে মনে ভাবিল 'যদি বেটা হরিপদর প্রেতাত্মার হাতে মরে, তা হ'লে এই বাড়িখানা সহজেই দখল করে নিতে পারবো।'

ডাক্তার আসিয়া consulting roomএ প্রবেশ করিলেন। এই ঘরে একখানি বড় টেবিল ও তাহার পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার ছিল। ডাক্তার রাম সিংকে বাতি জ্বালিতে বলিয়া চেয়ারে বসিলেন। রাম সিং তিনটি ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিল ও 'অপারেটিং রুমে' শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। ডাক্তার রাম সিংকে একটি টাকা দিয়া কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিতে পাঠাইয়া একখানি খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আঁধারের ঘন ছায়া পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। খবরের কাগজখানা যেন ডাক্তারের বিষবৎ বোধ হইল, তিনি উহা দূরে ফেলিয়া দিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের নিবিড় ব্যাথাগুলি এক এক করিয়া প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। তিনি অস্থির হইয়া বাহিরে আসিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম সিং খাবার লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। রাম সিং মেঝেতে শুইয়া এক অপূর্ব্ব নাসিকা-ধ্বনিতে ঘরটি মুখরিত করিয়া তুলিল।

ভূত যাহা ছিল—সে তো অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। যে দিন ভূতনাথের কুটীরখানি ঝড়ে পড়িয়া যায়—তৎপর দিন সে উহা বেচিয়া কিনিয়া যাহা কিছু পাইল—তাহা লইয়া সে সপরিবারে শান্তিপুরে আসিয়া নিজ ব্যবসা আরম্ভ করিল।

ভূতনাথ চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে একটা বিষম অমূলক ভীতি। উহা লোকের মনে এখনো এমনি ভূতের মতো চাপিয়া বসিয়া আছে, যে তাহারা ঐ বাড়িটার ছায়া মাড়াইতেও কাঁপিয়া উঠে।

চিন্তা যখন তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দেয়, নিদ্রা তখন দূরে সরিয়া

যায়। চিন্তার নাগপাশে বদ্ধ হইয়া প্রথম রাত্রিটায় ডাক্তারের নিদ্রা আসিল না কিন্তু শেষ রাত্রে নানা চিন্তার অবসানে সে ঘুমাইয়া পড়িল। রামসিংএর কিন্তু প্রথমও নাই আর শেষও নাই ; পতন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত অবিরাম নাসিকাধ্বনি নানা স্বরে বংশীবাদন করিতেছিল।

এদিকে কূটবুদ্ধি অবিনাশবাবুর রাত্রে নিদ্রা হইল না, সহস্র চিন্তা তাঁহার মস্তিস্ক বিকৃত করিয়া দিল—নিদ্রা যাইবে কে ? তাঁহার চিন্তার কারণ এই যে, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে একটা ডাক্তার ঐ ইন্দ্রালয়ের মতো বাড়িখানা যে তাহার চোখের সাম্‌নে ভোগ দখল করবে ইহা তাহার প্রাণে সহিবে না। বাড়িখানা, যে-কোনো প্রকারে হউক হস্তগত করিতেই হইবে। যদি সে ভূতের হাতে মরে ভালোই, নচেৎ কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহাও অনেক যুক্তি-তর্কের পর স্থির করিয়া রাখিল। ভগবানের চিড়িয়াখানায় কোনো জীবের তো অভাব দেখি না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই অবিনাশবাবু ডাক্তারের আত্ম শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া এক কলিকা তামাক সাজিয়া হুকাটি লইয়া রাস্তায় পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আরো দুই চারিজন লোক আসিয়া অবিনাশ বাবুর সহিত মিলিত হইল। তখন উহারা সকলে আসিয়া ডাক্তারের দরজা ঠেলিল। রামসিং ও ডাক্তার তখনো গভীর নিদ্রায় অভিভূত, কাজেই কোনো উত্তর পাইল না।

অবিনাশবাবু তফাত হইতে একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"দেখ তো হে রামবাবু, খড়খড়ির একটা পাকি তুলে, ঘরটার ভিতরে কেউ আছে কি না ?"

রামবাবু বাহির হইতে খড়খড়ির পাকি তুলিয়া দেখিয়া ভীত বিস্মিত ও চকিতভাবে বলিল—"চলুন চলুন মশাই, আর কাজ নেই ভূতের উপর মাম্‌দোবাজী একি খাটে ?"

অবিনাশবাবু বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"কি দেখলে হে ?"

মুখ বিকৃত করিয়া রামবাবু কহিলেন,—"আর কি ? ঘরে এখনো আলো জ্বল্‌চে—ভূতে দু বেটার গলা টিপে দিয়েচে, বেটারা লাস হয়ে পড়ে আছে।" সকলে ভীত হইয়া দ্রুতপদে অবিনাশবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল।

অবিনাশবাবু কহিলেন—"হ্যাঁ হে রামবাবু, কথাটা কি সত্যি ?"

"বিশ্বাস না হয় দেখে আসুন না একবার।"

অবিনাশবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"না হে আমি কি তোমার কথায় অবিশ্বাস করচি, বেটা বড় বলে বেড়াতো আমি ভূতের ওষুধ জানি—কৈ বাবা তোমার ওষুধ যে আজ খাটল না ?"

অপর একজন বলিল,—"অপদেবতার সঙ্গে চালাকি !"

আর একজন বলিল,—"এত টাকা খরচ করে মেরামত সমস্ত বৃথা হয়ে গেল।"

অবিনাশবাবু বলিলেন,—"সেই সময় আমি বেটাকে বারণ করেছিলুম, আমার কথা শুন্‌লে না, ধনেপ্রাণে মারা গেল।" এইরূপে কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে ডাক্তার সশরীরে আসিয়া দেখা দিলেন।

ডাক্তারের আবির্ভাবে সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল। অবিনাশ বাবুর সকল আশায় জল পড়িল, তিনি যেন এতটুকু হইয়া গেলেন ! মনে মনে বলিলেন 'বেটা কি দানোপেয়ে এল ?'

চতুর অবিনাশবাবু মনের আগুন বুকে চাপিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন,— "আসুন আসুন আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা কর্‌ছিলুম। আপনাকে কত ডাকাডাকি করলুম, দরজা ঠেললুম, আপনি কোথায় ছিলেন ?"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"কি জানেন, কাল সমস্ত রাত্রি ভূতের সঙ্গে লড়াই করে বিশেষ ক্লান্ত হয়ে ভোর বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তাই উঠ্‌তে একটু দেরি হয়েচে।"

"সে কী রকম লড়াই মশাই ?"

"সে বড় গুরুতর লড়াই।"

"তবু কি রকম একটু বলুন না।"

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, সকলে আগ্রহ সহকারে শুনিতে লাগিল।

"আপনারা তো কাল সন্ধ্যার সময় আমাকে ঐ ভূতুড়ে বাড়িটাতে রেখে চলে গেলেন, আমি বাইরের ঘরে টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে বস্‌লুম। রামসিং বাতি জ্বেলে দিলে, আমি তার হাতে একটি টাকা দিয়ে কিছু খাবার আনতে পাঠালুম। সে চলে যাবার কিছু পরে দেখলাম সেই ভূতটা একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।"

সকলে বিস্মিত ভাবে কহিল,—"সত্যি নাকি মশাই ?"

"সত্যি কি মিথ্যে যদি আমার সঙ্গে আজ রাত্রে কেউ থাকেন তা হ'লে বুঝতে পারবেন।"

সকলে তখন একবাক্যে কহিল,—"না না অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই ; ভূতে সব কর্ত্তে পারে ; স্ত্রীলোকের বেশ ধরবে তার আর বিচিত্র কি, তারপর ?"

"তারপর আমি যেমনি তাকে ধরতে গেলুম, সে অমনি অন্দরের দিকে গিয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌তে লাগলো। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গেলুম, সে

বরাবর খিড়কির দরজা দিয়ে পুকুর-ধারে চলে গেল ; আমি আর তার সঙ্গে যেতে সাহস করলুম না, ফিরে এলুম।"

অবিনাশবাবু মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া মুখে বলিলেন,—"বেশ করেচেন ফিরে এসেচেন ; বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন, ভূতের পিছু পিছু যেতে আছে ?" তারপর মনে মনে বলিলেন, 'বেটার বড় কপাল-জোর, আর একটু গেলেই ঐ পুকুরে চুবিয়ে ওর দফা রফা করত।'

অবিনাশবাবুকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রামবাবু কহিলেন, —"তারপর ?"

"তারপর আমি ফিরে এসে দেখি যে ভূতটা একটা প্রকাণ্ড তালগাছের মতন হয়ে আমার পথ আটক করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অনেক ঠেলাঠেলি করলুম কিছুতেই তাকে ঠেলে বাইরে আনতে পারলুম না। তখন আমি যে ভূতের ওষুধ জানতুম সেই ওষুধ ভূতের গায়ে ঠেকিয়ে দিলুম, ভূতটা 'বাপ-রে মা-রে' করতে লাগলো। এই সময়ে রামসিং আলো নিয়ে আমাকে খুঁজতে এল, ভূতটা বেগতিক দেখে সরে পড়লো।"

"ধন্য আপনার সাহস,—তারপর ?"

"তারপর বাইরের ঘরে এসে দেখি—টেবিলের ওপর কেবল দুইটা লেমনেড রয়েছে। রামসিংকে বললুম, 'রামসিং খাবার কোথায় ?' সে বললে যে সে খাবার ঐ টেবিলের ওপরই রেখেছিল। আমি বুঝলুম খাবারটা ভূতে খেয়ে ফেলেছে, কাজেই একটা লেমনেড খেয়ে শুতে গেলাম, আর রামসিং মেঝেতে শুয়ে রইল। খাবারটা ভূতে খেয়ে ফেলেচে শুনে সে ভূতটাকে অনেক গালাগালি দিল, ভূতটা তা মনে করে রেখেছিল। গভীর রাত্রে আবার তার ঘাড়ে চাপলো।"

অবিনাশবাবু বিস্ময়নেত্রে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! বেচারা বেঁচে আছে তো ?" মনে মনে বলিল 'ভূতটা তো বড় অবিবেচক ; চাপলি তো চাপলি একেবারে খোদের ঘাড়ে চাপলিনি কেন, তা হলে তো আমার মনে সুখ হ'ত।'

"আমার অনেক যত্নে রামসিং বেটা বেঁচে গেছে, আমি ভূতের ওষুধ জানি কি না।"

"তারপর ?"

"তারপর ভূতটা রাগে গরগর করে আমার ওপর এসে পড়লো, তখন দুজনে ঘরের ভিতর রীতিমত লড়াই চলতে লাগলো, একবার সে আমাকে ফেলে, একবার আমি তাকে ফেলি—তা ভূতটা আমার সঙ্গে পারবে কেন, আমি যে

ভূতের অনেক ওষুধ জানি, অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ভূতটা আমার নিকট হার মেনে চলে গেল।"

"যাবার সময় কি কিছু বলে গেল না?"

"বলে গেল যে তুই ওষুধ জানিস বলেই এ বাড়িতে থাকতে পারবি, অন্য কেউ এলে আমি তার ঘাড় মটকাবো।"

অবিনাশবাবুর মুখ শুখাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"তা অনুগ্রহ করে যদি ওষুধটা আমাকে শিখিয়ে দেন তা হলে আমাদেরও ভূতের ভয়টা যায়।"

ডাক্তার বিনয় সহকারে বলিলেন,—"মাপ করবেন, সেটি আমার গুরুর বারণ।"

অবিনাশবাবু শুষ্কমুখে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তা ভূতটা যে আপনার নিকট পরাস্ত হয়েছে তাতেই আমরা সুখী হলুম। এখন বোধ হয় আমাদের ভূতের ভয় ঘুচল?"

"আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভূতটা এখন বশে এসেচে। আমি যতদিন আছি ততদিন ভূতে আপনাদের কিছু করতে পারবে না।"

"আমরা আর বেশি কিছু চাই না, ভূত বেটা এখন সরে গেলেই হ'ল—ও ভূতটা হরিপদই হবে, কি বলেন মশাই?"

"তার আর ভুল আছে?"

"আর সেই স্ত্রীলোকটা হরিপদর স্ত্রীই হবে, কি বলেন?"

"হতেও পারে আশ্চর্য্য কিছুই নয়।"

"আমি যা ভেবেছিলুম তাই হয়েচে। জাহাজ-ডুবি হয়ে হরিপদ সপরিবারে মরে এখন বাড়ি কামড়ে পড়ে আছে!"

"সে স্ত্রী লোকটির কোলে একটি ছেলে দেখেছিলুম।"

"তা হলে আর বাকি কি রইল, হরিপদর সেই ছোট ছেলেটি পর্য্যন্ত ভূত হয়েছে, ওটা ভূতের পুরী হয়েছিল, তাই তাদের হাসি-কান্না আমরা বাইরে থেকে শুনতে পেতুম।"

"আর বেশি দিন ওদের এ-বাড়ি ভোগ করতে হবে না, এইবার তাড়াই দেখুন না।"

"আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, আর আমাদেরও একটা ভয় ভাবনা দূর হোক। আপনি কবে ডাক্তারখানা খুলবেন?"

"অল্পদিনের মধ্যেই ডাক্তারখানা খুলবার ইচ্ছা আছে। তবে এখন আসি কাল আবার দেখা হবে।"

ডাক্তার সকলের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। অবিনাশবাবু ও অপর সকলে ডাক্তারের বহু প্রশংসা করিতে লাগিল। ডাক্তারের ভূতের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা চকিতের মধ্যে পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

ছবি ও কবিতা। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ, প্রণীত। প্রত্যেক ভাগের মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

বালক বালিকাগণের কোমল হৃদয়ে সুশিক্ষা ও সদ্ভাবের বীজ বপন করা এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "বালক বালিকারা ছবি দেখিতে ভালবাসে কবিতা পড়িতেও ভালবাসে। কিন্তু বাল্যে এই দুইয়েরই সাহায্যে যাহা হইতে তাহারা সদুপদেশ পাইতে পারে এরূপ পুস্তক অধিক দেখিতে পাই না। যদি একটি সামান্য শাকের বীজ বপনের জন্য অনুকূল সময়ের প্রয়োজন থাকে, তবে মনুষ্যত্বের বীজ বপনের কি সময়ের প্রয়োজন নাই?"

এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; তাই আমাদের ন্যায় পলিতকেশ, গলিতদন্ত অভিভাবকগণেরও এই পুস্তক একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত। এই পুস্তকে এক এক-খানি ছবির সঙ্গে এক একটি করিয়া কবিতার দ্বারায় তাহার ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। আবার তাহা পাঠ করিয়া বালক বালিকাগণ যাহাতে তাহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তজ্জন্য নিম্নে প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষার উপায় বিধান করা হইয়াছে। এজন্য ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ বেশ সহজ হইয়াছে।

আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য ইহার একখানি চিত্র সহ একটি কবিতার অংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। পরন্তু ইহার প্রত্যেক বিষয়টি এত মনোহর যে, কোনটি রাখিয়া কোনটি গ্রহণ করি শীঘ্র স্থির করা যায় না।

অনাথনাথ

রাজা অনাথ বালকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন

*　　*　　*　　*

বুকেতে টানিয়া তারে, ভগ্ন কণ্ঠস্বরে,
কহেন জননী, অতি ব্যাকুল অন্তরে ;—
"বাছারে ! আমার তুই অঞ্চলের ধন ;
কার কাছে রাখি তোরে করিব গমন ?
কে দিবে ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল,
কে তোরে কাতর হেরি কোলে ল'বে বল্ ?
দয়াময় ! এই ভিক্ষা তোমার চরণে,
রেখো প্রভো ! কৃপা করি দুঃখিনীর ধনে।"
জননীর ভাব শিশু বুঝিতে না পারে ;
"কেন মা ! কাঁদিছ ? " এই কহে, বারে বারে।
বলে, "মাগো ! বলেছিলে তুমি ত আমায় ;
আছেন অনাথ নাথ মোদের সহায়।
যাব আমি তাঁর কাছে কহিব সকল,
কেঁদ না, মা ! মুছে ফেল নয়নের জল।"
নিরাশ হৃদয় তবু শিশুর বচনে
জননী, ক্ষণেক, হায়! শান্তি পান মনে।

নিশা ক্রমে হয় শেষ, উঠে দিনমণি ;
ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়েন জননী।
প্রভাত হেরিয়া শিশু বাহিরেতে চলে ;
সম্মুখে যাহারে দেখে, সবিনয়ে বলে।
"মোদের অনাথ নাথ আছেন কোথায়,
দয়া করে দেখাইয়া দাওগো আমায়।
ধনী দুঃখী বাল, বৃদ্ধ নিরখে যাহারে,
এই কথা মাত্র শিশু সুধায় সবারে।
বিস্মিত হইয়া সবে তার পানে চায়,
কি বলে বালক ভাবি নিজ কর্ম্মে যায়।
নগ্নদেহ, রুক্ষকেশ, মলিন বদন,
হেন জনে কেবা বল করে সম্ভাষণ ?
না পেয়ে উত্তর শিশু, ব্যাকুল অন্তরে,
"কোথায় অনাথ নাথ ?" ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
সুবেশ, সুন্দর, যাঁরে দেখিবারে পায়,
"তুমি কি অনাথ নাথ ?" বলিয়া সুধায়।
কভু ধায় নদী পানে কভু বা প্রান্তরে,
বলে, "হে অনাথ নাথ ! এস কৃপা ক'রে।
"মা আমার একাকিনী আছেন পড়িয়া
কেন হে অনাথ নাথ ! রয়েছ ভুলিয়া ?"
দৈবযোগে সে দেশের নৃপ পুণ্যবান্,
এসেছিলা নদীতীরে করিবারে স্নান।

পশিল শিশুর স্বর নৃপের শ্রবণে,
ডাকিতে তাহারে রাজা কহেন স্বজনে।
সৌম্যমূর্ত্তি হেরি তাঁর কাছে শিশু যায়,
"তুমি কি অনাথ নাথ?" বলিয়া সুধায়।
সস্নেহে নৃপতি, ডাকি, কহেন তাহারে,
"কে অনাথ নাথ? তুমি খুঁজিছ কাহারে!"
নৃপের বচনে শিশু ভাসে অশ্রুজলে,
"তুমি কি অনাথ নাথ?" এই শুধু বলে।
"মা আমার একাকিনী রয়েছেন ঘরে,
এস, হে অনাথ নাথ! এস ত্বরা করে।
এত বলি যায় শিশু পথ দেখাইয়া,
পশ্চাতে নৃপতি যান্ বিস্মিত হইয়া।

* * * *

দ্বারে আসি কহে শিশু, এমন সময়,
"দেখ মা! এনেছি কারে আর কিবা ভয়?
"ক ঃ রে খুঁজেছি মাগো! বলিব কাহারে?
দেখ, মা! অনাথ নাথ দাঁড়াইয়া দ্বারে।"
শিশুর বচনে মাতা বিস্ময়ে মগন;
আদরে ডাকিয়া তারে করেন চুম্বন।
গৃহে প্রবেশিয়া নৃপ বুঝেন সকল,
বহিল নয়নে তাঁর ধারা অবিরল।
বিনয়ে বলেন, "ভদ্রে! চিন্তা নাই আর,
তোমার অনাথ নাথ, আমি ভৃত্য তাঁর
আসিয়াছি আমি তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি;
আজ পোহাইল তব দুঃখ-বিভাবরী।
ঘুচাতে তোমার ক্লেশ অনাথের নাথ
পাঠায়ে দেছেন মোরে, চল মোর সাথ।"

* * * *

দাসের আত্ম-কথা

ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ।

ত্রৈলোক্যকে শশিপদ বাবুর আশ্রমে রাখিয়া আমি আপাতত এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম। সেখানে তাহার লেখা পড়া ও তৎসঙ্গে কিছু শিল্প শিক্ষা হইতে লাগিল।

এদিকে শ্বশুর বাটী সম্বন্ধে মনোমালিন্য দূর হইবার পর, শ্বশুর মহাশয় নিজে যত্ন পূর্ব্বক আমার স্ত্রীকে আমাদের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। "আমার ঐরূপ অবস্থা হইলে, স্ত্রী আমার জন্য কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেন ;" এই কথাটি যখন আমার মনে হইয়াছিল, তখন স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিব বলিয়া যে সঙ্কল্প ছিল, বাড়িতে সকলের মধ্যে থাকিয়া তাহা হইয়া উঠিল না। সময় সময় তাঁহার নিকট বসিয়া কথা বার্ত্তা দ্বারা তাঁহার চিত্ত-প্রসন্ন করিয়া আমার পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মভাব তাঁহার মনেও সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইলাম।

পিতাঠাকুর সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ভাল মন্দ কোন কথার মধ্যেই থাকিতেন না। মাতাঠাকুরাণীও অতিশয় সরল প্রকৃতির ছিলেন। বিশেষত আমার ধর্ম্ম মতান্তরের জন্য কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই ; তবে বিষয় কর্ম্মত্যাগের সময় সাংসারিক ক্ষতি বোধে আশঙ্কার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমার বিরোধী হইলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ; তাহার মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ দুই ভায়ের মনে যাহা হউক, আমার সামনে কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। মধ্যম ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথই হইল আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সামাজিক এবং সাংসারিক স্বার্থ রক্ষায় সেই হইল আমার সঙ্গে সমকক্ষ। কাজেই তাহাকে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইল।

উপেন্দ্রের ধর্ম্মভাব প্রথম হইতেই ছিল। বোধ হয় সরল ভাবে কতকটা আমায় অনুসরণ করিতেছিল। কিন্তু যখন সামাজিক গোলযোগের ব্যাপার দেখিল, তখন আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তদ্ভিন্ন আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থ যাহা রামকৃষ্ণ বাবুর ফারম হইতে পাইয়াছিলাম, যখন আমি বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইলাম, তখন সমস্ত অর্থই সংসার-প্রতিপালনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। বোধ হয় তাহা দেখিয়াই উপেন্দ্রর মনে স্বার্থ ঘটিত মন-বিকার উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু চিনির কারখানা অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইয়া মূলধন সওয়ায় যখন আরো কিছু দেনার সম্ভাবনা দেখা গেল ; এদিকে আমি চিরদিনের জন্য সংসার, জাতি, এবং প্রচলিত ধর্ম্মের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, তখন বোধ হয় উপেন্দ্রর মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। কাজে কাজেই তখন আর পূর্ব্ব সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিল না ; বরং বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হইতে লাগিল। এ অবস্থায় যাহা করা কর্ত্তব্য তজ্জন্য সে প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম দিনের সংঘর্ষে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার

প্রকৃত রহস্য আজো পর্য্যন্ত আমি অবধারণ করিতে পারি নাই। তাহাই প্রথমে বলিব।

শ্রদ্ধাস্পদ ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের আহিরিটোলার বাটীতে যে দিবস আমি ত্রৈলোক্যকে রাখিয়া বাটী আসিলাম, সে দিন উপেন্দ্র অতিশয় উত্তেজিত হইয়া আমাকে বাটী হইতে চলিয়া যাইতে বলে; এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে দিন তাহার সঙ্গে বাদানুবাদ না করিয়া প্রায় মধ্যাহ্নকালে আহারাদি না করিয়াই ব্রহ্ম মন্দিরে চলিয়া আসি। তাহার পর বোধ হয় ৩।৪ দিন আর বাড়িতে গেলাম না। কিন্তু ক্রমে মনে হইল, বাড়িতে থাকিব না বটে কিন্তু যতক্ষণ আমার স্ত্রী-পুত্র সেখানে আছে এবং তাহাদের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্যও রহিয়াছে, ততক্ষণ আমি বাড়ি যাইব না কেন? এই মনে করিয়া একদিন বাড়ি আসিলাম। প্রথমে নিচের ঘরে বসিয়া মাতাঠাকুরাণীর সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। উপেন্দ্র তাহা উপর হইতে দেখিয়া গেল। তারপর উপরে যে ঘরে আমার স্ত্রী ছিলেন, আমি সেই দিকে যাইতে দেখি, ভিতর হইতে সিঁড়ির দরজা বন্ধ। অন্য দিকে গিয়া দেখি সে দিকেও ঐরূপ বন্ধ, তখন আমি বুঝিলাম উপেন্দ্রই এইরূপ করিয়াছে, আমি উপরে যাইতে না পারি এই তাহার অভিপ্রায়। তখন আমার মনে হইল, এ কী অন্যায়! এরূপ সংকীর্ণ ভাব তাহার কেন? আমি ত বাড়ী থাকিতে আসি নাই, তবে এরূপ করিবে কেন! তখন আমার মনেও একটু উত্তেজনা-ভাব আসিল। আমি একেবারে সদর বাড়ির তেতালার সিঁড়ির পথে সর্ব্বোপরি ছাদের উপর দিয়া দ্বিতলে আমার স্ত্রী যে ঘরে আছেন সেই ঘরের দিকে যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। সিঁড়ির শেষ দরজা যাহা অতিক্রম করিলেই ছাদে যাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে তাহাও বন্ধ। ফিরিয়া সদর বাড়ির দ্বিতলের বারেণ্ডায় আসিয়া তথা হইতে স্পষ্ট দেখিলাম ছাদের দিক দিয়া দরজায় শিকল ও একটি তালা দেওয়া রহিয়াছে। তখন আর কি করিব, মন্দিরে চলিয়া যাওয়াই উচিত মনে করিলাম। কিন্তু মনে কেমন একটা অপমান বা পরাজয়ের ভাব আসিয়া কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে কে যেন আমাকে চালিত করিয়া আর একবার সেই ছাদের দরজার নিকট লইয়া গেল। তখন দরজার কপাট ধরিয়া টানিলাম; কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! এই যে দরজা বন্ধ ছিল, এখন কে খুলিয়া দিল। তবে কি উপেন্দ্রই খুলিয়া দিয়া গেল? কৈ সে ত আসে নাই! এই ঘটনাকে দৈব কিম্বা অন্য কোন অলৌকিক ক্রিয়া বলিয়া আমার মনে হইল না,

ইহা একমাত্র ভগবানের অভাবনীয় কৃপা। ইহাতে সেই দিন আমার মনে আর একটি বিশ্বাস হইল এই, আমি যে পথে যাইতেছি, এইরূপে ভগবান্ আমাকে সকল সঙ্কটে জয়যুক্ত করিবেন। তাঁহার নামে ধর্ম্মযুদ্ধে আমার জয় হইবে। আমি যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম তখন উপেন্দ্র আমার সহিত কথা কহিতে পারিল না। সে যেন স্তম্ভিত হইয়া আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। তাহার পর, স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া কিছু কথাবার্ত্তা কহিয়া মন্দিরে চলিয়া আসিলাম।
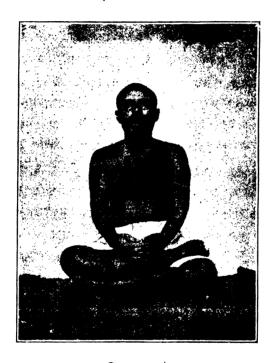
পরলোকবাসী ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ।

এইরূপে দীর্ঘকাল উপেন্দ্রর সঙ্গে মতান্তর ও স্বার্থের সংঘর্ষ চলিয়াছিল। প্রয়োজন মতে বোধ হয় আরো কিছু বলিতে হইবে। কিন্তু উপেন্দ্রর শেষ জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার সকল মনক্লেশ দূর হইয়াছিল, তাহার ভক্তি বিশ্বাস দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে প্রস্থানের অব্যহিত পূর্ব্বে কুশদহ-বাসি পরলোকগত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে ও তাঁহারই দ্বারা গৃহীত, তাহার একখানি ছায়াচিত্র (ফটোগ্রাফ) রাখিয়া যাওয়ায়, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের মধ্যেও একটি শান্তির বিষয় লাভ করিয়াছি।

বঙ্গে পাটের চাষ

—:০:—

যে কাজে যে সুবিধা বোধ করে, লাভ দেখে, সে সেই কাজ করিয়া থাকে। অন্যের মুখপানে তাকাইয়া কেহ কোন কাজ করে না, জগৎ এই ভাবেই চলিতেছে। চিকিৎসক দয়ার খাতিরে, রেলকোম্পানী অপরাপর গাড়োয়ানের দল পরোপকারার্থে কাজ করে না, তন্তুবায় লোকের বস্ত্রাভাব নিবারণ কামনায় বস্ত্র বয়ন করে না। এইরূপ যিনি যাহাই করুন নিজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়া থাকেন। কৃষকগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে যে ধান্যের চাষ অপেক্ষা পাটের চাষে বিলক্ষণ লাভ, তাই শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি আজ পাটের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ধানের চাষ বিলুপ্ত প্রায়। কৃষক নিজের প্রয়োজন মত ধান্য ও বিচালী সংগ্রহের জন্য কিছু জমী রাখিয়া তাহার আর সমুদয় জমীতেই পাট বুনিয়া থাকে। এই পাটের কাজে যে একাকী কৃষকেরই লাভ তাহা নহে, সহজে খাজনা আদায় হয় বলিয়া জমীদারগণ পাটের পক্ষপাতী, উকীল মোক্তার এমন কি গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত পাটের মঙ্গলকামী। রেলকোম্পানি ও অন্যান্য গাড়োয়ানের তো পাথরে পাঁচ কীল! শ্রমজীবিরা বর্দ্ধিত হারে বেতন পায়, মসীজীবীর বরবপুর আচ্ছাদনে পাট অনেক সহায়তা করে। পাটের মোরসোমে চিকিৎসক দালাল ও কুসীদজীবীরও জ্যৈষ্ঠমাস। ফলকথা পাটে লাভ নয় কার? দেশের সকলই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পাটের গুণে জড়িত, এ গুণ নাগপাশকেও পরাস্ত করিয়াছে।

বাঙ্গলার পাটে যে কেবল বাঙ্গালীই লাভবান্, তাহা নহে, সমস্ত পৃথিবী ইহা দ্বারা মহোপকৃত। তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় বিজ্ঞানবিৎ বিদেশীয় লোকেরই ইহাতে লাভ অধিক। ফলতঃ কি স্বদেশ কি বিদেশ সর্ব্বত্রই পাটের যথেষ্ট সমাদর। পাটের জন্য বাঙ্গালা ধন্য হইয়াছে। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে বঙ্গদেশে ক্রমশই পাটের উন্নতি হইতে থাকিবে।

কিন্তু সকল বস্তুরই এদিক ওদিক আছে। আর দিকে দেখ পাটে বাঙ্গালার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পাটের জন্য নদ নদী খাল বিল ডোবা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ই কুম্ভীপাক নরক সদৃশ হয়, তাহাদের ন্যক্কারজনক পূতিগন্ধে দিগন্ত পরিপূর্ণ, ঐ বিষাক্ত জলেই অনেকের স্নানাহার চলে; বাঙ্গালা স্বভাবতই মশকপ্রধান দেশ, বাঙ্গালার জলাশয় এই পাটপচা জলে অপ্রমেয় মশকের সৃষ্টি করিতেছে। এবং অসংখ্য রোগের সাংখ্যাতীত জীবাণুর উৎপাদন করিতেছে।

এই আব্ হাওয়ার দোষে যে অনেকেই নানারোগে মারা পড়িতেছে এবং অনেকে কোন রকমে প্রাণ পাখী চির-ভগ্ন দেহ-পিঞ্জরে পুরিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

দেশ যখন অসভ্য ছিল মাঠের অনেক জমী অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত থাকিত, গরু বাছুর ঐ সমস্ত ভূমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইত! সভ্যতার সমাগমে কৃষির প্রকর্ষে যখন ঘাসের অপ্রতুল ঘটিল, তখনও বিচালী দ্বারা তাহারা কতক পরিমাণে বাঁচিয়া থাকিত। এখন পাটের কল্যাণে সে বিচালীও যাইতে বসিয়াছে, দেশে ধান গেল, বিচালী গেল, গরু গেল, দুধ গেল, দুগ্ধপোষ্য বালক সাগু সুজী খাইতেছে। সুজী সাগু ও ডাকঘরের সস্তা কুইনাইনে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে, আরও কালে কত কি হইবে তাহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে। মা লক্ষ্মী নির্ব্বাসিত। মানুষ অল্পাহারে বা কুভোজনে এবং অন্যান্য শত শত কারণে লোকান্তরে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্‌যুক্ত। গোবংশ আহারাভাবে যমালয় যাত্রায় উন্মত। এইতো হইল দেশের পরিণাম। এখন প্রতীকারের উপায় কৈ? যাহার ভাবনা সেই ভাবিতেছে, যাহার যে কাজ সে তাহাই করিতেছে, সুতরাং যাহার যাহা গম্যস্থান সেই সেখানেই যাইবে। এখন সকলে বল হে ভগবন্—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

বর্ত্তমান যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য অল্প বিস্তর সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছেন; জন সাধারণের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। সুতরাং এ অবস্থায় ভাল কথা, আশার কথা, উন্নতির কথা বলিলে সহসা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। আমাদের স্বদেশী ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে যে আবার সুভদিন আসিতেছে একথা কয়জন লোকে ধারণা করিতে পারিতেছেন। যাহা হউক আমরা কর্ত্তব্য বোধেই আজ কুশদহবাসিকে একটি কথার ঈঙ্গিত করিতে চাই।

কুশদহ অঞ্চল চিনি গুড়ের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখন হইতে যাঁহারা চিনি গুড়ের কাজে আবার সচেষ্ট হইবেন, তাঁহারাই লাভবান হইবেন। আমরা নিম্নে আমাদের অভিজ্ঞ বন্ধুর অভিমত প্রকাশ করিলাম।

(প্রাপ্ত)

জার্ম্মণীর হঠকারিতা ও আত্মম্ভরিতায় ইয়ুরোপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কতকালে নির্ব্বাপিত হইবে সুবিজ্ঞ রাজনীতিক ও সুচতুর রণ-পণ্ডিতগণও বলিতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ডেশ্বর ইতিপূর্ব্বে অনেকবার অনেক সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে কখন এরূপ বাণিজ্য সমস্যা হয় নাই। এবার বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ। আমদানি রপ্তানি বন্ধ। মাসাধিক

কাল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব আশঙ্কার রব উঠিয়াছে। রবার তৈল বীজ চামড়া প্রভৃতি জিনিস রপ্তানি অভাবে ও ব্যবহারোপযোগী করিবার আমাদের ক্ষমতা অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে দেশের লোকের অর্থাভাবে প্রভূত কষ্ট হইতেছে। পাট একমাত্র বঙ্গভূমিতে জন্মায়। পাট এদেশের একচেটিয়া জিনিস। আমরা পাট রূপান্তর না করিয়া বিক্রয় করি। পাশ্চাত্য বাণিজ্যজীবিরা সেই পাট দেশে লইয়া গিয়া থলে, চট, দড়ি, সতরঞ্চ, গরম কাপড় ও কাগজ প্রস্তুত করেন। আমরা তাহা দশগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া কৃতার্থ হই।

আমাদের দেশজাত চিনি বিদেশজাত চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় দণ্ডায়মান হইতে না পারায় প্রায় লোপ পাইয়াছে। এখন আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য চিনি জাবা, মারিসাস, জার্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে আসে। এই শেষোক্ত দেশদ্বয়-জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার বাণিজ্য বন্ধ। সেকারণ চিনির অভাব হইবে। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যাহাতে এদেশে চিনি আবার পূর্ব্বমত উৎপন্ন হয় তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সেকারণ Agricultural chemist আনেণ্ট সাহেব ও আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর শোয়ান সাহেব ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন। এই সময় যদি শুকচর বাদুড়িয়া, গোবরডাঙ্গা, কোটচাঁদপুর ও তারপুর প্রভৃতি স্থানের চিনি ব্যবসায়ীগণ সচেষ্ট হন তবে তাঁহারা উন্নতিশীল ও লাভবান হইতে পারেন। যে পরিমাণে আমরা নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব, সেই পরিমাণে আমাদের আর্থিক উন্নতি হইবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া দেশের লোকে আর কতকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন?

শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র।

সাহায্য-প্রাপ্তি

(১লা ভাদ্র হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত)

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবালয়	৪৲
পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক		
(দুইটি পৌত্রীর বিবাহ-উপলক্ষে)		২৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রক্ষিত	বরাহনগর	২৲
„ বসন্তকুমার রায়		২৲
„ প্রকাশচন্দ্র বসু		২৲

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

বঙ্গের অদ্বিতীয় নাটককার

চৌবেড়িয়ার-গৌরবরবি

স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

পুত্র

কবিবর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, কলিকাতা

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩২১	সপ্তম সংখ্যা

ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মোৎসব

দেখিয়াছি দুর্গাপূজা, মহামায়া দশভূজা,
আশ্বিনে অম্বিকা দেবী বাঙ্গালীর ঘরে ;
পেয়েছি উদর পূরি, খাজা গজা লুচি পুরী,
মায়ের প্রসাদ, যার গন্ধে মন হরে।
জাগিয়া সকল নিশি, বাল্যসখা সঙ্গে মিশি
শুনেছি যাত্রার গান মনের উল্লাসে ;
পরিয়া নূতন বাস, করি হাস্য পরিহাস,
হরিয়াছি সুখে কাল বিবিধ বিলাসে।
বাল্যকালে ছেলেখেলা, দেবীপূজা মহামেলা,
ধুপ ধুনা পুষ্পগন্ধ পূজা বলিদান ;
সুগম্ভীর বাদ্যনাদ, শান্তিজল আশীর্ব্বাদ,
আত্মীয়ের আলিঙ্গনে জুড়াইত প্রাণ।
ইন্দ্রিয়ের সুখকর, বাহ্য দৃশ্য মনোহর
রূপ রস গন্ধ আদি যত উপচার,
করিত নয়ন মন, সহজেই আকর্ষণ,
উথলি উঠিত হৃদে সুখ পারাবার।

ভুলি নাই সে সকল, মনে আছে অবিকল,
সুন্দর সে ছবি, স্মরণেও হিয়া গলে ;
যখন যা প্রয়োজন, ছিল তার আয়োজন,
কিন্তু চিরদিন কি পুতুল নিয়ে চলে ?
তাই ভক্ত ব্রহ্মানন্দ, হরিপ্রেম মকরন্দ,
পিয়াইলা পিপাসিত নরনারী সবে :
শ্রীহরির শ্রীমন্দিরে, ভাসি চিদানন্দ নীরে,
ভাসাইলা ভক্তগণে মহা মহোৎসবে।
কে আছে এমন কবি, বর্ণিবে সে প্রেমচ্ছবি,
স্বর্গ যেন অবতীর্ণ অবনী মণ্ডলে :
অতীন্দ্রিয় চিদাকাশে, চিণ্ময়ী জননী হাসে,
কেশব তাহার পাশে ভা স অশ্রুজলে।
যোগ ভক্তি হীন যত, পাপতাপে অভিহত,
কলির কঠিন প্রাণ হিন্দুর সন্তান ;
নির্গুণ ঈশ্বরে ভজি, সংসারে আছিল মজি,
করিত আঁধারে বসি অন্ধকার পান।
কেশব তাদের সবে, মাতাইয়া মহোৎসবে,
কাঁদিয়া আপনি আহা, কাঁদাইলা কত :
হায় সে আনন্দ ধাম, হৃদে জাগে অবিরাম,
কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ মনে ভাবি যত !
গভীর অধ্যাত্ম যোগে, নিত্যানন্দ রসভোগে,
কাটিয়া যাইত দিন, দ্বিপ্রহর রাতি :
আনন্দময়ীর রূপ, প্রেমঘন অপরূপ,
নেহারিত সবে মহা মহোৎসবে মাতি।
নিরাকারা ভগবতী, প্রেমপূণ্যে মূর্ত্তিমতী,
করিয়া কেশব যবে ধরিত সম্মুখে ;
ভক্তির তুলিকা দিয়া, নানা রঙ্গে সাজাইয়া,
মায়ের চরণপদ্ম আঁকি দিত বুকে ;—
বহিত নয়নে ধারা কেঁদে সবে হ'ত সারা,
ভাসিত ভক্তির জলে মন্দির তখন ;

নিরখি সে ভাবাবেশ, পাসরিয়া ভবক্লেশ,
হিন্দুকুল নারী যত করিত ক্রন্দন।
হায়, সে সুখের স্বপ্ন, অকালে হয়েছে ভগ্ন,
তাইরে বিষন্ন আজ সকলের মুখ;
আর কি আসিবে ফিরে, সেই শোভা শ্রীমন্দিরে,
ধুয়ে যাবে প্রেমনীরে বিচ্ছেদের দুখ!
হায় বিধি নিজগুণে, পাপীদের কান্না শুনে,
দেখাবে কি সেই স্বর্গ ভূতলে আবার?
উৎসবের অবসানে, গাইব কি শেষগানে,
"গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর"

(পথের সম্বল) শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা

দুর্গোৎসব

হিন্দু সমাজে আর সকল পূজা অর্চ্চনা অপেক্ষা দুর্গা পূজা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎসব। ইহা জাতিয় উৎসব। হিন্দু নর নারী প্রত্যেকের প্রাণকে এ উৎসবে অত্যাধিক উদ্বুদ্ধ করে। এই সময় সকলেরই মনে একটি ভাবের সঞ্চার হয়। কেহ এই উৎসবকে উপেক্ষা করিতে পারে না। এমন কি, প্রতিমা পূজার বিরোধী মুসলমান সমাজও এ সময় উদাসীন থাকিতে পারে না। এই উৎসবে যোগ দিবার কাহার পক্ষে বাধা নাই। পল্লীর এক বাড়িতে প্রতিমা হইলে আর সকলেই তথায় যাইয়া প্রতিমা পূজা, আরতি দর্শন করে। গৃহস্থ তজ্জন্য বিশিষ্ট প্রতিবাসী দিগকে প্রতিমা দর্শনার্থে নিমন্ত্রণ করেন। সর্ব্বসাধারণে নিমন্ত্রিত না হইলেও অবাধে গমন করে।

ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের ভক্তি বিশ্বাসের ভাব অধিক দেখা যায়। আরতির সময় স্ত্রীলোকদিগের একাগ্রতা সমধিক হয়। পুরুষদিগের ভক্তি বিশ্বাসের ভাব অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। ইংরাজী শিক্ষিতগণের আরো কম। যাঁহারা স্বভাবত ভক্ত এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসী তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাকে জাতিয় উৎসব জ্ঞানে কিছু নবভাবে উদ্বোধন করিয়া লইয়াছেন।

ইহাতে পান ভোজন ক্রিয়া যাহা সম্পন্ন হয় তাহা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। দুঃখী দীনের যেটুকু সৎকার করা হয়, তাহাও ঐ নিয়মের অন্তর্গত। এই পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে পশুবধ শাস্ত্রানুমোদিত 'বলিদান' নামে নিবদ্ধ। কিন্তু সর্ব্বত্র নয়। যেখানে বলিদান হয় না, সেখানকার পূজা বৈষ্ণবী মতে কথিত হয়। কিন্তু শাক্ত মতে বলির প্রথাই সমধিক। শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও ইহা অনার্য্য-অনুকরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কালীমূর্ত্তি অনার্য্যদিগের দ্বারা কল্পিত। পরবর্ত্তী সময়ে আর্য্যগণ আধ্যাত্মিক ভাবে ইহার সংস্কার করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি মূল অনার্য্যভাব বিদ্যমান আছে। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-ফলে, এ বিষয়ে যে সকল সত্য তথ্য আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। দেবতাকে মদ্য, মাংস উপহার দেওয়া যে, আদিম অসভ্য অনার্য্য প্রথা ইহা নিশ্চিত।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে 'আগমনী' হইতে 'বিজয়া' পর্য্যন্ত যে আখ্যায়িকাটি ইহার সহিত সংযুক্ত আছে তাহাতে জ্ঞানাংশে ত্রুটী থাকিলেও ভাব অংশে বেশ মধুরতা আছে। ভগবানকে জগত-জননী অথচ কন্যাভাবে কল্পনা করিয়া স্নেহ বাৎসল্য রসের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহাতে নারী হৃদয়ের ভাবগুলি বেশ চরিতার্থ হয়। কিন্তু ভগবান্ যে কেবল সংসার-খেলার বস্তু নহেন, তিনি যে 'মহতোমহিয়ান্', এ ভাব ম্লান হইয়া গিয়াছে।

তারপর দুর্গোৎসব সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, ইহা একটি সাময়িক উত্তেজনা মাত্র, ইহা ভগবদুপাসনার উচ্চ আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, যে উপাসনা অর্চ্চনাতে চরিত্র সংশোধিত হয় না, পাপ পরিত্যাগের শক্তি আসে না, তাহা জ্ঞান-ভক্তি বিশ্বাস মূলক জীবন্ত সাধনা নহে। তাহা ব্যাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। তাই দেখা যায় দুর্গোৎসবের আরম্ভে হিন্দু-মানব-সমাজ যেমন ছিল উৎসব অন্তেও তেমনিই আছে। কথাটি বোধ হয় একটু শক্ত হইল, কিন্তু সত্য! তাই ভরসা হয় সত্য পিপাসু ব্যক্তি মাত্রে, অসন্তুষ্ট না হইয়া এ বিষয় সুচিন্তা করিতে অবকাশ পাইবেন। ভগবান্ সকলের প্রাণে শুভ সঙ্কল্প প্রেরণ করুন।

কুশদহের ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আগমন করেন তাঁহারা মহারাজ আদি-শূরের নিকট হইতে প্রত্যেকে এক এক গ্রাম লাভ করেন। তাঁহাদের বংশধরেরাও পরবর্ত্তী রাজগণের নিকট হইতে গ্রাম ও ভূমিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছাপান্নটী গ্রাম লাভ করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণের উত্তর পুরুষেরা নিজ নিজ গ্রামের নামে পরিচিত হন। কনোজাগত দক্ষের পুত্র ধীর মহারাজ আদিশূরের পুত্র ভূ শূরের নিকট গুড়গ্রাম লাভ করেন। ঐ গুড়গ্রাম মুরশিদাবাদ জেলায়। সেই অবধি তাঁহার বংশধরেরা গুড়গ্রামীন্‌ এবং সংক্ষেপতঃ গুড় নামেই পরিচিত। ধীর গুড়ের অধঃস্তন অষ্টম পুরুষ শরণিগুড় মহারাজ বল্লালসেনের সমসাময়িক এবং তাঁহার নিকট পরিচিত ছিলেন।

প্রবাদ আছে বিক্রমপুর রাজধানীতে অবস্থানকালে আষাঢ় মাসের এক দিবস মহারাজ বল্লাল পূজা সমাপন করিয়া দেবগৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময় দেওয়ালের গায়ে নিম্নলিখিত কবিতাটী দেখিয়াছিলেন।

পতত্যবিরলং বারি নৃত্যন্তি শিখিনঃ মুদা।
অদ্য কান্তো কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

মহারাজ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন শ্লোকটী তাঁহার পুত্রবধূর (লক্ষণসেন দেবের স্ত্রীর) লিখিত। লক্ষ্মণসেন দেব তখন রাজধানী গৌড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে সদ্য বিক্রমপুরে লইয়া আসার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া রাজনৌসেনাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন। কিন্তু বহু পুরস্কার লাভের লোভেও কোন নাবিক একার্য্যে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে সূর্য্যমাঝি নামক জনৈক যুবা নাবিক স্বীকৃত হইল। প্রতিজ্ঞা মত সে সদ্য লক্ষ্মণসেন দেবকে বিক্রমপুরে লইয়া আসিল। মহারাজ বল্লাল অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে সূর্য্যদ্বীপ নামে ভূখণ্ড পুরস্কার দিলেন। ঐ সূর্য্যদ্বীপ সূর্য্যমাঝির নামানুসারেই পরিচিত। এই দ্বীপকে এক্ষণে সুখদিয়া বলে। যশোহর জেলায় মহেশপুর গ্রামের নিকট সূর্য্যমাঝির বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যমাঝিকে ভূসম্পত্তি পুরস্কার দিয়া মহারাজ বল্লাল তাহার কাজ চালাইবার জন্য শরণিগুড়কে নিযুক্ত করেন। তদবধি শরণির বংশধরেরা

পুরুষানুক্রমে সূর্য্যমাঝি ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। কালে ঐ বংশীয় সুলতান মাঝি মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিলে গুড়মহাশয়েরা তাহার প্রাণসংহার করিয়া রাজ্যটী আত্মসাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বেনাপোলে কেহ ব্রাহ্মণনগরে কেহবা চেঙ্গুটীয়া প্রভৃতি স্থানে বিষয়-ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত হইতে খাঁ জাহান আলি নবাবের সময় পর্য্যন্ত গুড় বংশীয়েরা ইছামতী ও ভৈরবের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বিশেষ প্রবল হইয়াছিলেন। সেই জন্য মহম্মদ তাহের বলপূর্ব্বক জয়দেব ও কামদেবকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আশা করিয়াছিলেন যে অপর সকলে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না। রতিদেব ও শুকদেব অগ্রজদ্বয়ের অনুসরণ করিলেন না। যদিও শুকদেব ভগ্নীর বিবাহ জন্য অনেক দুশ্চিন্তা ও মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছিলেন তথাপি স্বধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা থাকাতে ও ঈশ্বরে অচলা ভক্তি থাকায় সে দায় হইতে অপ্রতিভভাবে অব্যাহতি লাভ করেন। স্বধর্ম্মে দৃঢ়মতি ছিল বলিয়াই উত্তরকালে তাঁহার বংশধরগণ ও জয়দেবের কোন সন্তান (মহেশপুরের গুড়গণের পূর্ব্বপুরুষ) ব্রাহ্মণসমাজে পুনরায় প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। যদিও ঘটকগণ নিজ নিজ কুলগ্রন্থে অনেক বিদ্রূপ ও ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছেন তথাপি শুকদেবের ধর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহার মার্জ্জিত হইবার মূল কারণ। নীলকান্ত রত্নমালার বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শুকদেবের এক ভগ্নী রত্নমালা নাম।
যত্নের বশে কল্লেন বিয়ে মঙ্গল গুণধাম॥
রত্ন দিয়ে বাড়ী নিয়ে ছিঁড়লেন কুলের বোঁটা।
অর্চ্চনা করিয়া দিলেন চন্দনের ফোটা॥
মঙ্গল আনন্দ মথো মুখবংশ জাত।
রামের সন্তান ইনি হলেন কুপোকাত॥

মঙ্গলানন্দ ফুলের মুখুটী রামের সন্তান। তাই ফুলের বোঁটার কথা বলা হইয়াছে। ফুল মেলের প্রধান কুলীন মুখবংশজাত মঙ্গলানন্দ কুলহীন হইলেন বলিয়া বিদ্রূপ করিলেও তাঁহারা যে স্বধর্ম্মে আস্থাবান রহিলেন ইহাই সমাজের পরমলাভ বলিতে হইবে। নহিলে সমাজ কতটা বলহীন হইতেন তাহা বলা যায় না। পীরালি সমাজকেও যদি তখনকার সমাজপতিরা বর্জ্জন না করিয়া বক্ষে স্থান দিতেন তাহা হইলে কত সুখের হইত বলা যায় না। যাহা হউক

শুকদেবের জন্যই আমরা এখনও এতগুলি ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে নিরত দেখিতেছি। তিনি ভগ্নীর বিবাহ জন্য যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, নিজের কন্যার বিবাহ জন্য তদপেক্ষাও অধিক কষ্টে পড়িয়াছিলেন। ইহাতেও যে তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগের ইচ্ছা হয় নাই তাহাতে হিন্দুসমাজ চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার ন্যায় ভক্তকে ভগবান্ রক্ষা করিয়াছিলেন। শুক দেবের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ভট্ট নীলকান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন।

জগন্নাথ ন্যায় পঞ্চানন বড়ই পণ্ডিত বিচক্ষণ।
বড় বজরায় পুরাণ কলবায় কর্ত্তেছেন গমন॥
ভামরব ভৈরবের জলে ভাসছে বজরা কুতুহলে।
এমন সময় ঝোড়ো কোণায় কাল মেঘের দরশন॥
জগন্নাথ আজ হবেন ঠুঁটো, পবন ধূলা উড়ায় মুঠো মুঠো,
তাই ধীরে গুড় গুড় মেঘেরা ডাকে ক্রমে কড়মড় চিকুর হাঁকে
জগন্নাথ পড়িয়া বিষম বিপাকে কেয়াতলায় কল্লেন মায়ের দরশন।
চেমুটীয়ার কেয়াতলা কালীবাড়ীর পাড়া।
রাজবাড়ীতে পড়ে গেল তখনই সাড়া॥
বটে বটে বটে ভাটেরা কয়,
খট খট খট চলে রাজার হয়।
ঝড়ের মাথায় চল্লেন রায় আরাধিতে পঞ্চানন।
যতনেতে জগন্নাথ বশ
আতিথ্য গ্রহণে সর্ব্বনাশ
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, রাখ মেরা বাত চলো মেরা সাথ
হোকে আসোয়ার এহি ঘোড়েকা পর
নজদিক হয় রাজভবন॥
পুরুষ উত্তম জগন্নাথ চল্লেন শুকদেবের সাথ
দেখিয়া সুন্দরী মেয়ে জগন্নাথ কল্লেন বিয়ে
মুখমিষ্টি গুড় খেয়ে পুরুষোত্তম গেলেন বয়ে
এই যে গোষ্ঠী মুখমিষ্টি জানে তাত সর্ব্বজন॥"

এই জগন্নাথ কুশারীবংশীয়। তাঁহার নিবাস পিঠাভোগ। তিনি মঙ্গলানন্দের ন্যায় কুলীন ছিলেন না। তিনি শ্রোত্রিয়। অপিচ তাঁহাদের ও পরিবাদ ছিল। তাঁহাদের বনমালী কুশারীর বংশধর শ্রীমন্তখাঁ মুসলমান

সম্পর্কে স্বনামখ্যাত থাকের ও দোষের সৃষ্টি করেন। প্রভাকর কুশারীর বংশধর শুভাচার্য্য সেরখালী দোষগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু মুসলমান রাজার অনুগৃহীত ও প্রবল ভূস্বামী বলিয়া লোকে তাঁহাদের তংটা খাটো করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু জগন্নাথ শুকদেবের কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাকে আর সমাজ গ্রহণ করিল না।

জগন্নাথ কুশারীর যতই দোষ থাকুক, যতই পরিবাদ থাকুক ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি স্থগিত ছিলেন না। শুকদেবের কন্যা বিবাহ করিয়া তিনি আর জ্ঞাতিগণের নিকট আদৃত হইলেন না। কাজেই তাঁহাকে শ্বশুর গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল। শুকদেবও নিজের দলপুষ্টি করিবার জন্য সাদরে জামাতাকে গ্রহণ করিলেন। তৎকালিন ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক স্বধর্ম্মনিরত শুকদেব কিরূপ নিপীড়িত হইয়াছিলেন তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়। উত্তরকালে স্বধর্ম্মত্যাগী জয়দেবের (?) কোন কোন সন্তানকে মার্জ্জিত করিয়া সমাজে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণসমাজ এই পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শুকদেবকে স্থগিত না করিলে হয়ত সমাজের আরও বলবৃদ্ধি হইত।

নীলকান্ত ঠিক কথা বলিয়াছেন যে "গুড়গোষ্ঠী মুখমিষ্টি জানে সর্ব্বজন।" শুকদেবের বিনয়, নম্রতা ও শিষ্টাচারগুণে বশীভূত হইয়া মঙ্গলানন্দ ও জগন্নাথ ন্যায়পঞ্চানন বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এখনও অনেক কুলীন অনেক পণ্ডিত, অনেক কুলাচার্য্য এই গুড়গোষ্টীর মিষ্ট কথায় ভুলিয়া থাকেন। তবে শুনিয়াছি এ গুড়ে এখন আর আদৌ সার নাই। যাহা আছে কেবল চিটা তাও বিষম তিক্ত। একবার গায়ে লাগিলে ছাড়ান মুস্কিল।

আর একটিমাত্র বিবাহ সম্বন্ধীয় দু' চারিটা কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। নীলকান্তের কারিকাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। পিরালী সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে নীলকান্তের কারিকার উপর বিশেষ নির্ভর করিতে হয়। কেন না পূর্ব্ববঙ্গের কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এই কারিকা হইতে পাওয়া যায় শুকদেবকেও প্রথমে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মচ্যুত করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় ধর্ম্মত্যাগ না করিয়া নিজ ধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন। এজন্য তাঁহার যতই নিগ্রহ

ভোগ করিতে হউক তিনি ধর্ম্মত্যাগে সম্মত হন নাই। ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিই তাঁহাকে সকল নির্য্যাতন সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছিল।

তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ কন্দর্প রায়। তিনি সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। তখনও তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ঠ ছিল এবং সমাজেও কতকটা মার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এক কন্যা রূপে গুণে অতুলনীয়া হইয়াছিলেন। ঐ কন্যাকে নদীয়ার রাজবংশে বিবাহ দেওয়ার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। এ জন্য নিজ ভাট প্রতাপ ভট্টকে নিয়োজিত করেন। প্রতাপ ভট্ট নদীয়ার রাজবংশের ভাট বৃদ্ধ রাঘবভট্টের শরণাপন্ন হইলেন। বৃদ্ধের অনুগ্রহে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইল। কিন্তু ব্যয় হইল প্রচুর। তদবধি শুনিতে পাওয়া যায় কেশরগ্রামীনদিগের মধ্যে পিরালী সম্পর্ক ঘটে। এ সম্বন্ধে নীলকান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রতাপভট্ট　　উত্তরাদি দক্ষিণাদি হয়ে দুই গাঁও।
কাম জয় রতি শুক রহা চারি ভাও॥
সোবরাত নমাজকা রাত খাঁজাঁহেকা দরগাও।
পহিলে পিরালী ভয়া শুকদেব রাও॥
কাম জয় নাম গয়া হুয়া কামাল জামাল।
রতি শুককা দুঃখ শুনলেও হাল॥
রৈদেও শুনা যব উহ সমাচার।
শুককা আপন ছোড়া রাজ্য সুখ ভার॥
ছোড় দিয়া ভাগ, গয়া তরফ উত্তর।
পোয়া জমিন গিয়া ভৈরো কিনার॥
উহ বংশ অবতংশ ইহ কন্দর্পরাও।
দানে যথা কর্ণ হয় যেত্তে মাঙ্গোপাও॥
উনকো এক লড়কী হায় ক্যা কহোণ রূপ।
খুব সুরতসে লছমীজীকো কর দিয়া বিরূপ॥
বিদ্যামে ভয়া সরস্বতী বাগ্‌বাদিনীবাদী।
মহারাজ রাঘবকা সাত লাগা দেও সাদী॥
শুন দাদা ভট্টরাজ মেরা পানে দেখো।
কাম ফতে কর দেও চুপচাপ রাখো॥

রাঘব।　　উত্তরদি দক্ষিণদি উহ বাত নেহি।

বুনিয়াদি গাঁও হ্যায় কিম্বা নহি ॥
আদ্ অন্ত মধ্য হাম সবজানে পরতাপ।
তুম অবহি লেড়কা হ্যায় জানে তেরা বাপ॥
আউর আজ কহ ভাই শুননে মাঙ্গে হাম।
কহত প্রতাপ ভাই বুঝে তেরা কাম॥

প্রতাপ। কন্দর্পকা পিতা রামকৃষ্ণ দোনে' ভাই।
উনকো পিতা সায়ন শরণ আচার্য্য কহাই॥
উনকো পিতা মহেন্দ্রদেও নরেন্দ্র দেওরায়।
মহেন্দ্র নিঃসন্তান ভয়া এহি কহা যায়॥
উনকো পিতা গৌরীদাস শ্যাম কালাচাঁদ।
জিন সাহেবসে স্থাপিত কিয়া রায় কালাচাঁদ॥
উনকো পিতা শুক রতি কামাল জামাল।
কর জোড়কে পাঁকড়ো চরণ এহি সাচ্চা হাল॥
আদ মধ্য ছোড় দেও অন্ত বাত কহো।
লাখ রুপেয়া লেও দাদা চুপচাপ রহো॥
আধা আধা কা দাদা এহি বাত সহি।
দাড়ি হিলায়কে বুড্ডা কহে নেহি ভাই নেহি॥

পরে অনেক চেষ্টায় এই বিবাহ ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে গুড় চৌধুরীরা মার্জ্জিত হইয়া সমাজে গৃহীত হইলেন। এই কেশব মহেশপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ। মহেশপুরের জমিদার শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী কেশব হইতে দশম পুরুষ। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন তাঁহারা জয়দেবের বংশীয়। সম্বন্ধ নির্ণয় ও জয়ন্তীপুরের ঘটকগ্রন্থেও তাঁহাদিগকে জয়দেব বংশীয় বলা হইয়াছে। অন্যমতে তাঁহারা শুকদেবের বংশধর। সেইমত ঠিক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(একটি পারিবারিক চিত্র)

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেনহাটী নিবাসী গৌরীকান্ত কবিভারতীর পুত্র মধুসূদন দাস কালিয়ায় বাড়ী করেন। কেহ বলেন, সংগ্রাম সিংহের সম্বন্ধ

দূষিত বাণীবহের রাজ বাড়ীর বিবাহে বরযাত্রী হওয়ার অপরাধে, কেহ বলেন তখন সুন্দর বনাঞ্চলে পর্টুগিজ দস্যু ও মগের আক্রমণের ভয়ে তাঁহারা বিল মধ্যে আসিয়া বসতি করেন। যে ভাবেই আসুন, গুরু পুরোহিত দাস নফরকুল সকলেই সঙ্গে ছিলেন, এবং প্রত্যেকেরই বাসস্থান দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল। খুল্লতাত রামকান্ত কবিকণ্ঠহারও ভ্রাতুষ্পুত্রের মমতায় আবদ্ধ হইয়া উক্ত গ্রামে বসতি করেন। ইনি বৈদ্যকুলজি গ্রন্থ সংকলন করিয়া বৈদ্য-সমাজে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের তিন পুত্র মধ্যে চন্দ্রশেখর দাসের দ্বিতীয় পুত্র রামকেশব কবিশেখরকে লোকে কবিশেখর দাস বলিত। কবিশেখর দাস অতি সদাশয় বুদ্ধিমান ও সুচিকিৎসক ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার বিবাহ হইয়া কয়েকটি সন্তান হয়, তন্মধ্যে বড় পুত্রের জপসা নিবাসী কোন জমিদার কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। পরোপকার অতিথি সেবা দশক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া নিষ্ঠাবান গৃহস্থ হইয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে সে দেশে কোন মহামারী উপস্থিত হওয়াতে একে একে তাঁহার পরিবার উৎসন্ন হইল। স্নেহের বাহনাগণ একে একে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে সংসারের একমাত্র অবলম্বন উপযুক্ত সুপুত্রটিও গেলেন। গৃহিণী পত্র-পুষ্প-শাখা শূন্য ছিন্ন-লতিকার ন্যায় অবস্থান অপেক্ষা অমর লোকে পুত্র কন্যার সহিত একত্র বাস আকাঙ্ক্ষা করিয়াই যেন দুঃখের সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর সময়ে বিধবা পুত্র-বধূর হস্তে শ্বশুরের সেবার ভার দিয়া বংশ রক্ষার জন্য স্বামীকে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া সংসারের শেষ কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলেন।

গৃহে, শ্মশান ভূমে যেন রাবণের চিতা জ্বলিতে লাগিল। যেখানে সুখ সৌন্দর্য্য আশা পবিত্রতা. পুত্র কন্যা গৃহিণীর মধুর সম্ভাষণ, সেখানে কেবলমাত্র নিরাভরণা অভাগিনী একমাত্র পুত্রবধূর হবিষ্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্য এবং নিষ্পত্র ছিন্ন শাখা বৃক্ষের ন্যায় আপনার অদৃষ্ট চিন্তা ব্যতীত আর কবিশেখর দাসের সংসারে কোন অবলম্বন রহিল না। চিকিৎসা ব্যবসাই বা কিরূপে চলিবে, যেখানে শিশুগণের রোগমলিন মুখচ্ছবিতে ক্রন্দন ও দুঃখের চিহ্ন দেখেন, সেখানেই নিজের কোমল স্নেহময় সন্তানগণের পবিত্র স্মৃতির দংশনে দগ্ধ হইয়া কবিশেখর ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এ দিকে বিখ্যাত

সাধক নরহরি দাস কবীন্দ্র বিশ্বাসের তপস্যা প্রভাবে তাঁহার বংশাবলী সাধন ভজনের জন্য চিরবিখ্যাত ছিলেন, সুতরাং কবিশেখর কেবল আহ্নিক পূজা ধ্যান ধারণা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সাধ্বী পবিত্র হৃদয়া স্বার্থত্যাগিনী বৌমা নিজের দুঃখে পাষাণ চাপা দিয়া কেবল দিবারাত্রি শ্বশুর ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষায় দিন কাটাইতেন। নিজে ধনীর সন্তান, এবং হৃদয়ে শোকের অজস্র প্রস্রবণ, সকল ভুলিয়া গেলেন। কেবল সেই পরম ভক্ত পবিত্র পুরুষ শ্বশুরের সেবায় সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহার পূজার ঠাঁই, তাঁহার সন্ধ্যার জায়গা সময়ে অন্ন ব্যঞ্জন ও শয্যাদি প্রস্তুত বিষয়ে যেন ঘড়ির কাঁটার মত প্রস্তুত থাকিতেন। সে সময়ে বয়স্কা-বধূগণ শ্বশুরের সহিত কথা কহিতেন না। কিন্তু বৌমা দেখিলেন, যে তাঁহার শ্বশুর বড়ই কষ্টবোধ করেন, তাঁহার এক একটি নিঃশ্বাসে যেন বুক দমিয়া যায়। তাই অনুমতি লইয়া শ্বশুরের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সৎকথা আলোচনা করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের মনস্তুষ্টি করিতেন। কবিশেখরের পুত্র কন্যাগণ দিনের মধ্যে শতবার বাবা বাবা বলিয়া ত্যক্ত করিত, আজ সম্বৎসর মধ্যে মধুর বাবা সম্ভাষণ কেহ করে নাই, তাই কবিশেখর বলিলেন, বৌমা, শ্বশুর ও পিতায় কোন পার্থক্য নাই, তুমি আমাকে বাবা বলিয়াই ডাকিয়ো। আমার তবুও মনে হইবে, আমি একদিন সন্তানের পিতা ছিলাম। বৌমা আনন্দে সেই দিন হইতে পিতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। প্রায় এক বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ক্রমে কবিশেখর জগতের সকল পাশ বিমুক্ত হইয়া প্রাচীন তরুমূল সকল যেমন ধীরে ধীরে ক্ষরিত হইলে একদিন সশব্দে ধরা বক্ষে পতিত হয়, তিনিও যেন সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

(২)

সে অনেক দিনের কথা, বৌমার পিতার নাম জানি না। তিনি জপসার জমিদার ও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। বোধ হয় চিকিৎসা ব্যবসায়েও অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সাধ করিয়া অরবিন্দ বংশোদ্ভব কবিশেখরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়াছিলেন। কোথায় জামাতা বাবাজী কৃতবিদ্য হইয়া কুলের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন, তাহা না হইয়া কন্যা অকাল বৈধব্য যাতনায় পতিত হওয়াতে জমিদার পত্নী একেবারে শয্যাগত হইলেন। চারিদিকে দুর্গোৎসবে সকলে নিজ নিজ দুহিতাগণকে আনয়ন করিয়া উমার সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বৌমার মাতাও তাই অভাগিনী কন্যাকে গৃহে আনিয়া তাহার ক্লেশ

লাঘব করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বামীকে কন্যা আনিতে পাঠাইলেন। কালিনায় কবিশেখরের বাড়িতে আসিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃদ্ধ রামশরণ দাসের স্ত্রী পুত্র কন্যা, ও পুত্রবধূগণ মধ্যে নূতন মৃত্যু শোকের ন্যায় একটা মহা শোক কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই ক্রন্দনের কুরুক্ষেত্র মধ্যে এই কথাই শ্রুত হইল, হায় এত দিনে রামকেশব কবিশেখরের নাম সংসারে লুপ্ত হইল। বৌমার পিতাও কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

পরে বৌমার পিতা বৈবাহিককে বলিলেন, আমার স্ত্রী শোকে শয্যাগত হইয়াছেন, কন্যাকে দেখিলে যদি একটু শান্তি পান, এইজন্যই জপসায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি আপনার মত কি?

কবিশেখর বলিলেন, এখানে বৌমার আর কি আকর্ষণ আছে, তিনি যাইতে পারেন। আমিও ঐ এক মায়ায় আবদ্ধ আছি; এখন স্বস্থানে যাইবার বন্দোবস্ত করি।

বৌমার পিতা জিনিসপত্র নৌকায় উঠাইতে বলিলেন, এমন সময়ে বৌমা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা, আমি যাইব না।

বৌমার পিতা বলিলেন, কেন মা!

"না আমি শ্বশুর ঠাকুরকে ভাসাইয়া দিয়া যাইতে পারি না।"

"মা তুমি দুই মাস পরেই ফিরিয়া আসিবে, এতদিন বড় বৈবাহিকা ও তোমার অন্যান্য জা'গণ তাঁহাকে যত্ন করিবেন।"

"না বাবা আমি যাব না।"

এমন সময়ে কবিশেখর আসিয়া বলিলেন, বৈবাহিক মহাশয়, যাত্রার সময় হইয়াছে, দেরি করেন কেন? ঘাটে আর একখানা নৌকা ছিল, কবিশেখর সেই নৌকায় কাশী যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন, তিনিও যাত্রা করিবেন কথা ছিল।

বৌমার পিতা বলিলেন, কই আপনার বৌমা তো যাইতে চান না। বলেন, শ্বশুরঠাকুরকে ভাসাইয়া দিয়া যাইতে পারি না।

কবিশেখর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা এমন বৌমাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে পারিলাম না, আমি অকালে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলাম, হা মা জগদম্বা, তোমার মনে এই ছিল। তারপর কবিশেখর বলিলেন, কেন বৌমা, তুমি যাবে না কেন?

"বাবা, আপনাকে কার কাছে দিয়া যাইব।"

"মা আমাকে বিদায় দাও, আমি স্বস্থানে গমন করি।"

বৌমা আজি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বিনিয়া বিনিয়া বলিতে লাগিলেন, না বাবা আমি আপনাকে কাশীতে যাইতে দিব না, আমি আবার আপনার বিবাহ দিব। শাশুড়ীঠাকুরাণী মরিবার সময় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাই করিব।

"সেকি মা, ষাট বৎসরের বুড়ার কি বিবাহ হয়? বৌমা তুমি পাগল হলে না কি?"

"না বাবা, অরবিন্দের ঘরে ৬০ বৎসরের পাত্রের বিবাহের অপ্রতুল হয় না, আপনার বিবাহ করিতেই হইবে।"

তখন রামশরণ দাসের স্ত্রী কন্যা ও পুত্র পুত্রবধূগণ, কালীচরণ ও রুদ্রদাসের পুত্রবধূগণ সকলে একত্র হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, আপনার বিবাহ করিতেই হইবে। আমরা উত্তরের বাড়ী শূন্য দেখিতে পারিব না।

সকলেই অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে ধরিল, বৌমার জেদ কিছুতেই কমিল না। "বাবা আপনার বিবাহ করিতেই হইবে।" রামকেশব কোনমতে অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। বৌমা পিতাকে পাত্রী জুটাইবার ভার দিলেন। তিনি বলিলেন আমি জানি সোনারঙে একটি বয়স্থা পাত্রী আছে। আমি তাহাকে ঠিক করিব। মেয়েটিও ভাল, বাপ অতিশয় গরিব, চিরদিন কখনও অপ-সম্বন্ধ করেন নাই, টাকা না চাহিলে এ কার্য্য নিশ্চয়ই হইবে।

বৈবাহিক দেশে ফিরিয়া গিয়া সেই সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভদিনে বিবাহের আয়োজন হইল। বরের বয়স দেখিয়া অনেক লোক বলিল, মেয়ের সঙ্গে একখানা হবিষ্যের মালসা দেও। শুনিয়া কন্যার মাতা কাঁদিয়া আকুল হইল।

রামকেশব কবিশেখরের এত বয়স ও শোক সত্বেও শরীর বেশ বলিষ্ঠ ছিল। বৌমার যত্নে শরীরের কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহাকে দেখিলে চল্লিশের অধিক বয়স্ক বলা যাইত না। বিবাহান্তে সপরিবারে তিনি কালিয়ার বাটীতে আসিলেন।

(৩)

বৌমা শাশুড়ীর: বৌ পরিচয় করিলেন। বৌমার বয়স ২০ বৎসর হইবে, নববিবাহিতা শাশুড়ীর বয়স ষোড়শের কম হইবে না। সে সময়ে বাল্যবিবাহ প্রবল থাকিলেও যে সকল পরিবার চিরকাল কুলসম্বন্ধ করিতেন, অথচ

অর্থাভাব বশতঃ বিবাহ দিতে পারিতেন না, তাঁহাদের গৃহে দুই একটি বয়স্থা কন্যা থাকিত, এবং কুলীনের স্বভাব ঘরেই তাঁহাদের বিবাহ হইত। শাশুড়ী আসিয়া বৌমাকে যেমন প্রণাম করিবেন, বৌমা তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কোলে করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন মা তুমি আমার সঙ্গে কথা কহ, কেন না এ সংসারে কেবল আমি আর তুমি, এই কথা বলিতে বলিতে বৌমার অশ্রু ধারা বহিল। চক্ষু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, মা তুমি ভিন্ন জগতে আমার আর কেহই নাই, বলিয়া অতি সাদরে বৌমা শাশুড়ীকে চুম্বন করিলেন। নূতন বৌ শাশুড়ীর নিকট এ এক নূতন রহস্য!

নূতন বৌ কথা কহিলেন, "আপনাকে আমি কি বলিয়া সম্বোধন করিব?"

"আমাকে আপনি বৌমা ও তুমি বলিবেন। আমি আপনাকে মা ও আপনি বলিব।"

"না মা, আমি তোমাকে মা ও তুমি বলিব, তুমিও আমাকে মা ও তুমি বলিবে।"

আবার বৌমা শাশুড়ীকে কোলের দিকে টানিয়া লইলেন। চিরপরিচিতের ন্যায় দুইজনের কত কথা হইল। বৌমা সংসারে কতদিন আসিয়াছেন, আসিয়া কি দেখিয়াছিলেন, এক্ষণেই বা কি দেখিতেছেন, যত পরিবর্ত্তন ও শোক সকলি বর্ণনা করিলেন। নূতন বৌ শুনিয়া প্রাণের ভিতর বড়ই সহানুভূতি করিলেন।

বৌমা বলিলেন, মা, আমি তোমাকে আনিয়াছি। বাবা ত কাশীবাস করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, আমি জেদ করিয়া আবার সংসার করাইলাম। দেখ মা, যে পরিবারে আসিয়াছ, যদিও আমরা ধনী পরিবার নহি, আমরা পুরুষানুক্রমে সম্ভ্রান্ত, এবং কত কবি পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই বংশের শেষ পণ্ডিত মহাত্মা কবিশেখরের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিলুপ্ত হইত, তাই আমি জেদ করিলাম। মা তুমি দুঃখিত হইও না, দেখ মা সকলেই জগতে সুখের জন্য জন্মে না। আর সুখ চাহিলেই কেহ সুখী হইতে পারে না। দেখ, আমার বাবা কাঁচা ছেলের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াও আমাকে সুখী করিতে পারিলেন না। তাই মা, তোমায় অধিক আর কি বলিব, তোমার পতি-ভক্তির যেন অভাব হয় না।

শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, বুড়া হইলেই কি হিন্দু-রমণী স্বামীকে ঘৃণা করে। আমি তোমাকে দেখাইব, আমার কেমন স্বামী ভক্তি।

বৌমাকে কেহ কখন ঝগড়া করিতে দেখে নাই, কিন্তু নূতন বৌ আসিলে তাঁহার অনেক সময় ঝগড়া করিতে হইত। সে কেবল নূতন বৌয়ের জন্য। যদি কেহ বলিত, পিতা মাতা কি দেখিয়া বুড়োর সঙ্গে এই মেয়ে দিয়াছে।

বৌমা শুনিয়া অমনি বলিতেন, মূর্খ স্বামী অপেক্ষা পণ্ডিত প্রাচীন স্বামী সহস্র গুণে ভাল।

কিন্তু বৌমার সে বিবাদ অনেক দিন করিতে হয় নাই, তিনি রাগেন, চক্ষের জল ফেলেন, তাঁর শোচনীয় দশার কথা বলেন, কাজেই তাঁহার ভয়ে আর কেহ কোন কথা বলে না।

বৌমা কর্ণধার হইয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। কর্ত্রী বৌমা, সত্য সত্যই বৌ শাশুড়ীর তিনি মাতৃতুল্যা। জীবনে বৌমার সঙ্গে শাশুড়ীর কোন রাগের কথা হয় নাই। এমন সুন্দর ভাব অনেক পরিবারে অল্পই দেখা যায়। বৌমা শাশুড়ীর চুল বাঁধিয়া দিতেন, সুন্দর করিয়া সিন্দুরের কৌটা দিয়া দিতেন। সুন্দর কাপড়খানি পরাইয়া দিতেন। সুন্দর মুখখানির চিবুক স্বহস্তে ধরিয়া কখনও একটি চুম্বন করিতেন, সকলে বলিত বৌমা, ওকি তোমার মেয়ে? বৌমা হাসিতেন।

ক্রমে নূতন বৌ পুরাতন হইলেন, তিন ছেলে ও তিন মেয়ে হইল। বড় ছেলে রামবল্লভ, মেজো ছেলে নীলকণ্ঠ, ছোট ছেলে রামজয়। মেয়েদের মধ্যে একটি বড় কালিয়ায় বিখ্যাত সেনবংশের জনয়িত্রী। কবিশেখর সন্তান সন্ততি লইয়া আবার যখন সোনারঙে গেলেন,তথায় একদিন হাসিয়া বলিলেন,যে আমার পত্নীকে মালসা দিতে চাহিয়াছিল, আজি আমার সোনার বাজার দেখিয়া যাক্। সোনার বাজারই বটে, এই বংশের গৌরব আজি দেখিলে মনে হয়, কবিশেখর সত্যই বলিয়াছিলেন।

(৪)

যথা সময়ে প্রায় অশীতি বর্ষে রামকেশব দাস কবিশেখর পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার পত্নীদেবী বৌমার হাতে সন্তানগণকে সমর্পণ করিয়া অগ্নি-কুণ্ডে আরোহণ করিলেন। বৌমা কত কাঁদিয়া বলিলেন, মা চিরকাল আমি একাকিনী, আমাকে আর দুঃখিনী করিয়া যাইয়ো না, মা, ছেলেদের জন্যও বলিতেছি, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

শাশুড়ী বলিলেন, মা বিবাহের পরে তুমিই ত বলিয়াছিলে, স্বামীকে ভক্তি করিবে, আজ আবার তুমি আমার সে পথে যাইতে বাধা দেও কেন? মা

এ বংশ ত আমার নয়, তোমার। আমাকে যে বংশ রক্ষার জন্য আনিয়াছিলে সেবংশ তোমার হাতে দিয়া আমি জন্মে জন্মে যাহাতে ইঁহাকে পতি পাই, এ জন্ম স্বামীর চিতায় আরোহণ করিব।

বৌমা অপগণ্ড কয়েকটি শিশু লইয়া আবার সাগরে ভাসিলেন। কালিয়ায় আর থাকিতে পারেন না। রামকেশব এক ভদ্রাসন ও সামান্য একটু তালুকের অংশ ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। জ্ঞাতিদিগের কাহারও অবস্থা তেমন ভাল নয়, তবে বাড়ী থাকিয়া মোটা বোরোর ভাত ও পর্য্যাপ্ত মৎস্যের অপ্রতুল হইত না। কিন্তু বিধবার পক্ষে একবার ছেলেদের পাক করিয়া আবার নিজের পাক করা, অতি শিশু ছেলেদের পালন আর এ শরীরে সহ্য হয় না। তাই মনে করিলেন, বাপের বাড়ী গিয়া যদি সুবিধা হয়, তবে তথায়ই থাকিবেন।

জপসায় তখনও পিতা মাতা জীবিত ছিলেন। জপসায় আসিয়া বৌমা পিতাকে বলিলেন, "বাবা ইহারা আমার সন্তান হইলে আপনাকেই পালন করিতে হইত, মনে করিবেন ইহারা আমারই পেটের সন্তান; এখন এ ছেলেদের আপনাকে যত্ন করিতে হইবে। বস্তুত ইহারা যে পেটের সন্তান নয়, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। ছেলেদের সকল প্রকার আবদার তিনি সহ্য করিতেন। রজনীতে বৌমা দশবৎসর বয়স্ক রামবল্লভকে লইয়া কত সংসারের সুখ দুঃখের কথা বলিতেন, শুনিয়া শুনিয়া রামবল্লভ নয়ন জলে ভাসিতেন। বৌমা তাহাকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা দিতেন। রামবল্লভ পারসীর পাঠশালায় সর্ব্বোচ্চ ছাত্র হইলেন। এবং বড় লোকদের ছেলেদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত ভাবে পড়া শুনা করিতেন।

ভাই ভাইয়ের সন্তানগণকে পর মনে করে, আর দিদির সতাত দেবর ও ননদকে কে পালন করিতে চায়। শেষে বৌমাকে বোধ হয় নীরবে গঞ্জনা সহ্য করিতে হইল।

একদিন রামবল্লভ আহার করিতে বসিয়া দেখিলেন অন্নের এককোণে এক মুষ্টি ছাই রহিয়াছে। তিনি বৌমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৌমা, একি? বৌমা কথা বলিলেন না। নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

রামবল্লভ সমস্ত বুঝিলেন। কয়েকটি কথা মাত্র বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। "আমি আবার যতদিন তোমাকে নিজ গৃহে লইয়া পালন করিতে না পারিব, ততদিন গৃহে আসিব না।"

রামবল্লভ চাকুরীর উদ্দেশে বিদেশে গেলেন; তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধি

যুবকের তখনকার দিনে অধিক দিন বসিয়া থাকিতে হইল না। তিনি নাটোর সরকারে মোক্তারিতে প্রবেশ করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে সদর মোক্তার হইলেন। ২।১ বৎসর মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নী ও বৌমাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন। ক্রমেই রামবল্লভের উন্নতি হইতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে তিনি অসাধারণ লোক হইয়া উঠিলেন।

আবার দশক্রিয়া কর্ম্ম আরম্ভ হইল, দান ধর্ম্ম কর্ম্ম তেমনি চলিতে লাগিল। প্রবাদ আছে, রামবল্লভের পুরোহিত শুকদেব বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কোন দায়ে পড়িয়া রামবল্লভের নিকট গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ৫০৲ টাকা হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু একজনের পরামর্শে তিনি বলিলেন, যে আপনার একদিনের উপার্জ্জন আমাকে দিবেন। তখন রামবল্লভ হাসিয়া বলিলেন, কে আপনাকে এ পরামর্শ দিলেন। তিনি কাছারী হইতে আসিয়া সকল পকেট হইতে ৮০৲ টাকা ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

কালীশঙ্কর রায় নাটোরের দেওয়ানী করিয়া লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন। দিঘাপতিয়ার রাজা, সেরপুরের মুন্সি, শুকুল প্রভৃতি জমিদারগণ নাটোর ঘর হইতে বড়লোক হইয়াছেন। রামবল্লভ সদর মোক্তার হইয়াও কিছু স্থাবর সম্পত্তি করেন নাই। নাটোরের কোন মকদ্দমায় যখন রামবল্লভ কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী আসিয়াছিলেন, তখন কালীশঙ্কর রায় বলিয়াছিলেম, দাস ঠাকুর, আপনি এত টাকার মধ্যে থাকিয়াও কিছু স্থাবর সম্পত্তি করিতে পারিলেন না।

"ভাবিয়াছিলাম, রাধানাথই সম্পত্তি লাভ করিবে। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিয়া যাইবে কে জানে।"

রাধানাথ রামবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পারস্য ভাষায় অতিশয় বিদ্বান হইয়া একবৎসর মাত্র পুলিসে কার্য্য করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরোলোক গমন করেন। রাধানাথ একবৎসরে এগার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া পিতাকে তাহা জানাইলেন। পিতা বলিলেন তুমি অধর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছ ইহা তোমার ভোগে আসিবে না। এই সময় পুলিসই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, "সাহেব তুমি দারগা হও", এই প্রবাদ এই সময়েরই। যাহা হউক পিতৃদত্ত অভিশাপ সফল হইয়া, সম্বৎসর মধ্যে রাধানাথ জীবনযাত্রা সমাপ্ত করিলেন।

(৫)

রামবল্লভকে বিদায় দিয়া বৌমা কয়েকদিন অশ্রুজলে ভাসিলেন, এবং যতদিন

রামবল্লভের পত্র না পাইলেন, ততদিন প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। রামবল্লভ দুই বৎসর পরে কার্য্যস্থল হইতে আসিয়া একটি টাকার তোড়া বৌমার পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। বৌমা রামবল্লভকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। ২।১ দিন পরে রামবল্লভ বলিলেন, মা চল বাড়ী যাই, বৌমা ওখানে রামবল্লভের বিবাহ দিয়া নূতন বৌকে সঙ্গে লইয়া আবার কালিয়ার ভবনে আসিলেন। বৌমার আবার এই নূতন গৃহস্থালী আরম্ভ হইল, এক্ষণে নীলকণ্ঠ ও রামজয়ের বিবাহ হইল। কাচাঁদিয়া নিবাসী সেনবংশে এক কন্যা ও আঠারখাদা নিবাসী জমিদার সেনেদের বাড়ী অন্যকন্যার বিবাহ হইল। আবার কালিয়ার বাটী উজ্জ্বল হইল। রামবল্লভের নামে কালিয়া পরিপূর্ণ হইল, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। রামবল্লভ নীলকণ্ঠ ও রামজয়ের অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা হইয়া গৃহে সর্ব্বদা বালক বালিকার হাসি খেলা ক্রন্দনে প্রতিধ্বনি হইত। নূতন নূতন বাটী প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বৌমা প্রাচীনা হইলেন, এ জীবনে আর তাঁহার কোন আশাই অপূর্ণ রহিল না, শ্বশুরের বংশ উজ্জ্বল হইল। রামবল্লভের যশে তাঁহার কর্ণ তৃপ্ত হইল। সকলেই মা বলিয়া তাঁহাকে আনন্দ সাগরে ভাসাইলেন। সেইদিন আর এইদিন। কোথায় রামকেশব শূন্যগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী উদাসীন হইতেন, না আজি তাঁহার বংশাবলীতে কালিয়া উজ্জ্বল হইল। বৌমার আত্মত্যাগ ও পবিত্র বাসনা এই বংশের প্রধান সাধনা।

বৌমা, আজি তুমি অধম প্যারীশঙ্করের প্রণাম গ্রহণ কর, তুমি আমাদের মাতা, আমাদের দেহে তোমার শোণিত নাই, কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা ধরায় আসিয়াছি, তোমার আশীর্ব্বাদে রামকেশব কবিশেখরের বিপুল বংশ ধরায় বিস্তৃত হইবে। আমরা গৌরবের সহিত আজি জগৎ সমক্ষে বলিতেছি, আমরা বৌমার বংশ।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

কবির আদর

—:*:—

সেকালে এদেশে কবির বড় আদর ছিল। রাজার রাজ সভায়, ধনীর মজলিসে সভাসদ্ রূপে দুই এক জন করিয়া কবি থাকিতেন। বড় মানুষেরা আমোদ করিয়া কবিতা পূরণ শুনিবার জন্য প্রশ্ন করিতেন। কবিরাও তৎক্ষণাৎ

তাহা ভাবপূর্ণ কবিতায় পূরণ করিয়া দিতেন। ধনীর অর্থেই কবির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। এখন আর সে দিন নাই। রোগ, শোক, দরিদ্রতায় দেশের লোক জর্জ্জরিত। "চাল" বাজায় রাখিতে ধনী বিব্রত। এখন,—

"ধনীর প্রাসাদ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িছে ভূমে,
মন্দির প্রাচীর স্তম্ভ সকলি মেদিনী চুমে।"

ধনীর আর সে ধনবল নাই; আবার যাঁহার ধন আছে তাঁহার মন নাই। এ দিকে জীবন সংগ্রামে পড়িয়া—ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল চিন্তায়—কবির কবিত্ব শক্তিও লোপ পাইতে বসিয়াছে। চিরকাল কখন সমান যায় না,—"কালোহি বলবত্তর"।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী নামে এক কবি ছিলেন। সকল লোকে তাঁহাকে হরু ঠাকুর বলিত। হরু ঠাকুর উপস্থিত কবি। বাংলার অনেক রাজা মহারাজার বাটীতে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। একদিন কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ আপন সভা-পণ্ডিতগণকে বলিলেন,—

"বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে"—এই সমস্যাটির পূরণ করুন। এমত সময়ে হরুঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। মহারাজ তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন করিবামাত্র তিনি চিন্তা না করিয়াই এইরূপ পূরণ করিয়া দিলেন—

"এক দিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
(রাণী) অঙ্গুলি হেলায় ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।"

উত্তর শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। কবি প্রচুর অর্থ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হরুঠাকুরের একটি কবির দল ছিল। এখনও লোক বলিয়া থাকে "কবির গুরু হরুঠাকুর।"

হরু ঠাকুরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে "রসসাগর নামে এক কবি জন্মিয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। কৃষ্ণকান্ত পদপূরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়াই "রসসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরীশচন্দ্র ইঁহাকে নিজ সভাসদ্ নিযুক্ত করেন।

পাঠক! এইবার "রসসাগরের" কবিতার একটু রসাস্বাদন করুন।

মহারাজ গিরীশচন্দ্র বলিলেন "হাটের নেড়া হুজুক চায়"।

অমনি কবির মুখে কবিতা বাহির হইল—

"উকীল খোঁজে মকদ্দামা, কোকিল বসন্ত চায়,
অগ্রদানী নিত্যগণে কোন্ দিন কে গঙ্গা পায়।
সাধু খোঁজে পারমার্থ, লম্পট খোঁজে বেশ্যালয়,
গোলমালেতে রেস্ত মেলে হাটের নেড়া হুজুক চায়" ॥

এক দিন মহারাজ রসসাগরকে প্রশ্ন করিলেন,—

"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

কবি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—

মহারাজ রাজধানী নগর বাহির,
বারইয়ারি মা ফেটে হলেন চৌচির।
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী হইল বাহির,
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।

এই ভাবের আরো দুই একটি প্রশ্নোত্তর শুনাইতেছি।

প্রশ্ন। "বড় দুখে সুখ"।

উত্তর। "চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে,
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে।
চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক,
বিধি হতে ব্যাধ ভাল, বড় দুঃখে সুখ ॥"

প্রশ্ন। "শমন ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী।"

উত্তর। "শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলে রণভূমি,
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী।
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি,
শমন ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী।"

আধুনিক কবিগণের মধ্যে সুকবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদপূরণে প্রসিদ্ধ। ইনি সাহিত্যরথি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অগ্রজ। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাপ্চন্দ বাহাদুর রঙ্গলাল বাবুর কবিতা পূরণ শুনিয়া তাঁহাকে "কাব্যরত্নাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল মহাশয়ও তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। এক দিন উক্ত রাজা বাহাদুরের সভায় একজন গায়ক গান করিতেছিলেন। গীত সমাপ্ত

হইলে রাজা রঙ্গলাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ক্ষণকালও চিন্তা না করিয়া একটি স্বরচিত গীতের দ্বারা এই গানটির উত্তর করিতে পারেন?" উপস্থিত কবি রঙ্গলাল বাবু তৎক্ষণাৎ গানের উত্তর গানেই বলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই দৈবশক্তি দেখিয়া রাজাবাহাদুর আহ্লাদে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রঙ্গলাল বাবুকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি কবিতাপূরণ শুনিবার জন্য কবিকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেন। একদিন ভূদেব বাবু সবান্ধবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রঙ্গলাল বাবু আসিয়া উপস্থিত। ভূদেব বাবু অমনি প্রশ্ন করিলেন,—ঠেঁটি পাঁচহাতি।" কবি মুহূর্ত্ত কালও চিন্তা না করিয়া এইরূপ পূরণ করিয়া দিলেন,—

"বেশ্যার ভাগ্যে ঘটে সাঁচ্চা সাড়ী বারাণসী,
স্ত্রীর ভাগ্যে মুখ ঝামটা, গালি রাশি রাশি।
ঢুলির ভাগ্যে শাল-দো-শালা ছালাছালা মিলে,
ছেলের ভাগ্যে জোটে না কাঁনি, কাঁদিয়া ককালে।
ঠাকুরের ভাগ্যে ঘোড়া মোণ্ডা, আর ঠোঁটেকলা,
খাজা গজা পোলাও কোপ্তা, ইয়ারদের বেলা।
খেমটির ভাগ্যে মণি মতি জোটে নানা জাতি,
পুরুতের ভাগ্যে ঘসা পয়সা, ঠেঁটী পাঁচহাতি।"

সভাস্থলে হাস্যের ফোয়ারা উঠিল। সকলেই কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রঙ্গলাল বাবুর বন্ধু বান্ধবেরাও কবিতা শুনিবার জন্য তাঁহাকে প্রায়ই এক এক প্রশ্ন করিতেন। একদিন প্রশ্ন হইল—

"হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল।"

রঙ্গলাল বাবু তখনই পূরণ করিয়া দিলেন;—

"একদিন হাসি হাসি শশিমুখী রাই,
কহিলেন শুন শুন প্রাণের কানাই।
লইয়া বাঁকার হাট ওহে নটরাজ,
আগমন করিয়াছ এই ব্রজমাঝ।
ললাটে অলকা তব, বাঁকা ভাবে আঁকা,
চরণে নূপুর পর, তাও শ্যাম বাঁকা।
শিরে শিখি পুচ্ছ চুড়া, বাঁকা হয়ে রয়,
সকলি তোমার বাঁকা, সোজা কিছু নয়।

বাঁকা আঁখি বাঁকা ঠাম, বাঁকাই সকল,
হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল ?"

রঙ্গলাল বাবুর অনেক কবিতা সে কালে "এডুকেশন গেজেটে" বাহির হইত। সকল লোকেই আদর করিয়া তাঁহার কবিতা পাঠ করিত। হায়! এই সকল কাব্যামোদ যাহারা উপভোগ করিতে পারিল না, আমার মনে হয় তাহাদের জীবন যেন অসম্পূর্ণ রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হে সুধন্যা কাশী—
ভূলোক পবিত্রা তুমি পঙ্কিলতা-নাশী ;
সারা বিশ্ব অশ্রু-সিক্ত　　　সকল হারায়ে রিক্ত
এসেছিল তব দ্বারে ভিক্ষান্ন প্রয়াসী,
তোমার অমল বক্ষে　　　জ্ঞানের কনক কক্ষে
মহার্ঘ্য রতন কত ছিল রাশি রাশি।

কাশী বারাণসী—
রাজ রাজেশ্বরী রূপে ভুবন উদ্ভাসী ;
বসি সিংহাসন পরে　　　ক্ষুধা নাশী সুধা করে
ভিক্ষা চেয়েছিল শুভ তব দ্বারে আসি।
শঙ্কর তোমারি ধূলি　　　লয়েছিল শিরে তুলি,
বেদবেদান্তের ওগো রত্নখনি কাশী।

সাধনার হিমাচল তুমি বারাণসী—
তৈলঙ্গের তপঃ সিদ্ধি　　　বাঞ্ছিত লভিয়া ঋদ্ধি,
ভাস্কর ভাস্কর জ্যোতি তপঃ অবিনাশী ;
কত ধ্যানী সিদ্ধ জ্ঞানী　　　স্পর্শি পূত তনুখানি,
বিচ্ছিন্ন সংসয় চিত্ত মোহ ভ্রম নাশী।

পুণ্য বারাণসী—
অরুণ আলোক ভূষা বিমোহিনী কাশী।
তোমার মন্দির মাঝে প্রাতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
সিক্তবাসে চলে পান্থ মোক্ষার্থ প্রয়াসী;
'জয় বিশ্বনাথ জয়' ধ্বনিত নগরময়
তপোবন হতে ধ্বনি আসিল কি ভাসি?

ভারতের পুণ্যতীর্থ শ্রেষ্ঠ বারাণসী—
তীর্থ তব স্থলে জলে তীর্থ তব নভনীলে,
বক্ষেতে বিষান বাজে কণ্ঠে মৃদু বাঁশী,
আনন্দ কানন আর শ্মশানের ভস্ম সার,
গলে দোলে বনমালা কণ্ঠে অস্থি রাশি।

ভেদ জ্ঞান নাশী—
সৌধ কিরীটিনী ওগো নগরী রূপসী;
কটিতে মেখলা পারা জাহ্নবী রজত ধারা,
জোছনায় সাজ যেন মোহিনী উর্ব্বশী;
গত শোক গত দৈন্য নিজ মহিমায় ধন্য,
অমরের করে রচা তুমি অবিনাশী,
জয় বিশ্বনাথ-পুরী হে সুধন্যা কাশী!

শ্রীশৈলবালা বসু।

দাসের আত্ম-কথা

—:০:—

আর একটি পরীক্ষা

অশান্তি বোধ হইতে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সাংসারিক আরো কোন কোন বিষয়েও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যখন ব্রহ্মমন্দিরে থাকিয়া, মন নির্জ্জন বাসের প্রয়াসী হইয়া উঠিল, তখন প্রথমে এই ভাব মনে হইল, কিসে মনের স্বচ্ছন্দতা রক্ষা হয়, কিসে শান্তি পাইতে পারি।

স্থানটি বড়ই অনুকূল হইল। অথচ কাহারো দ্বারা পরিচালিত হইয়া কিম্বা কাহারো বিশেষ ভাবে অনুমতি লইয়া এখানে আসিয়া থাকিতে হয় নাই। এখানে থাকিলে ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদক বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় তাহাতে সন্তুষ্ট, ইহাই কেবল বুঝিয়া ছিলাম। কিন্তু আমি স্বইচ্ছাতেই থাকিতে লাগিলাম।
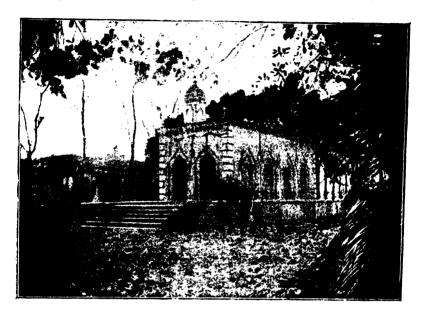
থাটুরা ব্রহ্মমন্দির

বিস্তৃত ক্ষেত্র মধ্যে ব্রহ্মমন্দির, প্রমুক্ত বায়ুপ্রবাহে প্রশস্ত রোয়াকে কখন কখন ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাদচারণা করিতাম। কখন উপবেশন, কখন শয়ন, স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া মুক্তভাবে অবস্থিত করিতে লাগিলাম। আত্ম-চিন্তা আত্মানু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া একপ্রকার শান্তি-স্পর্শানুভব করিতে লাগিলাম। দিনান্তে একবার স্বহস্তে প্রস্তুত সাদাসিদা রকমে খিচুড়ী, কোন দিন কেবল ভাতে ভাত আহার, তাহাতেই তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের স্বচ্ছন্দতা বোধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে শনিবারে শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্র বাবু আসিতেন, উপাসনা হইত। রবিবার দিন থাকিয়া তিনি চলিয়া যাইতেন। তাহাতে একেবারে নির্জ্জন বাসের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তনে বেশ আনন্দানুভব করিতাম। এবং তাঁহার সঙ্গগুণে অনেক উপকার পাইতাম।

যখন আমার মনে মুর্ত্তি-পূজা অতি অসার প্রণালী বলিয়া ধারণা হইল, এবং কঠিন হিন্দু সমাজ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, যতদূর স্মরণ আছে, তখনো আমি নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তৎপূর্ব্বে সহজ জ্ঞানে এই বুঝিলাম, ভগবান্ পরমাত্মা প্রাণ স্বরূপ, আমার অন্তরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাকে প্রাণ দিয়া পিতা, প্রভু, অথবা মা জননী বলিয়া ডাকিলে তাঁহার স্পর্শ প্রাণে অনুভব করিব। তাঁহার কৃপাগুণে তাহাই হইতে লাগিল। প্রাণে প্রাণেই তাঁহাকে বুঝিতে লাগিলাম। সময় সময় প্রাণ বিগলিত হইতে লাগিল। আর সকল সময় কেবল আপনার ভিতর আপন মনে একান্তে চিন্তা করিতেই ভাল লাগিত। তদুপযুক্ত স্থানও পাইলাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসার হইতে বাধা পাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আর একটি পরীক্ষা উপস্থিত হইল।

চিনির কারখানার দগ্ধাবশিষ্ট উদ্ধার করিয়া দণ্ডী দাদা অবশেষে ১৬৫০৲ টাকা দেনার হিসাব দিয়া আমাদের সংসার হইতে পিতা, কন্যা লইয়া আবার খাটুরার বাটীতে গেলেন। আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ায় তিনি আশঙ্কা করিলেন,—আমার সঙ্গে এক সংসারে থাকিলে যথা সময়ে কন্যার বিবাহে হয়ত বেগ পাইতে হইবে। তা ছাড়া আমি যখন বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম তখন আর কি রূপে এ সংসারে থাকিবেন।

ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথও দেখিলেন, দাদার উপার্জ্জন আর পাইব না, অধিকন্তু এই সাড়ে ষোলশত টাকা দেনার ভার গ্রহণ করিতে হয়, অতএব এ দেনা দাদার স্কন্ধে দিয়া পৃথক হওয়াই শ্রেয়! কিন্তু চিন্তা ও কল্পনা মাত্রেই পৃথক হওয়া ত সহজ নয়, তখনো আমার স্ত্রী পুত্র সংসারে রহিয়াছে; সবই সমান চলিতেছে, কেবল আমিই নিজে গৃহ ছাড়িয়া মাঠের মাঝখানে আসিয়াছি।

প্রথমেই আমি পাওনাদারগণকে বলিলাম, এই দেনা আমি এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। আমার হাতে কিছু আর নগত টাকা নাই, আছে কেবল বরাহনগরে একখানি বাড়ি। তাহা বিক্রয় করিয়া দিলে সমস্ত দেনা পরিশোধ হইবে। সকলে সম্মত হইলে এখনি বাড়ি বিক্রয় হইতে পারে। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।

পাওনাদারেরা দেখিলেন উপেন্দ্রই বাড়ি বিক্রয়ে অসম্মত, অথচ তাহা সঙ্গত কথা নহে, কেন না যোগীন্দ্রর একার দেনা নহে। কাজেই উপেন্দ্রকে সকলে পেড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রনাথ এই দায় হইতে একটু অব্যাহতি

পাইবার জন্য গোবরডাঙ্গার বাড়ি বন্ধ করিয়া সকলকে লইয়া বরাহনগর গেলেন। পিতা ঠাকুর সাংসারিক বিষয় উদাসীন কিন্তু অন্যায় দেখিয়া বোধ হয় উপেন্দ্রের উপর বিরক্ত হইয়া প্রথমে সকলের সঙ্গে বরাহনগর যান নাই। শেষে নিতান্ত বাধ্য হইয়া গিয়াছিলেন।

বাড়ি হইতে আমার বিকলাঙ্গিনী পত্নীকে লইয়া যাইতেও উপেন্দ্রকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনিও কষ্ট পাইয়াছিলেন। বিশেষত সেখানে গিয়া তিনি আরো কষ্টে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখন তথায় তাঁহার সেবাশুশ্রূষার পক্ষে তত সুবিধা ছিল না। আমি ব্রহ্মমন্দিরে থাকি, এই সকল ঘটনার প্রথমে কিছুই জানিতে পারি নাই। পরে শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। কেন না, আমার অজ্ঞাতে এরূপ ভাবে আমার স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া উপেন্দ্রর উচিত হয় নাই। যাহা হউক তখন চুপ করিয়াই রহিলাম।

উপেন্দ্রর এই কার্য্যে আরো বিপরীত ফল হইল। উত্তমর্ণগণের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের ১০০৲ টাকা পাওনা ছিল। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বরাহনগরে গিয়াও তিনি অতিশয় তাগাদা করিয়া সকলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। আমি প্রথমে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। আমার মুখে সকলে ঐ একই কথা শুনিয়া আমার নিকট আর কেহ তাগাদা করেন নাই।

এক দিবস আমি উপেন্দ্রর একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল।—"দাদা! একবার আসুন, আমরা আর এখানেও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। সকলের সম্মতিক্রমে বরাহনগরের বাড়ি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইবে। গঙ্গাধর সেন মহাশয় ২২০০৲ টাকায় বাড়ি ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি আসিয়া দলিলে সহি দিয়া যান।"

আমি এই পত্রের উত্তরে লিখিলাম। "বাড়ি বিক্রয়ের টাকা কে লইয়া দেনা মেটাইবেন তাহা আগে স্থির কর।"—উপেন্দ্র লিখিল, "আমরা লইব এবং সমস্ত কার্য্য করিব।" আমি লিখিলাম,—"উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা সঙ্গত হইবে না, একজন মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" এইরূপে এই সকল কথার মিমাংসা করিতে মধ্যে দুই একবার উপেন্দ্র আমার নিকট আসিল এবং পত্র লেখালিখিও হইল। শেষ বাদপ্রতিবাদের পর স্থির হইল, আমাদের উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে উমেশ দাদা টাকা লইয়া দেনা মিটাইয়া দিবেন।

উমেশ দাদার হাতে টাকা দিতে উপেন্দ্র প্রথমে অনেক আপত্তি করে, শেষে ঐ কথাই স্থির হয়। এই সকল ব্যাপার লইয়া প্রায় ২।৩ মাস গত হইয়া যায়। এ সময় আমি ব্রহ্মমন্দিরে থাকিয়া শান্তির মধ্যে অশান্তির আঘাত পাইতে থাকি। কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় সকল কার্য্য ন্যায় সঙ্গত পথে নির্ব্বাহ হওয়ায় শেষে প্রভুত আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম। সমস্ত পাওনাদারগণ সম্পূর্ণ টাকা পাইলেন। এ জন্য উমেশ দাদা অনেক গঞ্জনা পরীবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

আকিঞ্চন (কবিতা পুস্তক)—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত; এমারেল্ড প্রিন্টীং, ওয়ার্কস যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন কলিকাতা 'দীনধাম' হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ' ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১১২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা, কাগজ, ছাপা ভাল।

এই কবিতা পুস্তকে ২৫টি কবিতা আছে (অধিকাংশ ধর্ম্মমূলক), তন্মধ্যে 'শৈশব স্মৃতি' নামক কবিতার উত্তরে স্বর্গীয় দীজেন্দ্রলাল রায় 'উত্তর' বলিয়া যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এবং আর একটি কবিতা "বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থকারের সহোদরের লেখা। কবিবর দীজেন্দ্র লাল রায়ের কবিতাটিতে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য অতি সুন্দর ও সরল ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কবিতাটি এই :—

অনেক দিনের কথা—ঠিক নাহি আসে মনে—
মধুর শৈশবগাথা সে প্রথম জাগরণে ;
তবু যেন মনে পড়ে স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়,
এখনও গভীর সেই সাম গান শোনা যায়—
বিজড়িত সঙ্গে তার—সে নিশার অবসান,—
পবন হিল্লোলে আর প্রভাতের পিকতান,
প্রাতঃসূর্য্যবিহসিত সে আমার জন্মভূমি,
সঙ্গে তার বিজড়িত প্রিয়বর আছ তুমি !

মনে পড়ে আজি এই জীবনের এ সন্ধ্যায়
যেন সেই সুগভীর মহাগীত শোনা যায় ;
তাহার মধুর স্মৃতি এখনও বাজিছে প্রাণে,
বাজিবে তাহার সুর এ জীবন-অবসানে।
ঠিক্ মনে নাই বটে—সেই হাসি সেই গান,—
'দীনবন্ধু' 'কার্ত্তিকেয়' দুই বন্ধু এক-প্রাণ,
সেই হাসি সেই গান আমার জীবনে আসি',
বিজড়িয়া রচিয়াছে এই গান এই হাসি !
কিম্বা সব কল্পনা এ ! ভালবাস ব'লে তাই
সকলই সুন্দর দেখ আমার—প্রাণের ভাই !
রচিয়াছি যেই হাসি, যেই গান রচিয়াছি,
সে হাসির সে গানের নহে কিছু কাছাকাছি :
অন্য কোন নাই সুখ, অন্য কোন নাহি আশা,
শুধু চাহি এ জীবনে তোমাদের ভালবাসা !
যদি এই গানে হাস্যে লভিয়াছি তব প্রীতি,
সার্থক আমার হাস্য, সার্থক আমার গীতি :
প্রভাতে এ জীবনের, হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্রব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি :
জীবনের এ সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি—
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি !
মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের পুণ্য পাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।
ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই,
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হ'ক ভাই
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি,
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি !

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গ্রন্থকারের নিজের রচনাগুলিও ভাল হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমন" প্রভৃতি কবিতা পড়িতে পড়িতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "রৈবতক"

বা "কুরুক্ষেত্র" পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। লেখকের ভাবুকতা এবং কবিতা লিখিবার শক্তি আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই পড়িতে পড়িতে বিরক্তি ধরে না। "লছমন ঝোলায় গঙ্গা" শীর্ষক কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

কবিতাটি এই :—

ও কার করুণা বহে তরল তরঙ্গরূপে,
দ্রব করি' প্রবেশিছে প্রবল প্রস্তর স্তূপে :
ও কার মমতা নাহি পাষাণে পাষাণ জানে,
ঝরিতেছে অবিরত স্বর্গমর্ত্ত্য সমজ্ঞানে :
ও কার হৃদয় যেন স্নেহের উন্মাদে ধায়
ঊর্দ্ধতম ব্যোম হ'তে এই নিম্ন বসুধায় :
ও কেরে পতিত হ'য়ে, পতিতে উদ্ধার করে,
আপনি কাতর হ'য়ে, কাতরে ক্রোড়েতে ধরে :
ও কার মোহিনী মায়া পাষাণে জীবন আনে,
পেলব করিছে তারে পুষ্পিত পল্লব দানে :
ও কার অমল প্রেম বিমল প্রবাহে বয়,
সান্ত্বনা সম্পদ দিয়া বিপন্ন ভুবনময় ;
ও কার সরস বাণী অনিল আনিছে ব'য়ে,
সরস প্রাণের তার সরস পরশ ল'য়ে ;
ও কার পরশে, ভাষে, জাগিয়া উঠিছে সব :
অনন্ত মুখর হ'য়ে আনন্দে করিছে রব ?
হায় হরি, এ প্রাণের দুঃখ আর কাবে কব :
এ বিশ্ব উদ্ধার হবে, একা আমি প'ড়ে রব।

পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠায় পাদটিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—পিতৃদেবের পূর্ব্বনাম গন্ধর্ব্বনারায়ণ ছিল। তাঁহাকে বাল্যকালে সকলে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত। কলিকাতায় অধ্যয়ণ কালে তিনি দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

বঙ্গের এই অদ্বিতীয় নাটককারের নামের এই রহস্য, ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য জগতে জানাছিল না; থাকিলে, বঙ্গভাষার লেখক, গ্রন্থে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিতেন। চৌবেড়িয়ার "গন্ধর্ব্বনারায়ণ" যে কলিকাতায় আসিয়া "দীনবন্ধু" হন তাহা সাহিত্য জগতের পক্ষে পরিহাস রসিক সাহিত্যিকের জীবন ঘটিত একটি আমোদজনক সংবাদ।

কবি তাঁহার পিতৃদেব দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নামে একটি ভক্তি উচ্ছসিত

কবিতায় গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার শেষ চারি ছত্রে পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"তোমার স্নেহের নীরে যে পাদপ অঙ্কুরিত,
তাহার প্রসূনে দেব হবে তুমি হরষিত,
তাই আনিয়াছি ইহা, সে স্নেহে হাসিয়া ধর,
অভাগা জীবন মোর তিলেক শীতল কর।"

ফল কথা পুস্তকখানি সাধারণের সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীসমালোচক।

সরমা

—:০:—

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার বোনার্জ্জি অবিনাশ বাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর তাহার সিভিলিয়ান বন্ধু মিঃ রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে একটি ব্যাকুল প্রাণ, আকুল উৎকণ্ঠিত ভাবে ডাক্তারের আগমন প্রতিক্ষা করিতেছিল। ডাক্তার বাটীতে পদার্পণ করিবা মাত্রই সরোজিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ডাক্তার বাবু কাল আপনি কোথায় ছিলেন। দাদা, বাবা, আমি এই আসেন এই আসেন ক'রে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে শুতে গেলুম। তা গেলেন, গেলেন একবার কি বলে যেতে নেই। আপনার খাবারগুলো ঐ ঘরে ঢাকা চাপা আপনার অদর্শনে এখনও কাঁদছে, ওদের উপর না হয় এখন একটু কৃপা কটাক্ষপাত করুন।"

ডাক্তার একটু অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জিত ভাবে কহিল "রাগ ক'রোনা সরো, আমাকে একটা বিশেষ কাযে হঠাৎ যেতে হয়েছিল; তোমাদের না বলে যাওয়াটা আমার সম্পূর্ণ অন্যায় হয়েছিল তারজন্যে আমি তোমাদের সকলের নিকট apology চাহিতে প্রস্তুত আছি।"

সরোজিনী মুখে একটু মৃদু হাসি আনিয়া তাহার কৃষ্ণোজ্জ্বল টানা চক্ষু দুটি ঈষৎ বঙ্কিমভাবে ডাক্তারের চক্ষের উপর ফেলিয়া কহিল "আপনার বেশ ইংরেজি এটিকেট দুরস্ত আছে তা আমি জানি, তবে বিশেষ কাজটা যে কি ছিল তাকি শুনতে পাই না।"

ডাক্তার সরোজিনীর চক্ষুর উপর হইতে চক্ষু নামাইয়া নতমুখে ধীরে ধীরে কহিল "অবশ্য অবশ্য,—তোমার দাদা কোথায়?"

"দাদা বেড়াতে গেছেন।"

"তোমার বাবা?"

"বাবা এই চা খেয়ে ওপরে খবরের কাগজ পড়চেন।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে নিজ প্রকোষ্ঠে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিল। সরোজিনী সঙ্গে সঙ্গে আসিল এবং ডাক্তারকে অলস ভাবে চেয়ারে বসিতে দেখিয়া বলিল "একটু চা খাবেন কি? আপনার চা বোধ হয় এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"তা হোক ঠাণ্ডা চাই খাব একটু আনতে বল দেখি।"

"তার মানে কি, ঠাণ্ডা চা খাবেন কেন? আমি stoveটা জ্বেলে এখুনি গরম করে আনচি।" ডাক্তার তাড়াতাড়ী কহিল না না সরো তোমার যেতে হবে না। কিন্তু সরোজিনী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঝড়ের মত চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এক কপ গরম চা এবং কয়েক খানা বিস্কুট আনিয়া ডাক্তারের হাতে দিল। যখন সরোজিনীর শুভ্র কোমল হাতখানি ডাক্তারের হাতের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে আপনাকে একটু সংযত করিয়া সরোজিনীকে ধন্যবাদ দিয়া চা টুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল।

সরোজিনী ডাক্তারের হস্ত হইতে চায়ের পিয়ালাটি লইয়া তাহার মুখের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, সে চাহনিতে যেন একটা আশা, আকাঙ্খা ও উদ্বেগের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন সে যেমন আলো বাতাস মিশান খোলা আকাশের পানে একবার ভরা নয়নে চাহিয়া দেখে, এ চাহনিও ঠিক তাই। পরে ধীরে ধীরে কহিল "কৈ বল্লেন না কাল কোথায় গিয়েছিলেন? কোন কলে টলে নাকি?"

ডাক্তার সরোজিনীকে কি কৈফিয়ৎ দিবে তাহা এতক্ষণ ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখন সরোজিনীর কথায় তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল। সে চট্ করিয়া বলিল "ঠিক বলেছ সরো, একটা urgent call য়ে গিয়েছিলুম—সমস্ত রাত্রি থাকতে হয়েছিল।

সরোজিনী তৎক্ষণাৎ কহিল "কৈ কত টাকা পেলেন দেখি দুশো না পাঁচশো?

ডাক্তারের মুখ চুণ হইয়া গেল, এই বার কি বলিবেন তাহা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

সরোজিনী কহিল "অমন করলে আপনার ডাক্তারি করা চলবে না রুগী দেখবেন অথচ পয়সা নেবেন না, এমন করলে কস্মিন কালেও আপনি prosper করতে পারবেন না। আপনার বাড়ি ত অনেক দিন complete হয়েছে, ডাক্তারখানা খোলবার আর দেরি কি? কৈ আমাদের ত এক দিন আপনার বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন না।"

ডাক্তার সহাস্য বদনে কহিলেন "ও তোমাদেরই বাড়ি, তোমাদেরই ঘর তোমরা যখন তখন যাবে আসবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, আমি দেখেই সুখী হব, আমার আর কে আছে সরো কার জন্যে বাড়ি?

'আমার আর কে আছে সরো' কথাটা সরোজিনীর প্রাণের গুপ্ততম স্থানে আসিয়া আঘাত করিল, সে একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির অচঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এখনি সে ডাক্তারকে বলিয়া ফেলে "কেন আপনার ত সবই আছে।" বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু মুখ ফুটিল না। বলি বলি করিয়াও কথাটা বলা হইল না। তাহার মুখখানা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল—সেই লালাভ মুখের উপর স্বেদ বিন্দু ফুটিয়া উঠিল, প্রভাতের শিশির-সিক্ত গোলাপটি যেন ধরাবাসীকে কাঁদিয়া বলিতেছে ওগো তোমরা দেখ, আমি ফুটিয়াছি—তোমরা আমাকে তোল—একবার বুকে করিয়া রাখ—সেই আমার স্বর্গ সুখ—আর একটু পরে আমার পাপড়ীগুলি একে একে ঝরিয়া পড়িবে—তখন তোমরা আমার পানে আর তাকাইবে না। সরোজিনী আর দাঁড়াইতে পারিল না তাহার চরণ দুটি জড়াইয়া আসিল, বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল, সে যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সরোজিনী এই বৎসর বি-এ, পাশ করিয়াছে। তাহার বয়স আঠারো কিন্তু এখনো সে অনূঢ়া তাহার যোগ্য পাত্র জুটিয়া উঠে নাই। এ হেন শিক্ষিতা মহিলার সমযোগ্য পাত্র আজিকার দিনে হট্ করিয়া পাওয়া বড়ই কঠিন, কাজেই সরোজিনী এখনো কুমারী, কিন্তু হইলে কি হয়, সরোজিনীর যৌবন-স্রোত দামোদরের বন্যার ন্যায় খরতর বেগে চলিয়াছে। কখন কাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, কে বলিতে পারে। সে বেগ রোধ করে কাহার সাধ্য? সরোজিনী যৌবনভরে টলটলায়মান—তাহার রূপ-লাবণ্যের দীপ্ত ছটা

নিটোল অধরের মধুর হাসি—নিখুঁত নয়নের চঞ্চল চাহনি, অযথা রক্ষিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুবাসিত কেশরাশি সময়ে সময়ে আপনাকেই পাগল করিয়া তুলিত। সে অনেক সময় দর্পণের সম্মুখে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া অপনিই মোহিত হইত। সে মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিত অনেক যুক্তির আশ্রয় লইত, অনেক চরিত্র সমালোচনা করিত, কে তাহার যৌবনভরা রূপের বোঝা মাথায় করিয়া লইতে সক্ষম হইবে! সরোজিনী একটু প্রকৃতস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তখনো তাহার মাথাটা ঘুরিতেছিল, দুই হস্তে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল।

ডাক্তার কহিলেন "অমন করচ কেন সরো—কোনো অসুখ করেছে নাকি?"

"না তেমন কিছু নয়, এই মাথাটা বড় ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে—বস, asperin tablet আছে কিনা দেখচি,—এখুনি সেরে যাবে।"

"থাকগে ও ছাই ভস্ম আর খাবো না। একটু শুলেই সেরে যাবে। আপনি ততক্ষণ এই আঁচলটা আমার মাথায় বেঁধে দিতে পারেন?"

ডাক্তার সরোজিনীর হস্তস্থিত অঞ্চলটি স্বহস্তে লইয়া তাহার মস্তকে বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন—ডাক্তার কত কঠিন অস্ত্র চিকিৎসা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নিপুণ হস্ত মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হয় নাই—আজ সরোজিনীর করস্পর্শে হঠাৎ কম্পিত হইয়া উঠিল—বুকের ভিতর যেন একটা তাড়িতের স্পন্দন অনুভব করিলেন,এই সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। ডাক্তারের কম্পিত হস্ত হইতে সরোজিনীর অঞ্চল স্খলিত হইয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই ডাক্তারের বন্ধু মিঃ আর, সি, রে মস্-মস্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। উভয়েই একটু অপ্রতিভ হইল, সরোজিনী কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল "দেখুন দাদা, ডাক্তার বাবু এখন এলেন, কাল রাত্রে আমরা এঁর জন্যে কত eagrlyewait করছিলুম বলুন দেখি, আমাদের খাবার সময় over হয়ে গেলেও আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম।"

মিঃ রে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং একটি চুরুট ধরাইয়া কহিলেন "সরোজিনী ঠিক বলেছে, ডাক্তার কাল রাত্রে আমরা তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম—এমন কি বাবা নীচে এসে তোমার খবর নিয়েছিলেন—কাল তুমি আমাদের বাড়ির সকলকে কষ্ট দিয়েছ।"

"সে জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত—আশা করি তোমরা সকলে আমাকে ক্ষমা করবে।"

"তাতো হল, এখন শুনতে পাই কি, কাল কোথায় রাত্রিবাস হল?"

সরোজিনী চলিয়া গেল।

ডাক্তার একটি সিগারেট ধরাইয়া কহিলেন "আমি ব্যাচিলার মানুষ যদি একদিন পথভুলে কোথাও গিয়ে পড়ি তাতেই বা দোষ কি?"

মিঃ রে হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন "বাঃ ডাক্তার বাঃ, রোগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত—ঠাকুর ঘরে কে—আমি কলা খাইনি—কৈ দোষগুণের কথাতো কিছু বলিনি, তবে একবার বলে গেলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পেতুম।"

ডাক্তার এক কলম কালি লইয়া কহিলেন "সে জন্যে তো ইতিপূর্ব্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে এখন কি writen apology চাই, তাহলে address কোরবো কাকে?"

মিঃ রে কলমটা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন "থাক এসব বাজে কথা, কাল এতবড় রাত্রিটা কোথায় কাটালে শুনতে বাস্তবিকই বড় কৌতুক হচ্চে।'

ডাক্তার একটু গম্ভীর ভাবে কহিলেন "একটা 'কলে' গিয়েছিলুম।"

মিঃ রে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিলেন "আঁা কলে, সে patientটি রোগী না রোগীনী—সারা রাতই বুঝি তার চিকিৎসা করেছিলেন?"

ডাক্তার রাগতভাবে কহিলেন "ঠাট্টা ছাড়ুন।"

"তবে ঠিক কথা বলুন।"

"বিশ্বাস করবেন?"

"বিশ্বাসের যোগ্য হলেই কোরবো।"

"কাল আমি বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে শীগ্‌গির একটা ডিস্‌পেনসারি খোলবার বন্দোবস্ত করতে ও অন্যান্য কাজ কর্ম্মে রাত্রি অনেক হয়ে যায় কাজেই রাতটা সেখানে থাকতে বাধ্য হয়েছিলুম। বিশ্বাস করবেন কি?"

মিঃ রে চক্ষু দুটি উর্দ্ধে তুলিয়া মুখখানি সিঁটকাইয়া কহিলেন,—"উঁহু মনে তো লাগে না—তোমার বাড়িটা কি complete হয়েছে?"

"না এখনো কিছু বাকি আছে complete হলেই তোমাদের নিয়ে যাব।

"Thank you Dr. Bonerjee—কিন্তু সেখানে কি কোনো টেনিস ground করেছো?"

"হ্যাঁ, তাও একটা করেছি।"

"তবে তো বেশ হয়েছে, একটু তাড়া দিয়ে শীগ্গির করে complete করে ফেলুন।"

"সেই চেষ্টাইতো করচি।"

বৈকালে যখন সান্ধ্য ভ্রমণ করিয়া ডাক্তার ফিরিয়া আসিলেন তখন সকলে চায়ের টেবিলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ও নানা কথা বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে চা পান চলিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সরোজিনীর পিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কাল রাত্রে আমার জন্যে আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, তা আমি শুনেছি আমি কোনো বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলুম বলে' আসতে পারি নি সেজন্যে আমি বড়ই লজ্জিত আছি—আপনারা আমাকে মাপ করবেন।"

"না না লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই—তোমার আস্‌তে দেরি হচ্চে দেখে আমরা তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে' বসেছিলুম—তারপর তুমি এলে না দেখে শুতে গেলুম—রাত্রেও একবার উঠে তোমার খবর নিয়েছিলুম—সে যাহোক আমি সব শুনেচি তোমার বাড়িতো ফিনিস হয়ে গেছে, এখন ডাক্তারখানা খোলবার বিলম্ব কি?"

"আপনি আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখেন আপনাদের দয়া আমি কখনো ভুল্‌বো না। আমি—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সরোজিনী কহিল "দেখুন বাবা কি কথার কি জবাব—ডাক্তারখানা খোলবার বিলম্ব কি—তার জবাব হ'ল আপনাদের দয়া আমি কখনো ভুল্‌বো না—Regular lunatic."

চায়ের টেবিলে যাহারা ছিল সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ডাক্তার নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবেন কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। নত মুখে চায়ের পেয়ালাটি নাড়িতে লাগিলেন।

মিঃ রে, তাঁহার একটি বন্ধুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কেমন মিঃ ঘোষ সরোজিনীর রহস্যটি বেশ সময়োপযোগী হয়েচে না!" ঘোষ সাহেব রুমালে মুখ মুছিয়া কহিলেন "কৈ Dr. Bonrjeeতে লুনাটিকের কোনো লক্ষণ তো দেখি না।" সরোজিনী কহিল,—"এখন সবে রোগ সুরু হয়েছে, আর কিছু দিন পরেই আঁচড়াতে কাঁমড়াতে আসবেন।"

অপর একজন মৃদুস্বরে বলিল "মিঃ ়র তবে আর দেরি কেন! Asylumএ পাঠাবার একটা বন্দোবস্ত করে' ফেল।" সরোজিনীর পিতা বলিলেন, "না আমি ও সব ভালোবাসিনা।" পরে ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"ওদের কথা কানেই তুলো না, ওরা এখনো ছেলে মানুষ, কাকে কি বল্‌তে হয় কিছুই বোঝে না।"

ডাক্তার নত মুখে গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"তা আমি জানি।"

সরোজিনী কহিল,—"কিন্তু কথাটা যে চাপা পড়ে গেল।"

ডাক্তার কহিলেন,—"কি কথা?"

সরোজিনী গম্ভীর ভাবে কহিল,—দেখুন Lunatic আর কারে বলে?" সকলে আবার হাসিল।

সরোজিনীর পিতা কহিলেন, "সরো তুমি বড় বাড়াবাড়ি করচ।"

সরোজিনী আদুরে মেয়ের মতো একটু হ্যাকা হ্যাকা ভাবে কহিল,—"উনি কেন আপনার কথার উত্তর দিন না?"

"আচ্ছা সে কথা আমি বল্‌ছি।"

ডাক্তার কহিলেন "বোধ হয় দু'এক মাসের মধ্যেই ডাক্তারখানা খোলা হবে। আজ বিলেতে একটা Indent পাঠিয়েছি এক মাসের মধ্যেই সমস্ত জিনিস পত্র এসে পড়বে। আর কাল আমাকে Panjub mailএ Benares যেতে হবে সেখানে দু একদিন দেরি হবে। কোনো বিশেষ কাজ আছে।"

সরোজিনীর পিতা কন্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সরো তুমি না সেদিন বল্‌ছিলে—একটু বাহিরে বেড়াতে যাবার কথা—Now this is the best opportunity for you."

সরোজিনী নত মুখে অঞ্চলের অগ্রভাগটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে কহিল "তা উনি যদি নিয়ে যান ত যাব না কেন—তবে Benares কেন? That's a nasty place দার্জ্জিলিং সিমলা মরি মুসৌরি, নাইনিতাল—এ সব থাকতে বেনারস কেন?"

ডাক্তার সরোজিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা সরো যে Lunaticএর সঙ্গে বেড়াতে যায়, তাকে কি বলে?" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরোজিনীর পিতা কহিলেন,—"বেশ ঠিক জবাব হয়েছে—সরো, তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

সরোজিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া "আচ্ছা

আমি আপনার সঙ্গে যাব না” বলিয়া সত্বর উপরে চলিয়া গেল। কাজেই সভাভঙ্গ হইয়া গেল।

ডাক্তার মনে মনে বলিলেন—বাঁচলুম, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল। আমি কোথায় কাশীতে যাচ্চি একটা কাজের জন্যে, উনি আমার স্কন্ধে চাপ্‌লে সব মাটি হয়েছিল আর কি, যাহোক এখন ভাগ্যে ভাগ্যে রেহাই পাওয়া গেল।

পরদিন পঞ্জাব মেলে ডাক্তার রওনা হইলেন এবং একদিন কাশীতে থাকিয়া পর দিন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে ডাক্তার রায় পরিবারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনিলেন—ভূতের বাটী এখন রম্য নিকেতনে পরিণত হইল—সরোজিনীর মধুর কণ্ঠ তাল লয় সংযোগে হারমোনিয়ম সাহায্যে মধুরতর হইয়া দিক ভাসাইতে লাগিল। পাড়ার অনেকেই আজ ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া দেখা দিল। যাহারা ভূতের ভয়ে রাত্রে রাম রাম বলিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহারাও আজ নির্ভয়ে ডাক্তারের বাটীতে আসিল। কেবল আসিল না সেই পরশ্রী-কাতর অবিনাশ বাবু। ডাক্তার নিজে যাইয়া ডাকিলেন—“অবিনাশ বাবু আসুন, আমার ওখানে গান বাজনা হচ্চে কয়েকটি বন্ধু বান্ধব এসেছেন তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করে দিই।”

অবিনাশ বাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন “না মশাই ও ভূতের বাড়ি আমি যাবো না।”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন “সে কি মশাই এখনো ভূত—ভূত যে অনেক দিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।”

“ভূত চলে গেছে শুনে সুখী হলুম—কিন্তু আমাকে মাপ করবেন।”

ডাক্তার মিনতি করিয়া কহিলেন,—“দেখুন আপনা হতেই আমার এ বাড়ি আপনাকে এবার যেতে হবে।”

অবিনাশ বাবুর বুকে শেল বিদ্ধ হইতেছিল—তিনি মনে মনে বলিলেন ওঃ বেটা এত বড় বাড়িখানা হরিপদর মার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে নিলে—আর আমিই সেই পথ দেখিয়ে দিলুম—বেটা উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল। হরিপদর মা বেটীকে আমি মনে করলেই ঠিক করতে পারতুম। কতবার ঐ বাড়ির জন্যে আমার কাছে এসেছিল। বড় চুক হয়েছে। আচ্ছা আমি থাকতে ও বাড়ি কেমন করে বেটা ভোগ দখল করে তাই দেখ্‌ব। ও বাড়িখানা আমার হক্ পাওনা।”

অবিনাশ বাবুকে নিরুত্তর দেখিয়া ডাক্তার আবার কহিলেন,—

"ভাবছেন কি আসুন না।"

"ভাবছি আমার ওখানে যাওয়া ঠিক নয়—কারণ তোমরা সব বিলেত ফেরতের দল। শেষকালে কি একঘরে হব ?"

"সেকি মশাই আমরা বিলেত ফেরত বটে, কিন্তু হিন্দু—হিন্দুর কালী দুর্গা সবই মানি। আর আপনি তো আমাদের সঙ্গে ফলার কচ্চেন না যে, জাত যাবে, তা ছাড়া আপনাদের পাড়ার অনেকেই উপস্থিত আছেন।"

"যে যায় সে যাক মশাই—আমি ও দলে মিশতে পারব না, আমায় মাপ করবেন।"

ডাক্তার বেগতিক দেখিয়া বিদায় হইলেন।

অবিনাশ বাবু তুঁষের আগুনে পুড়িতে লাগিলেন। হৃদয়ে শত বৃশ্চিক-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। হিংসা এমনই খল এমনই ক্রূর!

অবিনাশ বাবু এক ছিলিম তামাক টানিতে টানিতে একটা মতলব আঁটিতে বসিলেন।

অবিনাশ বাবুর কথায় ডাক্তারের মনে যেন কি একটা ছাঁৎ করিয়া লাগিল,—তিনি ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

ভিতরে তখন হারমোনিয়মের সুরে সুর মিলাইয়া সরোজিনী গাহিতেছিল;—

কি দিয়া পূজিব তোমায় কি মম সম্বল।
দিনহীন কাঙাল আমি কি আছে আমার,
নাহি সাজিভরা ফুল রত্নালঙ্কার,
রেখেছি যতনে দেব, দিতে উপহার
প্রেমাশ্রু জলে ধুয়ে ভক্তি-বিল্বদল!—

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আজ কাল যুদ্ধের কথায় সকলেই চিন্তিত। তবে ক্রমে সময় অনেকটা দীর্ঘ হইয়া আসাতে চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞগণ এখন বিবেচনা করিতেছেন, যুদ্ধ আর খুব বেশীদিন চলিবে না। শীঘ্র একটা সন্ধির অবস্থায় আসিতেই হইবে।

এবার গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুদিগের মধ্যে বড় বাবুর অসম্পন্ন নূতন বাটীতে ও সেজোবাবুর সাবেক বাটীতে পৃথকভাবে দুইখানি দুর্গাপূজা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন গোবরডাঙ্গা একখানি, খাঁটুরায় দুইখানি, গৈপুরে (মিলিত ভাবে) একখানি, বাল্যিয়ানি একখানি ও মাটকোমরায় একখানি।

মাটকোমরা নিবাসী, কলিকাতা-মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় বাটী আসিয়া দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজ পল্লীভবন মাটকোমরায় বাস করি'বন। আমরা আশা করি তিনি গ্রামে বাস করিলে গ্রামের অনেক হিত সাধিত হইবে।

গোবরডাঙ্গায় আর কোন বিষয়ে না হউক, অল্পকালের মধ্যে থিয়েটারের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। আবার এই থিয়েটার সংক্রামক রোগের ন্যায় সকল গ্রামব্যাপী হইবার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। এবার পূজার কয়েক দিন অনেক পল্লীগ্রাম হইতে গোবরডাঙ্গা (সহরে) বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি এই নির্জীব নিস্তব্ধ পল্লীটি জন কোলাহলে বেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল; অভিনয়ে কৃতকার্য্য হইয়া গর্ব্বিতভাবে থিয়েটারের জনৈক নেতা আমাদের পশ্চাতে অথচ শুনাইয়া বলিতেছিলেন, "এবার আবার কলিকাতা হইতে ফিমেল ব্যাচ আনিতে হইবে।" ইতিপূর্ব্বে একবার যখন ফিমেলব্যাচ আনিয়া ছিলেন, তখন আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য স্থানীয় কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "গোবরডাঙ্গার এই অধঃপতনের কথা সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচার করিয়া, আর লজ্জা দিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর আর এরূপ ঘটনা হইতে পারিবে না।" এবার আবার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা কি বলেন আমরা তাহা শুনিতে চাই।

এক সময়ে গোবরডাঙ্গা চিনির জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তখন এখানে শতাধিক কারখানা ছিল। নানা কারণে বিদেশাগত চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় পরাস্ত হইয়া আজ বিধ্বস্ত অবস্থায় চারিটিমাত্র কারখানায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধকালীন বিদেশী চিনি আমদানী সম্ভবপর নয়, সে কারণ দেশী চিনি এবার উচ্চদরে বিক্রীত হইবে। চিনি ব্যবসায়ীদের এই সুযোগের প্রতি লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। বারাসাতের সাবডিভিসন্যাল অফিসর যাহাতে অত্র স্থানে পূর্ব্ববৎ চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার জন্য স্থানীয় চিনি ব্যবসাদারদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিবার জন্য, রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরকে এক অনুরোধ পত্র লিখিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস উক্ত জমিদার বাবু সচেষ্ট হইলে এদেশে আবার চিনি ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে।

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর অধীনে একটিমাত্র বালিকা-বিদ্যালয় আছে। সেটি খাঁটুরা দত্ত-বাটীতে স্থিত। এই বিদ্যালয়ে মিউনিসিপালিটী বাৎসরিক ৫০্ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করেন। শুনিলাম বালিকাদিগের শিক্ষাপনা আশানুরূপ হয় না। শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতিই অন্যতম কারণ। আশা করি ইস্কুল-সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

এবার সাহায্য প্রাপ্তি কম্পোজ হইয়াও স্থানাভাবে মুদ্রিত হইল না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
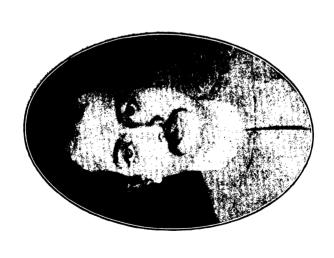
স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২১ { অষ্টম সংখ্যা

সঙ্গীত

—:o:—

ঝিঝিট—মধ্যমান

ওহে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি, তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে;
কে কোথা হয়েছে সুখী অধর্ম্ম পাপ আচারে।

দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ডদলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্মফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর, এ অধম মহাপাপীরে।

(ব্রহ্ম-সঙ্গীত

ছবির আদর

সাধারণত ছবি ঘর সাজাইবার একটি উপকরণ, ইহাই অনেকে মনে করেন। বড় বড় অয়েল-পেটিং, ব্রোমাইড, লিথো এবং বিলাতি ড্রয়িং চিত্রে ধনী-গৃহ সুশোভিত। আবার গরীবের ঘরে ২।১ খানা কালীঘাটের পটও থাকে। প্রায় সকল গৃহেই ২।৫ খানা ছবি থাকেই। কোথাও কোথাও অনেক বিচিত্র রকমের ছবিও দেখা যায়। আজ কাল শিক্ষিত শ্রেণী, দেশহিতৈষী দেশ-নেতা মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডবলু, সি, বোনার্জ্জী প্রমুখ মনস্বীগণের ছবি যত্নের সহিত রাখেন। আর এক শ্রেণী, দেব-দেবীর ছবি—পৌরাণিক ছবিগুলিই বেশী ভালবাসেন। কোথাও কোথাও দেখা যায়, মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও পরমহংস রামকৃষ্ণের ছবির সঙ্গে সাহেব-মেমের প্রেম-বিলাস ছবিও একত্রে স্থান পাইয়াছে। তদপেক্ষা আরো কত রকমের অশ্লীল ছবির কথা আমরা উল্লেখ করিতে চাহি না। এই সকল দেখিয়া মনে হয় আমাদের মধ্যে ছবি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সাধারণত বড়ই একটা বিশৃঙ্খল ভাব চলিয়াছে। বাস্তবিক ছবি কি কেবল ঘর সাজাইবার জিনিষ? তাহার মধ্যে কি কোনো ভাব নাই? ছবিখানি দেখিলে মনে যে একটি ভাবের সঞ্চার করে, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু সেই ভাবের কি একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত নয়? যে ছবি দেখিলে মনে পবিত্র ভাব হয়, আবার তাহারই পার্শ্বে লজ্জাস্কর ছবিগুলিও কি রাখা উচিত? যেখানে পুত্র-কন্যা অথবা পুত্র-কন্যার স্থানীয় সমস্ত বালক বালিকা হইতে যুবক ও বয়স্থা কন্যাগণের দৃষ্টি পড়ে, সেখানে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ ছবিগুলি রাখায় ভিতরে ভিতরে যে কি অনিষ্ট হয় তা'কি একবার ভাবিয়া দেখিবার কথা নয়? যদি ছবি রাখিতে হয়, তবে যে সকল ছবি দেখিলে, জ্ঞান হয়—পবিত্র সৌন্দর্য্য-স্পৃহা বলবতী হয়, ধর্ম্মভাব মনে আসে, এমন ছবি রাখাই তো উচিত।

তারপর ধর্ম্মাত্মাগণের ছবি রাখা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিতে চাই। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের কথায় ক্ষুণ্ন না হইয়া উদার ভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

সাধারণত দেখা যায় যাঁহারা ধার্ম্মিক সাধু মহাত্মাগণের ছবি ঘরে রাখেন তাঁহার অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সে সকল ছবি রাখার সঙ্গে আন্তরিক

তেমন কোনো শ্রদ্ধা ভক্তির সম্বন্ধ নাই। কারণ ছবিতে শ্রদ্ধা মানে কি? সেই ব্যক্তিতে শ্রদ্ধা নয় কি? ব্যক্তিতে শ্রদ্ধা তাহারই বা অর্থ কি? শ্রদ্ধা কি একটা বাহিরের ভাবমাত্র? বর্ত্তমান সময়ে ঐ বাহ্য ভক্তিতেই দেশ আচ্ছন্ন। কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে চরিত্রগত অন্তত কিছু যোগ আছে সেইখানেই প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তির স্থান। আমরা আজকাল দেখিতেছি ঘরে ঘরে পরমহংস রামকৃষ্ণের ছবি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রেতা—যেমন কাপড়, ঔষধ, মিষ্টান্ন মিছিরির কারখানা ইত্যাদি স্থানে ঐ সকল সাধু ভক্তের ছবি রহিয়াছে, অথচ তাঁহাদের কার্য্যে পরিচয় পাওয়া যায় যে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে সত্য ব্যবহার রক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ঐ ছবির সঙ্গে তাঁহাদের চরিত্রগত বিশেষ কোনো যোগ নাই। সম্মুখে মহাত্মাগণের ছবি রাখিয়া অসাধু জীবন যাপন করিলে, তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় না কি? অবশ্য অনেকে বলিবেন এত উচ্চভাবে কেহ ছবি রাখিতে পারে না, ভালো ছবি ঘরে থাকিলে দিনের মধ্যে পাঁচবার দৃষ্টি পড়িলে ক্রমে তাহাতেও আমাদের উপকার হইতে পারে। এই কি বাস্তবিক উত্তর হইল? সে তো মনকে প্রতারণা করিয়া মোহগ্রস্ত জীবনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া জীবন অবসান করা মাত্র। অবশ্য যাহাদের চরিত্র, ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত নিষ্ঠা আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কুশদহের ইতিহাস

—:*:—

মুখোপাধ্যায়-বংশ

অতি শুভক্ষণে মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শুভক্ষণে কনোজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইতে তাঁহার অভিলাষ হইয়াছিল। শুভক্ষণে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাংলায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এবং মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহারা বাংলায় বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে গ্রামভুমি দান করিয়া, বাংলায় তাঁহাদিগকে বাস করাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী মাত্রেই আদিশূরের এই কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আদিশূর সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

বাস্তবিক আদিশূর নামে বাংলায় কোনো রাজা ছিলেন কিনা, তাঁহার বংশ কতিপয় পুরুষ ধরিয়া বঙ্গ বা রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিল কিনা—তাঁহারা বাংলায় রাজত্ব করিলেও পালবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী কিনা—সে সকল কথার বিচার এখানে

নিষ্প্রয়োজন। যে প্রবাদ সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, কুলজীগ্রন্থে যাহা সমর্থিত হইয়া আসিতেছে—তাহা একেবারেই অবিশ্বাস্য একথা বলা চলে না। স্থানান্তরে ইহার যথাযথ আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণই বৌদ্ধবিপ্লাবিত বঙ্গভূমিতে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করিয়া সকলকে সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। বাঙালীর জাতীয় জীবনে আচার ব্যবহার রীতি নীতি নিত্যকর্ম্ম প্রভৃতির নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাদের উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার চাল চলন সকলেরই অনুকরণীয় হইয়াছিল। তাঁহারাও স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সন্তানগণ অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণ সন্তানের ন্যায় আজও গায়ত্রীহীন হন নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠ সন্তানেরা জানিয়া বা না জানিয়া আজও দু পাঁচটা বেদ মন্ত্র নিত্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রীহর্ষ বাংলার ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ। তিনি যেমন নৈষধচরিত রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তেমনই ন্যায় শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই বাংলায় নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বেদবিহিত যাগযজ্ঞে তাঁহার প্রগাঢ় দক্ষতা ছিল। তাঁহার ন্যায় সুকবি, দার্শনিক ও বেদজ্ঞ পণ্ডিত সেকালেও অধিক মিলিত না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার একটিমাত্র উদাহরণ এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মথ ভট্ট দেখিলেন শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়া যে শ্লোক লিখেন তাহাই মুছিয়া ফেলেন। কোন শ্লোকই তাঁহার মনোনীত হয় না! বার বার এরূপ করিয়া কদাচিৎ এক আধটি শ্লোক রাখিয়া দেন। অথচ যে শ্লোকগুলি তিনি পছন্দ করেন না সেগুলি প্রথম শ্রেণীর শ্লোক। এরূপ করিলে কাব্য রচনায় তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন না মনে করিয়া, মম্মট ভট্ট তাঁহাকে মাষ কলাইয়ের ডাল খাওয়াইতে লাগিলেন। মাষকলাই ভক্ষণে ক্রমে তাহার প্রতিভা সঙ্কুচিত হইল। যাহা লিখেন তাহাই রাখেন, তাহাই পছন্দসহি হয়। ক্রমে নৈষধচরিত অনেকদূর লেখা হইলে তিনি কারণ জানিতে পারিলেন। তাই দুঃখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "অশেষ সেমুষিমোষ মাষমশ্নামি সাম্প্রতং।"

শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জের (কনোজের) রাজার নিকট বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে তাঁহাকে তাম্বুল ও আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। তাৎকালিক পণ্ডিতগণের পক্ষে ইহা পরম গৌরবের কথা ছিল। অনন্তর বাংলায় আসিয়া

তিনি "গৌড়োর্ধ্বীশ কুল প্রশস্তি" অর্থাৎ গৌড়রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। তৎপরে মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়া "অর্ণববর্ণন কাব্য" লিখিয়াছিলেন। তদনন্তর শেষ বয়সে "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" রচনা করিয়া নব্য ন্যায়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাচর্চ্চা করিতে বিরত হন নাই। অনন্তর প্রপৌত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সজ্ঞানে তিনি গঙ্গালাভ করেন।

শ্রীহর্ষের সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাই যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ ও চরিত্রবান ছিলেন তাহা নহে, যাঁহারা উক্ত মর্য্যাদা পান নাই তাঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রচর্চ্চার অভাব ছিল না। চরিত্রবলে তাঁহারা হীন ছিলেন না। যাহাহউক গৌড় ও রাঢ়ে সেনবংশের রাজত্ব লোপ ঘটিলে কুলীনেরা গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

মিনহাজ নামক জনৈক লেখক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, সপ্তদশজন অশ্বারোহী আসিয়া নদীয়ার বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজপুরী আক্রমণ করে। রাজা তখন আহারে বসিয়াছিলেন। তাহার মুখের গ্রাস ফেলিয়া বৃদ্ধ ভূপতি খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন ও নৌকাযোগে নিরাপদ স্থানে পৌছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের বংশ-পরিচয় লেখকগণ অর্থাৎ ঘটকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় মহারাজ লক্ষ্মণসেনের উপযুক্ত পুত্র যুবরাজ কেশব সেন সহজে গৌড় রাজধানী শত্রুকে ছাড়িয়া দেন নাই। বিনা যুদ্ধে পলায়নও করেন নাই।

কেশব সেন বহুদিন পর্য্যন্ত শত্রুর সহিত অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন গৌড়রক্ষা অসম্ভব দেখিলেন তখন অল্পে অল্পে হটিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলেন। প্রত্যেক অঙ্গুলি-পরিমিত ভূমি অধিকার করিতে বিজেতা মহম্মদ বক্তিয়ারের ভূরি পরিমাণ সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। তবে রাঢ়ের কতকাংশ তিনি আপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যখন গৌড় বা রাঢ় রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল তখন কেশব সেন পূর্ব্ববঙ্গীয় রাজধানী বিক্রমপুরে গমন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ তখন পূর্ব্ববঙ্গ শাসন ও রক্ষা করিতে ছিলেন। কেশব ও বিশ্বরূপের ন্যায় উপযুক্ত পুত্রের উপর রাজ্য-ভার ন্যস্ত করিয়া বৃদ্ধ রাজা নদীয়ায় গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে হরিনাম করিয়া, সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া, জয়দেবের গীতগোবিন্দ গান শ্রবণে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

কিন্তু যখন নবদ্বীপ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল তখন সম্ভবতঃ বৃদ্ধ রাজা নৌকাপথে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নহিলে সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক নদীয়া জয় ঐতিহাসিক কল্পনা মাত্র। একটি সহজ কথা এই যে, নবদ্বীপ তখন গঙ্গার পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। শত্রু নিশ্চয়ই ভাগীরথী পার হইতে না পারিলে রাজবাটী আক্রমণ করিতে পারে না। তখন নদীও খুব প্রবল ছিল। কাজেই শত্রু সসৈন্য নদী পার হইতে বিশেষ বাধা পাইবার কথা। এ অবস্থায় সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক রাজপুরী অধিকার একটা প্রকাণ্ড অসত্য। তবে যদি গুপ্তভাবে নানাস্থানে গঙ্গাপার হইয়া অতর্কিতভাবে সপ্তদশ অশ্বারোহী নবদ্বীপ আসিয়া থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

যাহা হউক কেশবসেনের সহিত কুলীন ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলেন। রাজগণের আশ্রয়ে তাঁহারা অনেকটা নিরুপদ্রবে বাস করিতে লাগিলেন। তবে আশ্রয়দাতার অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদেরও অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিল, কুলীনগণের পরিচয়ও রূপান্তর গ্রহণ করিল। এই সময় হইতে কাঁটাদিয়া, সাগরদিয়া প্রভৃতি নাম পরিচয় স্থলে হইল।

অনন্তর পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানগণের হস্তগত হইলে চতুর্দ্দশ শতাব্দর মধ্যভাগে কুলীনগণ নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণকে মুসলমান রাজারা সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন। গৌড়ে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হইলে দেশবাসীদিগকে মুসলমান রাজারা আদর করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। দেশে শান্তি ও সুশাসনের ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহায়তা লইতেন। মুসলমান রাজগণের অনেকেই ধার্ম্মিক ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া গুণের আদর করিতেন। দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিতেন এবং অপক্ষপাতে তাহা বিস্তার করিতে যত্নবান ছিলেন। এইজন্য গৌড়ের পাঠান নৃপতিগণ প্রজার হৃদয় অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে মুখোপাধ্যায় কুলীনেরা গঙ্গাতীরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিলেন। তখনও তাঁহাদের কনোজীয় ওঝা উপাধি ছিল। মুখোপাধ্যায় উপাধি প্রচলিত হয় নাই। নবদ্বীপ হইতে খড়দহ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে তাঁহাদের বসতি স্থাপিত হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অনাথ বালক

—:o:—

(গল্প)

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখনো পল্লীগ্রাম সমূহে মধ্য ইংরেজী ও মধ্য বাংলা ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় হয় নাই, তখন প্রতি গ্রামেই দুইটি বা একটি পাঠশালা ছিল এবং গ্রামের দু' একজন পাটোয়ার এবং খঞ্জ অকর্ম্মণ্য লোকের দ্বারা পাঠশালার শিক্ষকতা বা গুরুমহাশয়ের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। গুরু-মহাশয়গণের বিদ্যার প্রগাঢ়তার পরিমাণ করা শক্ত ছিল, বালকেরা কতকটা অনুভব করিতে পারিত। শিক্ষকতা কার্য্যটি বা পাঠ দেওয়া এবং পাঠ লওয়া প্রভৃতি গুরুমহাশয়ের আবশ্যক গুরুভার "সর্দ্দারপোড়ো" বা শ্রেষ্ঠ বালকগণের দ্বারা সাধিত হইত। গুরুমহাশয় কেবল মাহিয়ানা আদায় করিতেন— দণ্ডবিধি আইনের মধ্যেও যেসকল দণ্ডের বিধান নাই গুরুমহাশয়ের নিকট তদপেক্ষা বেশী দণ্ডের বিধান ছিল। গুরুমহাশয়ের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তি-প্রভাবে অনেক লঘু পাপে বিভিন্ন প্রকারের গুরু দণ্ড তাহার সীমাবদ্ধ পাঠশালা রাজ্যের ছাত্ররূপ প্রত্যেক প্রজাকে ভোগ করিতে হইত। তবে গুরুমহাশয়ের নিকট যাহাদের সেবাপরাধ না হইত, সেইসকল গুরুভক্তিপরায়ণ ছাত্রগণ অপেক্ষাকৃত একটু কম দণ্ড ভোগ করিত। তবে গুরুমহায় বিশেষ পক্ষপাতশূণ্য ছিলেন, কাহাকেও অধিক ভালোবাসিতেন না।

এইরূপ একটি মহান্ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় একদিন গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে আমারা দ্বাদশ বর্ষীয় নিরীহ অনাথ বালক কাঙ্গালীচরণকে এক অদ্ভুতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। তাহার দুই হস্তে দুইটি প্রকাণ্ড ইট, পৃষ্ঠে একখানি লৌহের দশসের ওজনের বাটখারা এবং গুরুমহাশয় তাহার পৃষ্ঠে পদ-যুগল এরূপ ভাবে অবস্থিত করাইয়া দিয়াছেন যে যিনি শিনা এবং চেরি ব্রিজের উপর মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তিনি কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। কাঙ্গালী-চরণের অপরাধ সে গুরুমহাশয়ের জন্য তামাক আনিতে পারে নাই, মাসিক ৵৫ সের চালের সিদা তাহাও আনিতে পারে নাই। এক মাসের ।৹ চারি আনা বেতনও বাকী আছে। কাঙ্গালীচরণ কেমন করিয়াই বা আনিবে! তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, বিধবা পিসিমাতার যত্নে আজ ৫ বৎসর সে লালিত হইতেছে। পিসিমা সূতা কাটিয়া কোনো গতিকে বালকের ও তাহার জীবিকা উপার্জ্জন

করেন। এ হেন দরিদ্র পিতৃ-মাতৃহীন কাঙ্গালীচরণ কেমন করিয়াই বা লেখাপড়া শিখিবে! অথচ ভদ্রসন্তান অপর বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করা সমাজবিরুদ্ধ, সুতরাং যে-কোনো উপায়েই হউক তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইবেই। এইরূপে তিন ঘণ্টাকাল গুরু দণ্ড ভোগের পর হঠাৎ-কাঙ্গালীচরণ ভূতলশায়ী হইল, মুখ দিয়া ফেনরাশি বহির্গত হইতে লাগিল, চক্ষু কপালে উঠিল, পাঠশালার মধ্যে একটি বিকট কোলাহল উপস্থিত হইল। গুরুমহাশয়রূপী কোতয়ালের জিহ্বাতালু বিশুষ্ক হইল, কাঙ্গালীচরণের পিসিমা বাঘিনীর ন্যায় আসিয়া গুরুমহাশয়ের চতুর্দ্দশ পুরুষের আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া কাঙ্গালীচরণকে কোলে লইলেন। ইত্যবসরে কয়েকটি সহৃদয় বালকের জল সিঞ্চনে কাঙ্গালীচরণ নয়ন-উন্মীলন করিল। সেই দিন পিসিমা কাঙ্গালীকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহার দূর সম্পর্কীয় দেবর শ্যামাচরণ বসুর সকাশে উপস্থিত হইলেন। শ্যামাচরণ বসু কোনো মহাকুমার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, কাঙ্গালীর পিসিমা অনেক কাঁদাকাটা করিয়া কাঙ্গালীচরণের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ভার শ্যামাচরণ বসুর উপর অর্পণ করিলেন। শ্যামাচরণ বসু পিতৃ-মাতৃ-হীন অনাথ বালক কাঙ্গালীচরণকে সঙ্গে আনিয়া মহাকুমার ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন বলিলেন। পিসিমা, কাঙ্গালীচরণকে কেমন করিয়াই বা আজ প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিবে? একদিকে কাঙ্গালী তাহার অঞ্চলের নিধি স্বর্গগত ভ্রাতার বংশের দুলাল, আবার কাঙ্গালীর মা মরিবার সময় মৃত্যুশয্যায় পিসিমার হাতে ধরিয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন "দিদি, আমি তো জন্মের মতো চলিলাম, কাঙ্গালী আমার সত্যই কাঙাল হইল, ঠাকুরঝি, কাঙ্গালিনীর কাঙালকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিলাম, দেখ, আমার কাঙ্গালীচরণ যেন না খেতে পেয়ে মরে না, আর এক অনুরোধ, যদি কাঙ্গালীকে ভিক্ষা করিয়াও খেতে দাও, তবু পরের আশ্রয়ে রাখিয়ো না—স্বামী বলিতেন,—"পরের আশ্রয়ে থাকা পলকে পলকে মৃত্যু তুল্য।" ভ্রাতৃজায়ার মুমুর্ষুবাণী স্মৃতি-পথে উদিত হওয়ায় পিসিমাতার গণ্ডস্থল বহিয়া দর দর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কিন্তু চিরদিন চির দারিদ্র্যের কোলে লালিত স্নেহের মণি কাঙ্গালীচরণের ভবিষ্যৎ জীবন সুখে কাটিবে এই লুব্ধ আশার অস্ফুট আলোকের অরুণ রাগ পিসিমাতার নয়ন-কোণে আজ ভাসিয়া উঠিল। দূরাগত বংশীধ্বনি যেন হরিণীর কর্ণে বাজিয়া উঠিল। অমনি পিসিমা সকলি ভুলিয়া গেলেন, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কাঙ্গালীচরণকে বিদায় দিলেন। কাঙ্গালীচরণ বিদায়কালীন ছল ছল নেত্রে

পিসিমার পদধূলি গ্রহণ করিল। অজানিত অজ্ঞাত সুদূর প্রবাসে সম্পূর্ণ অপরিচিত আত্মীয়ের কর্ম্মস্থলে গমনের কি এক অচিন্তনীয় চিন্তা বালকের ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে ক্ষণে ক্ষণে ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল। কিন্তু পিসিমা বলিয়াছেন—"ভবিষ্যতে তুমি বড়লোক হইবে, সুখে খাইতে পাইবে, পিসিমার দুঃখ ঘুচাইবে, সংসারের দুঃখ জ্বালা দূর করিবে।" সেই ভাবী সুখের আশায় কাঙ্গালীচরণ আজ স্নেহময়ী জননীসমা পিসিমার স্নেহ-ক্রোড় হইতে দূরে আসিয়া পড়িল।

২

বিমলা শ্যামাচরণ বাবুর স্ত্রী। তিনি বড় গর্ব্বিনী মানিনী সহরবাসিনী। তিনি কস্মিনকালেও পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখেন নাই। তিনি এই সহরেই থাকেন। শ্যামাচরণ বাবু কাঙ্গালীচরণ-সহ বাসায় পৌঁছিলে তাঁহার স্ত্রী বিমলা বলিয়া উঠিল,—"বাড়ি হতে এবার তোমার সঙ্গে ও কে এলো গা ?"

স্বামী শ্যামাচরণ বাবু উত্তর করিলেন,—"বালকটি আমার আত্মীয়, পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয়, তাই সঙ্গে এনেছি।"

——"তুমি এত ঝঞ্ঝাট বাড়াতে পার, এখন পরের ছেলের কে করবে বল দেখি ? নিজের ছেলেদিগে সামলাতে পারি নে—তার উপর পরের ছেলে জড়ানো।"

——"তোমাকে আর কি করতে হবে ? ও বাহিরের ঘরে শুইবে, ইস্কুলে পড়বে, আর দু'বেলা চারটি ভাত খাবে বৈত নয় ?"

——"তা হলেও গলগ্রহ।" শ্যামাচরণ বাবু স্ত্রীকে কি জানি কেন একটু ভয় করিতেন, কারণ স্ত্রী বড়ই মুখরা. ছোট ঘর হতে আসিয়াই একেবারে স্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিত, পিত্রালয়ে কখনো দশটাকা একত্রে দেখে নাই। বিমলা স্বামী-গৃহে আসিয়া অবধি টাকার মুখ দেখিয়া সর্ব্বদাই আত্মহারা বা গরম হইয়া থাকিতেন। শিক্ষার অভাবে বিমলার মনেরও কোনো উন্নতি হয় নাই। নিজের ছেলে-মেয়ের উপরেও যত্ন ছিল না। স্বামীর উপর আন্তরিক যত্ন বা ভক্তি ছিল কি না তাহা সাধারণের অনধিগম্য ছিল। কেবল স্বামী মহাশয় জানিতেন মাত্র। শ্যামাচরণ বাবু দেখিলেন যে, স্ত্রী একটু বিরক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি ওকালতী ফন্দী যোটাইয়া স্ত্রীকে একটু খুসী করিয়া দিলেন।—"দেখ, বিমলা আমি এই বালকটিকে আনিলাম ইহাতে একটু সুবিধা আছে, চাকর বেটাকে ছাড়াইয়া দিব, ও-ই ছেলে লইয়া থাকিবে, ফাই-ফরমাশ শুনিবে, দরকার হলে বাজারে যাবে, সুতরাং চাকরের মাহিয়ানাটা

বাঁচিয়া গেল, আর চারটা ভাত দেওয়া, তা চাকরটা তো বরঞ্চ পাতের ভাত খেত না, এ-কে পাতের ভাত দিলেও চলবে—কেন না ঘরে তাও পে'ত না সুতরাং যে ভাত ফেলা যে'ত তা আর যাবে না। আর একবার ইস্কুলে যাবে, তা, তখন আমিও ঘরে থাকি না, আর তোমরাও তো দুপুর বেলায় ঘুমোও, গল্প কর, তাস খেলায় সময় কাটাও কাজেই তখন উহাকে দরকার হবে না। আর ইস্কুলের মাহিয়ানী, তাও আমায় দিতে হবে না, কারণ গরীবের সন্তান বলিয়া বিনা বেতনে যাহাতে পড়িতে পারে তাহার একটা ব্যবস্থা করিব। সে বিষয়ে তো আমার কতকটা হাত আছে। বিমলা, এখন ভালো করে বুঝে দেখ এত সস্তায় চাকর পাওয়া যায় কি ?"

বিমলা একটু মুচকি হাসিয়া মনে মনে স্বামীর বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"তবে থাক।"

৩

কাঙ্গালীচরণের মনটা এখানে আসিয়া অবধি হু-হু করিতে লাগিল—বড়ই ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল; মায়ের স্নেহ, মায়ের মৃত্যু, পিসিমার যত্ন, আসিবার কালীন পিসিমার ক্রন্দন সর্ব্বদাই বালকের হৃদয়ে উদিত হইয়া বালককে মাঝে মাঝে ম্রিয়মাণ করিয়া তুলিত। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় চিন্তার বেগ বালক অতিকষ্টে দমন করিত। বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটা প্রগাঢ় অনুরাগ বালকের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই উৎসাহে বালক সকল জ্বালা ভুলিল। হায়! বালকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এত অনুরাগ—এত আকাঙ্ক্ষা থাকিতেও পড়িবার অবসর হইত না, কারণ প্রাতঃকালে উঠিয়াই শ্যামাচরণ বাবুর খোস পাঁচড়াযুক্ত একটি দেড় বৎসরের বালককে লইয়া প্রাতঃভ্রমণ করিতে হইত, কপালগুণে ছেলেটিও ছাই কোলে বসিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না যে, দু দণ্ড কাঙ্গালীচরণ ইস্কুলের পড়া করিতে পারে। তারপর বাজার হইতে একটির পর একটি এইরূপ ক্রমাগত দ্রব্যাদি আনিতে হইত, কেন না বাবুর বাড়ির গিন্নি হইতে কুকুর বিড়ালটি পর্য্যন্ত কেহই একেবারে কোনো দ্রব্য আনিবার জন্য কাঙ্গালীকে আদেশ করিত না—বড় লোকের ঘরের মেয়ে-ছেলের একেবারে তো আর দরকার হয় না, খেয়াল অনুসারে যখন যাহার যাহা দরকার হইত তদ্দণ্ডেই কাঙ্গালী-চরণকে তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে সরবরাহ করিতে হইত। মধ্যে বিদ্যালয়ের সময় ব্যতীত কাঙ্গালীকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হইত। কারণ আশ্রিত বালক যখন বড়লোকের আশ্রয়ে আসিয়া

লেখাপড়া শিখিতেছে, আহার পাইতেছে, তখন সে ইহা ন্যায়ত ও ধর্ম্মত করিতে বাধ্য। যেদিন কাঙ্গালীচরণ অসুস্থ বোধ করিত—সে বড় লাজুক ছিল, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারিলেও সেদিনও কোনো কার্য্য করিতে বিরক্ত হইলে বা একেবারেই না পারিলে অমনি বাবুর এক গৃহপালিত সম্বন্ধী গৃহিণীকে বলিয়া দিত। গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিতেন—"কিরে কেঙ্‌লা, কাজ করবি না, বসে বসে ভাত মারবি, বাড়ি হতে ঝ্যাঁটা মেরে দূর করে দেবো।" কাঙ্গালী-চরণ একে তো মৃতপ্রায়ই থাকিত, তাহাতে আবার এইরূপ সুমধুর বাক্য-বাণ শ্রবণ করিয়া শত বিশ্চিক দংশনের অসহনীয় তীব্র জ্বালাও সহ্য করিতে হইত। যে অন্ন উঠাইয়া দিব বলিয়া বিমলাসুন্দরী ভয় দেখান, সে অন্নও বহুজনের উচ্ছিষ্ট। গৃহ-মধ্যে কাঙ্গালীর সুখ ছিল না, তবে ইস্কুলের কতিপয় শিক্ষকের সস্নেহে ও কতিপয় বালকের সহৃদয়তায় কাঙ্গালীর আশ্রয়দাতা মহাত্মার গৃহের জ্বালা ক্ষণেকের তরে ভুলিয়া যাইত। ইস্কুলের পাঠ কাঙ্গালী কতকটা শেষরাত্রে আলো জ্বালিয়াই সারিত। তাহার পুস্তকের বিশেষ অভাব—২।১ টি উদারপ্রকৃতি সমপাঠী তাহাকে সাহায্য করিত এবং দেবতুল্য প্রধান শিক্ষক নিজ হইতে কাঙ্গালীকে পুস্তকসাহায্য করিতেন ও শীতকালে গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি দিয়াও কাঙ্গালীকে শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতেন। এইরূপ ভাবে কাঙ্গালীচরণের দিন কোনোক্রমে কাটিতে লাগিল। পূজার ছুটী ও গ্রীষ্মাবকাশেও কাঙ্গালী একবারও তাহার স্নেহময়ী পিসিমাকে দেখিতে যাইতে পাইত না, কারণ শ্যামাচরণ বাবুর ছোট ছেলেটি তাহাকে এত ভালো-বাসিত যে, সে কাঙ্গালীকে ছাড়া কোনো সময়েই থাকিতে চাহিত না। সুতরাং তাহার এত কষ্ট পিসিমার দুদিন স্নেহ যত্ন পাইয়া যে ভুলিবে তাহারও উপায় ছিল না। বৃদ্ধা পিসিমাও সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া কাঙ্গালীকে দেখিতে আসিতে পারিত না। পিসিমা বুকের কষ্ট বুকেই লুকাইয়া কাঙ্গালীর মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট পূজা দিত আর কাঁদিত।

দেখিতে দেখিতে ৩।৪ বৎসর কাটিয়া গেল। কাঙ্গালী ইস্কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া প্রশংসা পাইতে লাগিল, কিন্তু বালকের এত আশা এত ভরসা হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইতে বসিল।

দারুণ পরিশ্রমে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে শয়নে ও অর্দ্ধাশনে একদিন রাত্রে কাঙ্গালীর ভয়ানক জ্বর হইল। একদিন পরেই বিকার এবং তাহাতেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল; দুঃখের বিষয় শ্যামাচরণ বাবু ও তাঁহার পত্নী চিকিৎসার কোনোই ব্যবস্থা

করিলেন না। বাড়িতে প্রায়ই ডাক্তার আইসেন, তাঁহাকেও কিছুই বলা হইল না। বালক বিকারের অবস্থায় বলিতে লাগিল,—"মায়ের কাছে যাব, পিসিমার কাছে যাব, আমি কোথায়? যমপুরীতে আর থাকিব না, ঐ মা ডাক্‌ছে আমাকে স্বর্গে নিয়ে চল!" ২।৩ দিন এইরূপ বিনা চিকিৎসায় কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিনে সহৃদয় কয়েকটি বালক দেখিতে আসিল দুটি বালক সমস্ত রাত জাগিয়া কাঙ্গালীর সেবা করিতে লাগিল। ডাক্তার আনা হইল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়ানো হইতে লাগিল কিন্তু কোনোই ফল হইল না। পরিশেষে কাঙ্গালীকে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ছাত্রাবাসে লইয়া যাওয়া হইল এবং অবস্থা অতীব শোচনীয় জানিয়া তাহার পিসিমাকে টেলিগ্রাম করা হইল। পিসিমা ১৭ ক্রোশ রাস্তা দুদিনে হাটিয়া আসিয়া কি দেখিলেন—যাহা দেখিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। পথশ্রম-জনিত শারীরিক কষ্টে ও মানসিক উত্তেজনায় বৃদ্ধা অচৈতন্য হইল। এদিকে অতি কষ্টেও কাঙ্গালীর জ্ঞানসঞ্চার হইল না। চার দিনের রাত্রি শেষে অনাথ কাঙ্গালী মাতৃসকাশে চলিয়া গেল। ত্রিরাত্রি জাগিয়া দুইটি সহপাঠী তাহার সেবা করিয়াছিল, তাহারা কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু ও প্রধান শিক্ষক রুমালে চক্ষু মুছিলেন। হায়, কাঙ্গালী তুমি বাঁচিলে কি মরিলে আমরা বুঝিলাম না।

"পরান্নভোজী পরাশশায়ী যজ্জীবনং
তন্মরণং যন্মরণং সোস্য বিশ্রামঃ।"

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

সন্ন্যাসী

—:*:—

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

অবিনাশ বাবুর চিন্তার ফলে একদিন সকালবেলা, কোথা হইতে এক জাল হরিপদ আসিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল। অবিনাশ বাবু তখনই পাড়াময় প্রচার করিয়া দিলেন যে, হরিপদ ফিরিয়া আসিয়াছে। পাড়ার অনেকেই তাহাকে দেখিতে আসিল—তাহার চেহারাটা আসল হরিপদর সহিত এতই

মিলিল যে, সকলে তাহাকে হরিপদ বলিয়াই চিনিল। সেইদিন অপরাহ্নে অবিনাশ বাবু পাড়ার কয়েকটি ভদ্রলোকের সহিত হরিপদকে লইয়া ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার দলিলের সর্ত্তানুযায়ী হরিপদকে বাটীখানি ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিল।

মাথায় যদি হঠাৎ আকাশখানা ভাঙিয়া পড়ে, তাহা হইলে লোকে যেমন বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠে; সম্মুখে আজ হরিপদকে দেখিয়া ডাক্তার ততোধিক বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই সে আপনাকে সংযত করিয়া সহজ ও সরলভাবে অবিনাশ বাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল,— "তা বেশ বসুন, ওরে মালী বাবুদের তামাক দে।"

অবিনাশ বাবু কহিলেন,—"তা হলে লেখাপড়াটা আজই হয়ে যাক, আমাদের সঙ্গে এই উকীল আছেন—রেজেষ্টারিটা না হয় কাল হবে, কি বলেন?"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ইনি যদি প্রকৃতই হরিপদ হন তবে এ বাড়ি আমি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি; তবে আমি যখন হরিপদকে চিনি না—তখন আমার বিবেচনায় এ কার্য্য আদালত থেকে নিষ্পত্তি হওয়াই দরকার—কারণ হয়ত দুমাস ছ'মাস পরে আবার একজন হরিপদ এসে এই বাড়ির দাবী করতে পারে।"

"আমরা এতগুলো লোকে সাক্ষী দিচ্চি ইনি সেই হরিপদ আর দ্বিতীয় হরিপদ নেই, তবু কি আপনার বিশ্বাস হয় না?"

"আপনাদের কথা অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, তবে আমি ইচ্ছে করি এ কার্য্য আদালত থেকে হওয়াই ভালো।"

অবিনাশ বাবু স্বরটা চড়া করিয়া কহিলেন,—"আপনি তা হলে অমনি দিচ্চেন না—হরিপদকে নালিস করে বাড়ি আদায় করতে হবে—এই কি আপনার অভিপ্রায়?"

ডাক্তার ঠিক সেইরূপ চড়া গলায় কহিল,— "হাঁ। আমার অভিপ্রায় তাই বটে!"

অবিনাশ বাবু বিরক্তির সহিত কহিলেন,—"কলিকাল কিনা—ওঠহে সব ওঠ আর এখানে তামাক খেয়ে কাজ নেই। দেখলে তো সব—টাকার লোভ বড় লোভ। ছুঁচ হয়ে সেঁধিয়ে ছিলেন, এখন ফাল হয়ে বেরুতে চান।" পরে হরিপদকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"দেখলে তো হরিপদ ব্যাভারটা দেখলে—এখন চল—নালিস করতেই হবে।"

এই সময় হরিপদ ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,— "আপনি আমার মাকে কাশীতে রেখে এসেছেন শুনলুম—তিনি কাশীতে যেথায় আছেন সেই ঠিকানাটা যদি দয়া করে দেন, তা হলে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

ডাক্তার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিপদর মুখের পানে চাহিল, পরে গম্ভীর-ভাবে কহিল,—"অবশ্য দেবো—কিন্তু এখন নয়—আপনি আগে আদালত থেকে হরিপদ বলে সাব্যস্থ হউন—তখন আমিই আপনাকে সঙ্গে করে আপনার মাতার কাছে নিয়ে যাব। এতদিন আপ।ন ছিলেন কোথায় ?"

হরিপদ সুরটা একটু কড়া করিয়া কহিল,—"এতদিন আমি ছিলুম কোথায় সে কথা আর এখন আপনাকে বলবার বিশেষ আবশ্যক দেখি না। আদালতেই সেটা জানতে পারবেন।"

ডাক্তার সেই সুরে সুর মিলাইয়া কহিল,— "সেই ভালো।"

সকলে উঠিয়া গেল—মালি বেচারা তামাক সাজিয়া আনিয়াছিল সে হুকা হস্তে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যথা সময়ে কেস্‌টি আদালতে আসিয়া গড়াইল।

হরিপদর জবানবন্দিতে এইরূপ প্রকাশ পাইল—তাহার নাম হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সে রেঙ্গুনের টেলিগ্রাম আপিসে চাকরি করিত। স্ত্রীপুত্র লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতে যাইতে পথে একটা প্রচণ্ড বাত্যায় জাহাজখানি জলমগ্ন হয়। তাহার স্ত্রীপুত্র ডুবিয়া যায়, সে বহু কষ্টে একখানি কাষ্ঠ-ফলক ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়—পথে একখানি জাপানের জাহাজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লয়। সেই জাহাজে জাপানের এক সোপ Factoryর manager ছিলেন। তিনি হরিপদর সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া নিজ আবাসে লইয়া যান ও সাবানের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করেন। এখন সে সাবানের কার্য্য উত্তমরূপে শিখিয়াছে। এখন সে একটি সাবানের Factory খুলিবার মতলবে দেশে আসিয়াছে।

ডাক্তার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া কহিল,— "যিনি এখন আপনাকে হরিপদ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তিনি জাল হরিপদ। আমারই নাম হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাকে এখন সকলে ডাক্তার বোনার্জি বলে জানে। আমি বর্ম্মার টেলিগ্রাম ডিপার্টমেণ্টে Construction timeএ চাকরি করতুম, আমার হেড্ আপিস ছিল মাইমোতে। আমি স্ত্রীপুত্র নিয়ে কর্ম্মস্থলে যাবার জন্যে রওনা হই—কিন্তু পথে কলেরায় তারা উভয়েই মারা যায়। আমার মনের অবস্থা

নিতান্ত খারাপ থাকায় আমি কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরে বেড়াই, পরে বিলাতে গিয়ে ডাক্তারি শিখতে থাকি—ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে এসেছি। ফিরে এসে প্রথমেই আমার এক মাসীর বাড়িতে আমার মা ঠাকরুণকে দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন এ অবস্থায় তাঁকে আমার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে আর ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য আপনাকে গোপন করে তাঁর ইচ্ছামত হরিপদ ফিরে এলে তাকে বাড়িখানি প্রত্যর্পণ করবো এই সূত্রে লেখাপড়া হয়ে যায়। মনে জানতুম দ্বিতীয় হরিপদর অস্তিত্ব অসম্ভব। এখন দেখচি আমারই ভুল, এখন দেখচি মানুষও জাল হতে পারে। তারপর মা ঠাকরুণের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কাশীতে রেখে এসেছি। যতদিন তিনি বাঁচবেন যাতে তাঁর কোনো কষ্ট না হয় তার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছি—আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁকে দেখে আসি। আর এখানকার লোকেরা যখন আমার বিলাতি পোষাক—গালে এত বড় একটা কাটা দাগ (যা পূর্ব্বে ছিল না) আর এই গোঁপ দাড়ী দেখে চিনতে পারলে না তখন আমি আত্ম-পরিচয় দিয়ে আপনাকে আর খেলো করতে ইচ্ছে করি নি।”

হরিপদর কথাতে যাহারা সাক্ষীরূপে আসিয়াছিল তাহারা সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। কিন্তু অবিনাশ বাবুর ইঙ্গিতে প্রায় সকলেই জাল হরিপদকে আসল হরিপদ বলিয়া identify করিল।

পাড়ার লোকে যাহাকে চিনিল সেই আসল হরিপদ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বিচারক মহাশয় তাহাকে বাটী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ডাক্তারের উপর হুকুম-জারী করিলেন।

কিন্তু আপিলে সমস্তই উল্টাইয়া গেল। জজ সাহেব বর্ম্মা হইতে উভয় হরিপদর Service Book তলব করিলেন। হরিপদ ওরফে ডাক্তারের Service Book আসিয়া পৌঁছিল—কিন্তু নবাগত হরিপদর Service Book আসিল না—কিন্তু একখানি চিঠি আসিল—তাহাতে লেখা ছিল হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এখানে কেহ ছিল না।

Service Bookএ হরিপদর thumb impression ছিল। এখন উভয়ের thumb impression লইয়া expert দ্বারা পরীক্ষা করানো হইল। ইহাতেই স্থির হইল ডাক্তারই প্রকৃত হরিপদ এবং নবাগত হরিপদটি জাল।

জজ সাহেব জাল হরিপদকে সশ্রম সাত বৎসর কারাবাসের হুকুম দিয়া

বলিয়াছেন যদি সে তাঁহার সমস্ত দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে তিনি দণ্ডাজ্ঞা কিছু লাঘব করিতে পারেন। ইহাতে আসামী জজ সাহেবের প্রতি চাহিয়া যুক্তকরে কহিল,—"হুজুর আমি সম্পূর্ণ দোষী। আমার আসল নাম সীতানাথ ঘোষ, বাড়ি সোনাপুর। অবিনাশবাবুর ষড়যন্ত্রে পড়ে' আজ আমার এই দশা হয়েছে। আমি যা কিছু বলেছি সমস্তই অবিনাশ বাবুর রচিত কথা। তিনি আমাকে বলেছিলেন যদি বাড়িখানা আদায় করতে পারা যায়, তাহলে আমাকে নগদ হাজার টাকা দেবেন বাড়িটা অবশ্য আমি তাঁকে সাফ বিক্রি কবলা লিখে দেবো, এই রকম কথা ছিল। আমি অবশ্য প্রথমে রাজি হই নি; আমাকে অনেক লোভ দেখিয়ে রাজী করেছে, বলেছিল হরিপদ মরে ভূত হয়ে গেছে; এখন আমি একবার গিয়ে দাঁড়ালেই বাড়িখানা পাওয়া যাবে। আর এই মোকদ্দমার খরচ হুজুর এক পয়সাও আমার নয়, সব অবিনাশবাবুর। আমি শুধু হুজুর টাকার লোভে এই কাজ করেছি।

এই স্বীকারোক্তিতে জজ সাহেব দয়া করিয়া দণ্ডাজ্ঞা এক বৎসর কমাইয়া দিলেন।

এডিং এবং অ্যাবেটিংএর চার্জ্জ দিয়া অবিনাশ বাবুকে গ্রেফতার করা হইল, এবং বিচারে তাঁহার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

মানুষের শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে, মানুষ যেমন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, তেমনি মনের উপর চিন্তার গুরুভার পাষাণ চাপাইলে, মনও ব্যথিত হইয়া পড়ে এবং সহসা কর্ত্তব্য স্থির করিতে অক্ষম হয়। চিন্তার সহস্র তাড়নায় হরিপদ সহসা কর্ত্তব্য স্থির করিতে অক্ষম হইয়া কমলাকে তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া হরদেবপুরে নামিয়া পড়িল। সে ভাবিয়াছিল, এইখানে বসিয়া একটু মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া লইবে কি তাহার করা উচিত। চিন্তাক্লিষ্ট হরিপদ হরদেবপুরের মাঠ হইতে একটা সোজা রাস্তা ধরিয়া পাগলের ন্যায় একমনে চলিতে লাগিল, কোনো দিকে দৃকপাত নাই, সে রাস্তার অন্ত নাই, কোথা সে যাইতেছে, তাহা জানে না; ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া চিন্তার তাড়নায় সে বরাবর চলিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন সূর্য্য যখন তাহাকে অগ্নিবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিল তখন তাহার চৈতন্য হইল। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সে ছায়াশীতল বটবৃক্ষের তলে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বটবৃক্ষের শীতল সমীরণে

তাহার ক্লান্তি দূর হইল—মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হইয়া আসিল—ক্রমে সে সেইখানে তৃণ-শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। হরিপদ যখন উঠিয়া বসিল তখন তাহার কর্ত্তব্য ঠিক হইয়া গিয়াছে, মনের সহিত শত দ্বন্দ্ব করিয়া সে স্থির করিয়াছে, কমলাকে এমন ভাবে ভাসাইয়া দিয়া সে চলিয়া যাইতে পারিবে না। তাহার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, সে তাহাকে লইয়া বর্ম্মায় চলিয়া যাইবে আর দেশে ফিরিবে না।

হরিপদ উঠিল। যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিল। যখন সে হরদেবপুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সান্ধ্য গগনে একটি দুটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতেছিল। হরিপদ একটি দোকানে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। পরে ঘাটে আসিয়া গোপালপুরে যাইবার জন্য নৌকার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু ঘাটে তখন একখানিও নৌকা ছিল না। কাজেই হরিপদ এক চটিতে আশ্রয় লইয়া চেটায়ের উপর শুইয়া রাত কাটাইতে বাধ্য হইল। হরদেবপুর হইতে গোপালপুর তিন ক্রোশ তফাতে। হরিপদ প্রভাতে উঠিয়াই আর নৌকার অপেক্ষা না করিয়া, এই তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইবার মানসে বহির্গত হইল। বেলা আন্দাজ দশটার সময় হরিপদ কালী-মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অনুসন্ধানে শুনিল কালীমোহন বাবু বাটী বিক্রয় করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহা কেহ জানে না।

যে ভদ্র লোকটি কালী বাবুর বাটী ক্রয় করিয়াছেন, হরিপদ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কহিল,—"মহাশয় কাল এখানে কালী বাবুর ভাগ্নী তাঁর একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে এবাড়িতে এসেছিলেন কিনা বলতে পারেন ?"

ভদ্রলোকটি কহিলেন,—"কালী বাবুর ভাগ্নীকে আমি চাক্ষুস দেখি নি বটে, কিন্তু তাঁর কথা শুনেছিলুম। এক মাঝি এসে এই বাটীতে কালী বাবুর খোঁজ করছিল তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, কালী বাবু এ বাড়ি বিক্রী করে কোথায় চলে গেছেন তা কেউ বলতে পারে না।"

"তার পর" বলিয়া হরিপদ উৎসুকনয়নে ভদ্র লোকটির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

ভদ্র লোকটি কহিলেন,—"তার পর আর আমি কিছু জানি না—সম্ভবত যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন মাঝি তাঁকে সেই খানেই রেখে এসেছে।"

কথাটা হরিপদর মনে লাগিল। সে মাঝিকে খুসী করিয়াছিল—নিশ্চয়ই সে তাহাকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। হরিপদ কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক

সংবাদ না লইয়া থাকিতে পারিল না। সে তখনই একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া হরদেবপুরে ফিরিয়া আসিয়া এক চটিতে আশ্রয় লইল; এবং সেখান হইতে অর্থের সাহায্যে একটি লোক ঠিক করিয়া গুপ্তভাবে কমলার সংবাদ আনিবার জন্য বাটীতে পাঠাইয়া দিল। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—'কমলা সেখানে নাই, কেবল হরিপদর মাতা আছেন। সেখানে এইরূপ জনরব যে হরিপদ তাঁহার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কর্ম্মস্থানে চলে গেছেন।' হরিপদ মনে করিল, তবে হয়ত সে তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে—হরিপদ জানিত কমলার পিত্রালয়ে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সেখানে কাহার নিকট সে থাকিবে? হরিপদর মন তবুও সেখানে একবার অনুসন্ধানের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে সেই দিনই রওনা হইল, এবং যখন সে কমলার পিত্রালয়ে আসিয়া তাহার কোনো সন্ধানই পাইল না—তখন সে মর্ম্মাহত হইল। মনে করিল, হয়ত কমলা শিশুটি কাহাকেও বিলাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়া সংসারের উৎপীড়ন হইতে শান্তিলাভ করিয়াছে। "ভগবান্ যাহা করেন ভালোর জন্যই করেন" ইহাই সার ভাবিয়া হরিপদ উদাসপ্রাণে একদিকে উধাও হইয়া চলিয়া গেল।

দুই দিন পরে হরিপদ কলিকাতায় আসিল, এবং ব্যাঙ্ক হইতে তাহার সমস্ত টাকা তুলিয়া লইল। সেই দিন রাত্রের ট্রেনে সে কাশীর টিকিট কিনিয়া রওনা হইল। কাশীতে দুই দিবস থাকিয়া হরিপদ এলাহাবাদে আসিল—সেখান হইতে আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরিয়া দিল্লীতে আসিল—দিল্লী হইতে বম্বে যাত্রা করিল। বম্বে আসিয়া হরিপদ দেখিল উহা একটি মস্ত বাণিজ্য-প্রধান সহর—প্রত্যহ বহু সহস্র টাকার লেন-দেন হইতেছে, অনেক ধনপতির বাস। হরিপদ একটি হোটেলে আশ্রয় লইল। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা সে সমুদ্র-তটে বেড়াইতে আসিত। এখানে আসিয়া সে দেখিত কত জাহাজ বিলাতে যাইতেছে—কত জাহাজ বিলাত হইতে আসিতেছে—কত লোক উঠিতেছে কত লোক নামিতেছে—দেখিয়া দেখিয়া হরিপদর মনে বিলাত যাইবার সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল—কিন্তু বিলাত যাইবার টাকা তাহার কোথায়? যাহা তাহার নিকট আছে তাহার দ্বারা সে বিলাতে যাইতে পারে বটে, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার টাকা তাহার কোথায়! এই সময় হরিপদ ভাবিল বর্ম্মায় থাকিতে তাহার সেই প্রাণদাত্রী বন্য রমণী—যাঁহাকে সে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছিল, তিনি দয়া করিয়া যে সাতখানি প্রস্তর দিয়াছিলেন, এই সময়

তাহার একবার মূল্য নিরূপণ করা উচিত। যদি প্রস্তর কয়খানি বেচিয়া অন্তত ফিরিয়া আসিবার খরচাটাও পায় তাহা হইলে সে একবার বিলাতটা ঘুরিয়া আসে।

হরিপদ তিনখানি প্রস্তর লইয়া বম্বের প্রসিদ্ধ জহুরি দাদাভাই জিজিবাইয়ের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রস্তর কয়খানি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কত দামে প্রত্যেকখানি ক্রয় করিতে পারে? জিজিবাই প্রস্তর কয়খানি হস্তে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আইগ্লাস দিয়া নানা রূপে পরীক্ষা করিয়া কহিল, "এগুলি ঝুটো আছে বাবু—এই তিনখানির দাম তিন দশ ত্রিশ টাকা।" কিন্তু জিজিবাই মনে মনে বুঝিল উহার মূল্য অনেক। ঐ শ্রেণীর অতবড় পাথর বাজারে দুর্লভ। ত্রিশ টাকা দাম শুনিয়া হরিপদর মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। অপর পাশে বসিয়া অন্য একজন জহুরি জহরত বাছিতেছিল। পাথরের দাম ত্রিশ টাকা শুনিয়া সে একবার চোখ ফিরাইয়া পাথর কয়খানি দেখিয়া লইল।

হরিপদ পাথর কয়খানি কাগজে মুড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া জিজিবাই কহিল—"আপনি এখানে থাকেন কোথায়? কত হ'লে আপনি পাথর ক'খানা ছাড়তে পারেন?"

হরিপদ কহিল—"আমি থাকি—নং কালবাদেবী রোডে—পাঁচ দোকান দেখে যে দর উঠ্‌বে সেই দরেই দেবো।"

জিজিবাই কহিল—"অন্য দোকানে যে দর পাবেন আমার দর তার চেয়ে দশ টাকা বেশী রইল—আমাকে না বলে পাথর ক'টা বেচবেন না।"

"তাই হবে" বলিয়া হরিপদ বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ত্রিশ টাকা, না হয়, চল্লিশ টাকা, না হয় বড় জোর পঞ্চাশ টাকা দাম উঠিতে পারে, তার জন্য এই দুপুর রৌদ্রে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়ানো সঙ্গত নয়। সে একখানা গাড়ি লইয়া বরাবর তাহার হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অপরাহ্নে যে জহুরিটি জিজিবাইয়ের দোকানে এক পাশে বসিয়া জহরত বাছিতেছিল, সে আসিয়া হরিপদর সহিত দেখা করিল এবং পাথর তিনখানি দেখিয়া কহিল—"দেখুন বাবু সাহেব, আমি বুড়া হয়েছি আমার এক কথা—আমি পাথর তিনখানি নয় হাজার টাকায় নিতে পারি।" ত্রিশ টাকা হইতে নয় হাজার টাকা—হরিপদ অবাক হইয়া গেল—তাহার মনে হইতে লাগিল এখনই ছাড়িয়া দেয়—কিন্তু মনকে দমন করিয়া সে কহিল—"আচ্ছা আর দু'একদিন দেখি কি রকম দর পাওয়া যায়, তার পর বিবেচনা করব।"

বৃদ্ধ জহুরিটি কহিল,—"দেখুন বাবু সাহেব, নয় হাজার টাকায় কিনে আমাকে অনেক খরচ করতে হবে। পাথরগুলি এখন কোরা আছে ওগুলিকে ছিল্‌তে হবে, কাটাতে হবে—তবে বিক্রীর মতো দাঁড়াবে।"

হরিপদ গম্ভীর ভাবে কহিল—"এখনি তো আর বিক্রী হচ্চে না—আপনি কাল একবার খবর নেবেন।"

জহুরি হরিপদকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে জিজিবাইয়ের জুড়ী আসিয়া হরিপদর হোটেলের দরজায় দাঁড়াইল। জিজিবাই শুনিল বৃদ্ধ জহুরি পাথরগুলির নয় হাজার টাকা দাম দিয়াছে—সে অমনি বারো হাজার টাকা হাঁকিল। হরিপদ কিন্তু এবার টলিল না—সে কহিল "আজ সন্ধ্যা হয়ে এল কাল যা হয় হবে।"

যাইবার সময় জিজিবাই বলিয়া গেল,—"তাহার অপেক্ষা বেশী দর দেয় বাজারে এমন কোনো জহুরি নাই।"

ইতিমধ্যে এ সংবাদ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল—অনেক দালাল ও জহুরি আসিয়া হরিপদর সহিত দেখা করিতে লাগিল—শেষে পনেরো হাজার টাকায় পাথর কয়টি বিক্রয় হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল বিলাতে পাঠাইলে পাথর কয়টি আরো অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত।

পর দিন হরিপদ সাহেব সাজিয়া বিলাত যাত্রা করিল।

হরিপদ বিলাতে আসিয়া বেলভেডিয়ার রোডের উপর একটা হোটেলে আশ্রয় লইল। কয়েক দিন সে লণ্ডনের নানা স্থান দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কল কারখানার নানা রূপ অবিশ্রান্ত শব্দে সহরটি দিন রাত মুখরিত। হরিপদ দেখিল এই কর্ম্মপটু সহরে, সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত, তাহার মতো বেকার কেহ নাই। ভারত, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বহু লোক এখানে আসিয়াছে—কিন্তু সকলেই শিক্ষার্থী ঘুরিয়া বেড়াইবার অবসর কাহারো নাই। হরিপদ ভাবিল যখন সে এখানে আসিয়াছে, তখন তাহাকে কিছু না কিছু শিখিতেই হইবে। প্রথমে সে ভাবিল কোনো কারখানায় থাকিয়া নূতন কিছু শিখিয়া আসিবে। ইহাতে অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হইবে বটে—কিন্তু লোকের বিশেষ উপকার হইবে না। তার পর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করিল। পাঁচ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের পর হরিপদ ডাক্তারি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল, এবং নূতন নূতন গবেষণা করিয়া কয়েকটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইল। ছাত্র

অবস্থায় হরিপদকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল—তাহার গালে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন আজীবন তাহার সাথী হইয়া থাকিবে।

মিঃ রে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে সে এক সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল। হরিপদ যখন শুনিল ম্যাডাম গ্রের বাটীতে একজন ভারতবাসী টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহার বাঁচিবার আশা কম। সেখানে তাহার আপনার কেহ নাই। হরিপদ তখনই ম্যাডাম গ্রের বাটীতে আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া নিজেই ঔষধের ব্যবস্থা করিল এবং নিজ ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্য আনাইয়া দিন রাত তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত রহিল। হরিপদর সুচিকিৎসা, অকৃত্রিম শুশ্রূষা ও অনলস পরিশ্রমের ফলে মিঃ রে অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিল, এবং হরিপদকে ভ্রাতৃত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিল। মিঃ রে সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, হরিপদ তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিল। কথা রহিল যখনই হরিপদ দেশে ফিরিবে, তখনই যেন সে তাহাদের বাটীতে আসিয়া অতিথি হয়।

মিঃ রেকে বিদায় দিয়া হরিপদ ফ্রান্সে চলিয়া আসিল, এবং সেখানে তিন বৎসর থাকিয়া ডাক্তারি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানার্জ্জন করিল, তারপর দুই বৎসর আমেরিকাতে থাকিয়া অনেক নূতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিল। এইখানে সে অস্ত্র-চিকিৎসায় নিপুণতা দেখাইয়া একটি স্বর্ণ পদক উপহার পাইল এবং অনেক যশ লাভ করিয়া ডক্টর বোনার্জি নামে অভিহিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমেই সে মিঃ রের বাটীতে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গেল। মিঃ রে, তাহার পিতা, মাতা, তাহার ভগ্নী সকলে মিলিয়া হরিপদকে অভ্যর্থনা করিল। হরিপদর আগমন-উপলক্ষ্যে সেদিন রাত্রে তাহাদের বাটীতে একটা ভোজের আয়োজন করা হইল, এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সহিত হরিপদর পরিচয় করিয়া দিল। সেই দিন হইতে হরিপদ মিঃ রের পিতা ও মাতার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রায়-পরিবারভুক্ত হইয়া গেল। কথা রহিল যতদিন না সে কলিকাতায় বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, ততদিন তাহাকে রায়-বাড়িতে থাকিতেই হইবে।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

"মা এখানে আপনি কেমন আছেন, কোনো কষ্ট হচ্চে না তো ?"

"কে বাবা তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে ?"

"আমাকে চিন্‌তে পারচেন না?"

"কি করে' চিনবো বাবা, আমার কি চোখ আছে?"

"আমি সেই ডাক্তার—যে আপনাকে এখানে রেখে গেছি।"

"ওঃ চিনেছি বাবা, এসেছ বস। আমার এখানে কোনো কষ্ট নেই, বেশ আছি। এমনি মধুর স্বরে—এমনি করে সে আমাকে মা বলে ডাকতো।" বৃদ্ধার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল—সে উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল—"ওরে আমার হরিপদ রে, আমাকে ফেলে তুই কোথা গেলি রে—একবার আয় বাছা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যা"—হরিপদর মাতার মুখের উপর দিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

হরিপদ বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিল, তাহার হৃদয় ভাঙিয়া চূরিয়া যেন শতখান হইয়া গেল—তাহার চক্ষু ফাটিয়া মুখের উপর দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এখনি যেন সে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই যে মা আমি তোমার সেই হরিপদ এসেছি বলিয়া মাতার অশ্রু মুছাইয়া দেয়। কিন্তু তাহা সে পারিল না; আপনাকে সংযত করিয়া রুমালে অশ্রু মুছিয়া আর্দ্র-কণ্ঠে কহিল,—"মা আপনি কাঁদচেন কেন—আপনার হরিপদ যে ফিরে এসেছে আমি তাকে তার বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছি—"

হরিপদর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হরিপদর মাতা অঞ্চলে মুখ মুছিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"অ্যাঃ, হরিপদ আমার ফিরে এসেছে! সে বেঁচে আছে—তাকে কেন এখানে আনলে না? সে কি আমাকে দেখ্‌তে চাইলে না? একবারও কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে না? সে কি আমাকে জন্মের মতো—" বৃদ্ধার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

হরিপদ কহিল,—"মা আপনি এত অধীর হচ্চেন কেন? হরিপদ আজ দু'দিন হল এসেছে—এসেই সে আপনার খবর নিয়েচে। আপনার কাছে আসবার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেচে—আমিই কেবল তাকে আসতে দিই নি।"

হরিপদর মাতা ভূমি হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলেন—"কেন বাবা কেন তুমি তাকে এখানে আনলে না?"

"তাকে আনি নি তার কারণ এই যে—এখন আন্‌লে তাকেও আপনি চিন্‌তে পারবেন না—আর সে আপনাকে এই অন্ধ অবস্থায় দেখ্‌লে তারও প্রাণে বড় কষ্ট হবে। সেই জন্যে আমি মনে করচি আর মাসখানেক পরে এসে আপনার চোখের ছানি তুলে দেবো—তত দিনে ছানি বেশ পেকে আস্‌বে। তখন আপনি

বেশ দেখতে পাবেন, সকলকে চিন্‌তে পারবেন—সেই সময় আমি হরিপদকে নিয়ে আসবো—কি বলেন ?"

"যা ভালো বোঝো তাই কর, এ চোখ কি আবার হবে বাবা ?"

"হবে বৈকি মা—ছানি তুলে দিলে আবার বেশ দেখতে পাবেন।"

"যদি বাবা বিশ্বেশ্বর দয়া করে একবার চোখ দেন, তাহলে তাকেও একবার দেখ্‌বো।"

হরিপদ আগ্রহের সহিত কহিল,—"কে সে, কাকে দেখবেন ?"

"সে কে তা জানি নে—সে একটি বামুনের মেয়ে—সে রোজ সকালে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনে—বাবার মন্দিরে নিয়ে যায়—একটু বেলা হলে এসে আমাকে রেঁধেবেড়ে খাইয়ে যায়। আহা কী তার যত্ন! সে আমাকে মা বলে ডাকে। আমি তাকে কতবার বলেছি আমার এমনি একটি বৌমা ছিল, সে আমাকে এমনই যত্ন করত। হ্যাঁগা বাছা তুমি কি আমার কেউ—অন্তত আর জন্মেও কি কেউ ছিলে ? আহা মেয়েটির বোধ হয় কেউ নেই—সে আমারি মতো অভাগিনী—সে মুখে কিছুই বলে না কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আমি আর তাকে কিছু বলি নে। আজ দুদিন হল সে আর আসে না, বোধ হয় তার কোনো অসুখ হয়ে থাক্‌বে—তুমি বাবা ডাক্তার, তাকে যদি একটু ওষুধ দিয়ে এস, তা'হলে আমার বড়ই উপকার করা হয়।"

হরিপদ কহিল,—"কোথায় সে থাকে বলুন আমি এখনি যেতে রাজি আছি।"

"তা তো জানি নে বাবা, সে কোথায় থাকে, একদিনও আমাকে বলে নি।"

"তবে আমি কোথায় যাব ?"

"তাই তো বাবা" বলিয়া বৃদ্ধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

হরিপদ ভাবিল কে সে রমণী—ভগবান্ বুঝি তাহার অন্ধ মাতাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহার হৃদয়ে এত দয়া ঢালিয়া দিয়া, তাহার মাতৃসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন—ধন্য তাঁহার মহিমা! হরিপদর হৃদয়টা এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল—সে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল। একটু পরে হরিপদ কহিল,—"দেখুন আমি কালও এখানে থাকবো—যদি তিনি আসেন—তাহলে আমি সব কথা শুনবো—যদি তাঁর কোনো সাহায্য করতে পারি। তিনি কি টাকাকড়ি চান ?

"হ্যাঁ বাবা থাকো, কাল যদি সে ভালো থাকে তাহলে নিশ্চয় আসবে। সে টাকাকড়ি বোধ হয় চায় না—একদিন 'জল খেয়ো' বলে একটি টাকা দিতে গেছলুম—সে টাকাটি ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে 'টাকায় কি হবে মা—আপনার আশীর্ব্বাদই আমার লক্ষ টাকা'।"

"তার কি ছেলেপুলে আছে?"

"তা তো জানি নে—কৈ সে কথা তো সে একদিনও বলে নি—বোধ হয় নেই।"

পরদিন হরিপদ কাশীতেই কাটাইল—কিন্তু যাহাকে দেখিবার জন্য সে সমস্ত দিন বসিয়া রহিল কৈ সে রমণীটি তো আসিল না।

হরিপদর মাতা বিশ্বেশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন। হরিপদ সেই দিন রাত্রের ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হইল। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবকগণ *

—:০:—

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে সাধারণতঃ কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত আমরা তাহাকে লালন পালন করিয়া থাকি। যদি সম্যক্ চিন্তার সহিত শিশু-চরিত্র পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে কি ইতর কি ভদ্র সকল শিশুরই চরিত্রগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে।

যখন শিশু হস্ত ও পদের সাহায্যে গৃহের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায় তখন তাহারা সম্মুখে যে সমস্ত বস্তু পায় তাহাই খাদ্যদ্রব্য বোধে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে; তখন আমাদের সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন শিশুরা ভ্রমণকালীন সম্মুখে এমন কোনও পদার্থ না পায় যাহা তাহাদের শারীরিক অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। এই অদ্ভুত স্বভাবটি আমরা ইতর ভদ্র সকল শিশুরই চরিত্রে লক্ষ্য করিয়া থাকি। আরও লক্ষ্য করিয়া থাকি যে তাহারা

* খাঁটুরা মধ্য ইংরাজী স্কুলের সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের উপদেশানুসারে উক্ত স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত। (সম্পাদক)

সকলেই সরলমতি এবং তাহাদের চরিত্রেও কোনরূপ কলঙ্ককালিমা স্পর্শ করে নাই।

কিন্তু ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে থাকে। তখন তাহাদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ শান্তপ্রকৃতি কেহ বা দুর্দ্দান্ত হইয়া থাকে—কেহ বিদ্যা ও সংশিক্ষা লাভ করিয়া কালসহকারে সংসারে একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি-মধ্যে পরিগণিত হয়, কেহ বা কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও অসৎ স্বভাবের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকে। শৈশবে যাহাদের চরিত্র ও লক্ষ্য প্রায় একই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কালে কেন তাহারা বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহার কারণানুসন্ধান করা যাউক।

আমাদের মধ্যে চাকুরী যাঁহাদের অন্ন-সংস্থানের একমাত্র ভরসাস্থল, তাঁহাদের সাধারণতঃ লক্ষ্য হইয়া থাকে যে পুত্রকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন সে কালে বড় চাকুরী করিয়া সংসারের দুঃখ দূর করিতে পারে। এইরূপ ব্যবসায়ী তাঁহার পুত্রকে ব্যবসাকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করাইতে যত্নবান হন, কৃষিজীবী তাঁহার পুত্রকে কৃষিকার্য্য শিখাইয়া থাকেন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী তাঁহার পুত্রকে নিজের পসার প্রতিপত্তি দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং চাকুরীজীবীর পুত্র চাকুরী করিবে—ব্যবসায়ীর পুত্র ব্যবসায়ী হইবে—কৃষকের পুত্র কৃষক হইবে—রজকের পুত্র তাহার জাতীয় ব্যবসা করিবে,—প্রামাণিকের পুত্র ক্ষৌরকার্য্য করিবে—ইহা আমরা সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারি। এই নিয়ম যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইবে, সে কথা বলিতেছি না—অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু তাহা অনুপাতে এত কম যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

শিশুদিগের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে উল্লিখিত যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহা সাধারণ পরিবর্ত্তন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এবং ইহা একমাত্র পিতা মাতা বা অভিভাবকগণের ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আরও গভীরভাবে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার মধ্যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয়।

আমরা দেখিতে পাই যে চরিত্রবান বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পুত্র অসচ্চরিত্র, মূর্খ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া থাকে। আবার নীচকুলোদ্ভূত

ইতরজাতির পুত্র কালসহকারে নিজের অলৌকিক শিক্ষার গুণে ভদ্র সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। এস্থলে শিক্ষা এবং তাহার অভাবই এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। অতএব আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, শিক্ষাই সকলের মূল। যে বাল্যকালে সংশিক্ষা লাভ করিয়াছে সে নীচ বংশোদ্ভূত হইলেও ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এখন দেখা যাউক সংশিক্ষা কিরূপে লাভ করা যায়।

আমরা পাঁচ কিম্বা ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান লালন পালন করিয়া তাহাকে বিদ্যালয়ে দিয়া থাকি—আমাদের সকলেরই বিশ্বাস যে বিদ্যালয়ই সৎশিক্ষা লাভের একটি প্রকৃষ্ট স্থান। পুত্র প্রত্যূষে উঠিয়া স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদির পাঠে মনোনিবেশ করিবে এবং পরে আহারাদি সমাপন করিয়া নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক নীতিশিক্ষা এবং বিদ্যালাভ করিবে এবং অপরাহ্নে এমন কোনও ক্রীড়ায় রত থাকিবে যাহাতে তাহাদের শারীরিক উন্নতিসাধন হয় এবং সন্ধ্যা হইলে পুনরায় পাঠে নিযুক্ত থাকিবে। পুত্রের এইরূপ অভ্যাস, সকল পিতামাতারই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই এইরূপ অভিলষিত পুত্রলাভ হইয়া থাকে। ইতর ভদ্র সকলেই সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির আশা করিয়া থাকেন, কিন্তু কাহারও ভাগ্যে তাহা হয় আর কাহারও ভাগ্যে তাহা হয় না। কেন এইরূপ হয়? যাঁহার চারিটি পুত্র আছে তাঁহার হয়ত একটি পুত্র কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র হইল কিন্তু অপর তিনটি ঠিক তাহার বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট হইল। এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? ইহার একমাত্র কারন কুসঙ্গ। তাহা হইলে বেশ বোঝা গেল যে, বিদালয়ে পাঠাইলেই পিতামাতা বা অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য শেষ হইল না। পুত্র যাহাদের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া কৌতুকাদি করিয়া থাকে তাহাদের চরিত্র কিরূপ তাহা রীতিমত লক্ষ্য করিতে হইবে এবং যদি পুত্র কুসঙ্গে মিশিয়াছে এরূপ সন্দেহ হয় তাহা হইলে কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা এই অভ্যাস অপরিপক্ক অবস্থায় দূরীভূত করিতে হইবে।

এক বৎসর বয়স্ক শিশু যদি স্বীয় অভ্যাসবশতঃ কোনও বিষাক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা পায় তখন পিতামাতা যেরূপ শিশুর ক্রন্দনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অঙ্গুলি-সাহায্যে সেই দ্রব্য মুখগহ্বর হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ যদি দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকও আপাত মধুর ভাবিয়া কুসঙ্গে মিশিবার প্রলোভনে পতিত হয়, তাহা হইলে বালককে অসৎ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রাণপণ যত্ন করাই সেই বালকের পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্রের

প্রতি পিতামাতা বা অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য কি তাহা একরূপ মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হইল, এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

শিক্ষকতা করিতে হইলে শিক্ষকদিগের কয়েকটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। শিক্ষকগণ সচ্চরিত্র, শান্তপ্রকৃতি ও ধৈর্য্যশীল হইলে শিক্ষকতা কার্য্যে উপযুক্ত হইতে পারেন। ভীতিপ্রদর্শন না করিয়া মিষ্ট বাক্যের দ্বারা ছাত্রদিগের ভক্তিভাজন হইয়া তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে হইবে। প্রহার করিলেই ছাত্রদিগকে শাসন করা হয় না, বরং তাহাতে অনেক সময়ে কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপভাবে শিক্ষকতা করিতে হইবে যেন ছাত্রগণ শিক্ষকের কাছে আসিতে এবং তাহার ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁহাকে জানাইতে ভীত না হয়। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া ছাত্রদিগের চরিত্রগঠনের দিকেও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের ভিতর যাহাতে চরিত্র ও বিদ্যালাভ সম্বন্ধীয় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় তৎসম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা উচিত। যে গ্রামে বালকদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যে ও সামর্থ্যে, বিদ্যায় ও সচ্চরিত্রতায় প্রতিযোগিতা নাই, সে গ্রামের উন্নতি সুদূরপরাহত। আমার বিশ্বাস যে, এই প্রতিযোগিতার অভাবই আমাদের গোবরডাঙ্গা গ্রামের এত অবনতি সাধন করিয়াছে।

এখানে যে একেবারেই প্রতিযোগিতা নাই, তাহা নহে। দুঃখের বিষয় যে এখানে প্রতিযোগিতা আছে থিয়েটারে; সেই প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষুদ্র গোবরডাঙ্গার তিনটি পার্টির অভ্যুদয়—খাঁটুরায় দুইটি—ইচ্ছাপুরে একটি। গৈপুর গ্রামটি আপাততঃ ইহাতে বঞ্চিত। এই প্রতিযোগিতায় গোবরডাঙ্গা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার বক্তব্য শেষে ছাত্রগণের পিতামাতা বা অভিভাবকগণের প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন,—যেন তাঁহারা তাঁহাদের সরলমতি বালকগণের চরিত্র এবং সঙ্গের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখেন—যেন তাঁহারা তাঁহাদের বালকগণের সহিত একসঙ্গে উপবেশন করতঃ আবদাল্লা ও মর্জ্জিনার হাবভাবপূর্ণ নৃত্যগীতে মনঃসংযোগ করিয়া তরলমতি বালকগণের হৃদয়ে তাহাদের অজ্ঞাতসারে কুশিক্ষার বীজ ধীরে ধীরে রোপণ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারপূর্ণ করিয়া না ফেলেন। যদি দেশের—ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গল চান তবে প্রত্যেক অভিভাবকের এ বিষয়ে একান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

শ্রীঅমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দাসের আত্ম-কথা

পথ-নির্ণয়

যখন ব্রহ্মমন্দিরে নির্জ্জন-বাসে মন নিবিষ্ট হইতে লাগিল, তাহার পূর্ব্বে একটি ঘটনা হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই ঘটনাটি আমার আধ্যাত্মিক জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এবং তাহা অত্যন্ত অলৌকিক। কিন্তু যেদিন সে ঘটনা ঘটে, সেদিন সেসময়ে তাহার গুরুত্ব আমি কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারি নাই। বাহ্যিক ঘটনার সঙ্গে যেটি মনরাজ্যের বিষয়, সেটি অল্পক্ষণেই মনের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তারপর কতদিন পরে মন্দিরে বাসকালীন যখন মনের শান্তভাব স্থায়ী হইতে লাগিল, এবং পুনরায় অবস্থারও সমতা ঘটিল, তখন সেই স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

আজ আমার প্রাণের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম বিষয়—অতি নিগূঢ় হৃদয়ের গোপনীয় কথা, অথচ যাহা সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়া সমস্ত জীবনকালব্যাপী বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিতে চাই; যেমন সতী পতির পরিচয়েই গৌরবিনী অথচ পতির নাম মুখে আনিতে সঙ্কোচ বোধ করেন এ আমার তেমনই কথা। সে কথাটি পরে বলিতেছি।

আমি যখন ঈশাচরিত এবং বাইবেল, মহম্মদচরিত, গৌরাঙ্গচরিত, বুদ্ধদেব-চরিত প্রভৃতি পাঠ করিয়া সাধু মহাপুরুষগণের ধর্ম্ম-বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম, তখন আমার মনে হইল, তবে কোন্ ধর্ম্ম সত্য; প্রথম হইতে আমার মনের ধারণা, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। তবে ধর্ম্মের এত মত, এত পথ হইল কেন? যাহা হউক আমার অন্তর যে ধর্ম্ম চাহিতেছে তাহা একমাত্র ঈশ্বরের পথ হওয়া চাই; সে পথ, সে প্রণালী কিসে পাই। সময়ে সময়ে মনে হইতে লাগিল, ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই এক ঈশ্বরের সাধন-পথ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে দিন, "যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় কামনা।" এই গান শুনিয়া বিষয়কর্ম্ম ত্যাগের একটি নিশ্চিত আদর্শ লাভ করি, তারপর মধ্যে মধ্যে রবিবারের উপাসনায় যাইতাম। তখন প্রায় সর্ব্বদাই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিতেন; সে বাংলা ১২৯৩, ইংরাজী ১৮৮৫।৮৬ সালের কথা। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ অতিশয় প্রাণস্পর্শী হইত।

আর একটি কথা আমার স্বভাবত মনে হইত, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন

হইবে না কেন? এ সংসার কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়? কিন্তু দেখা যায় এবং মানুষ বলে, "সংসারে ধর্ম্ম হয় না"; ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সংসারের বাহিরে যাইতে হইবে। আমি ভাবিতাম হিন্দুসমাজে এমন একটি পরিবার দেখি না যেখানে অশান্তি নাই। আর যদি শতের মধ্যে এক, কি হাজারে দুইটি কোথাও থাকে তাতে কি? আমি এমন ধর্ম্মাদর্শ চাই যাহার মূল ভিত্তি ঈশ্বর-প্রেমের উপর পরিবার গঠিত, এমন ধর্ম্ম-সমাজ চাই। এ কথাটি ক্রমে আমি অতি পরিষ্কাররূপেই অনুভব করিলাম।

তার পর দেখিলাম, খৃষ্টীয় সমাজের পারিবারিক গঠন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলে মিলিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের বন্দনা প্রার্থনা, সদুপদেশ হৃদয়ে ধারণা করিয়া নর-সেবার ভাবে সমস্ত দিনের কার্য্য করা হয়। বালক বালিকাদিগকে শিশু কাল হইতে সুশিক্ষা এবং ধর্ম্মভাবে গঠিত করার ব্যবস্থা সুন্দর। বাঃ, এ তো চমৎকার প্রণালী!—কিন্তু হইলে কি হইবে খৃষ্টীয় মত-বিশ্বাস তো কখনই গ্রহণ করিতে পারিব না। খৃষ্টের জন্মবৃত্তান্তে (কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরের ইচ্ছায়) বিশ্বাস করিতে পারিব না। তাহা যদি পারিতাম তবে আমার হিন্দুধর্ম্মে দ্রোণ-(ডোঙ্গা) মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম এবং তদ্রূপ রাশি রাশি অস্বাভাবিক ঘটনায় অবিশ্বাস করিলাম কেন? জানি না, ঈশ্বরের কোন্ করুণায় প্রথম হইতে এমন এক বিজ্ঞানঘন দৃষ্টি কোথা হইতে পাইলাম যে, বেদ হউক বাইবেল হউক, যত বড় ধর্ম্ম, যত বড় শাস্ত্র হউক, অস্বাভাবিক অনৈসর্গিক অবৈজ্ঞানিক কোনো ঘটনাই সত্য নহে, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিলাম। এই দৃষ্টির দ্বারা সমস্ত কুসংস্কার যেন আমার নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

যাহা হউক এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে কতদিন কাটিয়া গেল। শেষে এক সময় যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ঈশ্বরের সাধন পথ বলিয়া অল্পে অল্পে বুঝিতে লাগিলাম, তার সঙ্গে আমার আবার সেই পূর্ব্ব স্মৃতিটিও জাগিয়া উঠিল। দেখিলাম ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপরই ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক ধর্ম্মের ভিত্তি। এখানে ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করিয়া সংসারযাত্রা, সমস্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা। এখানেও স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা মিলিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা হয়; বালকবালিকার ধর্ম্ম-নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নরনারী মাত্রেই শিক্ষিত ও শিক্ষিতা। খৃষ্ট-সমাজে যেমন খৃষ্টের নামে প্রার্থনা, এখানে তেমনি একমাত্র ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা হয়। এখানে যেমন জ্ঞান ও ভক্তির স্থান আছে; তেমনি প্রেম ও স্বাধীনতারও

স্থান আছে। তখন আমার মনে হইতে লাগিল ইহাই সার্ব্বভৌমিক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, আর সকল ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—এক একটি মানুষের নামে কল্পিত। অবশ্য তাঁহারা মহাপুরুষ, কিন্তু তাঁহারা কাহার নাম কীর্ত্তন করিতেন, কাহার কথা বলিতেন? তাঁহারা কি আত্ম-পূজা প্রচার করিয়াছিলেন? খৃষ্ট কি কোথাও বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার নামে উপাসনা করিবে? গৌরাঙ্গ কি বলিয়াছিলেন, তোমরা আমাকেই হরির আসনে বসাইবে? আমি যাহা বিশ্বাস করিতে চাই, তাহা আমার বিশ্বাসে একেবারে নিরেট হওয়া চাই। তার মধ্যে একবিন্দু 'অতএব' 'যেহেতু'র স্থান থাকিতে পারিবে না।

যখন একদিকে মনের অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আমার প্রাণের টান যেন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যাহাতে সমস্ত জীবনটা একেবারে দিয়া ফেলি এমন একটা কিছু যেন তখনো পাই নাই। মধ্যে মধ্যে একটু খালি খালি বোধ হইত।

এইরূপ সময়ে একদিন কলিকাতার মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলাম। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, ভিতরে লোক প্রবেশ করিতেছে। উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন যে রবিবার কিম্বা এই মন্দিরে উপাসনায় আসিব, এমন কথা ইতিপূর্ব্বে আমি ভাবিয়া এ পথে আসিয়াছিলাম কিনা তাহা আমার ঠিক স্মরণ হয় না; তবে এ কথা অনেকটা স্মরণ হয়, যেন ইহার পূর্ব্বে আর কোনো দিন আমি এ মন্দিরে আসি নাই। যাহা হউক আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপাসনায় যোগদান করিলাম। অবশ্য বলা বাহুল্য উপাসনা খুবই ভালো লাগিল। তবে ভিতরকার গভীর মর্ম্মার্থসকল কতদূর বুঝিলাম তাহা জানি না। এ কথা যে কেবল আমার জন্য বলিতেছি তাহা নহে। কারণ দেখি, ব্রাহ্মসমাজে শত শত লোক আসেন, কিন্তু উপাসনার গভীর অর্থ কয়জনে বুঝেন? অধিকাংশেই মনে করেন, "কথাগুলি মন্দ নয়।" আধ্যাত্মিক ভক্তি বিশ্বাসের প্রাণ ভিন্ন আসল কথা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক সাধারণ ভাবে আমারও সেদিন সেই অবস্থা বটে, কিন্তু বিশেষভাবে আমার সেই দিন ধর্ম্মজীবনের এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভ দিন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সেদিন বেদীতে আচার্য্যের কার্য্য যিনি করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। পরে যখন প্রচারকবৃন্দকে চিনিয়াছিলাম, তদনুসারে মনে হয় ত্রৈলোক্য বাবু হইবেন। যাহা হউক এখানে আর একটি

কথা বলা আবশ্যক যে, আমি কেশবচন্দ্রের জীবিত মূর্ত্তি কখনো দেখিয়াছিলাম বলিয়া আমার কিছুমাত্র স্মরণ হয় না ; তবে ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার উপাসনা-রত পরম সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তির ছবিমাত্র আমি দেখিয়াছিলাম।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

আমি উপাসনা-কালীন অন্তর-চক্ষে দেখিলাম, কেশবচন্দ্র বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন। সমস্ত উপাসনার মধ্যে আমার অন্তরে এইরূপ একটি বাণী ফুটিয়া উঠিল, "তুমি এই মহাপুরুষের অনুসরণ কর, বর্ত্তমান সময়ে ইঁহার জীবনে ধর্ম্ম-সমন্বয় হইয়াছে, তুমি ধর্ম্ম-জগতে যাহা খুঁজিতেছ তাহা, ইঁহারই মধ্যে

পাইবে।”” উপাসনা ভাঙিয়া গেল। মন্দির হইতে চলিয়া আসিলাম, ঐ বাণীও অন্তরে যেন বিলীন হইয়া গেল। তার পর কত দিন পরে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে থাকিতে থাকিতে ঐ দিনের কথা অন্তরে জাগিয়া উঠিল।

তারপর কত পরীক্ষায় পড়িয়া কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে কত কথা শুনিয়াছি; কুচবিহার বিবাহের নিন্দাবাদ কতই শুনিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভাবও বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে সত্য তথ্য লাভ করিবার সুযোগ সহজে ঘটিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার আগাগোড়া জীবন-সাক্ষী-সহচর, অনুগত বিশ্বাসী, তন্মধ্যে এখন যিনি কেশবচন্দ্রে অন্ধ বিশ্বাসী নন—অতন্ত্র বিবেকী, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ স্বাধীনচেতা তেজস্বী ধার্ম্মিক পুরুষ তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াছি—যিনি স্বচক্ষে কুচবিহারের ঘটনা দেখিয়া বিবেক-বিচার এবং ভক্তি-বিশ্বাসের দিক দিয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া যেসকল বিষয় বুঝিয়াছিলেন, আমি তাঁহার মুখের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। তা ছাড়া নিজ অন্তরের বিশ্বাস, আলৌকিক বাণী এ সকল বিচারও যে আমাকে প্রয়োগ করিতে না হইয়াছে তাহা নহে। অথচ আর আর সকল বিষয়ে কেশবচন্দ্রকে আমি মানুষ বলিয়াই বিশ্বাস করি, কিন্তু ঐ যে বাণী যাহা প্রাণের মধ্যে চিরদিন ঝঙ্কার করিতেছে—“ইনিই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম-সমন্বয়কারী মহাপুরুষ।” ঐ যে সৌম্য মূর্ত্তি যাহা প্রাণে চিরমুদ্রিত। আমি নিশ্চয় জানি সেই মহাপুরুষের আদর্শ কিছুই আমি জীবনে আনিতে পারিলাম না, আমি তাঁহার হীন শিষ্য, কিন্তু একলব্য যেমন দ্রোণ ছাড়া আর কাহারো দোহাই দিতে পারেন নাই, আমার প্রাণেও তেমনি গুরুর আসন আর কাহারো নাই। কেশব-মন্ত্র সর্ব্বগ্রাসী হইয়া গিয়াছে। তাই আজ মুক্ত আকাশের পাখীর ন্যায় নিরালম্ব যোগে এ প্রাণ একটু একটু উড়িতে শিখিয়াছে। সকল সাধু সকল শাস্ত্র সকল ধর্ম্ম এক হইয়া নব ধর্ম্মের নব আদর্শ প্রাণে চির মুদ্রিত হইয়াছে। আশা ছিল আমার প্রিয় জন্মভূমিকে এই ধর্ম্মের সুসমাচার শুনাইয়া যদি দশ জনের প্রাণেও এই আশ্চর্য্য জ্ঞান-বিশ্বাসের আস্বাদ দান করিতে পারি, তবেই আমার মৃত্যুতে সুখ হইবে। কিন্তু দয়ালের এই আদেশ যথাসাধ্য পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া সমস্ত জীবন পাত করিলাম; এখন ফলদাতার হাতেই শেষ ফল দিয়া তবু হৃদয়ের বিশ্বাস লইয়া ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিতে পারিব।

গোবরডাঙ্গা

যমুনাকূলের মত জগতে কোথায় আর
সৌহার্দ্দের চিত্র আছে সুপবিত্র চমৎকার ?
সেই স্মৃতি জাগাইয়া হে গোবরডাঙ্গা তুমি
হ'য়েছিলে কি অপূর্ব্ব সখ্যের বিলাসভূমি !
তোমার যমুনাবাহু বাড়ায়ে, বেড়েছ সুখে
অদূরে সে চৌবেড়িয়া দীনধাম যার বুকে ;
তেমনি সাদরে তব সারদাপ্রসন্ন ধন
দিয়াছিল সে দীনেরে তার হৈম আলিঙ্গন ।
হৃদিময় যে তড়িতে মিলেছিল দুইজনে,
বেঁধেছিল তাহা বুঝি জীবন-মরণ-সনে !
তাই সে মুমূর্ষু-আঁখি ছিল সখা-পথ চেয়ে,
জীবন ভাসিয়াছিল ক্ষণেক মরণে বেয়ে !
প্রসন্ন-অন্তিম ছিল দীনবন্ধু-প্রতীক্ষায়,
অন্তিমে প্রসন্ন হ'ল নিরখি সে মুখ হায় !
কাল ছায়া উজলিয়া ফুটিয়া উঠিল হাসি,
মুমূর্ষুর মগ্ন আঁখি হর্ষনীরে গেল ভাসি !
অশান্তির সে স্পন্দন ক্ষান্ত হ'ল সেই বুকে,
সখা-করে কর রাখি' চিরনিদ্রা গেল সুখে !
মরণে সন্তাপহরা এ সখ্য কি দিব্য ধন,
জীবনের অস্তাচলে বিন্যস্ত সুবর্ণ ঘন । *

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ।

---

* দীনবন্ধু তাঁহার বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো প্রহসন যে বিখ্যাত ভূস্বামী সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসস্থান যমুনা নামক নদী-তীরস্থ গোবরডাঙ্গা। দীনবন্ধুর জন্মস্থান গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী যমুনা-তীরস্থ চৌবেড়িয়া । এইজন্য বাল্য হইতেই উভয়ের বন্ধুত্ব হইয়াছিল । এই সখ্য এতই প্রগাঢ় ছিল, যে সারদাপ্রসন্ন যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন মৃত্যুকালে একবার দীনবন্ধুকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু সংবাদ পাইয়া প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বড়ই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের অল্পকাল পরেই সারদাপ্রসন্নের মৃত্যু হইল। সারদাপ্রসন্নের আত্মীয়েরা বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণ যেন দীনবন্ধুর সহিত শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্যই বিলম্ব করিতেছিল । (লেখক)

ফল বৃক্ষের অবনতি

ইদানীং প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে আম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষে আর পূর্ব্বের মত ফল হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এত অলসস্বভাব যে ইহার একটা দৈব কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই সন্তুষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ প্রবীণগণ বলিবেন যে, এই কলিকালে পাপের মাত্রা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, লোকের ভোগ ততই কমিয়া আসিতেছে, তাহাতেই বসুন্ধরা এখন আর পূর্ব্ববৎ ফল প্রসব করে না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, জল বায়ুর পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ। ঋতু-বিপর্য্যয়ে কোনো কোনো বৎসর অধিক ফল হয়, কোনো কোনো বৎসর কম ফল হয়। এইরূপ আবহমান কালই হইয়া থাকে এবং হইবেও, ইহার উপর কাহারো কোনো হাত নাই। ইহা ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত কার্য্য। কিন্তু বিশেষ চিন্তার কথা এই যে, আব হাওয়ার অবস্থা অনুকূল থাকিলেও অনেক সময় বৃক্ষদিগকে উপযুক্ত ফল প্রসবে বিরত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কি সত্য সত্যই মনুষ্যের পাপের জন্য তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া এইপ্রকার উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছে ? আমাদের বিবেচনায় কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে, কর্ত্তব্য অবহেলায় যদি পাপ হয়, তবে এই পাপের জন্য বৃক্ষাদির এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

উদ্যানস্বামীগণ কেবল বৃক্ষের নিকট ফল চাহেন, কিন্তু তাহাদিগকে যে আহার দিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, বৃক্ষ রোপণ করিলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাতে ফল ফলিবেই। তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে তাঁহারা নিজের অদৃষ্টের দোষ দিতেও ছাড়েন না ; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের ফল বলেন, তাঁহারাই সত্য কথা বলেন।

যদি সারবান জমিতে গাছ বসানো হয় তবে ৮।১০ বৎসর মন্দ ফল ফলে না, তৎপরেই কিন্তু গাছগুলিকে অকালে বৃদ্ধ হইতে দেখা যায় এবং তাহাতে ফল আর ভাল হয় না। তজ্জন্য বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা আবশ্যক। ফল নিঃশেষ হইয়া গেলে বর্ষায় আইল বাঁধিয়া দিয়া জল খাওয়াইতে হইবে, আশ্বিন কি কার্ত্তিক মাসে গোড়া কোপাইয়া তাহাতে সার ও নূতন মাটি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চারি পাঁচ ঝুড়ি পুরাতন পাঁকমাটি, দুই তিন ঝুড়ি পুরাতন গোময়, অর্দ্ধসের অস্থিচূর্ণ প্রতি বৎসর প্রত্যেক ফলবান ১০ বৎসর বয়স্ক বৃক্ষের উপযুক্ত আহার বলিয়া বিবেচিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে কত অত্যধিক মূল্যের রাসায়নিক

সার ব্যবহৃত হয়, ফলও তদ্রূপ হয়, ব্যয় অপেক্ষা আয় নিশ্চয় অনেক অধিক হয়, আমরা স্থূল কথা এই বুঝাইতে চাই যে, ফলের আশা করিতে হইলে বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা করা একান্ত আবশ্যক। আম, লিচু, জাম, জামরুলাদি যে গাছই হউক না কেন, তাহা প্রতিবৎসর ছাঁটা আবশ্যক পুরাতন ডালপালা কতক কতক ছাঁটিয়া বাদ না দিলে, শুকনো ডালগুলি সযত্নে ছাঁটিয়া না ফেলিলে তাহাতে ফল ফলিবে কি প্রকারে? কোনো কোনো গাছের পুরাতন ডাল একেবারে বাদ দিতে হয়। আতা, কুল, নেবু প্রভৃতি জাতীয় গাছের পুরাতন ডাল কাটিয়া ফেলিবার পর, তাহা হইতে যে নূতন ডাল বাহির হয় তাহাতেই বৃহৎ, সরস ও সুমিষ্ট ফল প্রদান করে, আম, লিচু বৃক্ষও প্রতিবৎসর অল্প বিস্তর ছাঁটা আবশ্যক। এই সমস্তের প্রতি যত্ন ও লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ফলাকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশী হইলে চলিবে কেন?

বঙ্গদেশে শীতকালের শেষে প্রায় অধিকাংশ ফল বৃক্ষেরই মুকুলোদগম হয়, এই মুকুলোদগমের কিছুদিন পূর্ব্বে জলসেক আবশ্যক, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শীতের শেষে প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাতেই জলসেক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু যদি সময়মত বৃষ্টি না হয়, তবে বৃক্ষাদিতে কেহ জলসেকের ব্যবস্থা করেন কি? পাশ্চাত্য দেশে এবং আরো অন্যান্য স্থানে গোড়ায় জল সেক তো অল্প কথা, ফল ও মুকুল রক্ষার জন্য গাছে পিচকারী দিবারও ব্যবস্থা আছে। তাঁহারা তাঁহাদের সেই অধ্যবসায়ের ফলও পান। আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হইয়া যাই, বৃক্ষাদির আবার রোগ আছে, এবং সেই রোগ নিবারণও আবশ্যক, কাঁঠাল গাছে পোকা গর্ত্ত করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং ক্ষতমুখ হইতে কাঠের গুঁড়া ও রস নির্গত হইতেছে, লিচুপাতার কোঁকড়া রোগ ধরিয়াছে, আমগাছের ডাল ক্ষত হইয়া ঘুণ পড়িতেছে, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। হইলই বা রোগ, তা বলিয়া ফল হইবে না কেন, এত বড় গাছটার এক স্থানে একটু রোগ তাতে কি হইবে, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে খুবই লোকসান বুঝা যায়, গাছটি মরিয়া যায়, নচেৎ জীয়ন্তে মরা হইয়া দণ্ডায়মান থাকে।

বৃক্ষে আগাছা জন্মিয়া, না হয় বন্যলতা উঠিয়া গাছটি ছাইয়া ফেলিয়াছে, তলায় ঘাস জন্মিয়া গোড়াটি জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, তবুও কিন্তু আমাদের ফলের আশা কমে না, আমরা কখনো কি ভাবি বৃক্ষাদিরও শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, রোগ আছে, আহারের আবশ্যকতা আছে? আবার নূতন বাগান তৈয়ারির সময়ও কতই ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়, গাছ যেন বড় হইবে না, তাই ঘন ঘন গাছ বসাই,

শেষে বড় হইয়া গাছে গাছে জুড়িয়া যায়, আবার সস্তার গাছ পাইলে অধিক মূল্য দিয়া ভাল সতেজ ও সঠিক গাছ ক্রয় করা হয় না, কখনো বিনামূল্যে চাহিয়া কখনো রথ দেখার রথে গাছ কিনিয়া বসাইয়া বিফলমনোরথ হইতে হয়, গাছ কিনিবার সময় কোন গাছের চারা, কি প্রকার শাখার চারা ইত্যাদি অনুসন্ধান করা হয় না। বীজের গাছটি সতেজ পূর্ণবয়স্ক সুপক্ক ফল হইতে সংগৃহীত কিনা তাহা তত লক্ষ্য করা হয় না, গাছ হইলেই হইল, তাহাতে ফল তো হইবেই। পাশ্চাত্য ও অন্যান্য দেশে কত কত নূতন উপায়ে কলম ও শঙ্কর উৎপাদন করিয়া কত প্রকার উন্নত জাতীয় ফলের সৃষ্টি হইতেছে আর সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের ফলের বাগান সব খারাপ হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত অসুবিধার প্রতিকার সযত্নে ও সচেষ্ট হইয়া করিতে পারিলে বঙ্গদেশেও ফলবৃক্ষের বিশেষ উন্নতির আশা করা যায়।

(সম্মিলনী) শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

যুদ্ধ শেষ হইবে কবে

কেহ বলেন ৬ মাসে যুদ্ধ শেষ হইবে, কেহ বলেন ৩ বৎসরের পূর্ব্বে যুদ্ধ শেষ হইবে না। বিজ্ঞ লোকেরা বলিতেছেন, টাকা, সৈন্য ও আহার সামগ্রীর উপর যুদ্ধ নির্ভর করে। কিন্তু ইতিহাস বিজ্ঞদের কথা অলীক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বুয়ারদের টাকা ছিল না, কোথাও ঋণ পাইবার আশা ছিল না; খাদ্য সামগ্রীও যৎসামান্য ছিল। তবু তাহারা বৎসরাধিককাল যুদ্ধ করিয়াছিল। আরো বহুদিন যুদ্ধ করিতে পারিত, যদি তাহাদের গোলাগুলির অভাব না হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধও গোলাগুলির অভাবে শেষ হইবে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ থাকিতে ইংলণ্ডের আহার-সামগ্রীর অভাব হইবে না। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া বিশেষত ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে বহুলক্ষ সৈন্য দিতে পারিবে। সুতরাং ইংলণ্ডের সৈন্যের অভাবও হইবে না। টাকাতে ইংলণ্ড জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং টাকা, সৈন্য বা খাদ্যের জন্য ইংলণ্ডের ভাবিতে হইবে না। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রুষিয়ার গোলাগুলি তৈয়ারের অনেক কারখানা আছে। আমেরিকা হইতেও অনেক গোলাগুলি ক্রয় করিয়া আনা হইতেছে কিন্তু যে পরিমাণ গোলাগুলি খরচ হইতেছে, সে পরিমাণ মজুত হইতেছে না।

জর্ম্মণী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া গোলাগুলি খরচ করিতেছে, সেও আয় দেখিয়া ব্যয় করিতে পারিতেছে না। লিজ নগরে বেলজিয়ানদের অতি বৃহৎ গোলাগুলি নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। বেলজিয়ানেরা এই নগর পরিত্যাগের সময় সে কারখানা ধ্বংস করিয়া যায় নাই, সুতরাং জর্ম্মণী দিন রাত্রি এই কারখানা হইতে গোলাগুলি তৈয়ার করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমের রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে। লিজ নগর অধিকৃত হওয়াতে জর্ম্মণী দ্বিগুণ পরিমাণ গোলাগুলি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। রুষিয়ার পুটিলফ কারখানা খুব বড় কিন্তু এখানেও প্রয়োজনানুরূপ গোলাগুলি নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং যাহাদের যত গোলাগুলি মজুত থাকুক না কেন, তাহা শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবে। অতঃপর যত্র আয় তত্র ব্যয় করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ৪০ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যুদ্ধের নিয়মানুসারে প্রতি ১০০০ সৈন্যের সঙ্গে ৩টা কামান থাকে। ৪০ লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে ১২ হাজার কামান প্রেরিত হইয়াছে। এই ১২ হাজার কামানের মধ্যে ফিল্ড কামান ও হাউটজার কামান প্রভৃতি নানারকম কামান আছে। তাহাদের মুখ সচরাচর ৩ ইঞ্চ হইতে ১২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা অপেক্ষা বড় মুখের কামানও আছে। ঐ সকল কামান হইতে যে গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার এক একটার ওজন ৭॥০ সের হইতে ৫০০ সের।

ছোট কামান হইতে প্রতি মিনিটে ২০টা গোলা নিক্ষেপ করা যায়। বড় কামান হইতে প্রতি মিনিটে ৩ হইতে ১০টা গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ৩ ইঞ্চ ফিল্ড কামানের সঙ্গে অনতিবিলম্বে ব্যবহারের জন্য ১২৫ গোলা থাকে।

যুদ্ধ যদি ১৮ মাস কাল চলে, তবে ১৮ মাসে অর্থাৎ ৫৪৭ দিনের মধ্যে অন্যূন ২০০ দিন প্রকৃত যুদ্ধ হইবে এবং প্রত্যেক কামান অন্যূন ২০০ গোলা নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক ছোট কামান মিনিটে ২০টা সুতরাং ঘণ্টায় ১২০০ গোলা নিক্ষেপ করিতে পারে। ১২০০০ কামান মিনিটে যদি ২০টা গোলা নিক্ষেপ করে এবং প্রত্যেক কামান ২০০ ঘণ্টা যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তবে ৭॥০ সের হইতে ৫০০ সের ওজনের ২৮৮ কোটি গোলার প্রয়োজন।

৩ ইঞ্চ কামানের এক একটা গোলার মূল্য ১৮৸০। বড় বড় গোলার মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কেবল ছোট গোলার মূল্য গণনা করিলেও গোলার মোট মূল্য ৫৪০০ কোটি টাকা হয়।

২ ঘণ্টার যুদ্ধে কত কত টাকার গোলা খরচ হয়, তাহা ভাবিলেও অবাক

হইয়া যাইতে হয়। ৪০০০ কামান মিনিটে ২০টা নয়, যদি ৫টা গোলা নিক্ষেপ করে, তবে ২ ঘণ্টায় ২৪ লক্ষ গোলা নিক্ষেপ করিবে। তাহার মূল্য ৪॥ কোটি টাকা। ২ ঘণ্টার যুদ্ধে ৪॥ কোটি টাকার গোলা খরচ হইবে।

জর্ম্মণীর ক্রুপের কারখানা অতি বৃহৎ; এখানে ৩ ইঞ্চ কামানের এক একটা গোলা নির্ম্মাণ করিতে একজন সুদক্ষ কারিগরের ৬ ঘণ্টা লাগে। এক একজন কারিগর যদি ১২ ঘণ্টা কাজ করিয়া ২টা গোলা তৈয়ার করিতে পারে, তবে প্রতিদিন ২৮৮ কোটি গোলা নির্ম্মাণ করিতে ১৪৪ কোটি লোকের প্রয়োজন।

ক্রুপের কারখানায় প্রতিদিন ৮০ হাজার লোক খাটে, এবং ১১৫০০০ কল চলে। এই ৮০ হাজার লোকের দ্বারা লৌহখনির কার্য্য, জাহাজ নির্ম্মাণের যন্ত্র, ঢালাইএর কারখানা প্রভৃতি নানারূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। তাহারা যে কেবল গোলা নির্ম্মাণ করে, তাহা নয়। এসেন নামক স্থানে ক্রুপের প্রধান কারখানা। এই কারখানায় ৮৪০০০ কল অ[illegible]িতেছে। এখানে ১৫টা দোকানে কামানের নল তৈয়ার হয়, ৭টা দোকানে কামানের লক্ষ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হয়, ১৫টা দোকানে কামানের গাড়ী, ২টা দোকানে যুদ্ধযান তৈয়ার হয়, কিন্তু কেবল ৫টা দোকানে গোলা ও ২টা দোকানে পলিতা তৈয়ার হয়। এই ৭টা দোকানে ১০ হাজার কারিগর ও ৩০০০ কল খাটিতেছে। এই ১০ হাজার লোক ৩ হাজার কলে জর্ম্মণদের জন্য গোলা তৈয়ার করিতেছে। ইহা ছাড়া জাহাজী কামানের ও দুর্গের কামানের সুবৃহৎ কামানও ইহারাই নির্ম্মাণ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে বৎসরে যে হারে গোলা খরচ হইবে, সেই পরিমাণ গোলা নির্ম্মাণ করিতে ৪০ হাজার কলের প্রয়োজন, কিন্তু ইউরোপের সর্ব্ব বৃহৎ ক্রুপের কারখানায় ৩ হাজারের বেশী কল নাই। সেই পরিমাণ গোলা নির্ম্মাণ করিতে ১২৫০০০ সুদক্ষ কারিগরের প্রয়োজন, কিন্তু তত কারিগর কোথাও নাই। ক্রুপের ৮০ হাজার কারিগরের মধ্যে ৫০ হাজারই সৈনিক বেশে রণক্ষেত্রে গিয়াছে। ক্রুপের কারখানা ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের ও অন্যান্য লোকের কারখানাও আছে। কিন্তু তাহা অতি ক্ষুদ্র।

গোলা বরং তাড়াতাড়ি তৈয়ার করা যায়। কামান তৈয়ার করিতে অনেক সময় লাগে। কোনো কামান হইতে ৫০০০ গোলা নিক্ষেপ করিলে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সে কামান ভাঙিয়া নূতন কামান করিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে কামানের ব্যবহার অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। অনেক কামান হইতেই ৫০০০ গোলা বর্ষণ করিতে হইবে। (সঞ্জীবনী)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

খাঁটুরা নিবাসী, শ্যামবাজার প্রবাসী এবং শ্যামবাজার মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক মহাশয় কুশদহ সম্পাদককে লিখিয়াছেন, "৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার কৌলিক প্রথা অনুসারে খাঁটুরার নব-নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে "কুশদহ" পত্রিকার জন্য ১৲ টাকা দিব স্থির করিয়াছি। আমি আমার বাড়ীর কোন কার্য্য উপলক্ষে "কুশদহ"কে কিছু দিই তাহার উদ্দেশ্য এই যে, কুশদহের সকলে ঐ প্রথার অনুসরণ করিলে "কুশদহ" কিয়ৎ পরিমাণে উপকৃত হইবে।

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী জন সংখ্যা ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ৫০৭০ তাহার মধ্যে পুরুষ ২৫৩৩ স্ত্রী ২৫৩৭, গত ১৯১৩ সালে ১৩৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে—কলেরা ২, বসন্ত ১, জ্বর ৮৫, রক্ত আমাশা ও উদরাময় ১৫, শ্বাস যন্ত্রের রোগ ৮, আত্মহত্যা ২, ক্ষিপ্ত শৃগাল দংশন ৩, আঘাত ২, ও অন্যান্য কারণে ১১। ঐ সালে ১০০০ করা ৯৭·৭৫ জন্ম ও ২৭·২ মৃত্যু অর্থাৎ হাজার করা ৯·২৭ মৃত্যু বেশী এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু বেশী। যখন জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার, যথেষ্ট পরিমাণে বেশী, তখন দেশ বাসীর ও কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ চিন্তার কারণ। এ বিষয় উপেক্ষনীয় নহে। দেশে স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া যাহাতে মৃত্যু সংখ্যা কমে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের পশ্চিম হইতে ব্রহ্মমন্দিরের উত্তর দিয়া গৈপুর ফকির পাড়ার ঘাট পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তার কথা আমরা ইতি পূর্ব্বে কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছিলাম। রাস্তাটির দুর্গতি দূরের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই হইল না। বোধ হয় ঐ রাস্তা গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী হিসাবের মধ্যে ধরেন না। কিন্তু গৈপুর ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু লোকের এই রাস্তায় যাতায়াত করিতে হয়। বিশেষ বর্ষাকালে কাদাভাঙ্গিয়া ট্রেণ ধরিবার সময়ে যে কি দুর্গতি হয়, তাহা অনেকেই ভুক্ত ভোগী। মধ্যে শুনিয়া ছিলাম যে ঐ রাস্তায় বালী দিয়া কাদা নিবারণের উপায় করা হইবে। কই তাহাও ত এত দিনে হইল না। আমাদের মনে হয়, চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয় একটু মনযোগী হইলে বহুলোকের এই কষ্ট নিবারণ করিতে পারেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে কুশদহর ব্যবসায়ী শ্রেণীর সুবিখ্যাত স্বর্গীয় ভুতনাথ পালের তৃতীয় সহোদর বাবু জয়গোপাল পাল সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। জয়গোপাল বাবু এক সময় চিনির কারবারে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও গাড়ি ঘোড়া করিয়া অল্প দিনে এ দেশে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই কারবারে লোকসান হইয়া নিঃস্ব-প্রায় হইয়া পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া আর অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই। এখন ভগবান তাঁহার পরিশ্রান্ত আত্মার সদ্গতি করুন।

সাহায্য-প্রাপ্তি

(১লা আশ্বিন হইতে ৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে	...	...	২৲
„ ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র	...	...	২৲
„ হেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৲
ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র	...	...	২৲
শ্রীযুক্ত কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	২৲
শ্রীমতী সুশীলাবালা রক্ষিত	...	...	২৲
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রক্ষিত	...	...	২৲
„ জ্যোতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার—২০।২১ সালের চাঁদা			৪৲
কুশদহের ঋণ শোধার্থে	...	...	৪৲
শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়	...	...	২৲
„ সাধনচন্দ্র শ্রীমাণি		...	২৲

(অগ্রহায়ণ মাসে)

পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক (নব-গৃহ প্রবেশোপলক্ষ্য)		...	১৲
শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল	...	...	২৲
„ কানাইলাল সেন	...	...	৩৲
„ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল	...	...	১৩৲
„ গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, চৌবেড়িয়া		...	২৲
শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত	...	...	৫৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সম্পাদকের অসুস্থতা ও ছাপাখানার পরিবর্ত্তন জন্য এবার "কুশদহ" বাহির হইতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে, বোধ হয় ২।৩ বারের কম পুনরায় ১লা বাহির করিতে পারা যাইবে না, তজ্জন্য গ্রাহক গ্রাহিকাগণ চিন্তিত হইবেন না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

U. RAY & SONS.

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"
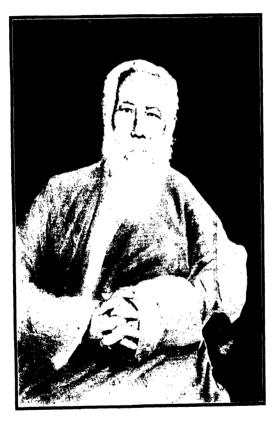
"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ } পৌষ, ১৩২১ { নবম সংখ্যা

সঙ্গীত

(রামপ্রসাদী সুর)

মিছে আর কেন ভাবনা ?
ভেবেত কভু কুল পাবে না।
ভেবেই বা কি করবে বল,
ক্ষমতায় তো কুলাবে না ;
এই অনন্ত বিশ্ব মাঝারে তুমি ক্ষুদ্র কীট বইতো না।
সর্ব্ব মূলাধার যিনি,
তাঁরে কেন ভার দাও না ;
হয়ে অবিশ্বাসী দিবানিশী ক'রো না বৃথা কল্পনা।
যাঁর হাতে ব্রহ্মাণ্ড আছে,
সকলই তার আছে জানা ;
ছেড়ে কুটিল বুদ্ধি মন্দ মতি কর তাঁর উপাসনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি*

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যিনি পরে মহর্ষি হইয়াছিলেন,—প্রথমে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনা করিয়াছিলেন। নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সভার সম্পাদক ছিলেন। সভাপতি রাজা সত্যচরণ ঘোষাল পত্রিকা সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত "প্রভাকরের" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তকে দেন। উক্ত সভা হইতে প্রতি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল ১৲ টাকা। যিনি ন্যূন কল্পে মাসিক চারি আনা চাঁদা দিতেন, তিনি সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারিতেন এবং সভ্যগণ পত্রিকার এক এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইতেন। পত্রিকাতে যখন ঋগ্বেদ সংহিতার মূল টীকা এবং ভাষ্য ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন মোক্ষমূলার সাহেব বলিয়াছিলেন, যদি এটী সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে একটি সুমহৎ কাজ হইবে। যে সকল লোকের দ্বেষ ভাব ছিল তাঁহারাও পত্রিকা লইতে লাগিলেন এবং ইহাকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র (organ) বলিতে লাগিলেন। এই পত্রিকার বিরুদ্ধে নন্দকুমার কবিরত্ন ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা" বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম্মসভা ও সেই পত্রিকা দীর্ঘকাল চলে নাই।

দেবেন্দ্র বাবু যখন ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহ ছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে তৃতীয়তল গৃহ করিয়া দেন। তখন বেদ ও উপনিষদ হইতে ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা হইত, বেদ ঈশ্বর-প্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া তাহাকে মান্য করা হইত। বেদের যথার্থ অর্থ জানিবার জন্য চারি জন ছাত্রকে তিনি কাশীতে বেদ শিক্ষা করিতে পাঠান। আনন্দচন্দ্র, বাণেশ্বর, তারক ও রমানাথ ইঁহারা যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, বেদ ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া বোধ হয় না, ইহা ঋষি-প্রণীত বাক্য মাত্র, তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কলন করিলেন। সেই পুস্তকখানি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার পুস্তক হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

---

* শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহর্ষির সময়ের লোক। ইঁহার অশীতি বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। ইনি মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠ করেন নাই—নিজের স্মৃতি হইতে মহর্ষির সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, লিখিয়াছেন। সেইজন্য বৃদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত লেখা পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিবে আশা করিয়া ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

(কুঃ সম্পাদক)

তাঁহার পিতা ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে গেলেন তখন তাঁহাকে মোক্ষমূলার সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমার পুত্র আমার বেদসম্বন্ধে পুস্তক দেখিয়া কি চারিজনকে বেদ শিক্ষা করিতে কাশীতে পাঠাইয়াছেন?" দ্বারকানাথ সে সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। তিনি প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়া যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথের বিষয়-কার্য্যে মন নাই, কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়ান। তিনি দেবেন্দ্র বাবুকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সাম্‌নে কোন কথা বলিতে পারিতেন না, অসাক্ষাতে পারিষদদিগকে বলিতেন "তোমরা আমার ছেলেকে নষ্ট করিলে।" তখন বিষয় রক্ষার আর কোন উপায় নাই ভাবিয়া তিনি পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে কিছু সম্পত্তি Trust property করিলেন, এবং লিখিয়া দিলেন যে—রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় এই তিনজন সেই সম্পত্তির মালিক হইলেন, নিজ পুত্রদের সহিত সেই সম্পত্তির কোন সংস্রব রহিল না। কেবল ইহার উপস্বত্ব পুত্রেরা পাইবেন এবং পরে পৌত্রগণ পাইবেন। তাঁহার বড় হৌস ছিল, তাহাতে তাঁহার অৰ্দ্ধেক অংশ ছিল। বাকী অর্দ্ধেক William carr, capt. Taylor, Dr. macpherson, Major Henderson এবং C. D. M. Plowden এই কয়েকজন অংশীদারের ছিল। তাঁহার যে অর্দ্ধেক অংশ ছিল তাহা দেবেন্দ্র বাবুকে লিখিয়া দিলেন; অপর ছেলেদের দিলেন না। তিনি যখন দ্বিতীয়বার বিলাতে গেলেন তখন সেখানে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। দেবেন্দ্র বাবু বোটে বেড়াইতে বেড়াইতে সেই সংবাদ পাইয়া মেজ ভাইকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে সালিখায় কুশ পুত্তল দাহ করিয়া ১১ দিনে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন; সেই শ্রাদ্ধে পৌত্তলিকতার কোন সংস্রব ছিল না বলিয়া হিন্দুসমাজের লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র বাবুর পিতা যে হৌস তাঁহাকে দিয়াছিলেন তিনি তাহা একা না লইয়া তিন ভায়ে সমান অংশ করিয়া লইলেন। গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন ইংরাজেরা লাভের ভাগী, লোকসানের দাইক নহে, আপনি যদি সাহেবদের অংশ খরিদ করিয়া লন, তবে ভাল হয়। তাঁহার কথামত তিনি সকল অংশ খরিদ করিয়া লইলেন এবং যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল হৌসের তত্ত্বাবধান করিলেন। প্রধান ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত গর্ডন সাহেব ১০০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। তত্ত্বাবধান ভালই চলিয়াছিল, কিন্তু ৩০০০০৲ টাকার হুণ্ডি

শোধ করিতে না পারায় হৌস্ ফেল হইল। দেবেন্দ্রনাথ বিমর্ষ হইয়া বৈঠক-খানার বসিয়া আছেন এমন সময়ে গর্ডন সাহেব আসিয়া বলিলেন ফার্ম্মে এক কোটি টাকা দেনা, তিনি তাহার কোন উত্তর করিলেন না। রাধাপ্রসাদ রায়, রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, এবং মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় আসিয়া বলিলেন তুমি Insolvent নাম লেখাও। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন আমি তাহা পারিব না। "তুমি কি এক কোটি টাকা দিতে পারিবে?" তিনি বলিলেন, "আমার যাহা কিছু আছে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া যদি ৫০৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি করিয়া খাইতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য তথাপি ইনসলভেন্সি লইতে পারিব না। Insolvent নাম লইতে হইলে Schedule পূরণ করিয়া নীচে সহি করিতে হয়—আমার আর কিছুই বিষয় নাই। অথচ আমার এত বিষয় থাকিবে যে সে Schedule আমি পূরণ করিতে পারিব না। বিষয় থাকিতেও আমার আর কিছুই নাই এ মিথ্যা কথা আমি বলিতে পারিব না।" তাঁহারা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। রমানাথ ঠাকুর আবার অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন "দেবেন্দ্র তুমি ক্ষেপিয়াছ। Trust property তে তোমার কোন অধিকার নাই, আমি একজন Trustee আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তিনি কাকার কথায় কোন উত্তর করিলেন না। এইরূপ গোলমাল হওয়ায় অনেকে কৌতূহলী হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। দেবেন্দ্র বাবু মেজ ভাইকে বলিলেন, "গিরীন্দ্র তোমার মত কি বল দেখি।" তিনি বলিলেন, "আপনি যাহা করিবেন তাহাই আমার মত।" তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যখন দেবেন্দ্র বাবু বাটি হইতে বাহির হইয়া উত্তমর্ণদের সভায় চলিলেন, তখন বাটিতে মরাকান্না উঠিল, "আজ হইতে আমরা পথের ভিখারী হইলাম।" যাহারা তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল—"young man গুরুতর বিপদ হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইবেন;" শত্রুরা বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তা এবার মিথ্যা কথা বলেন কিনা দেখা যাইবে। কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মপথ রক্ষা করিয়া চলেন। ধর্ম্ম, যে সূক্ষ্ম পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন তাহা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। সভায় গিয়া গর্ডন সাহেবকে বলিলেন—"আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে সমস্ত ধরিয়া দিতেছি; এই সম্পত্তির উপসত্ব থেকে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ হয়, এই আমার ইচ্ছা।" গর্ডন সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, ইহাদের সমস্ত সম্পত্তি ইহারা ধরিয়া দিতেছেন ঐ সম্পত্তির উপসত্ব হইতে ঋণ পরিশোধ হউক, কিন্তু ইহাদের

Trust property ছাড়িয়া দেও।" পাওনাদারেরা সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "এখানে সকল পাওনাদার উপস্থিত নাই; যদি কেহ বলে যে Trust property লোককে ঠকাইবার জন্য করিয়াছে, সে কথা আমি সহ্য করিতে পারিব না।" যখন Trust property ধরিয়া দিলেন, তখন শত্রু মিত্র সকলেরই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, সত্যই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যযুগের লোক কলিতে জন্মাইয়াছেন; কলিতে এরূপ ধার্ম্মিক লোক হইতে পারে না। তিনি যখন সকল সম্পত্তি ধরিয়া দিলেন, তখন পাওনাদারেরা বলিলেন "এদের সংসার চলিবে কিসে?" Gordon সাহেব বলিলেন, "সে তোমরা বিবেচনা কর।" পাওনাদারেরা বলিলেন—নূতন যে Trust property হইল তাহা হইতে বৎসরে ২৫০০০৲ টাকা সংসার খরচের জন্য ইঁহারা পাইবেন এবং জোড়াসাঁকোর বাটি ও বেলগেছিয়ার বাগান Trust propertyর বাহিরে ব্যবহারের জন্য রহিল। বাকী টাকায় পাওনাদারদিগের ঋণ পরিশোধ হইবে। Trust property চালাইবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে লাগিল। এক একজনের মাহিনা ১৪০০৲ ১২০০৲ ১০০০৲ টাকা এইরূপ উঠিতেছে দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আমাকে দিলে আমি অল্প টাকায় ইহার সুব্যবস্থা করিতে পারি।" সকলেই বলিলেন, ইনি যখন এত সততা প্রকাশ করিলেন তখন ইঁহাকেই ভার দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া, ব্যবস্থার ভার তাঁহার হাতেই দিলেন। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন "গিরীন্দ্র কি হইল বুঝিতে পারিলে না?" গিরীন্দ্র বলিলেন, "না কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন "তোমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্ত Trust property হইল। ঐ propertyর উপস্বত্ব হইতে পাওনাদারদিগের ঋণ পরিশোধ হইলে তোমাদের বিষয় ফেরত পাইবে। ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তোমাদের হাতেই রহিল। সেই হৌসে যে আফিস ছিল, তাহা ৬ মাস চলিল। গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন "দাদা, ৬ মাসের মধ্যে কিছুমাত্র ঋণশোধ হইল না, সমস্ত বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমরা ভিখারী হইব, আপনি আফিস বাটীতে আনিলে ভাল হয়।" তাঁহার কথামত দেবেন্দ্র বাবু আফিস বাটীতে আনিলেন এবং রামচাঁদ গাঙ্গুলিকে ১০০৲ টাকা বেতনে দেওয়ান রাখিলেন। গিরীন্দ্র বাবু বেলা ১০টার সময় কাছারী করিতে বসিতেন, ৫টা পর্য্যন্ত কাছারী করিতেন। দেবেন্দ্র বাবু সকল কার্য্যই তত্ত্বাবধান করিতেন। পরে তিন জনে স্থির করিয়া নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে কলিকাতার মধ্যে প্রধান বাবু ছিলেন। যত কিছু ফ্যাসান্ তাহা তাঁহারি দ্বারা বাহির হইত। জগদ্ধাত্রী ভাসানের সময় যেরূপ পোষাক করিয়া তিনি বাহির হইতেন, কলিকাতার অনেক বাবু তাঁহার অনুকরণে সেইরূপ পোষাক করিয়া আসিতেন। যিনি এত বড় বাবু ছিলেন, তিনি ধর্ম্মরক্ষার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাই আশ্চর্য্য!

বেগগেছিয়া বাগানের এবং নিজ বৈঠকখানার Household property catalogue অর্থাৎ গৃহের আসবাবের তালিকা যখন বাহির হইল, তখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী সকলে চমকিয়া উঠিল যে একজনের এত সম্পত্তি থাকিতে পারে। তিনি অকাতরে সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন। অপর লোকের মনে কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার নিজের মনে কোন কষ্ট হইল না। ব্যবহারের জন্য সামান্য গালিচা ও অপরাপর সামান্য জিনিষ রাখিলেন।

হাজারিলাল ইহাদের সরকারে চাকর থাকিয়া ৫০০০৲ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং সেই টাকা হৌসে জমা ছিল। তিনি পশ্চিমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন, সেখানে শুনিলেন Carr Tagore হৌস ফেল হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ নিজ হইতে হাজারিলালকে ঐ ৫০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

পনেরো দিন ধরিয়া নিলামে তাঁহার গৃহের সকল আসবাবপত্র বিক্রীত হইল।*

যে সকল সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছিল, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দিলাম:—

১। লর্ড বিশপের বর্ত্তমান প্রাসাদ।

২। মাউণ্টেন্স্ হোটেল, এখন ম্যাথেসনের দোকান।

৩। রাণীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি।

৪। রামনগরের চিনির কারখানা।

৫। কুমারখালির রেশমের কুঠি।

৬। শিলাইদা, বিরাহিমপুর, সাজাদপুর এবং অন্যান্য স্থানের নীল কুঠিগুলি।

এই সমস্ত সম্পত্তি নিলামে প্রায় জলের দরে বিক্রয় করিয়া ৪২ লক্ষ টাকা শোধ হইল। বাকী ৪০ লক্ষ টাকা সম্পত্তির আয় হইতে ক্রমে শোধ হইল।

* শ্রীনাথ বাবু বলেন যে সেই নিলামে তিনি একখানি বই ক্রয় করিয়াছিলেন।

তা ছাড়া ডিস্‌ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটিতে দ্বারকানাথের প্রতিশ্রুত লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজকে মাসিক সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ নগেন্দ্রনাথের বিধবাকে মাসিক অর্থসাহায্য করিতে হইয়াছিল।

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়—

উমেশচন্দ্র সরকার নামক এক বালকের যখন বয়স ১৪ বৎসর এবং তাহার স্ত্রীর বয়স ১০ বৎসর তখন বৈকুণ্ঠনাথ দে তাহাদিগকে লইয়া ডফ্ সাহেবের কাছে খৃষ্টান হইতে গেল। তখন কলিকাতায় বড় আন্দোলন হইয়াছিল। লাটু বাবু দেবেন্দ্র বাবুকে পত্র লেখেন, "দেশহিতৈষী ব্যক্তি এক আপনি আছেন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, গরীব লোকের জন্য যাহাতে একটি স্কুল হয় তাহার চেষ্টা করুন।" দেবেন্দ্র বাবু সম্মত হইয়া প্রতিদিন প্রাতে বাহির হইয়া বেলা ১০।১১টা পর্য্যন্ত লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেন। এক মাস পরে কয়েকটী সভা হয়। রাজা বাবুর বাড়ীতে এক বৃহৎ সভার আয়োজন হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্কুলের উদ্দেশ্য কি তাহা বলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ছাতু বাবুকে বলিলেন "কলিকাতার মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী লোক আপনি আছেন, চাঁদার খাতায় প্রথমে আপনাকে সহী করিতে হইবে।" তিনি লাটু বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ দশ হাজার টাকা এককালীন এবং মাসিক ৫০৲ টাকা সহী করিলেন; তাহার পর ৫০০০৲ ৪০০০৲ এইরূপে ৪০০০০৲ হাজার টাকা সহী হইয়া গেল। দেবেন্দ্র বাবু সন্তুষ্ট হইয়া নীচে মুখ হাত ধুইতে গিয়াছেন, এমন সময়ে মতিলাল শীল উঠিয়া বলিলেন,—"যদি এই স্কুলে আমার একটী নাম থাকে তাহলে আমি লক্ষ টাকা দিই।" ছাতু বাবু অন্যায় করিয়া তাঁহাকে গালি দিলেন। দুই জনে তখন মারামারি হইবার উপক্রম হওয়ায় দেবেন্দ্র বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া ছাতু বাবুকে ধরিলেন। বলিলেন "আপনারা দেশের মঙ্গল করিতে আসিয়া মারামারি করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়!" অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিয়া বসাইলেন। 'হিন্দু হিতার্থী স্কুল' পাথুরেঘাটায় রাধাকৃষ্ট বসাকের বৈঠকখানা বাটীতে হইল; ভুদেব মুখোপাধ্যায় Head Master হইলেন। অনেক ছেলে হওয়ায় শিমলা বাজারের কাছে উঠিয়া যায়। ১২০০ ছেলে হইয়াছিল। ৪০০০০৲ হাজার টাকা যাহা ছাতু বাবুর House এ আমানত

ছিল ছাতু বাবুর House Fail হওয়ায় ক্রমে ক্রমে চাঁদা বন্ধ হওয়ায় সমস্ত খরচ দেবেন্দ্র বাবু একলা দিতেন। কেশব বাবুর সময়ে কিরূপে স্কুল বন্ধ হইয়া গেল, তাহা আমি অবগত নহি। (তত্ত্ববোধিনী)

শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জননী

—:০:—

সুদুর্ব্বল দীনবেশে জনমিনু যবে
সাদরে প্রসারি কর যাতনা ভুলিয়া
হৃদয়ে টানিয়ে মোরে—কে প্রথম ভবে।
সঞ্জীবিত করেছিল—প্রদানি আমিয়া ?

রোগ ক্লিষ্ট চিন্তাতপ্ত ললাট হইতে
কে মোর মুছায়ে দেছে নিভৃত কালিমা ?
কে পারে পরাণ দিতে হাসিতে হাসিতে
নিজ প্রাণ বিনিময়ে; কে তিনি প্রতিমা ?

অনাহারে অনিদ্রায় সিয়রে বসিয়া
বিজনে ব্যজন করে—ডাকি ভগবানে !
নিমীলিত সিক্ত নেত্রে—প্রকম্পিত হিয়া
"দয়া ময় কর রক্ষা মোর বাছাধনে ! !"

শত দোষে ক্ষমা শীলা,—ভিন্ন শুভাশীষ
বর্ষণ আমার শিরে—কাজ নাই যাঁর।
সুধাসিন্ধু পূর্ণ হৃদি—নাহি উঠে বিষ
সাকারা স্বরূপা দেবী—জননি আমার ! !

নাহি দ্বেষ হিংসা স্বার্থ ও পবিত্র হৃদে
অগাধ অপরিমেয় আছে ভালবাসা।

স্থির সৌম্য সুগম্ভীর স্বচ্ছ হৃদি নদে
প্রস্ফুটিত তনয়ের শুভেচ্ছা লালসা ॥

মাতৃবক্ষ বিগলিত ক্ষীরধারা কাছে
নতশির সমুচয় সুধা পরমাণু।
কতই সুষমা শান্তি 'নন্দনের' আছে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষপ্রদ পদরেণু!!

কি আছে কি দিব দেবি! চাহনাক' কিছু
মুক্ত হস্ত মুক্ত হৃদি অযাচিত দান!
বিপথ স্খলিত পদ হেরি ধাও পিছু
ক্ষীণ দৃষ্টি অল্প বুদ্ধি—অধম সন্তান!!

হেরি না ত' কোন দেবী এতিন ভুবনে
দয়া মায়া স্নেহময়ী তোমার সমান!
মহা' লোক ক্ষুদ্র হৃদে—এ ভগ্ন ভবনে
শত নতি মহাশক্তি! দেবতা প্রধান!!

কৃতজ্ঞতা জানাব কি জননী জননি!
কণ্ঠ হয় অবরোধ ভাষা মুখে বাধে
প্রসারিত যুক্ত কর কেন মা কি জানি ?
দুরু দুরু কাঁপে বুক শত অপরাধে!!

শ্রীঅভয়াপদ ভট্টাচার্য্য
বিদ্যাবিনোদ।

সরমা

—:*:—

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রায়পুরের মহারাজা অনেক লোকলস্কর হাতিঘোড়া লইয়া সপরিবারে কাশীতে স্বীয় প্রাসাদে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাণী প্রত্যহ প্রভাতে

দাসদাসী সঙ্গে লইয়া শিবিকারোহণে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে যাইতেন। সে দিন তিনি পূজা সমাপন করিয়া বাটীতে আসিয়া যখন উপরে উঠিতেছিলেন, সেই সময়ে হটাৎ পড়িয়া যান। সেই যে পড়িয়া গেলেন আর উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বাম অঙ্গ একেবারে অবশ Paralise হইয়া গেল। মহারাজের পারিবারিক চিকিৎসক দেখিয়া শুনিয়া কহিল মহারাণীর প্যারালিসিস হইয়াছে। কাশীর বড় বড় ডাক্তার ও তথাকার Civil Sergeon আসিয়া দেখিল তাহাদেরও ঐ মত। রিতিমত ঔষধপত্র চলিতে লাগিল কিন্তু রোগের কোনও উপশম হইল না। ক্রমে দক্ষিণ অঙ্গও অবশ হইয়া আসিল। কলিকাতা হইতে সাহেব ডাক্তার আসিয়া কহিল রোগ যেরূপ ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে—তাহাতে ইঁহার জীবনের আশা খুবই কম। বোধ হয় দুই তিন দিনের মধ্যেই মস্তিস্ক আক্রান্ত হইবে ও উহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। সাহেব ডাক্তার সেইখানেই থাকিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন কিন্তু রোগ ঔষধ মানিল না—সে মস্তিস্কের দিকে ছুটিতে লাগিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে রাজপুরী যেন অন্ধকার হইয়া গেল। সকাল সন্ধ্যায় নহবৎখানায় আর নহবৎ বাজে না। গীতবাদ্য হাস্যপরিহাসের উচ্চ রোল যাহা রাজপুরি মুখরিত করিয়া তুলিত আজ তাহা গভীর নীরবতায় পরিণত হইয়াছে—পরিজনবর্গ আজ বিষণ্ণ মলিন—কাহারও মুখে কথা নাই—ঘোর অশান্তি!

বৃদ্ধ মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ আমার এক নিবেদন আছে।"

"বল্‌তে পারেন।" বলিয়া মহারাজ মন্ত্রির মুখের দিকে চাহিলেন।

মন্ত্রী গম্ভীর ভাবে কহিলেন "দেখুন দুর্গাবাড়ীর পশ্চিমে একটা বাগানে সামান্য একখানি কুটিরে একটী স্ত্রীলোক থাকেন; শুনেছি তিনি নাকি গুরুর প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তিনি অনেক গরিব লোকের অনেক কঠিন রোগ ভাল করেছেন—তিনি গরিবের মা—আমার ইচ্ছে একবার তাঁকে নিয়ে আসি কি বলেন?"

"আমার আর বলবার কিছু নেই—আপনি এখন যা ভাল বোঝেন তাই করতে পারেন। যেখানে ভগবান অপ্রসন্ন সেখানে মানুষের কি হাত!" বলিয়া মহারাজ রুমালে চক্ষু মুছিলেন।

"আপনি স্থির হোন—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—ভগবান কি এমনই করবেন" বলিয়া মন্ত্রী সত্বর মহারাজের কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহারাজের প্রকাণ্ড জুড়ী যখন সেই রমণীর কুটিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল,

তখন কোথা হইতে একরাশ ভিক্ষুক আসিয়া গাড়ী খানির চারিদিকে হৈ চৈ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে কুটির প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন—দেখিলেন রমণী কুটিরের এক পার্শ্বে বসিয়া যুক্ত করে মুক্ত প্রাণে নিমিলিত নয়নে কাহার ধ্যানে নিমগ্ন—তাঁহার মৌন প্রার্থনা যেন কোন দেবতার চরণে আসিয়া আঘাত করিতেছিল। তাঁহার মুখের উপর এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ মন্ত্রী ভক্তিভরে সেই দেবীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রমণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া সহসা সম্মুখে অপরিচিত এক বৃদ্ধকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রমণীর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মন্ত্রী কহিলেন "মা আমি আপনাকে নিতে এসেছি। একবার রাজবাড়ী যেতে হবে। আমি মহারাজের মন্ত্রী মহারাণী বুঝি"—

মন্ত্রীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রমণী কহিলেন—"আজ আমার পরম সৌভাগ্য —আপনি রাজমন্ত্রী হয়ে এই দরিদ্র রমণীর কুটিরে পদার্পণ করে কুটির পবিত্র করলেন—কিন্তু আমার এখানে আপনার মত লোককে বসতে দেবার কোন আসনই নেই—যদি দয়া করে এই কুশাসন খানি — "

মন্ত্রী তাড়াতাড়ী কহিলেন, "মা আপনার কুটিরের ভূম্যাসনই পবিত্র আসন এর তুল্য আসন কি আর জগতে আছে," বলিয়া মন্ত্রী মাটির উপরে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

রমণী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

মন্ত্রী আবার কহিলেন "মা এখানে আমার আজ বসবার সময় নেই, আপনি এখুনি আমার সঙ্গে আসুন—মহারাণী বুঝি রাজপুরি অন্ধকার করে চলে যান।"

রমণী কহিলেন "আপনাদের মহারাণীর অসুখ ?"

"বিশেষ পিড়ীতা—আপনাকে এখনি আমার সঙ্গে যেতে হবে—রাণীমাকে বাঁচাতেই হবে—তা না হলে এত বড় রাজসংসার ছারখার হয়ে যাবে। মহারাজ পাগল হয়ে যাবেন।"

"অসুখ হয়েছে ভাল ভাল ডাক্তার কবিরাজ দেখান ভাল হয়ে যাবেন। আমি ডাক্তারও নই কবিরাজও নই আমি গিয়ে কি করব ?"

"ভাল ভাল ডাক্তার কবিরাজের শ্রাদ্ধ করা হয়েছে—তারা সকলেই একবাক্যে বলেছে মহারাণীর মৃত্যু নিশ্চয়—দু এক দিনের ভিতর।"

"তবে আমি গিয়ে কি করব। সেবাশুশ্রূষা করতে বলেন, অবশ্য প্রাণ দিয়ে করব।"

"সেখানে গিয়ে যা ভাল বোঝেন তাই করবেন এখন আসুন গাড়ী প্রস্তুত।"

"যাচ্চি, কিন্তু——"

"কিন্তু আবার কি ?"

"আমার মত লোকের রাজবাড়ীতে প্রবেশাধিকার আছে কি ?"

"আছে কিনা সে কথার বিচার সেখানে হবে। মহারাজের আদেশ আসুন।"

রমণী আর বৃদ্ধের কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার সহিত গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। গাড়ীখানি গড় গড় শব্দে পাথরের রাস্তার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

মন্ত্রীর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মহারাজের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি স্বয়ং ফটকের নিকট আসিয়া পথ পানে চাহিয়া রহিলেন—সঙ্গে তাঁহার পরিজনবর্গও যথেষ্ট ছিল। সকলেই রমণীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল।

গাড়ী আসিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াইল—প্রথমে মন্ত্রী নামিলেন, তারপর পট্টবসন পরিহিতা এক রমণী ধীরে ধীরে নামিলেন। তখন প্রাতঃসূর্য্যের সোনালি কিরণ তাহার মুখের উপর ঝলমল করিতেছিল—সিমন্তের সিন্দুর বিন্দু মেঘের পাশে বিজলির ন্যায় ঝিকিমিকি করিতেছিল—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন চন্দ্র কিরণের ন্যায় একটা শান্ত শীতল দীপ্তি বাহির হইতেছিল। তাঁহার মুখের উপর যেন স্বর্গের পবিত্রতা ফুটিয়াছিল। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা স্বয়ং তাঁহাকে আহ্বান করিলেন।

রমণী মৃদুস্বরে কহিলেন "আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি রাজদর্শন পেলুম—কিন্তু জানি না আমার মত ক্ষুদ্রের দ্বারা মহারাজের কি উপকার হতে পারে।"

রাজা কহিলেন, "আপনি আমাদের মাতৃস্থানীয়া—আসুন, দেখুন আমাদের অবস্থা, এ রাজ সংসার হয়ত কাল শ্মশানে পরিণত হবে, ভগবান আমার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন কে জানে" বলিয়া মহারাজ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রমণী ধীরে ধীরে কহিলেন "অত উতলা হচ্চেন কেন, মহারাণী সেরে উঠবেন—ভয় কি ?"

"সে আপনার আশীর্ব্বাদ" বলিয়া মহারাজ রমণীকে লইয়া মহারাণীর কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষে যাহারা ছিল তাহারা বাহিরে আসিল।

মহারাজ একখানি মখমলে মোড়া কারুকার্য্য বিশিষ্ট সোফার উপর উপবেশন করিলেন—মন্ত্রী তাঁহার এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন একজন সাহেব ডাক্তার তাঁহার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল—দ্বারের নিকট হইতে অনেকগুলি উৎসুক চক্ষু নবাগতা রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল। রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক বহুমূল্য পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মহারাণীর ক্ষীণ দেহ শায়িতা—তাঁহার হাত পা তুলিবার শক্তি নাই—বাকশক্তিও প্রায় রোধ হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাঁহার ভ্রমর কৃষ্ণ চক্ষু দুটী যেন শেষ বিদায় লইবার জন্য মহারাজের দিকে সকাতরে চাহিয়া আছে।

রমণী ধীরে ধীরে আসিয়া মহারাণীর পালঙ্কের উপর বসিলেন এবং তাঁহার মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কহিলেন "মা আপনার সব অসুখ ভাল হয়ে গেছে—আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন ?"

রমণীর অঙ্গ স্পর্শে মহারাণীর সর্ব্বশরীরে যেন একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল, তিনি একবার কাঁপিয়া উঠিলেন, তারপর দেহে যেন একটা নূতন বলের সঞ্চার হইল—তিনি তখন চক্ষু দুটি উন্মুক্ত করিয়া একবার রমণীর মুখের পানে চাহিলেন। রমণীর চক্ষু দুটি যেমন তাঁহার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল অমনি তাঁহার চক্ষুদুটি সহসা নিমীলিত হইয়া আসিল। শত বৎসরের নিদ্রা আজ যেন আবেশে ঢুলুঢুলু হইয়া তাঁহার চখের পাতায় জড়াইয়া পড়িল। মহারাণী ঘুমে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

রমণী তখন মহারাণীর মস্তক এক শেফালি শুভ্র কোমল উপাদানে রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার দেহের উপর উৰ্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন, তারপর মহারাজের দিকে চাহিয়া বিনয় নম্র মধুরস্বরে কহিলেন,—"মহারাজ যদি অনুমতি করেন তা হলে আমি এখন আসি—মহারাণী চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমাবেন, ঘুম ভেঙে গেলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থা হবেন, আর কোন অসুখ থাকবে না।"

রমণীর কথায় সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল—মহারাজ কহিলেন, "অ্যাঁ চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমুবেন—কৈ ঘুমত এঁর চোখে একদিনও আসেনি !

রমণী মুখ নত করিয়া কহিলেন—"সেইজন্য একটু অধিকক্ষণ ঘুমুবেন।

কথাটা ডাক্তারের একেবারেই অসহ্য বোধ হইল, তিনি কহিলেন—She must be a chamer—I think Moharani is no more ; let examine her বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া মহারাণীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখনও

তাঁহার মৃদুনিশ্বাস বহিতেছে—নাড়ী ক্ষীণভাবে চলিতেছে—ডাক্তার তখন একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—Moharani has been mesmerised it is doubtful whether she will awake again ডাক্তারের কথা শুনিয়া মহারাজের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—মন্ত্রী শশব্যস্তে কহিলেন—"মা আমরা বাস্তবিক বড় ভয় পেয়েছি—আপনার এখন যাওয়া হবে না—মহারাণী আগে আরোগ্য লাভ করুণ তারপর সে কথা—"আপনারা ভয় পেয়েছেন, তবে আমি যাব না" বলিয়া রমণী মহারাণীর মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইয়া পালঙ্কের উপর বসিলেন।

উদ্বেগ, আতঙ্ক, আশা ও নিরাশার অজস্র ঘাতপ্রতিঘাতে মহারাজের প্রাণটা তখন টল্‌মল্ করিতেছিল। মানুষ মন্দটাই অগ্রে ভাবিয়া লয়। মহারাজ ভাবিলেন ডাক্তার ঠিক বলিয়াছে এ রমণী নিশ্চয়ই কোন কুহকিনী—এর চাহনিতেই মহারাণীর জ্ঞান লোপ হইল—তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই নিদ্রাই বোধ হয় চিরনিদ্রা হইবে। মহারাজ শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে উঠিয়া—আপনার শয়ন কক্ষে আসিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া আসিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলের মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। একজন মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিল "আপনি এ স্ত্রীলোকটিকে কোথা থেকে এনেছেন—দেখ্‌চেন না এ নিশ্চয়ই কোন মায়াবিনী, মহারাণীর দিকে চাইতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন—যদি বা আর দু একদিন বাঁচতেন, কিন্তু এ মাগীটাকে এনে তাঁকে মরণের পথে এগিয়ে দিলেন।"

কথা গুলা মন্ত্রীর প্রাণে আসিয়া বিষাক্ত ছুরিকার ন্যায় বিঁধিতে লাগিল—তাঁহার মুখখানা শ্রাবণের ভরা মেঘের ন্যায় অন্ধকার হইয়া আসিল—তিনি মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, ভগবান কি এমনই করিবেন, তাঁহাকেই কি দোষের ভাগী হইতে হইবে—না কখনই নয়! রমণীর উপর মন্ত্রীর বিশ্বাস অটল ভাবেই রহিল।

সে দিনটা সকলেরই নিকট অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—রাত্রিটা আরও দীর্ঘ—সে দীর্ঘ নিশার যেন আর অবসান নাই। রাজপুরীর সকলেই যেন প্রভাতের আরাধনায় নিমগ্ন ;মহারাজ শয্যায় পড়িয়া ছটফট করি-

তেছেন—নিমিলিত চক্ষে নিদ্রা নাই—রাত্রির যেন আর শেষ নাই—তিনি এক-বার উঠিলেন ধীরে ধীরে আসিয়া মহারাণীর কক্ষদ্বার উন্মোচন করিলেন। গৃহমধ্যে দীপ জ্বলিতেছিল—তিনি দেখিলেন তখনও সেই রমণী মহারাণীকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া শয্যার উপর বসিয়া আছেন, মহারাজ কিছু না বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব গীতধ্বনী তাঁহার কর্ণে আসিয়া বাজিতে লাগিল—কে যেন বীণা বাজাইয়া প্রভাতকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে।

"এস প্রভাত আজ মধুর সাজে সাজিয়া
নব অনুরাগে নবীন হাস্য বিলাইয়া,
এস এস আজ তোমার কনক কিরণ ছড়াইয়া
বিশ্বমাঝে আজ সুপ্রভাত হইয়া!
এস আজ তুমি দু:খ দৈন্য নাশিয়া
আমরা লইব তোমাকে বরিয়া!

মহারাজ তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন দূরে একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী একতারা বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

এস প্রভাত আজ শান্তিসলিল ছিটাইয়া
তোমার ফুলের সুবাস মাখিয়া!"

মহারাজ একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ন্যাসী রাস্তার একটা বাঁকে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মহারাজ অস্ফুট স্বরে বলিলেন, হে ভগবান, এই সন্ন্যাসীর কথাই যেন ঠিক হয়। আজিকার প্রভাত যেন আমাদের সুপ্রভাত হয়—যেন সমস্ত দুঃখ দৈন্য নাশ করিয়া আমাদের দ্বারে শান্তিসলিল ছিটাইয়া দেয়। তখন পূর্ব্বাকাশ নানা রঙে রঞ্জিত হইয়াছে—বিহঙ্গমের কলকণ্ঠ চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজ প্রাতঃকৃত সমাপন করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে মন্ত্রী আসিয়া অভিবাদন করিলেন—তারপর একে একে পরিজনবর্গ অনেকেই আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

মন্ত্রী মহারাণীর কক্ষমধ্যে আসিয়া রমণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মা আমাদের মহারাণী——"

"রমণী কহিলেন "মহারাণী ত বেশ আছেন—আর খানিক পরে বোধ হয় তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে।"

এই সময় মহারাজ ও আরও কয়েকজন আসিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন আটটা বাজিতে কুড়ী মিনিট বাকি আছে—মহারাণীর চক্ষু একবার উন্মিলিত হইল—কিন্তু তখনই আবার মুদিয়া আসিল। এই সময় রমণীর আদেশে সকলেই একটা পরদার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী মহারাণীর মুখের নিকট একবার হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "মা, উঠে বসুন বেলা হয়েছে অনেক ?"

যাদুকরের ভেল্কির মত পঙ্গু মহারাণী সহসা উঠিয়া বসিলেন। সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ডাক্তার কহিলেন—She is not an ordinary woman she got some superhuman power.

পুলকচঞ্চল হৃদয়ে মহারাজ কহিলেন "উনি দেবী"।

মন্ত্রী কহিলেন "আমি ত পুর্ব্বেই আপনাকে সে কথা জানিয়েছিলুম।"

মহারাণী উঠিয়া বসিয়া রমণীর মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে কহিলেন "মা তুমি কে ?"

রমণী ধীর ভাবে কহিলেন "মা আমি আপনার মেয়ে।"

"অ্যাঁ, তুমি আমার মেয়ে—" একটা নিবিড় কৃতজ্ঞতায় যেন মহারাণীর প্রাণটা গলিয়া গেল—তাঁহার চখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

"হ্যাঁ মা আমিই তোমার মেয়ে বলিয়া রমণী মহারাণীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। রমণীর করস্পর্শে মহারাণীর দুর্ব্বল দেহে যেন একটা নববলের সঞ্চার হইল—যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তির বলে মহারাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রমণীর হস্তধারণ করিয়া অতি সহজ ও সুস্থ ভাবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরাবর বারাণ্ডা দিয়া মহারাজের কক্ষে চলিয়া গেলেন—যেন তাঁহার কোন রোগই ছিল না।

ষট্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

মহারাণীর এই অপূর্ব্ব আরোগ্য সংবাদ নিমেষ মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই দিন অপরাহ্নে রাজবাড়ীতে একটা মহাভোজের আয়োজন হইল। নহবত্‌খানায় আবার নহবত্ বাজিয়া উঠিল। পত্রপুষ্পে সুশোভিত, গীত বাদ্য হাস্যপরিহাসের আনন্দ কোলাহলে রাজবাড়ী আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। মহারাজের আজ সত্যসত্যই সুপ্রভাত হইল।

মরণের মুখ হইতে যে মানুষ ফিরিয়া আসে, কেবল সেই বলিতে পারে মরণ কি ভীষণ! মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী চিত্রগুলি কেমন করিয়া তাহার হৃদয়ে বিকট ভাবে অঙ্কিত হইয়া মুহু মুহু ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়—কেমন করিয়া মৃত্যু ধীরে ধীরে আপনার নিকট লইয়া আসে। মহারাণীর সমস্ত কথা মনে পড়িল। তাঁহার জীবন মরণের সন্ধিস্থলে কোন্ দেবী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—কাহার পদ্ম হস্ত স্পর্শে মরণের দূত দূরে সরিয়া গেল—কে তাহাকে মৃত্যুর নিবিড় বেষ্টন হইতে টানিয়া আনিলেন—কে সে দেবী! কে তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিল। মহারাণীর শিরায় শিরায় তখন পুলকের শোণিত ছুটিতেছিল—তাঁহার আনন্দ-বিহ্বল হৃদয়টা তখন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রমণী তাঁহাকে দুই হস্তে ধরিয়া বিনয়নম্র মধুর স্বরে কহিলেন—"মা অমন করে হটাৎ দাঁড়িয়ে উঠবেন না—আপনি এখন বড় দুর্ব্বল আছেন, চাই কি মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন।"

মহারাণী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার ক্ষীণ হস্তে রমণীকে বেষ্টন করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে কহিলেন—"মা, তুমি দেবী! আমি কি দিয়ে তোমাকে বরণ করব মা! কি আছে আমার"—বলিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তার মালা খুলিয়া রমণীর কমণীয় কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন এবং করযুগল হইতে হীরক-খচিত বলয় খুলিয়া রমণীর হস্তে পরাইয়া দিয়া তাঁহার সীমন্তের সিন্দুর উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তখন রৌদ্র ও বৃষ্টির অপূর্ব্ব সমাবেশের ন্যায় তাঁহার নব বিকশিত মুখের উপর দিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

রমণী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চল নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে মহারাণীকে পালঙ্কের উপর বসাইয়া বিনীত ভাবে কহিলেন "মা! এ রত্নালঙ্কার আমাকে কেন মা—এ নিয়ে আমি কি করব—রাখব কোথায়, চোরে ডাকাতে লুটে নিয়ে যাবে। এ আমার কাজ নেই," বলিয়া রমণী অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া মহারাণীর পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন।

"মা এ জিনিস আমি তোমাকে দান করেছি—আমি আর ফিরে নেব না, তুমি না নাও আমি ফেলে দেব।" মহারাণীর স্বরটা অভিমানসূচক।

"মা আপনি রাগ করবেন না, আমি সামান্য গরীব, এ জিনিস আমার কাছে থাকলে লোকে আমাকে চোর বল্‌বে—অথচ আমার কোন কাজে আসবে না—আমার রাখবারও জায়গা নেই।"

"মা আমি হাতে তুলে দিয়েছি—আমার দান তুমি নাও, একদিন না একদিন কোন কাজে আসতে পারে। এখন না নাও থাক—আমি তোমার রাখবার জায়গা করে পাঠিয়ে দেব" বলিয়া মহারাণী অলঙ্কার কয়খানি উপাধানের নিচে রাখিয়া দিলেন।

রমণী আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরিচারিকা আসিয়া খবর দিল মহারাজ আসিতেছেন।

রমণী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মহারাজ নিকটে আসিলে রমণী বিনয় বচনে কহিলেন "মহারাণী এখন বেশ সুস্থ হয়েছেন—অনুগ্রহ করে আমাকে বিদায় দিন।"

"মা আপনাকে বিদায় দিতে আমার মন সরচে না। আপনি কেন আমাদের সঙ্গে আমার দেশে চলুন না? সেখানে আপনি আমাদের গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাকবেন।"

রমণী নতমুখে কহিলেন "আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলব না—আমায় মাপ করবেন আমি কাশী ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না, গুরুর আজ্ঞে।"

"তবে বলুন আপনার কিং চাই—কত টাকার দরকার কি দিলে আপনি সুখী হবেন।"

"আমি একটী পয়সাও চাই না—আপনার আশীর্ব্বাদ আমার লক্ষ মুদ্রা—তাই দিলেই আমি সুখী হব।"

"আমি সামান্য মানুষ, আপনি দেবী, আমার কি ক্ষমতা যে আপনাকে আমি আশীর্ব্বাদ করি।"

"আমি আপনার রাজপুরীতে সামান্য একজন দাসীর যোগ্যা নই, আমাকে দেবী বলে লজ্জা দেওয়া কেন?"

"আপনি আমাদের সংসারের পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়ে এনেছেন, এই যে এত আনন্দ কোলাহল—এ শুধু আপনার আশীর্ব্বাদে।"

"আমি কিছু নই ভগবানই সব—আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।"

"সে যা হোক আপনাকে কিছু দিতে না পারলে আমার মনটা কিছুতেই স্থির হচ্চে না। আমি শুনেছি আপনি একখানি সামান্য কুটিরে থাকেন। আমার ইচ্ছে আপনার বাসের জন্যে একখানি পাকা স্থায়ী বাড়ী তৈরি করে দিই।"

"আমার বাসের জন্য ইমারতের কিছুই প্রয়োজন নাই—তবে যদি অভয় দেন ত একটী কথা বলি"

মহারাজ উৎসাহের সহিত কহিলেন "অবশ্য বলবেন বৈকি, কি আপনার বলবার আছে বলুন।"

রমণী ধীরে ধীরে কহিলেন "দেখুন মহারাজ, এই পবিত্র কাশীধামে অনেক দেশদেশান্তর থেকে লোকে তীর্থ করতে আসে। এখানে এসে যারা হটাৎ পিড়ীত হয়ে পড়ে—তাদের দেখবার কেউ থাকে না, অর্থাভাবে ঔষধপত্রেরও ভাল ব্যবস্থা হয় না, একটা জঘন্য স্থানে পড়ে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। আবার যাদের কোন সংক্রামক ব্যাধি হয়—লোকে তাদের রাস্তায় ফেলে দেয়—তারা বিনা চিকিৎসায় পথে ঘাটে পড়ে প্রাণ হারায়—আপনি যদি দয়া করে এখানে একটা হাঁসপাতাল তৈরি করে দেন তাহলে অসহায় রোগক্লিষ্ট যাত্রিদের নিকট আপনার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে আর আমারও একটা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।"

মহারাজ প্রফুল্ল অন্তরে কহিলেন "আপনার উদ্দেশ্য সাধু—আপনার এই মহৎ উদ্দেশ্য অবশ্য পূর্ণ হবে।"

"মহারাজের জয় হোক—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

রমণীর আশীর্ব্বাদ বাণী যেন মহারাজের হৃদয়ে পুষ্প বৃষ্টি করিল। তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিলেন—"এই বাড়ীখানা আপনার হাঁসপাতাল হবে—আর এই বাড়ীর পিছনে যে বাগানটা আছে সেইখানে আপনার বাসভবন হবে। আমি এখান থেকে যাবার পূর্ব্বে সমস্ত ঠিক করে যাব।"

একটা অচিন্তনীয় পুলকস্পর্শে রমণীর হৃদয়টা তখন টলমল করিতেছিল—তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা স্পষ্ট বাহির হইল না। তাঁহার মুখের উপর তখন একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রমণীকে নিরুত্তর দেখিয়া মহারাজ কহিলেন "আপনার আর কিছু বলবার আছে?"

রমণী কহিলেন "না।"

"তবে আমি মন্ত্রিকে ডেকে পাঠাই তিনি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

"আমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে আর বৃদ্ধ মন্ত্রিকে কষ্ট দেবার দরকার নেই। আমার সঙ্গে একজন দাসী দিলেই যথেষ্ট হবে।"

"আচ্ছা তাই হবে" বলিয়া মহারাজ একজন দ্বারবানকে ডাকিয়া গাড়ী তৈরি করিতে আদেশ দিলেন।

রমণী আপনার কুটিরে আসিয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন। খানিক দূর আসিয়া যে বাটীতে হরিপদর মাতা থাকিতেন, সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন। হরিপদর মাতা তখন একখানি কম্বলাসনে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন।

রমণী নিকটে আসিয়া কহিলেন, "মা দুদিন আসতে পারিনি কোন কষ্ট হয়নি তো?"

"আমার আর কষ্ট কি মা—এখন বাবা বিশ্বেশ্বর একটু স্থান দিলেই সব কষ্ট জুড়িয়ে যায়। তুমি আসতে পারনি কেন মা, তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়েছিল।"

"আমি এখানে ছিলুম না মা—এক যায়গায় গিয়েছিলুম।"

"তাই ভাল, আমি ভেবেছিলুম কোন অসুখবিসুক করেছে—আহা গরিবের মেয়ে তুমি তোমার দেখবার কেউ নেই। দেখ মা যে বাবুটী আমাকে এখানে রেখে গিয়েছেন তিনি খুব ভাল—সে দিন আমাকে দেখতে এসেছিলেন—তিনি নাকি আবার ডাক্তার। তাঁকে তোমার সব কথা বললুম মা—আমাকে তুমি এত সেবাযত্ন কর শুনে খুব খুসী হলেন তিনি তোমাকে কিছু দেবার জন্যে এক দিন এখানে বসে রইলেন। তুমি এলে না দেখে তিনি কলকেতায় চলে গেলেন—কাজ ক্ষতি করে কি তিনি এখানে বসে থাকতে পারেন?

"এবার তিনি এখানে এলে তাঁকে বলবেন আমি এ কাজের জন্যে তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না—এ আমার কর্ত্তব্য কাজ।"

"তিনি বড় লোক তাঁর কাছে কিছু নিলিই বা মা।"

"না মা এখন আমার কিছু অভাব নেই—যখন আমার অভাব হবে তখন আমি তোমাকে এসে জানাব।"

"আচ্ছা মা সেই ভাল—তিনি আর মাসখানেক পরে এসে আমার চোখের ছানি তুলে দেবেন বলে গেছেন। সেই সময় তুমি মা একবার এসো—"

"আসব বৈ কি।"

"তোমার অসুখ করেছে ভেবে বাবুটিকে বললুম তোমাকে একবার দেখে এটু ওষুধ দিয়ে আসতে—তিনি তোমার ঠিকানা চাইলেন, ও মা তা ত আমি জানি না—তোমার ঠিকানাটা মা আমাকে বলে দিও।"

"তা দেবো—এখন নাইতে যাবেন কি?"

"হ্যাঁ মা যাব।"

রমণী আন্‌লা হইতে বৃদ্ধার পরিধানের জন্য একখানি শুষ্ক বস্ত্র লইলেন এবং

তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দশাশ্বমেধঘাটের দিকে চলিতে লাগিলেন।

পথে চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন "নেয়ে এসে আগে দুট যা হয় রেঁধে তোমাকে খাইয়ে তবে আমি বাড়ী যাব—এ দু'দিন তোমার ভাল খাওয়াই হয়নি মা!"

বৃদ্ধা কহিলেন "যাদের বাড়ী আমি থাকি তাঁরাও আমাকে যত্ন করেন—তবে তোমার মত নয় মা—তাঁরা করেন কেবল পয়সার জন্যে—কিন্তু তুমি এত যত্ন কর কেন মা—আর জন্মে তুমি কি আমার কেউ ছিলে?"

রমণী একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "তা হবে মা।"

"তোমার কে আছে মা?"

"আমার ভগবান আছেন।"

"আমারো তাই মা, আমারো তাই। আমার জাজ্বল্লিমান সংসার ছিল—আমার ছেলে ছিল, বৌ ছিল—মেয়ে ছিল অমন ছেলে কলিতে হয় না—মাগো কপাল দোষে সব হারালুম মা সব হারালুম। দুধের মেয়ে আমার—বে দিলুম—ঘর করতে গেল আর ফিরে এলো না—মা আমি সব খেয়ে বসে আছি—মরবার সময় এক গণ্ডুস জল দেবার কেউ নেই" বলিয়া বৃদ্ধা পথের মাঝে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাণবিদ্ধ পক্ষির ন্যায় রমণীর প্রাণটা তখন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, একটা রুদ্ধ ব্যথা বুকের মাঝে চাপিয়া রাখিয়া রমণী কহিল "এই যে মা আমি রইচি তোমার ভাবনা কি—কেঁদনা।"

অশ্রু মুছিয়া বৃদ্ধা কহিল "তুমি ত বাছা পর।"

"পরই তো আপনার হয় মা—বৌটি যখন প্রথম ঘর করতে আসে তখন সে তো পরের মেয়ে—তারপর সে কি আপনার হয় না?"

"ঠিক বলেছ মা—বুড় হয়েছি কি বলতে কি বলি—কিছু মনেও থাকে না আমার কথার দোষ নিও না। এই দেখ না কেঁদেকেটে আমার ছেলের অকল্যাণ করছিলুম—ডাক্তার বাবু বলে গেলেন, সে ফিরে এসেছে আমার চোক ভাল হলে তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন—কথাটা কিন্তু আমার স্তোক বাক্য বলেই মনে হল—আমার হরিপদ আমি বেঁচে আছি শুনে যে দেখতে এল না, এ কথাই আমার বিশ্বাস হয় না।"

রমণীর দেহের উপর যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবল ধাক্কা আসিয়া

লাগিল, সে প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল ডাক্তার বাবুর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা বিশ্বেশ্বর করুন তাঁরই কথা ঠিক হয়।"

আনন্দবিগলিত কণ্ঠে বৃদ্ধা কহিলেন, "সেই কথাই বল মা—সেই কথাই বল।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শীত সমাগম

—:০:—

শেফালী গন্ধে গিয়েছে শরৎ
হেমন্তও গেল বয়ে
জর্জ্জর শীত এসেছে আজিকে
শিশির সমীর লয়ে,
ফুটেছে কলাই সরিষার ফুল
আজিকে ক্ষেত্র ভরে
শ্যামল গুচ্ছ যবের শীর্ষ
হিম সিক্ত প্রান্তরে,
আতসী গাঁদা স্তবকে স্তবকে
ফুটেছে মালঞ্চ ভরে
আকুল চ্যুত মুকুল গন্ধে
মুগ্ধ ভ্রমরা ফেরে,
খর্জ্জুর কুঞ্জ ঢালিছে কেবল
স্নিগ্ধ মধুর ধারা
প্রভাতে কি সাঁঝে গগনে ভুবনে
কুয়াশার জালে ঘেরা,
পক্ক পত্র কাননের তলে
পড়িতেছে ঝরে ঝরে
কম্পিত বিহগ গুন্ঠিত ভাবে
মৌন আপন নীড়ে,

পুঞ্জ পুঞ্জ নবীন ধান্য
আজিকে সকল ঘরে
অঙ্গন কোণে মুলায় পালঙ্গে
গিয়েছে পল্লি ভরে,
হীন তেজ আজি সূর্য্য কিরণ
অস্ফুট গগন কোলে
পূর্ণিমা নীশায় পাণ্ডুর শশী
পাংশু জোছনা ঢালে ;
জড়ত্ব এসেছে জীবনে মোর
অনিচ্ছা সকল কাজে
দূরে কাহার করুণ আহ্বান
কেবলি শ্রবণে বাজে ॥

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দরিদ্র সাহিত্যিক

(গল্প)

মজ্জাগত জ্বরের ন্যায় সাহিত্য সেবাটা চন্দ্রনাথের হাড়ে মাসে জড়াইয়া ছিল। শত কর্ম্মের মাঝেও সে দিনান্তে একবার সাহিত্য দেবীর সেবা করিত। সংসারে সে, তাহার মাতা, একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার সহধর্ম্মিণী চারুশশী ও পৈত্রিক শালগ্রাম শীলা ব্যতিত আর কেহই ছিল না। সে একটি সরকারি আপিসে সামান্য মাহিনায় চাকরি করিত এবং সকালে টুইসনি করিয়া যাহা পাইত তাহাতেই তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটি কোনরকমে চলিয়া যাইত। চন্দ্রনাথ গোঁফ দাড়ী বিবর্জ্জিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কুমার মস্তকে একটি নাতি দীর্ঘ শিখাও ছিল। সে প্রত্যহ নিশীথে তৈল দাহ করিয়া সাহিত্য দেবীর আরাধনা করিত। তাহার এই ঐকান্তিক সাধনার ফলে সে কতকগুলি কবিতা, লিখিয়া ফেলিল এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে শুনাইল। সকলেই বলিল ভাবে, ভাষায় ছন্দে বন্দে

কবিতাগুলি অতুল হইয়াছে। কেহ বা সেগুলিকে মাসিকের পৃষ্ঠায় কেহ বা পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু ছাপাইবার ব্যয় ভার গ্রহণ করিতে কেহই স্বীকার হইল না।

চন্দ্রনাথ ক্রমাগত : তিন মাস ধরিয়া মাসিক সাহিত্য সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয়দের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তিন টাকা সাড়ে তের আনা ট্রাম ভাড়া খরচ করিয়া ও এক জোড়া চটি জুতা ছিঁড়িয়া শেষে সাহিত্যের বাজারে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। শুনিল সে নূতন লেখক তাহার লেখা ছাপা হইতে পারে না। কথাটা সিমেণ্টের মত চন্দ্রনাথের বুকের মধ্যে জমিয়া গেল—সে মর্ম্মাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল আর সে লেখনি ধারণ করিবে না। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে কার্য্যে তাহা হইয়া উঠে না। চন্দ্রনাথের অত বড় প্রতিজ্ঞাটা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। জলবুদ্বুদের ন্যায় হঠাৎ মিলাইয়া গেল। ইহাতে তাহার দোষ কি? সত্য সত্যই যখন সাহিত্য দেবী তাহার মস্তিষ্কে আবির্ভূত হইয়াছেন—তখন সে বেচারা করে কি? তাঁহার সেবা ত করিতেই হইবে। তাতে তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক। চন্দ্রনাথ এবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত একখানি উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়া দিল। সে ভাবিল দেখা যাক সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার একটু স্থান হয় কিনা! কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে আমিও একজন হতে পারি কি না। কত লোক অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পুস্তক রচনা করিয়া কত উপায় করিল—কত নাম কিনিল—আর আমার এই সামাজিক উপন্যাসখানা কি একেবারে ভেসে যাবে! তাও কি হয়! চন্দ্রনাথ মস্ত একটা আশার ভিতর আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্য দেবীর জুগল চরণে অঞ্জলি দিতে লাগিল। সে প্রত্যহ আপিস হইতে আসিয়া আহারাদির পর রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে সাহিত্য দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত থাকে। ইহাতে চারুশশীর বড়ই বেজার বোধ হইত। এক দিন সে এক ঘুমের পর উঠিয়া দেখিল লেখনি হস্তে চন্দ্রনাথ দীপাধারের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে বসিয়া নিমিলিত নেত্রে কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বুঝি তাহার সাহিত্য দেবী হটাৎ এই সময় মস্তিস্কের বাসা ছাড়িয়া সশরীরে তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—তাই বুঝি সে আপনাহারা হইয়া তন্ময়ভাবে তাঁহার ধ্যানে রত ছিল। বুঝি সে তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যের একটি অঙ্গ তাহার মানস চক্ষের মধ্যদিয়া ধীরে ধীরে হৃদয় ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে ছিল। সমস্ত সাহিত্য জগতটা যেন তাহার হৃদয় মন্দিরের ক্ষুদ্র দর্পণে এতটুকু হইয়া প্রতিফলিত হইতে ছিল।

সে তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। কিন্তু এ সুখ তাহার ভাগ্যে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

চারুশশী চন্দ্রনাথকে ধ্যান পরায়ণ সাধুর মত নিসাড় ভাবে বসিয়া ঘুমাইতে দেখিয়া, তাহার রমণী সুলভ কোমল প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল, সে মনে মনে সাহিত্য দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া, চঞ্চল ভাবে বলিয়া উঠিল "হ্যাঁগা, ওগো, শুনচ, রাত যে একটা বাজে, আজ কি আর শুতে হবে না, ঐখানে বসে বসেই কি সারারাত ঘুমুবে ?"

চন্দ্রনাথ সমাধিস্থ ঋষির ন্যায় নিরবে বসিয়া রহিল।

চারুশশী নিরুপায় হইয়া চন্দ্রনাথের স্কন্ধদেশ ধরিয়া অল্প একটু জোরে নাড়া-দিল। চন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল !

চারুশশী মৃদু হাসিয়া কহিল "ভয় নেই আমি মানুষ—বলি আজ কি শুতে হবে না, এই খানেই বসে বসেই ঘুমুবে ?"

চন্দ্রনাথ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল "কে বল্লে আমি ঘুমুচ্চি, কে তোমাকে ডাকতে বললে—কেন তুমি আমার গা নাড়া দিলে ? তুমি আমার কি ক্ষতি করলে তা তুমি জান ? আমার দু'ট টাকা গেলেও এত কষ্ট হত না।"

চারুশশী বিনীত ভাবে কহিল "কেন, হয়েচে কি ?"

চন্দ্রনাথ ভ্রূভঙ্গি সহকারে স্বরটা আরও একটু কড়া করিয়া বলিল" হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ডু, সব মাটি হয়ে গেল। সমস্ত accumilated thoughts disconneot হয়ে গেল ! সব গোলমাল হয়ে গেল, ছি ছি ! এমন কাজও করে ?"

চারুশশী নম্র স্বরে বলিল "আমার ঘাট হয়েচে—কিন্তু আমি দেখলুম তুমি ঘুমুচ্ছিলে।"

চন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল "নানা আমি ঘুমাইনি, নায়ক নায়িকার চরিত্রের developmentএর জন্যে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলুম। এখন বুঝতে পারলে, তুমি আমার কি ক্ষতি করলে !"

চারুশশী ধীর ভাবে কহিল "দেখ আমি মেয়ে মানুষ আর সে রকম বিদ্যেও নেই, কাজেই ও সব কিছু বুঝি সুঝি না, তবে মনে একটা ভয়—মানুষের এত ভাবা ভাল নয়, ভেবে ভেবে অনেক মানুষ পাগল হয়ে যায়।"

চন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া কহিল "ছিছি চারু এত ভুল বিশ্বাস তোমার ! সাহিত্য সেবায় যদি মানুষ পাগল হয়, সে পাগল আমি হতে ইচ্ছে করি !"

চারুশশী জিব্ কাটিয়া কহিল "ছিছি অমন কথা মুখে এনো না ; অল্প বুদ্ধি মেয়ে মানুষ আমি আমার ভুল চুক পদে পদে—"

চন্দ্রনাথ কথায় বাধাদিয়া বলিল, "তা বেশ আরত কোনও ভয়ের কারণ নেই, এখন সুখে নিদ্রা যাও।"

চারুশশী গাঢ় স্বরে বলিল, "ভয়ের আরও একটা কারণ আছে, যদি কিছু মনে না করত বলি।"

চন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল "বলে ফ্যাল, পেটে রাখা ভাল নয়, আবার পেট ফুলবে।"

চারুশশী ধীরে ধীরে বলিল "ভয় হয় এই জন্যে—হয় তুমি রাত্রি জেগে জেগে একটা (ঈশ্বর না করুণ) মহা অসুখে পড়বে ; না হয় এই ছাই ভস্ম বইখানা লিখে, প্রকাশকদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবে, কেউ বলবে নতুন লেখক, এখন মক্স করগে—কেউবা হয়ত অপমান করে তাড়িয়ে দেবে, তখন শরীর পাত মনস্তাপ। তাই বলি বই টই লেখা ছেড়ে দাও। সন্ধ্যা থেকে যদি রাত্রি নটা অবধি ছেলে পড়াও—তা হ'লে তবু কিছু কিছু ঘরে—মিছে এ ভুতের বেগার কেন খাটা।"

চন্দ্রনাথ স্নেহ ভরে বলিল "দেখ চারু সাহিত্য সেবায় মনটা যে কত দূর উন্নত হয়—প্রাণের ভিতর যে কি একটা আনন্দের লহরি ছুটে বেড়ায়—কতটা আশা যে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকে, তা দু পাঁচটা টাকার সঙ্গে তুলনাই হয় না। তুমি মেয়ে মানুষ তায় লেখা পড়া জাননা ও সব কিছু বুঝতে পারবে না।

চারুশশী প্রদীপটা নিভাইয়া দিয়া কহিল—"আমি বুঝতে চাইনা, শুতে হয় সোও, না হয়, ঐখানে বসে বসে ঝিমাও আর পোড়া সাহিত্যের সেবা কর।"

চন্দ্রনাথ নিরুপায় হইয়া বাক্য যুদ্ধের অবসানে শয়নে পদ্মলাভ করিল।

২

চন্দ্রনাথ অক্লান্ত হৃদয়ে ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ উপন্যাস খানি সমাপ্ত করিল। উহার নাম রাখিল নির্ম্মলা। চন্দ্রনাথ পাণ্ডু-লিপি খানি তাহার বন্ধুবান্ধবদের ভিতর অনেককেই পড়িতে দিয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া সকলেই নির্ম্মলার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিল। কেহ বলিল চন্দ্রনাথের হাত বেশ পাকিয়াছে, কেহ বলিল আমাদের ঘরের কথা লইয়া তাহার প্লট রচনার ক্ষমতা অদ্ভুত—কেহ বলিল তাহার ভবিষ্যত উজ্জ্বল ! বন্ধু-

বান্ধবদের প্রশংসা বাক্যে চন্দ্রনাথের বুকটা ফুলিয়া উঠিল, সে ভাবিল তাহার এতটা শ্রম সার্থক হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পুস্তকখানিরও ছাপাইবার ভার লইতে কেহই সম্মত হইল না।

চন্দ্রনাথ তাহার কোন ধনশালী সাহিত্যিক বন্ধুকে বলিয়াছিল যদি সে এই পুস্তকখানি ছাপাইবার ব্যয়ভার লয়, তাহা হইলে এই পুস্তক বিক্রয় হইয়া ছাপাই খরচা বাদে যে লাভ হইবে তাহাতে উভয়ের সমান অংশ থাকিবে। ইহার উত্তরে বন্ধুটি বলিয়াছিল—"দেখ চন্দর আজকাল নামজাদা লোকের লেখা না হলে, বাজারে বিক্রি হয় না, তোমার নির্ম্মলা যদিও সর্ব্বাংশে উপাদেয় হয়েচে, তবুও বাজারে যে বিক্রি হবে, তা আমার বোধ হয় না। কিন্তু এ কথাও বল্‌তে পারি এই নির্ম্মলাই যদি কোন খ্যাতনামা লেখক প্রণীত বলে প্রকাশ হয়, তা হলে বাজারে একটা হাঁক ডাক পড়ে যাবে এবং অনেক কাপি বিক্রিও হবে। আরও দেখ তুমি নূতন লেখক একখানি বই প্রচার করতে হলে, অনেক টাকার দরকার, অনেক কাগজে advertisement দিতে হয়, খালি বই ছাপিয়ে ঘরে রেখে দিলে কোন লাভ নেই, সে যা হোক যদি আমার কথা শোন ত এক কাজ কর।"

চন্দ্রনাথ যেন কি একটা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে গম্ভীর ভাবে বলিল, "কি করতে হবে বল প্রস্তুত আছি।"

বন্ধুটি বলিল, "এখন তুমি কোন একটি ভাল মাসিকপত্রের সম্পাদকের কাছে গিয়ে, তোমার এই বইখানি তাঁকে দেখাও। বোধ হয় বইখানি কিছুতেই তাঁহার অমনোনীত হবে না—তার পর তোমার বইখানি যদি তাঁহার পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়—তখন বাজারে তোমার একটা নাম হবে। আর মাসিক পত্রিকায় তোমার নির্ম্মলা শেষ হতে বোধ হয় এক বৎসর লাগবে। এই সময়ের ভিতর আরও দুই একটি উপন্যাস লিখে, অন্যান্য মাসিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা কর। সম্পাদকেরা বোধ হয় তোমার উপন্যাস আগ্রহের সহিত প্রকাশ করবে—কারণ তোমার লেখার মাধুর্য্য আছে—ভাষা-টুকুও বেশ ঝরঝরে। এতে আপাতত তোমার কোন লাভ নেই বটে, কিন্তু সম্পাদকের লাভ যথেষ্ট আছে। তার পর যখন তোমার উপন্যাসগুলি তিন চার খানি মাসিকে প্রকাশ হতে থাকবে, তখন অন্যান্য সম্পাদকেরা তাদের কাগজের জন্যে তোমাকে লিখতে অনুরোধ করবে—তখন তোমার পসার বাড়তে আরম্ভ হবে, এদিকে যখন এক একখানি বই মাসিকে শেষ হয়ে আসবে,

অমনি ছাপিয়ে বাজারে বার করতে পারলে কিছু বিক্রি হবে বলে আশা করা যায়। তখন তুমি আমার কাছে এসো আমি চেষ্টা করব।"

বন্ধুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মলিন মুখে বিদায় হইল। সে বুঝিল সাহিত্যের পথ, বড় সুগম নহে, পঙ্কিল, পিচ্ছল, কণ্টকাকীর্ণ। এ পথ অতিক্রম করিতে হইলে অনেক আছাড় খাইতে হয়, এক গলা কাদা মাখিয়া কণ্টকিত পদে অনেক বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে অনেক সময় সাপেক্ষ। সে ত বুঝিল কিন্তু তাহার মন বুঝে কৈ—মন যে নির্ম্মলা লইয়া পাগল। যতক্ষণ উহা ছাপা না হয় ততক্ষণ যেন তাহার আহার নিদ্রা নাই। বিধির কি বিড়ম্বনা!

৩

মাষ্টার মশাই পড়াটা মুখস্ত হয়েছে—বলব?

চন্দ্রনাথ ছাত্রের প্রতি না চাহিয়াই বলিল "হুঁ"।

যে সময়ে ছাত্রটি পড়ামুখস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে চন্দ্রনাথ একখানা পরিত্যক্ত বঙ্গবাসী লইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিল। সে হঠাৎ উহার প্রথম পৃষ্ঠায় কি একটা দেখিয়া গভীর মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিল।

দুই ছত্র মুখস্ত বলিয়া ছাত্রটির এক স্থানে আটকাইয়া গেল, অনেক চেষ্টাতেও উহা তাহার স্মরণপথের ত্রিসীমানায় আসিল না, তখন সে নিরুপায় হইয়া বলিল মাষ্টার মশাই In has absence the Norman nobles whom he left to rule the land drove the people to তার পর কি?

চন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল "হুঁ"।

ছাত্রটি মাষ্টার মহাশয়ের বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপন পাঠে একাগ্রতা দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ একবার দুইবার তিনবার পড়িল। সে যেন নিবিড় আঁধারের ভিতর একটু আলোক রেখা দেখিতে পাইল। তাহার হৃদয়াকাশে ঘন কুহেলিকা ভেদ করিয়া যেন প্রভাতের তরুণ কিরণ ফুটিয়া উঠিল। তাহার প্রাণে একটা নব আশার সঞ্চার হইল। কে যেন তাহার নয়নকোণে হাসির তুলি টানিয়া দিল।

উহা একটী Pnblishing companyর বিজ্ঞাপন। উহাতে নানাবিধ পুস্তকের মূল্য তালিকার সঙ্গে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল।

নবীন লেখকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ।

আমরা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে, নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়াও এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আমরা নূতন ও পুরাতন লেখকদিগের রচিত পুস্তক সকল অতি সামান্য কমিসন লইয়া প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন নূতন লেখক পুস্তকাদি রচনা করিয়া উহার পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন, আর যদি ঐ রচনা আমাদের মনোনীত হয়, তাহা হইলে আমরা উহা নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া প্রচার করিতে রাজি আছি। কিম্বা উহার সত্ব কিনিয়া লইতে পারি। লেখকগণ পাণ্ডুলিপি পাঠাইবার সময় তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইবেন। General Publishing Company নং ৭৭ কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা। আগ্রহ সহকারে এক টুকরা কাগজে চন্দ্রনাথ ঠিকানাটি লিখিয়া লইল, এবং বুকভরা আশা লইয়া চন্দ্রনাথ বাটীতে ফিরিল।

যথা সময়ে চন্দ্রনাথ আপিসে আসিল, সঙ্গে নির্ম্মলার পাণ্ডুলিপিখানি আনিতে ভুলিল না। আপিসের ফেরতা সে বরাবর ৭৭নং কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল—দেখিল দিব্য একখানি পুস্তকের দোকান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "মশাই আপনারাই কি বঙ্গবাসীতে——" চন্দ্রনাথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাবুটি বলিল "হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাই বটে—কোথা থেকে আস্‌চেন, বসুন" বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া দিল।

চন্দ্রনাথ বাবুটির ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া চেয়ারে বসিল।

বাবুটি ধীরে ধীরে কহিল "আপনার কি চাই বলুন দেখি?"

"আপনারা বিজ্ঞাপনে বলেছিলেন যে যদি কোন নতুন লেখক কোন পুস্তক রচনা করে—আর যদি তা আপনাদের মনোনীত হয়, তা হলে আপনারা নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে প্রচার করবেন।"

"হ্যাঁ আমরা এ সব কাজ নিয়ে থাকি আর লেখককেও কিছু কিছু দিয়ে থাকি।"

চন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত কহিল "সে কি রকম রেটে দেন?"

"আমাদের ছাপাই খরচা ও বিজ্ঞাপন খরচা বাদে যে লাভ হয় তার ৳ অংশ আমাদের আর ৳ অংশ লেখকের।"

চন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না বরং ভাবিল এমন

অপূর্ব্ব সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয় সে বলিল "আমি একখানি উপন্যাস লিখেছি ——"

বাবুটি চন্দ্রনাথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিল, "তা বেশ হয়েছে আপনার সঙ্গে আছে নাকি ? দেখি ?"

চন্দ্রনাথ পকেট হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া বাবুটির হাতে দিয়া বলিল "যদি মনোনীত হয় তা হলে ছাপিয়ে বাধিত করবেন। কত দিনে আমি খবর পাব ?"

বাবুটি খাতাখানা কয়েক বার নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "এখানা রিভিউ করতে আর কদিন লাগবে ! দিন পনের। আপনি এই মাসে ২৭ শে ২৮ শে নাগাদ আসবেন।"

চন্দ্রনাথ কহিল "মহাশয়ের নাম ?"

"আমার নাম নিবারণচন্দ্র ঘোষ—আমি এই ফারমের ম্যানেজার।"

চন্দ্রনাথ একটু বিনীত ভাবে কহিল দেখুন, "এই বইখানার কাপি রাখবার সময় পাইনি, যদি এটা আপনাদের অপছন্দ হয়, আর আপনাকে যদি এখানে দেখতে না পাই, তা হলে ফিরে পাওয়া সম্বন্ধে একটু অসুবিধা হতে পারে।"

"সে কি মশাই, এই যে আমি রসিদ লিখে দিচ্ছি।"

চন্দ্রনাথ রসিদ লইয়া বিদায় হইল—ভারি খুসী, আনন্দ ধরে না। যেন সে একটা আজ অসাধ্য সাধন করিল।

২৭ শে তারিখে বেলা পাঁচটার সময় চন্দ্রনাথ নিবারণ বাবুর সহিত দেখা করিল। নিবারণ বাবু বলিল, "দেখুন আপনার বইটা আমাদের বিনোদ বাবু রিভিউ করতে করতে একটা বিশেষ কাজে দেশে চলে গেছেন, দিন পনের পরেই আসবেন। সেটা এখন তাঁরই কাছে আছে, আপনি পনের শোলো দিন পরে একবার আসবেন। "চন্দ্রনাথ যথা সময়ে নিবারণ বাবুর সহিত দেখা করিল নিবারণ বাবু বলিল দেখুন, "বিনোদ বাবু যদিও দেশ থেকে ফিরেচেন বটে, কিন্তু নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে এখনও সমস্তটা রিভিউ করতে পারেন নি। তবে বলেছেন ছাপা হতে পারে লেখা মন্দ নয়—কিন্তু মাঝে মাঝে addition, alteration করতে হবে। আপনি নতুন লেখক কি না !"

"Codition alteration সম্বন্ধে আপনারা যেমন ভাল বুঝবেন সেই রকম করবেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

"বেশ, তবে আপনি মাস খানেক পরে একবার আসবেন তাহলে ঠিক খবর পাবেন।"

চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল—কিন্তু এ কথা কাহাকেও বলিল না। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিল।

এক মাস পরে চন্দ্রনাথ আবার নিবারণ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। এবার নিবারণ বাবু বলিল "সম্প্রতি বিনোদ বাবু কোন বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষ আবার দেশে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তা এবার তিনি ফিরে এলেই আপনার কাজটা আগে take up করতে বল্‌ব। আপনি আর কষ্ট করে আসবেন না, আমি আপনাকে চিঠি লিখে জানাব।" চন্দ্রনাথের মনটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল সে আপনার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া মলিন মুখে গৃহে ফিরিল। দেখিতে দেখিতে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল—নিবারণ বাবু কিছুই লিখিল না। একদিন কথায় কথায় চন্দ্রনাথ তাহার ধনী বন্ধুটিকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল—সে শুনিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "দেখ চন্দর আমার ত ভাল বোধ হচ্চে না; যখন ছমাস কেটে গেল এখনও উচ্চবাচ্চা নেই তখন আমার বিবেচনায় তোমার নির্ম্মলকে ফিরিয়ে আনাই ভাল—কি জানি যদি বেহাত হয়।"

চন্দ্রনাথ কহিল "আমারও সেই ইচ্ছা, কাল যা হয় একটা করব।" পরদিন চন্দ্রনাথ নিবারণ বাবুর সহিত দেখা করিল। এবার নিবারণ বাবু যেন একটু বিরক্তি সহকারে বলিল—"আপনি যে রকম তাড়াতাড়ি করচেন, তাতে কি করে কি হয় তা আমি বুঝতে পারচি না। আমাদের আগাম পয়সা খরচ করতে হবে। যতক্ষণ না আমাদের মনঃপুত হয় ততক্ষণ আমরা ছাপতে পারব না এ সব অত তাড়াতাড়ীর কাজ নয়।"

নিবারণ বাবুর নিরস কর্কশ কথা কটা যেন চন্দ্রনাথের প্রাণে শেলবিদ্ধ করিল, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। নাক, মুখ ও কান দিয়া যেন একটা আগুনের হল্কা বাহির হইয়া গেল—সে আপনাকে একটু সংযত করিয়া কহিল "মশাই আর কাজ নেই—বইখানা ফেরৎ দিলে বাধিত হই।"

নিবারণ বাবু মুখভঙ্গি সহকারে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া "সচ্ছন্দে" বলিয়া একটা ড্রয়ার টানিয়া কাপিখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। চন্দ্রনাথ উহা তুলিয়া লইয়া রসিদখানি ফেরত দিয়া গোঁ ভরে চলিয়া আসিল। সে প্রাণের ভিতর একটা মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার এত আশা এত উদ্যম সব যেন কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়া গেল। অদৃষ্টের কি দারুণ অভিশাপ!

৪

নানা কাজের মধ্য দিয়া তিন মাস কাটিয়া গেল। সাহিত্য দেবীর উপর চন্দ্রনাথের যে বিরক্তির লক্ষণটুকু দেখা গিয়াছিল, তাহা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না। সে তাহার বন্ধুর উপদেশ মস্তকে লইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একখানি মাসিক পত্রিকার কার্য্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রনাথ গৃহটির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল উহা অতি অপ্রশস্ত গবাক্ষহীন কুটারী। বাঙ্গালা করিয়া বলিতে হইলে বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে, বাবুরা তাঁহাদের বাটিসংলগ্ন আস্তাবলটী ভাড়া দিয়াছেন, আর সম্পাদক মহাশয়ের কৃপায় উহা এখন মাসিক পত্রিকার কার্য্যালয় রূপে পরিণত হইয়াছে। সে যাহা হউক চন্দ্রনাথ দেখিল সে অপ্রশস্ত গৃহের এক পার্শ্বে একটি বাবু একখানি ছোট টেবিলের নিকট চেয়ারে বসিয়া কতকগুলি খাতাপত্র দেখিতেছেন। আর এক পার্শ্বে একটি সতের আঠার বৎসরের বালক মেঝেতে মাদুরে বসিয়া কতকগুলি কভার আঁটা মাসিক পত্রিকার উপর একটা লম্বা খাতা দেখিয়া গ্রাহকগণের নাম ঠিকানা লিখিতেছিল।

চন্দ্রনাথকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাবুটি বলিয়া উঠিলেন "কি চাই? কাকে খোঁজেন?"

চন্দ্রনাথ বিনীত ভাবে কহিল "আপনার নাম কি কৈলাস বাবু—আপনিই কি "মিলনের" সম্পাদক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বসুন" বলিয়াই কৈলাস বাবু তাঁহার নকল সোনার চসমাখানি খাম হইতে বাহির করিয়া নাকের উপর লাগাইয়া খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন—যেন ভারি ব্যস্ত।

কৈলাস বাবু বসিতে বলিলেন,—কিন্তু চন্দ্রনাথ বসিবে কোথায়? দ্বিতীয় আসন সে খুঁজিয়া পাইল না। বালকটি তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—সে চাহনীর অর্থ যেন সে তাহার মাদুরের এক পার্শ্বে আসিয়া বসে। কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিল না—সে দাঁড়াইয়াই রহিল। প্রায় পাচ মিনিট পরে কৈলাস বাবুর অবসর হইল, তিনি তাঁহার আবক্ষ লম্বিত দাড়ীর ভিতর কয়েকটি অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিলেন "আপনি কি আমাদের গ্রাহক? কাগজ পান নি?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে কি নতুন গ্রাহক হবেন।"

"আজ্ঞে না।"

"তবে আপনার কি চাই?"

"দেখুন আমি একখানা উপন্যাস লিখেছি—যদি দয়া করে ধারাবাহিক-রূপে আপনার কাগজে বার করেন তা হলে বিশেষ উপকৃত হই।"

"আপনি আর কখন কোন বই টই লিখেছেন কি? না নতুন লেখক?"

"আমি নতুন লেখক মশাই!"

"তবেই ত আপনারা ছাই ভস্ম যা লিখিবেন, তাই কাগজে বার করতে গেলে ত আর চলে না, তা ছাড়া পুরাণ লেখকদের ভাল ভাল লেখা এত রয়েছে যে ছেপে উঠতে পারি না।

চন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইয়া কহিল—"তবে কি মশাই সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন লেখকদের পথ একেবারেই বন্ধ।"

কৈলাস বাবু নাকের ডগা হইতে চশমা খানি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—"না না তাকেও লওয়া হবে, রচনা যদি ভাল হয় তাহলে সে আপনার জোরে আপনি উঠবে—কেউ তার পথ বন্ধ করতে পারবে না।"

"তবে যদি দয়া করে আমার রচনাটা একবার দেখেন।"

"অবশ্য আপনি যখন এত করে বলছেন, তখন দেখব বৈকি! কিন্তু নতুন লেখকদের এই সব দেখা শুনায় আমাদের অনেকটা সময় বাজে খরচ হয়।"

চন্দ্রনাথ আর কিছু না বলিয়া পকেট হইতে নির্ম্মলার পাণ্ডুলিপি খানি বাহির করিয়া দিল।

কৈলাস বাবু খাতাখানির গুরুত্ব অনুভব করিয়া বলিলেন—"এ যে মস্ত বই, রচনা যদি ভাল হয়, তাহলে মাসিক পত্রিকার উপযোগী করতে গেলে অনেক বাদ সাদ দিতে হবে। যা হোক আমি দেখে রাখব আপনি হপ্তাখানেক পরে আসবেন।"

৫

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, চন্দ্রনাথ পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে বাটি হইতে বাহির হইল, এবং মাঘ মাসের শীতে হিহি করিতে করিতে কৈলাস বাবুর কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিল। কৈলাস বাবু তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, বাবুকটি কোথা হইতে একটি টুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাকে বসিতে দিয়া কহিল—"আপনি বসুন, বাবু এই নিকটেই এক জায়গায় গিয়েছেন এখুনি আসবেন।"

প্রায় পনের মিনিট পরে কৈলাস বাবু আসিয়া টুলস্থিত চন্দ্রনাথকে দেখিয়াই তাঁহার রাশিকৃত কাল কাল গোঁফ ও দাড়ীর মধ্য হইতে কয়েকটি দন্ত বাহির করিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বিদ্রুপস্বরে বলিলেন—"কি মশাই এসেচেন—সেদিন এই জন্যেই বলেছিলুম যে নতুন লেখকদের ছাই ভস্ম লেখা আমাদের হাতে করতে ইচ্ছে হয় না—তবে আপনি নিহাত ধরেছিলেন, তাই আপনার বইটা নিয়েছিলুম—ছিছি ষোল আনাই চুরি।"

চন্দ্রনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল—সে বিস্মিতভাবে বলিল—"সেকি মশাই আপনি বলছেন কি?"

কৈলাস বাবু দাড়ী নাড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—"আর সে কি—চারুচরণ দত্ত প্রণীত ললিতার ভারবেটিম কপি, কেবলমাত্র নাম কটার অদল বদল। ভাগ্‌গি, এক কপি আমরা সমালোচনার জন্যে পেয়েছিলুম, তা না হলে আপনি আমাদের ভারি বিপদে ফেলতেন।"

কৈলাস বাবুর কথা গুলা চন্দ্রনাথের কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। সে জোরের সহিত প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"মশাই এ লেখা আমার, আমি শপথ করে বলতে পারি।"

কৈলাস বাবু মুখভঙ্গি সহকারে তীব্রস্বরে কহিলেন "আপনি আপনার খাতা নিয়ে এখন যান—আমাদের অনেক কাজ আমি সব বুঝেছি। হায়, অভাগা চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ অশ্রুসজলনয়নে বলিল "মশাই আমার একটি নিবেদন—"

"কি শিগ্‌গির বলুন?"

"যদি দয়া করে একবার ললিতাখানি দেখতে দেন? আর ললিতার কি কোন সমালোচনা আপনার কাগজে বেরিয়েছে?"

"হ্যাঁ, গত মাসের কাগজে ললিতার সমালোচনা বেরিয়েছে—অতুল, মাঘের কাগজখানা আর সেই ললিতা বইটা এঁকে একবার দেখতে দাও ত।"

বালকটি চন্দ্রনাথের হাতে বই দুখানি আনিয়া দিল। চন্দ্রনাথ ললিতা খুলিয়াই অবাক—প্রত্যেক কথাটি তাহার নির্ম্মলার সঙ্গে মিলিতে লাগিল। কেবল নির্ম্মলার স্থানে ললিতা অমূল্যর স্থানে প্রফুল্ল ইত্যাদি। মলাটের উপর লেখা ছিল ললিতা শ্রীচারুচরণ দত্ত প্রণীত মূল্য এক টাকা। চন্দ্রনাথ একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিল এ চারুচরণ দত্তটি কে, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইল না, ঐ নামে তাহার কোন পরিচিত লোক ছিল না। সে তাহার নির্ম্মলার

পাণ্ডুলিপিখানি তাহার কয়েকটি বন্ধু ও নিবারণ বাবু ছাড়া আর কাহাকেও দেয় নাই তবে এ ভুঁইফোঁড় চারুচরণ দত্ত কে? কি করেই বা সে তাহার নির্ম্মলার পাণ্ডুলিপি পাইল—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও চন্দ্রনাথ কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পারিল না। ঘটনাটি যেন তাহার নিকট একটা উদ্ভট রহস্যের বিচিত্র প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার প্রাণের ভিতর যেন একটা অত্যন্ত যাতনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে বিনা দোষে কৈলাস বাবুর নিকট অবমানিত ও তাড়িত হইল। সে মনে মনে সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সঙ্কল্প করিল।

চন্দ্রনাথ এইবার মিলনে ললিতার সমালোচনাটি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল :—

ললিতা শ্রীচারুচরণ দত্ত প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। কাপড়ে বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা মূল্য ১৲ টাকা—প্রকাশক শ্রী ——চট্টোপাধ্যায়। নবীন লেখকের নবোদ্যম সার্থক হইয়াছে। পুস্তক খানি পড়িতে বসিলে আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকা যায় না। উহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি নিখুঁত ফটো। ঘটনার বৈচিত্র্যে, রচনার মাধুর্য্যে পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। ভাষা সবল—সরল ও লালিত্যময়। পুস্তক খানি প্রত্যেক গৃহস্থের পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য, উহাতে তাঁহাদের অনেক শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ হইবে। উহা গৃহলক্ষ্মীদের অঞ্চলের ধন। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আমরা এই নবীন লেখকের কল্যাণ কামনা করি।

এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পাঠ করিয়া চন্দ্রনাথ যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে আপনাকে ধন্য মনে করিল—তাহার লেখা যে এত আদরের সহিত গৃহীত হইবে এত উচ্চ প্রশংসা লাভ করিবে, তাহা সে একবারও ভাবে নাই। তাহার বিষাদভরা কাল হৃদয়খানার ভিতর যেন একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; তাহার মুক্ত প্রাণের উচ্চ আশা যেন নিমেষে মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই গভীর আঁধার ঘনাইয়া আসিল—জ্যোতিহীন প্রাণের নীরব বেদনা তাহার ম্লান মুখের মলিন ছবিখানির উপর একটা বিষম কালিমার রেখাপাত করিল। সে ভাবিল হায় আমার এই সৌভাগ্যের কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিব না—যে শুনিবে সেই এখন আমাকে চোর বলিয়া সাব্যস্থ করিবে। আমার শত প্রমাণ থাকিলেও আমি এখন সাধু হয়ে চোর। সাধারণের নিকট ঘৃণ্য—আমি এখন হ্যাক—থু—ছি!

নগদ মূল্য সাড়ে চারি আনা দিয়া চন্দ্রনাথ মাঘের মিলনখানি কিনিয়া লইল। কৈলাস বাবু পয়সা কয়টি পকেটে রাখিয়া অতি কর্কশ বচনে চন্দ্র নাথকে হাঁকাইয়া দিলেন।

মর্ম্মাহত চন্দ্রনাথ কৈলাস বাবুর কার্য্যালয় হইতে নিক্রান্ত হইয়া বরাবর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে এক কপি ললিতা কিনিল আর জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিল যে চারুচরণ দত্তের সহিত তাঁহাদের চাক্ষুস আলাপ নাই কিম্বা তাহার ঠিকানা তাঁহারা জানেন না। চারু চরণের কোন বন্ধু ললিতার পাণ্ডুলিপি তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছিল। তাঁহারা উহা ছাপিবার যোগ্য বিবেচনা করিয়া নিজ ব্যয়ে ছাপিয়া উপযুক্ত কমিসনে প্রকাশক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ভিন্ন কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেছেন। চন্দ্রনাথ চারুচরণের বন্ধুর নাম ও ঠিকানা লইয়া ভগ্ন হৃদয়ে বাটী ফিরিল।

চন্দ্রনাথ তাহার সেই উপদেশ দাতা বন্ধুটিকে ললিতা ও ললিতার সমালোচনা না পড়াইয়া থাকিতে পারিল না। বন্ধুটি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সমস্ত দোষ চন্দ্রনাথের অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"দেখ চন্দর নির্ম্মলার কাপিটা নিবারণ বাবুকে দেবার পূর্ব্বে আমাকে একবার বলা উচিত ছিল।"

চন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। সাহিত্যজগতে সে মর্ম্মান্তিক শিক্ষালাভ করিল।

চন্দ্রনাথ চারুশশীকে সমস্ত ঘটনাটি শুনাইল, চারুশশী কাতর প্রাণে বলিল "যা বলে ছিলুম তাই হল—এই রাত জেগে প্রাণান্ত করে বই লিখে আবার তুমি অবমান কুড়িয়ে আনলে। তোমার এ অবমানে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তাই আমি টিকটিক করি—বই লিখতে বারণ করি। যাদের পয়সার সংস্থান নেই পরের কাছে হাত পাততে হবে, তাদের এ সব কাজে হাত দেওয়া খালি অবমান কেনা। এখন তুমি তোমার সাহিত্য সেবা ছাড়। যখন তোমার পয়সা হবে তখন কোরো; সকাল বিকেল ছেলে পড়াও—তবু দুপয়সা ঘরে আসবে—

চারুশশীর কথা শেষ হইতে না হইতেই চন্দ্রনাথ কহিল "ঠিক বলেছ চারু—আমার যদি কিছু সংস্থান থাকত, তাহলে আমাকে নিবারণ বাবুর পায়ে তেল

দিতে হত না—আর কৈলেস বাবুও আমাকে এমন করে অবমান করতে পারত না। সবই অদৃষ্ট চারু!"

চারুশশী বেদনাকাতর স্বরে বলিল "যা হবার তা হয়েছে এখন আর ও সব ভেবে মাথা গরম করে কি হবে। যাও, শোওগে!"

লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে চন্দ্রনাথ আর নিবারণ বাবুর সহিত দেখা করিল না। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে চারুচরণ দত্ত নিবারণ বাবুর ভাগিনেয় হাওড়াতে থাকে ও ময়দার কলে পনের টাকা মাহিনার চাকরি করে। তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে রহস্যের রুদ্ধ কপাট নিমেষে খুলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ সব বুঝিল, বুঝিয়া নীরবে রহিল।

একদিন যখন চন্দ্রনাথ আপিসে যাইবার জন্য ট্রামে উঠিতেছিল, সেই সময় একখানা লম্বা প্লাকার্ড তাহার হাতে আসিয়া পড়ে। উহা দেখিয়াই তাহার হৃদয়টা স্পন্দিত হইয়া উঠিল, সে কম্পিত হস্তে স্থির নয়নে পড়িতে লাগিল :—

সর্ব্বজন প্রসংশিত শ্রীচারুচরণ দত্ত প্রণীত ললিতা কোন খ্যাতনামা লেখকের দ্বারা নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া মহা সমারোহে আজ আমাদের রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হইবে। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ষড়রস বিজড়িত সামাজিক নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অভিনয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যিনি এ অভিনয় না দেখিবেন তাঁহার জীবনের একটা কোণ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে ইত্যাদি—

চন্দ্রনাথ একবার দুইবার তিনবার কাগজখানি পাঠ করিল। তাহার প্রাণের ভিতর একটা তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল। সে একটা প্রাণখালি করা নিশ্বাস ফেলিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল এবং পাগলের ন্যায় একদিকে চলিয়া গেল। সে দিন আর তাহার আপিসে যাওয়া হইল না।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের পুনরভ্যুদয়

দেশীয় শিল্পবাণিজ্য কিপ্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল তাহা অনেকেই জানেন। এই ধ্বংসপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি শিল্পজাত দ্রব্যে দেশ প্লাবিত হইল। ক্রমে

ক্রমে সুলভ জার্ম্মাণ পণ্য অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ্য বিলাতি দ্রব্যকে পরাস্ত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। আজ আমাদের রাজা ইংলণ্ডেশ্বর জার্ম্মানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, সে কারণ জার্ম্মানির এদেশে বাণিজ্য-আশা কম। আমাদের অনেক অভাব জার্ম্মাণি দূর করিত। যে জাতি যে পরিমাণে আপনার অভাব আপনি মোচন করিতে পারে, সে জাতি সেই পরিমাণে সভ্য; আর যে জাতি যতটা পরের উপর নির্ভর করে সে ততটা অসভ্য। এই মতে যে-ভারত এক সময়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আজ আবার সেই ভারত সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী, সুতরাং অবনতির অতি নিম্ন স্তরে উপনীত।

দেশের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা মোচনের প্রধান উপায় ব্যবসা। আজ দেশবাসী শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। লুপ্ত শিল্প পুনরুদ্ধারের এই প্রকৃষ্ট সময়। দেশের যাবতীয় অভাব দেশ হইতে পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত অবসর। সুখের বিষয় সদাশয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে।

রাজশক্তির আনুকূল্য ভিন্ন কোনো দেশেই কখনো শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ঘটে নাই। শুদ্ধ প্রজাশক্তিতে কোথাও কিছু হয় নাই। রাজা সর্ব্বত্র দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। জার্ম্মাণির চিনি এদেশে সুলভে বিক্রীত হইবার কারণ ঐ চিনি-ব্যবসায়ীরা তদ্দেশীয় রাজার নিকট হইতে বৃত্তি (bounty) পায়। আমাদের দেশীয় চিনি-সংরক্ষণ জন্য কর্জ্জন-গভর্ণমেণ্ট বিদেশাগত চিনির উপর প্রতিকর (Counter vailing duty) স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে করের মাত্রা অতি সামান্য হওয়ায় তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

আমাদের গভর্ণমেণ্ট অবাধবাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করেন। আমাদের শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ প্রার্থনীয়। আমাদের উপযুক্ত মূলধন নাই। সমবেত মূলধন বিনা বিস্তৃত ব্যবসা হয় না। বাষ্পীয় যন্ত্র-সাহায্যে সুলভে উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাণ-প্রকরণ আমাদের জানা নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা-অনুসারে পরিচালিত কলকারখানার কার্য্য-কৌশল শিক্ষা এদেশবাসীর নিতান্ত আবশ্যক। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতেও গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অনেক শিল্পের উন্নতি করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট যেমন রপ্তানি চার উপর Tea-cess বসাইয়া সেই সেসের টাকা হইতে চা-চাষের (tea-plantation) উন্নতির চেষ্টা করেন সেইরূপ যদি এদেশীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য কার্পাস-কর (cotton-duty) ব্যয় করেন তবে ঐ শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

কাঁচা চামড়ার উপর যে-রপ্তানি-শুল্ক আছে তাহার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত শুল্কলব্ধ অর্থ হইতে দেশী কারিকরদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত চর্ম্মপরিষ্করণ প্রথা (Scientific process of tanning) শিক্ষা দিলে চামড়া ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। এইরূপে সামান্য কাঁচা মালের (raw material) উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন করিলে গভর্ণমেণ্ট এদেশের অনেক শিল্পের উন্নতি করিতে পারেন। আশা করি গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কৃপা দৃষ্টি পড়িবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র।

—:০:—

প্রতীক্ষা

নিকুঞ্জে বিহঙ্গ গীতি গেছে থামি ওগো বন্ধু জানি,
ধরি বিধবার বেশ কাঁদিতেছে মাধবী যামিনী ;
ভগ্ন দীর্ণ ধূলিকীর্ণ সুর হারা মরমের বীণা
আনন্দ বাসনা আশা ম্লান মুখে ধরণী নিলীনা,
তবু যেন বাজে কাণে অজ্ঞাত সে সুদূরের কথা
জ্বালায়ে আশার বাতি কে রজনী জাগিতেছে কোথা।
ঝলমল চিনাংশুক মণিহার রতনে জড়িত
কে যেন রাখিছে তুলি সন্তর্পণে করিয়া সজ্জিত,
চম্পক গোলাপ দলে গাঁথিছে কে সুরভীত মালা,
মর্ত্ত্যের প্রবাসী লাগি চিত্তকার আকুল উতলা !
প্রতিদিন প্রতিপল পলে পলে করিয়া গণন
বিরহের দীর্ঘ দিন, না জানি গো ফুরাবে কখন,
হেথা এ জলধী তটে বসে বসে আমি যে উন্মনা,
কবে গো ভিড়িবে তরি দিবে দেখা সাগর-মোহানা।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

—:০:—

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

একসিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার যমুনা নদী সংস্কার সম্বন্ধে preliminary repost সদরে পেশ করিয়াছেন। রিপোর্টে তিনি লিখিয়াছেন যে, সাতবেড়িয়া হইতে যমুনা ইছামতীর সঙ্গমস্থল টিপির

Ganze readingএ চালু অতি সামান্য। এ নদী সংস্কৃত হইলেও অতি অল্প-কালে পুনরায় মজিয়া যাইবে সে কারণ সংস্কার করা বৃথা। সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার কাউলি (Cowley) সাহেবের এ রিপোর্ট মনোপুত হয় নাই। তিনি ঐ নদী পুনরায় বিস্তারিত সার্ভের (detailed sarvey) আদেশ দিয়াছেন ও এখন সার্ভে হইতেছে। এতদ্দেশীয় লোকের আগ্রহ না থাকায় ও সংস্কারে সাহায্যদানে অনিচ্ছুক থাকায় সরকার বাহাদুর এই শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এখন দেশের লোক কর দিতেও প্রস্তুত ও সংস্কারপ্রার্থী এখন নদী সংস্কার যোগ্য নয় এই কথা উঠিয়াছে; দেখা যাউক ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশের ভাগ্যে কি আছে। দেশের লোক যিনি যাহা বলুন, আমরা জানি যমুনা সংস্কার কমিটির সম্পাদক ডাক্তার বাবু সুরেশচন্দ্র মিত্র এ বিষয় নিশ্চেষ্ট নন।

সাহায্য-প্রাপ্তি

(৮ই অগ্রহায়ণ হইতে ৮ই মাঘ পর্য্যন্ত)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	২য় বারে	২৲
„ দ্বিজরাজ দত্ত	২য় বারে	৪৲
„ যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (আহিরিটোলা)	২য় বারে	৩৲
„ হাজারীলাল দত্ত		২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ পাল ও „ খগেন্দ্রনাথ পাল	২য় বারে	১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পৌষ মাসের "কুশদহ" ২০শে পৌষ ছাপা শেষ হইবে, ছাপাখানার সহিত এইরূপ কথা ছিল; কিন্তু কার্য্যবাহুল্য বশতঃ তাঁহারা তাহা পারিলেন না; এজন্য পৌষ সংখ্যা বাহির হইতেও বিলম্ব হইল। যদিও সম্পাদক আবার শয্যাগত, তথাপি মাঘ ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যাগুলি যাহাতে তৎপর ছাপা হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। নচেৎ আগামী বৎসরের পক্ষে আমাদেরই ক্ষতি। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ চৈত্র পর্য্যন্ত কাগজ পাইবেন তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

পরলোক-গত

কর্ম্মী লক্ষণচন্দ্র আশ।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"

ষষ্ঠ বর্ষ	মাঘ, ১৩২১	দশম সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা

—:•:—

দয়াল প্রভু পরমেশ্বর! তব কৃপায় জীবনের ৫৫ বৎসর কাটিল। জানি না আর কয়দিন এ পৃথিবীতে আছি! শরীর ভাঙিয়াছে; ডাক আসিতেছে—মনে হয় শীঘ্র যাইতে হইবে। তজ্জন্য কোনো দুঃখ নাই। কেবল প্রভু একটি কামনা আছে। তুমি এ অধমকে তোমার দাসত্ব-ব্রত পালনে যে কাজে নিযুক্ত করিয়াছ তাহার কিঞ্চিৎ শেষ ফল দেখিয়া যাইতে একান্ত ইচ্ছা হয়। যখন তোমার আনন্দ সম্ভোগ করি তখনই মনে হয় আমার আত্মীয়-প্রিয় দেশবাসী নরনারিগণ যাঁহারা সংসারে মজিয়া অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের কবে তোমাতে মতি হইবে? প্রভু, এ পৃথিবী হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে কি এই অসমাপ্ত সেবাব্রত পালনে তোমার পথের পথিক, তোমার ভাবের ভাবুক একজনকেও দেখিয়া যাইতে পারিব? তাহা হইলে মৃত্যু বড়ই সুখের হইবে।

———

পথ্য

——:•:——

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে—

"বিনাপি ভৈষজৈর্ব্যাধিঃপথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥"

ঔষধ ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র সুপথ্যের গুণেই রোগী অনেক সময় নিরাময় হইতে পারে। কুপথ্য সেবা করিলে রাশি রাশি ঔষধ সেবনেও রোগ প্রশমিত হয় না। অতএব রোগী পথ্যের প্রতি কখন উদাসীন থাকিবে না।

ভিন্ন ভিন্ন পীড়ায় ভিন্ন ভিন্ন পথ্যের ব্যবস্থা আছে। এস্থলে সে সকল বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। তবে এতদ্ সম্বন্ধে যেসকল সাধারণ কথা প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা উচিত আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই বিষয় বলিতেছি।

১। রোগীর পক্ষে সহজপাচ্য খাদ্যই উপযোগী; কারণ পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাক-যন্ত্রটি প্রায়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

২। একবারে অধিক পরিমাণে আহার নিষিদ্ধ; অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ খাওয়াই সুব্যবস্থা।

৩। রোগীকে অনবরত এক প্রকার খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে; তাহাতে অরুচি জন্মিতে পারে।

৪। রোগী যেখাদ্য খাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে, সেখাদ্য তাহাকে দেওয়া অনুচিত। অপ্রবৃত্তির সহিত সুপাচ্য সামগ্রী গ্রহণ করিলেও বিষতুল্য হয়।

৫। একরূপ খাদ্য সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। দুগ্ধের ন্যায় লঘু পথ্যও কাহারো কাহারো পক্ষে দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে।

৬। দুগ্ধ, সাগু বা এমন কোন একটি লঘুপথ্য পরিপাক করিতে না পারিলে মনে করিয়ো না যে, আর কোন খাদ্যই রোগীর সহ্য হইবে না। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, দুগ্ধ সহ্য হয় না, কিন্তু মাংসের ঝোল বেশ সহ্য হইতেছে। আমার একটি উকিল বন্ধুর "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" রোগ হইলে পুরাতন চাউলের অন্ন ও টাট্‌কা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল ব্যবস্থা করা যায়। তিনি কিছুতেই

উহা জীর্ণ করিতে পারিলেন না। পরে দেখা গেল ছোলার ডাউলের ঝোল ও ভাত বেশ পরিপাক করিতেছেন।

৭। রোগীর খাদ্য সদা প্রস্তুত ও উষ্ণ হওয়া আবশ্যক।

৮। অৰ্দ্ধপক, বিরসতা প্রাপ্ত, পর্য্যুষিত খাদ্য কখনই রোগীর পক্ষে হিতকর নহে।

৯। সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি খাদ্যগুলি নিতান্ত লঘু। এজন্য জ্বর ও বিবিধ পীড়ায় ঐগুলিই সচরাচর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ঐসকল সামগ্রী যথাসম্ভব সুস্বাদু ও মুখরোচক করিয়া প্রস্তুত করিবে। শুশ্রূষাকারিণীরা যে ভাবে সাগু বার্লি রন্ধন করেন, তাহাতে কোন রোগীই উহা স্ব-ইচ্ছায় খাইতে চাহে না। নিম্নে উহাদের পাকপ্রণালী লিখিত হইল :—

সাগু—আড়াই পোয়া জলে এক তোলা সাগু দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহাকে কিছুক্ষণ মৃদু অগ্নি-সন্তাপে ফুটাইয়া লইবে—দেখিয়ো যেন অধিক ঘন না হয়। শীতল হইলে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া রোগীর ইচ্ছা বা পীড়ার অবস্থানুসারে উহাতে বরফ, লেবুর রস, লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। উদরাময় না থাকিলে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধসহ পাক করা যাইতে পারে।

বার্লি—দুই তোলা বার্লি দুই সের জলে গুলিয়া অনেকক্ষণ ফুটাইতে হইবে। এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া আবশ্যক মত বরফ, লেবুর রস, লবণ বা চিনি সংযোগে পান করিতে দিবে। "Pearl Barley" নামক বার্লিই রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

এরারুট—প্রথমে এক তোলা এরারুট অল্প জলে গুলিয়া লইবে। পরে উহাতে পাঁচ বা ছয় ছটাক উষ্ণজল ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত করিবে ও নাড়িতে থাকিবে। শেষে কয়েক মিনিটের জন্য অগ্নিতে ফুটাইয়া লইলে এরারুট প্রস্তুত হইবে। রোগীর রুচি অনুসারে চিনি বা লবণ মিশ্রিত করিবে। উদরাময়ের আশঙ্কা থাকিলে সাগু, বার্লি অপেক্ষা এরারুটই ভাল। শটীর পালো উদরাময়ের অন্যতম সুপথ্য।

পরিপাক শক্তি ভাল থাকিলে উপরি উক্ত সকল খাদ্যেই দুগ্ধ মিশ্রিত করা যায়। সাগু, বার্লি ও এরারুটে শতকরা ৩০ ভাগেরও অধিক শ্বেতসার আছে; সুতরাং উহারা বহুমূত্র রোগীর অপথ্য।

১০। জ্বরে খৈ মন্দ পথ্য নহে। "লাজ পেয়াং সুখজরাং।" টাটকা খৈ উষ্ণজলে ভিজাইয়া পেষণ করত কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়ে যে মাড়বৎ পদার্থ প্রস্তুত

হয় তাহাকে খৈএর মণ্ড কহে। পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়েরা সাগুর পরিবর্ত্তে এই মণ্ড ব্যবস্থা করিতেন। খৈএর উভয় প্রান্ত অর্থাৎ যে স্থান অস্ফুটন্ত থাকে এবং যাহাকে গ্রাম্য ভাষায় খৈএর "কুণি" কহে, তাহা অত্যন্ত দৃঢ় ও সংহত; একারণ উহা দুষ্পাচ্য। নতুবা বস্তুগত্যা খৈ সহজে লঘুপাক। মণ্ড করিয়া লইলে কোন ভয় থাকে না।

ভাতের মণ্ডও ঐ শ্রেণীর খাদ্য। জ্বররোগী ইহা অনায়াসে খাইতে পারেন। সাধারণত জ্বরে যেসকল ছাই ভস্ম পথ্য দেওয়া হয়, সেসকল অপেক্ষা অন্ন-মণ্ড উৎকৃষ্ট। চিঁড়ার কাথ পেটের উগ্রতা নষ্ট করে ও পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা করে। হিক্কা, বমন প্রভৃতিতে বিশেষ উপযোগী। মুড়ী দেশী বিস্কুট; অজীর্ণ না থাকিলে বিস্কুটের পরিবর্ত্তে দেওয়া যাইতে পারে। মুড়ী ভিজান জল বমন ও হিক্কার সুপথ্য। আমাদের দেশে অনেকের সংস্কার আছে যে জ্বর অবস্থায় মুড়ী খাইলে প্লীহা বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু ইহা দ্বারা প্লীহা বর্দ্ধিত হইবার কোন কারণ নাই। মুড়ীতে লবণ অধিক থাকায় উহা শোথ রোগীর পক্ষে উপকারী নহে।

১১। ভাত অপেক্ষা রুটী গুরুপাক। জ্বররোগীকে রুটীর পরিবর্ত্তে দুধ ভাত পথ্য দেওয়াই উত্তম ব্যবস্থা। ভুষি মিশ্রিত আটার রুটি বেশ বলকর; কারণ গমে যে ফস্ফরাস্, ম্যাগনেসিয়াম্ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য আছে, তাহার অধিকাংশ ভাগ ঐ ভুষির মধ্যে থাকিয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে ভুষিমিশ্রিত আটার রুটীই উপযোগী। এই আটা খাইলে কোষ্ঠ বেশ সরল থাকে।

বহুমূত্র রোগী ময়দা বা আটার রুটি খাইবেন না। কেবলমাত্র ভুষির রুটি ইহাদের পক্ষে উপযোগী। যাঁহারা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে সুজির রুটিই প্রশস্ত। সুজির রুটি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে আটার রুটি অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয়। উহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ:—প্রথমত সুজি এক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করত একটি গোল পিণ্ডাকার প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ সুজির ডেলাটি গরম জলে দশ পনর মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া লইবে। শেষে উহাকে তুলিয়া ভাল করিয়া চট্‌কাইয়া পাতলা পাতলা রুটী প্রস্তুত করিবে।

যাঁহাদের অম্ল হয়, তাঁহারা সুজি চট্‌কাইবার সময় উহার সহিত এক টিপ্ সোডা মিশ্রিত করিয়া লইবেন।

কাহারো কাহারো আহারের পরক্ষণেই অম্ল, বুকজ্বালা ও আধ্মান উপস্থিত

হয়। এই সকল ব্যক্তির পক্ষে শর্করা ও শ্বেতসার সংযুক্ত খাদ্য যত কম ব্যবস্থা করা হয় ততই মঙ্গল। অন্ন ত্যাগ করিয়া সোডা মিশ্রিত সুজির রুটী ও মাংসের ঝোল খাইলে আগ্মানগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক ভাল থাকিবেন।

১২। টেপিওকা (Topioca) সাগুর ন্যায় লঘু পথ্য। সাগু যেরূপে রন্ধন করিতে হয় ইহার পাকপ্রণালীও সেইরূপ। তবে সাগুর ন্যায় ইহা শীঘ্র সিদ্ধ হয় না ; একারণ ইহাকে অনেকক্ষণ ফুটাইয়া লইতে হয়। দুগ্ধ সহ পাক করিলে ইহা বেশ বলকর ও সুস্বাদু হয়। জ্বর ও অন্যান্য পীড়ায় টেপিওকা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে শ্বেতসার থাকায় বহুমূত্র রোগে নিষিদ্ধ।

ওট্ নামক শস্যের চূর্ণ "Oat meal" নামে বাজারে বিক্রয় হয়। ইহার প্রতি শত ভাগে ১৫ অংশ জল, বার দশমিক ছয় অংশ প্রোটীড, ৫৮ অংশ শ্বেতসার, পাঁচ দশমিক চারি অংশ শর্করা, পাঁচ দশমিক ছয় অংশ তৈলময় পদার্থ এবং ৩ অংশ লবণ আছে। ওট্ চূর্ণও জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ সংযোগে রোগীকে পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে।

ইহাতে শ্বেতসার ও শর্করার ভাগ অধিক থাকায়, বহুমূত্র রোগীর পক্ষে ইহা হিতকর নহে। তবে কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, নিম্নলিখিত উপদেশমত প্রস্তুত করিলে রোগীর ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। অল্পপরিমাণ "Oat meal" প্রচুর জলে গুলিয়া উহাতে সামান্য লবণ সংযুক্ত করত কয়েক ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিবে। বেশ ফুটিতে আরম্ভ করিলে অল্প মাখন ও অণ্ডের লালা মিশ্রিত করিয়া নাড়িবে এবং তরল অবস্থায় নামাইয়া রোগীকে মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিবে। *

১৩। পাঁউরুটী বাসি হইলেই লঘুপাক হয়। তবে উহা উত্তমরূপে প্রস্তুত হওয়া দরকার। সাধারণ রুটীওয়ালারা ইহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্যক্ অবগত নহে। এজন্য দোকানের পাঁউরুটী প্রায়ই রোগীর সহ্য হয় না। উইলসন্ হোটেলের পাঁউরুটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। টাট্‌কা পাঁউরুটী রোগীকে দিতে হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া (Toast) দেওয়াই উচিত।

---

* Oat meal 250 Gm.
Butter 100 Gm.
Egg albumen 100 Gm.
1 Gram = 15, 432 Grains (গ্রেণ) Troy.

১৪। ডিম্ব বেশ স্নিগ্ধকর ও পোষক। কাঁচা ডিম্বই রোগীর পক্ষে প্রশস্ত; তন্নিম্নেই অৰ্দ্ধসিদ্ধ। সুসিদ্ধ ডিম্ব বড়ই গুরুপাক। ডিম্বে শ্বেতসার ও শর্করা আদৌ নাই। ইহাতে শতকরা ৭৪ অংশ জল, ১৪ অংশ প্রোটীড, দশ দশমিক পাঁচ অংশ তৈলময় পদার্থ ও এক দশমিক পাঁচ অংশ লবণ আছে। কাঁচা ডিম্ব দুই ঘন্টায় এবং সুসিদ্ধ ডিম্ব প্রায় চারি ঘণ্টায় পরিপাক হয়। বহুমূত্র ও যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে ডিম্ব হিতকর। ইহা বাতরোগীকে অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ডিম্ব ব্যবহৃত হয়; যথা—

এগ্‌ফ্লিপ—ব্রাণ্ডি ৪ আউন্স, * দারুচিনির জল ৪ আউন্স, † দুইটি ডিম্বের কুসুম ও অৰ্দ্ধ আউন্স বিশুদ্ধ শর্করা—এই কয়টি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে এগফ্লিপ প্রস্তুত হয়। অৰ্দ্ধ হইতে এক আউন্স মাত্রায় পান করিতে দিবে। অবসন্ন রোগীর পক্ষে এই পথ্য মহোপকারী।

ডিম্বের সরবৎ—দুইটি ডিম্বের কুসুম দুই ছটাক শর্করার সহিত আলোড়ন করিতে থাকিবে। পরে দেড় পোয়া গরম জল অল্প অল্প করিয়া উহাতে মিশাইয়া লইবে।

ডিম্বের সরবৎ অন্য প্রকার—একটি ডিম্বের মধ্যস্থ কুসুম, চা-চামচের এক চামচ শর্করা, দুই চামচ দুগ্ধ, অৰ্দ্ধ পাইণ্ট সোডার জল।

যে কোন পীড়ায় শরীর অত্যন্ত ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে ডিম্বের সরবৎ বিশেষ উপকারী।

দুইটি ডিম্বের শ্বেতাংশ অৰ্দ্ধ পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া উহাতে শর্করা, নেবুর রস ও বরফ দিলে উৎকৃষ্ট পানীয় প্রস্তুত হয়। ডাক্তারেরা উহাকে "Albamen water" বলেন। টাইফয়েড জ্বরের রোগীকে এই পানীয় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে ডিম্বের গুণ—

"নাতি স্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানী চ।
বাতঘ্নান্যতি শুক্রাণি গুরুণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্॥"

ডিম্ব অনতিস্নিগ্ধ, বলকর, বাতঘ্ন (Narvine tonic) ও শুক্রবর্দ্ধক।

---

* কোন রূপে সুরার ব্যবস্থা "কুশদহ"র মতবিরুদ্ধ, কেবল ঔষধানুসারে চিকিৎসকের দায়ীত্বে এই অংশ প্রবন্ধে স্থান পাইল। (কুঃ সঃ)

† দারুচিনীর জল (Aqua Cinnamomi) ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। দারুচিনির জল অর্থে দারুচিনি-ভিজান জল নহে।

রসকর্পূর (Perchlorideof Mercury) খাইয়া বিষাক্ত হইলে রোগীর গলদেশ ও পাকাসয়ে জ্বালা, রক্ত শ্লেষ্মা সংযুক্ত ভেদ বমন, অবসন্নতা প্রভৃতি দুর্লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় ডিম্ব মহোপকারী। একটি ডিম্ব চারি গ্রেণ রসকর্পূরের শক্তি নষ্ট করে ।

বিষ মাত্রায় তুঁতিয়া খাইলে যে বিষলক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতেও রোগীকে ডিম্ব সেবন করানো সুব্যবস্থা।

১৫। সাধারণত মৎস্য মাত্রই বীর্য্যজনক, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক।

"কফপিত্তকরাঃ মৎস্যাঃ বিনা রোহিত মদ্গুরৈঃ"—সুতরাং রোগীর পক্ষে মদ্গুর ও রোহিত মৎস্যই শ্রেষ্ঠ। অধিক "পাকা" মাছ ভাল নহে।

অজীর্ণ, অতিসার, অম্লপিত্ত, গ্রহণী ও জ্বরে কই, মাগুর, শিঙ্গী, মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল উপকারী। বাতব্যাধিতে (Diseases of the nervous system) রোহিত, মাগুর, শিঙ্গী, কই ও খলিশা মাছই সুপথ্য। পাণ্ডু রোগে শিঙ্গী হিতকর। বাতে ও বাতরক্তে অধিক মৎস্য খাওয়া ভাল নহে। বহুমূত্রে মৎস্য মাংসই প্রধান পথ্য। ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগীর পক্ষে রোহিত মৎস্যের "মুড়া" পথ্য ও ঔষধ।

রক্তপিত্ত রোগে উপযুক্ত অগ্নিবল থাকিলে বড় চিংড়ী বা বাইন মৎস্যের ঝোল উপকারী। মৎস্যে "জেলেটিন" নামক পদার্থ অধিক থাকায় কাহারো কাহারো মতে উহা মাংস অপেক্ষাও গুরু।

মৎস্যের (শ্বেত) প্রতি শত ভাগে প্রোটীডাংশ আঠার। এই প্রোটীড দ্বারাই আমাদের মাংসপেসি গঠিত হয়। ডিম্বের ন্যায় মাছেও শ্বেতসার বা শর্করা নাই। সিদ্ধ মৎস্য পরিপাক করিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

আয়ুর্ব্বেদে মৎস্যের গুণ—

"মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ"।

কথিত আছে বোয়াল মৎস্য কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন করে এবং খলিশা শূল ও আমবিনাশক।

(ক্রমশ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দাসের আত্ম-কথা

—:•:—

বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ ও মঙ্গলগঞ্জ

যখন উমেশ দাদার মুখে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশের উচ্চান্তঃকরণের কথা শুনি, তখন একবার তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র মঙ্গলগঞ্জ দেখিবার ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য বনগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া বিশেষ কারণে ফিরিয়া আসি, তখন আর যাওয়া হইল না। তার-পর কতদিন পরে লক্ষ্মণ বাবু খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া আমাকে সাদর আলিঙ্গন দানে প্রাণের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। এক দিন কি একবেলা আমার সঙ্গে বৈরাগীর ব্যবস্থামত কাটাইলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিলাম তিনি কেবল বিচক্ষণ বিষয়ী, ধার্ম্মিক দাতা তাহা নহেন, তিনি ভাবুক ভক্ত এবং বৈরাগ্যেও তাঁহার আনন্দ উৎসাহ যথেষ্ট। তিনি যাইবার সময় আমাকে মঙ্গলগঞ্জে যাইতে একান্ত অনুরোধ করিয়া গেলেন।

কয়েক দিন বাদে বোধ হয় সামান্য কোনো উপলক্ষ্যে মঙ্গলগঞ্জে গেলাম। তখন বনগ্রামের ঘাটে মঙ্গলগঞ্জ যাইবার নৌকা ও অন্যান্য বন্দোবস্ত প্রায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত, সুতরাং মঙ্গলগঞ্জে যাইবার জন্য কোনো ভাবনাই ছিল না।

মঙ্গলগঞ্জ গিয়া যাহা দেখিলাম এবং ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মণ বাবু সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে না করিলে অতঃপর বিষয় বলিবার উপায় নাই। আর আমার বোধ হয় ভবিষ্যৎ বংশের নিকট এই বৃত্তান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

বনগ্রাম মহকুমার প্রায় ৬ ক্রোশ পশ্চিমে ইছামতী নদীর দক্ষিণ কূলে মঙ্গলগঞ্জ অবস্থিত। মঙ্গলগঞ্জ নাম লক্ষ্মণ বাবুর দ্বারা তাঁহার পিতা মঙ্গলচন্দ্র আশের নামানুসারে রক্ষিত। এই স্থান তাঁহার জমিদারীর এলাকাধীন ধানের জমি ও নদী-তীর শ্মশানঘাট বিশেষ ছিল। লক্ষ্মণ বাবু এই স্থান নিজে নির্ব্বাচন করেন। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পরিসর ভূমির তিন দিকে পরিখা-বেষ্টিত (গড়বন্দী) কেবল উদ্যান বাটীকার নাম মঙ্গলগঞ্জ। ফল ফুল শস্য ক্ষেত্র; প্রচারাশ্রম বাটী পাকশালা, কর্ম্মচারীদিগের অবস্থানের জন্য প্রকাণ্ড আটচালা; সকলের সম্মুখে ইছামতী তটভাগে দ্বিতল এমারত বাটীর নিম্নতলে কাছারী সেরেস্তা; দ্বিতলে উপাসনার স্থান ও ধর্ম্ম বন্ধু বান্ধবগণের অবস্থিতির জন্য

সুসজ্জিত ২।৩টি প্রকোষ্ঠ। কোথাও গোশালা, কোথাও ভৃত্যদিগের বাসগৃহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নির্ম্মিত। সর্ব্ব পশ্চিম-প্রান্তে কিঞ্চিদ্দূরে নীলকুটি—হউস-বাড়ি। কোথাও শতাধিক কেবল গোলাপজাম ও লিচুগাছ এমন শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত যে, একটি অন্যটির উপর আসিয়া পড়ে নাই, অথচ পরস্পর সংলগ্ন। এই বৃক্ষ-শ্রেণীর নীচে ভূমিতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাহার চারিদিকে টবে বৃক্ষ মূল মধ্যে মধ্যে আলবাল-বেষ্টিতের ন্যায়। এই স্থানের নাম "তপোবন"; এখানে মধ্যে মধ্যে জমাট উপাসনা হয়। কি সুন্দর এই স্থানটি! কোথাও "সাধন কুটীর" নির্জ্জন ধ্যান ধারণার জন্য। কোথাও বৃক্ষতলে রন্ধন-স্থান। অর্থাৎ উপাসনান্তে সাধক-শ্রেণী মিলিয়া স্বহস্তে রন্ধন করা হয়, তখন শাস্ত্র পাঠ ও সদালোচনা হয়; কদলীপত্রে ভোজন, মৃৎপাত্রে জলপান, সাত্ত্বিকভাব এবং বৈরাগ্য সাধন।

এক দিকে উদ্যান মধ্যে আম্র কাঁঠাল গোলাপজাম লিচু পেয়ারা কদলী প্রভৃতি ফলের অগণন বৃক্ষ; অন্য দিকে শাক-সবজীর প্রশস্ত ক্ষেত্রসকল; অন্য দিকে গোলাপ বেল মল্লিকা মালতী প্রভৃতি পুষ্প-ক্ষেত্র। মঙ্গলগঞ্জের গোলাপক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! একত্রে সহস্রাধিক প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য্যে ও মনোহর গন্ধে ভাবে বিভোর হইয়া ভক্ত গাহিয়াছিলেন,—"ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি।" তাই মনে হয় সে দৃশ্য বর্ণনীয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়।

একই ক্ষেত্রে বিষয় কর্ম্ম, সংসার ধর্ম্ম, সাধন ভজন তপস্যার আয়োজন ও ধর্ম্ম প্রচার, দাস ধর্ম্মের সমাবেশ দেখিয়া মনে হইল রাজর্ষি জনকের আদর্শ তো মিথ্যা নহে; বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে বিধাতা এই নির্জ্জন প্রান্তরে সেই আদর্শ আমাদের জন্য আবার নবভাবে প্রস্তুত করিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় করিবেন। লক্ষ্মণ-চন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র ও তাঁহার সেই তপস্যা-রত শুভ্র সুন্দর ভক্ত মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে কি এক অব্যক্ত আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম, তাহা এখন ভাবিতেও প্রাণ উৎসাহে পূর্ণ হয়। দুঃখের বিষয় তাঁহার তাৎকালীন কোনো ফটো পাওয়া গেল না, তাঁহার যে চিত্র প্রদত্ত হইল ইহা তাঁহার আরো পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের।

ভক্ত কর্ম্মবীর বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ ন্যূনাধিক অষ্টাদশ বৎসরের পরিশ্রমে বা সাধন-ফলে এক প্রান্তর-মধ্যে এই মঙ্গলগঞ্জ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা বাংলা ১২৯৪ সালের কথা। তখন লক্ষ্মণ বাবুর বয়স আনুমানিক ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। আমাপেক্ষা তিনি ৭।৮ বৎসরের অধিক

বয়স্ক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সামাজিক প্রচলিত প্রথানুসারে বাল্যকালে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার অব্যবহিত পরে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পত্নীও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি একমাত্র শিশু কন্যা স্নেহলতাকে রাখিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। লক্ষ্মণ বাবু ঐ শিশু কন্যার প্রতিপালনের ভার তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়ার প্রতি অর্পণ করেন। তিনিও ইতি পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তৎপরে এই দীর্ঘকাল বিপত্নীক অবস্থায় মঙ্গলগঞ্জের উন্নতি এবং সদ্ভাবে প্রজাপালন ও জনহিতকর কার্য্য সাধনে অতিবাহিত করেন। আমি যে সময়ে মঙ্গলগঞ্জে যাই, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি পুনরায় ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। তখন তাঁহার একটি শিশু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিবাহ সম্বন্ধে তিনি আমাকে নিজ মুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাব এইরূপ,—তিনি বলেন,—"যখন আমি কর্ম্মস্রোতে ও সাধন-ভজন ব্যাপদেশে কালাতিপাত করিতেছিলাম তখন এ-বাসনা আমার মনে ছিল না। ক্রমে যখন মঙ্গলগঞ্জের শ্রী সম্পদ হইতে লাগিল, তখন একবার প্রচারক শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয়ের সহিত দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যাই। তিনি সেখানে নানা প্রকার কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার আর সংসার-ধর্ম্ম সাধনের বাসনা আছে কি না,—যদি থাকে তবে মঙ্গলগঞ্জে ব্রাহ্মপরিবার গঠনের উদ্দেশ্যেও অন্তত বিবাহ করা উচিত—অবশ্য উপযুক্ত পাত্রী হওয়া চাই, এই বিষয় আমার অন্তর পরীক্ষা-সূচক কতকগুলি কথা বলেন। তার পর দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়া সময় সময় ঐ বিষয় চিন্তা মনে উঠিতে লাগিল। মঙ্গলগঞ্জের আশ্রম যেন "সন্ন্যাসীর আড্ডা" বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মনে হইল এখানে আর পাঁচটি ব্রাহ্মপরিবার প্রতিষ্ঠা এবং নিজের দু একটি সন্তানকে যদি ধর্ম্ম-ভাবে গঠন করিয়া যাইতে পারি, তবে এই সকল ব্যাপার স্থায়ী হইবে। অতএব এই আদর্শ গঠনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কোনো কুমারী কন্যা অপেক্ষা যদি হিন্দুসমাজের কর্ম্মশীলা বয়স্কা বাল-বিধবা হয়, তাহা হইলে শিক্ষা দিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মিলনে ঠিক উপযুক্ত হইতে পারে।

ক্রমে এই কথা তাঁহার মাতুল প্রজ্ঞাবান বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় ও স্নেহলতার প্রতিপালিকা আত্মীয়া শুনিলেন। তাঁহারা যাহাতে কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের শিক্ষিতা কন্যা পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দু একটি পাত্রীর কথাও উঠিল। কিন্তু লক্ষ্মণ বাবু ঐ সকল সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ

করিলেন না। এ সম্বন্ধে ক্ষেত্র বাবু বলেন,—"হিন্দুসমাজের কোনো অজ্ঞাত বাল-বিধবা বয়স্কা পাত্রীর সম্বন্ধে ভালোরূপ না জানিয়া শুনিয়া কখনো বিবাহ করা উচিত নয়। হিন্দু সমাজের বয়স্কা কন্যার মন হইতে বদ্ধমূল কুসংস্কার সহজে দূর হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং ধর্ম্মের উচ্চভাব-ধারণা করিতে পারাও সহজ নয়। তবে যদি খুব উচ্চ শিক্ষা থাকে এবং প্রকৃতি-গত ধর্ম্ম-স্বভাব হয় তবে খুব ভালো ফলও হইতে পারে।"

যাহা হউক এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদ এবং অনুসন্ধান লইয়া কিছু দিন যায়; তার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রস্তাবে হিন্দুসমাজের একটি বাল-বিধবা বয়স্কা সুন্দরী কন্যা, কোনো উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মপরিবারে আসিয়া শিক্ষা পাইতেছেন, সুতরাং সে পাত্রী তাঁহার উপযুক্ত হইবে এইরূপ প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হয়। পাত্রী দেখিয়া লক্ষ্মণ বাবুর পছন্দ হয়। সে সময় তাঁহার পিতার মুমূর্ষ অবস্থা, এ-কারণ ক্ষেত্র বাবু বলেন, "লক্ষ্মণ, এ সময় বিবাহ করিয়ো না, পরে যাহা হয় হইবে।" লক্ষ্মণ বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি যখন মিসেস রায়ের টেলিগ্রাম পাইয়া ঢাকায় যাই, তখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাই নাই। সেখানে গিয়া এমন অবস্থায় পড়িতে হইল, যে বিবাহ করিয়া সঙ্গে আনা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না।"

ইতিপূর্ব্বে ক্ষেত্র বাবুর সৎ পরামর্শে ও সাহায্যে "মঙ্গলগঞ্জ মিশন ফণ্ড" নামে একটি অনুষ্ঠান হইয়াছিল। লক্ষ্মণ বাবুর নিজ পরিশ্রমলব্ধ নীলকুঠির আয় হইতে ক্রমে এই ভাণ্ডারে অর্থাগম হয়। ও প্রদেশে শিক্ষাবিস্তার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে সাহায্য দান, খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদির ব্যয় নির্ব্বাহ ও অন্যান্য সৎ কাজের জন্য দান সমস্তই ঐ মিশন ফণ্ড হইতে নির্ব্বাহ হইত।

আমি প্রথম বারে কয়েক দিন মঙ্গলগঞ্জে থাকিয়া খাঁটুরায় ফিরিয়া আসি। তাহার পর মধ্যে মধ্যে আমার যাওয়া ও লক্ষ্মণ বাবুর খাঁটুরায় আসা চলিতে লাগিল। মঙ্গলগঞ্জে তখন সর্ব্বদাই কলিকাতা হইতে নববিধান প্রচারক মহাশয়-গণের শুভাগমন হওয়ায় নিয়মিত রূপে উপাসনার একটা জমাট ভাব রক্ষিত হইতে লাগিল। সেই ভাবের মধ্যে আমি অনেক উপকার লাভ করিয়াছিলাম। বলিতে গেলে এই সময় হইতেই উপাসনা-তত্ত্ব যাহা কিছু প্রাণের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এমন সাধন-ভজনের সানুকূল অবস্থা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র হয় না। তখন মঙ্গলগঞ্জে সমাগত অনেকগুলি যুবক কর্ম্মচারী রূপে থাকিয়া এই উপাসনায়

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশের মনে বিশেষ কোনো ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই, কারণ তাঁহাদের মন অন্য ভাবে পূর্ণ ছিল। যাঁহাদের মন খালি ছিল তাঁহারাই উপকৃত হইয়াছিলেন।

আমার মঙ্গলগঞ্জ যাওয়া, লক্ষ্মণ বাবুর খাঁটুরায় আসা, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। প্রায়ই দুইজনে একত্রে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে আমার প্রাণে যে, ধর্ম্ম-প্রচার-স্পৃহা ঘনীভূত হইতেছিল, তাহা লক্ষ্মণ বাবুতেও প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমার কঠোর ভাব, তাঁহার কোমল ভাবের সহিত যেন বিনিময় হইতে লাগিল। তখন উভয়ে দু' একটি সঙ্গী লইয়া, কখনো উভয়ে খালি পায়ে গৈরিক গায়ে একতারা-যোগে নাম গান করিতে করিতে এক এক গ্রামে প্রত্যূষে গমন করা হইত। কখনো গোবরডাঙ্গা, খাঁটুরা গৈপুর গ্রামে কখনো মঙ্গলগঞ্জের সন্নিহিত এক এক গ্রামে—একবার গোপালনগর, গরীবপুর, রাণাঘাট, শান্তিপুর পর্য্যন্ত; একবার খুলনা জেলার খেসরা কাটপাড়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হয়।

লক্ষ্মণচন্দ্র যখন সাধনভজন ধর্ম্মপ্রচারে মন দিতেন তখন তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতেন; আবার যখন কাছারিতে বসিয়া বিষয়কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেন, তখন মনে হইত তিনি ঘোর বিষয়ী। যখন সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন—নিয়মিত পরিচারক পরিচালক থাকা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে নিজ হস্তে তাহাদের স্নান-আহার করাইয়া দিতেন, তখন মনে হইত তিনি ঘোর সংসারী। মনে হয় তিনি যে সমন্বয়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই এইরূপ চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—:•:—

এপনিনা

—:*:—

বর্ত্তমান সময়ে যে দেশ ফ্রান্স নামে অভিহিত, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমান-দিগের সময়ে ঐ দেশের নাম গ্যালিয়া এবং উহার অধিবাসিগণের নাম গল্ ছিল। যখনকার কথা বলিতেছি, সে সময়ে রোমানেরা অনেকটা সভ্য হইয়াছিল, কিন্তু গলেরা প্রায় অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় ছিল।

তখন রোমান ও গল্‌দিগের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ হইত। উভয় জাতিই স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সময়ে সময়ে ঐ যুদ্ধ সাংঘাতিক হইয়া উঠিত। একবার গলেরা রোমানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজধানী রোম অধিকার করে; এবং তথাকার অনেক গৃহ ও দ্রব্য সামগ্রী পুড়াইয়া ছারখার করে। কিন্তু প্রকৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং উন্নত যুদ্ধ-কৌশল প্রভৃতি না জানায় গলেরা অধিক দিন উহা দখল করিয়া রাখিতে পারে নাই। রোমানেরা তখন জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। সুতরাং কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই গলেরা রোমানদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ইটালি হইতে বিতাড়িত হয়। রোমানেরা তখন প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ও পরাক্রান্ত জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। গল্‌দিগকে শুধু ইটালি হইতে বহিষ্কৃত করিয়াই তাহারা নিরস্ত হইল না। গ্যালিয়া অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ-যাত্রা করিতে লাগিল।

রোমানদিগের অপেক্ষা গলেরা অনেক অসভ্য হইলেও বড় স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। তাহারা সহজে রোমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই। এজন্য গ্যালিয়া অধিকার করিতে রোমানদিগকে বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে রোমের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ জুলিয়াস সীজর যিশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গ্যালিয়া অধিকার করেন। রোমানদিগের সুশাসনের গুণে গলেরা ক্রমশই রোমানদিগের বশীভূত হইতে থাকে। পরিশেষে তাহারা রোমানদিগের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই গ্রহণ করিয়া রোমের অনুগত প্রজা হইয়া উঠে।

এইরূপে গ্যালিয়া রোমসাম্রাজ্যের একটি বিখ্যাত প্রদেশ রূপে গণ্য হয়। বাহ্য দৃশ্যে গ্যালিয়া প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হইলেও সমস্ত গল্‌দিগের হৃদয় হইতে স্বাধীনতা-প্রিয়তার বীজ নির্ম্মূল হইল না। গল্ যুবকেরা নিজেদের দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার বিষয় ভাবিয়া গোপনে গোপনে কত কাঁদিত, এবং এই দুরবস্থা মোচনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কত পরামর্শ করিত। তাহার ফলে বহু সংখ্যক গল্ যুবক একযোগে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। কিন্তু রোমের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তৎকালে সমস্ত যুরোপ কম্পিত হইত। এমন কি রোমকে সে-সময়কার পরিচিত সমগ্র ভূভাগের অধীশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। সুতরাং এই সকল বিদ্রোহ দমন করিতে তাহাকে বেশি বেগ পাইতে হইত না।

কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গল্‌বীর ক্লডিয়স সিভিলিস ও জুলিয়াস স্যাবাইনাস যে প্রচণ্ড বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করেন, তাহার প্রভাবে বিশাল রোমক সাম্রাজ্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্যাবাইনাস নিজে স্বাধীন রাজমুকুট পরিধান করিয়া গ্যালিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া প্রচার করেন এবং বিপুল সৈন্য-বাহিনী লইয়া রোমক সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। স্যাবাইনাস প্রথমে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই আবার সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তিনি অতি কষ্টে একটি পর্ব্বত-গহ্বরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই সময়ে স্যাবাইনাসের সাধ্বী পত্নী এপনিনাই স্বামীর একমাত্র সঙ্গিনী ও সহায় হইলেন। স্যাবাইনাস সমস্ত দিন সেই অন্ধকারময় গিরি-গুহায় একাকী থাকিতেন; আর তাঁহার সুশীলা স্ত্রী এপনিনা ফল মূলাদি আহরণ করিয়া তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। এবং দিবা নিশি ঐ গহ্বরের মুখে থাকিয়া পাহারা দিতেন। নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। দূরে অশ্ব-পদ-শব্দ শুনিলে অমনি তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীকে সতর্ক করিয়া দিতেন, এবং কোনো রূপ বিপদের সম্ভাবনা জানিতে পারিলেই তাঁহাকে কোনো নির্জ্জনতর সুদৃঢ় নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতেন। নিজের কোনো প্রকার কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। স্বামীকে সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে নিরাপদে রক্ষা করাই তখন তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়াছিল। বিদ্রোহী স্যাবাইনাসকে ধৃত করিবার জন্য তৎকালে রোমক সৈন্য প্রত্যেক গ্রাম নগর, প্রত্যেক বন, পর্ব্বত-গহ্বর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতেছিল। কিন্তু এই অসাধারণ বুদ্ধিমতী প্রতিপ্রাণা নারীর আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-কৌশলে তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। এপনিনা তখন একাকিনী স্বামীর সমস্ত অভাব মোচন করিয়া দিতেন স্বামীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য তিনি বিবিধ চেষ্টা করিতেন। স্বামীর কল্যাণ-চিন্তাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। স্যাবাইনাসও এই অশেষ গুণবতী পত্নীকে হৃদয়ের সহিত ভালো বাসিতেন। পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি হয় তো দূরবর্ত্তী কোনো দেশে গিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু এমন পতিব্রতা ত্যাগশীলা স্ত্রীর সঙ্গ তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তজ্জন্যই এই বিপদসঙ্কুল স্থানে এত কষ্টের মধ্যেও তিনি প্রসন্ন-মনে বাস করিতে লাগিলেন।

অবশেষে এপনিনা যখন বুঝিলেন, এমন করিয়া আর বেশি দিন থাকা যাইবে না—একদিন-না-একদিন ধরা পড়িতেই হইবে, তখন তিনি এক ভয়ানক দুঃসাহসিক কার্য্য করিলেন। স্বামীকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া দুই জনে রোম-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অলৌকিক শক্তিশালিনী ও প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামীকে সঙ্গে লইয়া এই দীর্ঘ পথের শত বিপদ অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রোমে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বামীকে একটি নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া নিজে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষার জন্য ভিখারিণী-বেশে সম্রাট-সমীপে উপনীত হইলেন। নিতান্ত ব্যাকুল-ভাবে অশ্রুপূর্ণ লোচনে সম্রাটের নিকট স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার সেই করুণ প্রার্থনায় সম্রাটের কঠিন হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তখনকার রোমক রাজবিধিতে বিদ্রোহীর ক্ষমা ছিল না। সুতরাং এপনিনার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না।

ব্যর্থমনোরথ হইয়া সাধ্বী এপনিনা তখন হতাশমনে স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবং তাঁহাকে সমস্ত জানাইয়া আবার তাঁহার সহিত স্বদেশে রওনা হইলেন। পথে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক রোমক সৈন্যদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার সেই গিরি-গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

আরো কয়েক বৎসর যাবত স্যাবাইনাস সেই গিরি-গুহায় নিরাপদে কাটাইলেন। এই সময়ে নারী-শিরোমণি এপনিনা আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া একান্ত-ভাবে কায়মনপ্রাণে স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন। অবশেষে অশেষ গুণবতী ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী ভার্য্যার অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশলে ও অক্লান্ত সেবায় স্যাবাইনাসের মৃতকল্প জীবনেও আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল। অবশেষে নয় বৎসর পরে স্যাবাইনাস ধৃত হইয়া রোম নগরীতে বিচারার্থ আনীত হইলেন। সম্রাটের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

যথাসময়ে স্যাবাইনাস বধ্যভূমিতে আনীত হইলেন। একান্ত পতিপ্রাণা এপনিনাও ধীর গম্ভীর প্রশান্ত-বদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীর সহিত একত্র পরলোক গমনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তিনিও মৃত্যু ভিক্ষা করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সব ফুরাইল! সতী সাধ্বী এপনিনা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া স্বামী-সঙ্গে হাসিতে হাসিতে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। স্বর্গের ফুল বিশ্বপিতার চরণতলে ঝরিয়া পড়িল।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

—:০:—

সরমা

—:০:—

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

তিন মাসের মধ্যেই রায়পুরের রাজবাড়ি হাঁসপাতালে পরিণত হইল। হাঁসপাতালটির নামকরণ হইল মহারাণী হাঁসপাতাল। হাঁসপাতালের পশ্চাতে উদ্যান-মধ্যে শ্যামসুন্দর তরুশ্রেণীর ছায়া-শীতল প্রাঙ্গণে রমণীর এক ক্ষুদ্র বাসভবন নির্ম্মিত হইল। হাঁসপাতালের জন্য মহারাজ বার্ষিক দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। প্রথমেই উহাতে কুড়িটি রোগী থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। একজন assistant surgeon, দুইজন compounder, একজন ম্যানেজার, এক-জন কেরাণী, চাকর দ্বারবান প্রভৃতি নিয়োজিত হইল। ইহারা সকলেই রমণীর অধীনে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। ঔষধ-পত্রেরও সুব্যবস্থা হইল। এক মাসের মধ্যেই কাশীতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রোগমুক্তির এমন একটা আশ্চর্য্য বিবরণ কেহ কখনো শুনে নাই। রমণী সকাল-সন্ধ্যায় আসিয়া রোগীগুলিকে দেখিয়া থাকেন—প্রাণ দিয়ে তাহাদের সেবা-যত্ন করেন। তাঁহার অমৃত বাণী রোগীর যন্ত্রণায় শান্তি আনিয়া দেয়। তারপর যাহার অঙ্গে রমণী তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দেন—যাদুকরের ভেল্কির মতো তখনি তাহার রোগ দূরে সরিয়া যায়—সে সুস্থ দেহে ফিরিয়া আসে। ডাক্তারের ব্যবস্থা লওয়া, ঔষধ খাওয়া সে যেন একটা নামমাত্র। রোগীর সংখ্যা ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, হাঁসপাতালে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়া পড়িল।

এই সময় সংবাদপত্র-মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বাংলা, ইংরাজি, হিন্দী প্রভৃতি কাগজগুলি তারস্বরে বলিতে লাগিল। "কাশীর মহারাণী হাঁসপাতাল এক বঙ্গরমণীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গরমণী-পরিচালিত হাঁসপাতাল ভারতে এই প্রথম। হাঁসপাতালের কার্য্য এমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, রোগীগণ এমন সত্বর আরোগ্যলাভ করিতেছে যে, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মহিলাটি এই হাঁসপাতালের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু আর্থিক সংস্থান তেমন নাই। রায়পুরের মহারাজা ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। আমরা আশা করি, তাঁহার ন্যায় ভারতের অন্যান্য রাজা মহারাজা, তালুকদার, জমিদার

সকলেই এই হাঁসপাতালটির উন্নতিকল্পে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করিয়া এই মহানহৃদয়া মহিলাটিকে তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ দিয়া আপনাদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন। ইহার ফলে অনেক দেশীয় রাজা মহারাজার নিকট হইতে সাহায্য আসিতে লাগিল। হাঁসপাতালে তখন পঞ্চাশটি রোগী থাকিবার ব্যবস্থা হইল এবং আর একটি ডাক্তার নিয়োজিত হইল। তিন মাস পরে হাঁসপাতালটি সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া একদিন কাশীর সিভিলসার্জ্জন মহারাণী-হাসপাতাল পরিদর্শনে আসিলেন। হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "আমি ১৭ই তারিখে মহারাণী-হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়াছি। হাঁসপাতালটি রায়পুরের মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহারই যত্নে একটি উচ্চবংশীয় বঙ্গমহিলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। হাঁসপাতালের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া আমি আশাতিরিক্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছি। উহা আমাদের হাঁসপাতাল হইতে কোনো অংশে হীন নহে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গত তিন মাসের রিপোর্ট লইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলাম। এই তিন মাসে হাঁসপাতালে ১০৫টি রোগী আসিয়াছিল এবং একটি ব্যতীত সকলগুলিই রোগমুক্ত হইয়া সুস্থদেহে চলিয়া গিয়াছে। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। মহিলাটির সহিত আমার একবার অল্পক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি তিনি একজন সামান্য রমণী নহেন। তিনি একটা অসাধারণ দৈবশক্তির বলে বলীয়ান। তিনি সম্মোহন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী—তাঁহার সর্ব্বশরীরে একটা বৈদ্যুতিক শক্তির মহা তেজ বিরাজমান। তিনি এই শক্তিপ্রয়োগে অনেক রোগীকে কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়া থাকেন। রোগীরা যখন রোগের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে, আমরা তখন তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য কত কি ইন্‌জেক্‌ট করিতে থাকি, কিন্তু এই রমণীর করস্পর্শে তাহারা আপনি ঘুমাইয়া পড়ে। সকলে এই রমণীকে মাতৃ সম্বোধন করে। আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে এই মাতৃরূপিণী মহিলাটির কল্যাণ কামনা করি এবং আশা করি সদাশয় গবর্ণমেণ্ট মহারাণী-হাঁসপাতালের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও উন্নতির জন্য যথোচিত সাহায্য দানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এই ঘটনার এক মাস পরেই সরকার বাহাদুর মহারাণী-হাঁসপাতালের জন্য মাসিক পাঁচ শত টাকা মঞ্জুর করিলেন ও অনেকগুলি ভালো ভালো যন্ত্রাদি

পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে ক্রমে চারিদিক হইতে হাঁসপাতালের জন্য অর্থ আসিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই হাঁসপাতালফণ্ডে অনেক টাকা জমিয়া গেল।

এই সময় হইতে হাঁসপাতাল-ফটকের নিকট বহুসংখ্যক দীন-দরিদ্রের সমাবেশ হইত। রমণী যখন স্নান-উপলক্ষ্যে হাঁসপাতাল-বাটীর বাহির হইতেন তখন এই জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া উল্লাস ভরে 'জয় মহারাণী কী জয়' বলিতে বলিতে স্নানের ঘাট অবধি যাইত; আবার সেই ভাবে হাঁসপাতালের ফটকের নিকট ফিরিয়া আসিত। তাহারা অবশ্যই রমণীর নিকট হইতে দুই একটি করিয়া পয়সা পাইত। উহারা বুঝিয়াছিল, মহারাণী-হাঁসপাতালের এই রমণীই মহারাণী—রমণী বুঝিয়াছিল তাহারা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয় ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ জনতার সহিত রমণী যখন পথে বাহির হইত, তখন চারিদিক হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেক লোক ছুটিয়া আসিত এবং পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিত,—"ইনি কোথাকার মহারাণী"? কিন্তু কেহই তাহা বলিতে পারিত না—তবে তিনি যে মহারাণী তাহা অনেকেই সাব্যস্ত করিয়াছিল—কেহ কেহ বলিত, তিনি মহারাণী হাঁসপাতালের-মহারাণী।

এই সময় একদিন রায়পুরের রাজমহিষীর নিকট হইতে এক সিপাই আসিয়া রমণীর হস্তে একটি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বাক্স অর্পণ করিল। রমণী বাক্সটি খুলিয়া দেখিলেন—একখানি সাঁচ্চার কাজ করা বহুমূল্য বেনারসী সাড়ী, এক জোড়া হীরক-বলয়, এক ছড়া মোতীর মালা আর একখানি ক্ষুদ্র চিঠি; উহাতে লেখা ছিল, "মা আমার এই সামান্য দান গ্রহণ করুন।"

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সংসারে মুকুন্দবাবুর সরমা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তাই তিনি সরমার সংসারটি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সংসারের সমস্ত খরচ পত্র স্বহস্তে চালাইতেন। সরমার প্রাণটা কিন্তু আকাশের মতো উদার ও বায়ুর মত মুক্ত ছিল। তাহার নিকট কিছু চাহিয়া কেহ কখনো বিফলমনোরথ হয় নাই। সে সাধ্যমত সকলের অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিত। সেদিন মধ্যাহ্নে এক খড়ি-মাখা সাধু আসিয়া সরমার নিকট নূতন বস্ত্র চাহিল। সরমা তাহার বাক্স খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল, কিন্তু এমন অর্থ পাইল না যাহাতে সে সাধুকে একখানি নব বস্ত্র কিনিয়া দিতে পারে। তাহার মনটা এতটুকু হইয়া গেল—তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল—আহা! আজ তাহার হাতে একটি টাকাও নাই!

সুশীল আসিয়া কহিল—মা, সাধু যে কাপড়ের জন্য বসে আছে। সরমা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তা কি করবো বল বাছা, ঘরে তো আর নতুন কাপড় নেই—আর হাতে পয়সাও নেই যে একখানা কাপড় কিনে দিই।"

সুশীল কহিল—"তবে মা সাধুকে আজ যেতে বলি।"

"না, না, আমি কাপড় দিচ্চি" বলিয়া সরমা একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া আপনার পরিহিত বস্ত্রখানি সাধুকে দান করিল।

সুশীল এ কথা তাহার দাদামহাশয় মুকুন্দ বাবুকে জানাইল। মুকুন্দবাবু মর্ম্মাহত হইলেন—ভাবিলেন সামান্য অর্থের জন্য সরমাকে আজ চোখের জল ফেলিতে হইল, ধিক আমাকে! আমার এত অর্থ খাইবে কে? আমার জমিদারি কাহার জন্য!

অল্প দিবসের মধ্যেই মুকুন্দ বাবু তাঁহার জমিদারির খানিকটা অংশ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন এবং প্রফুল্লর নামে এই টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিলেন। প্রফুল্ল যে হঠাৎ এই পঙ্গু অবস্থায় এত টাকার মালিক কেন হইল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস সে ইতিপূর্ব্বেই সুশীলের নিকট হইতে পাইয়াছিল। তাই প্রফুল্ল সমস্ত টাকাই সরমার নামে লিখিয়া দিল।

সরমা ভাবিল তাহার পিতার এ কি খেয়াল, পাছে আমি তাঁহার দান লইতে অস্বীকার করি তাই বুঝি তিনি তাঁহার জামাতাকে দিয়া দান করাইলেন। যেন এ অর্থে আমার পূর্ণ অধিকার থাকে। যা হোক লক্ষ্মী যখন অযাচিতরূপে আসিয়াছেন তখন তাঁহাকে আর ফিরাইবে না।

মুকুন্দ বাবু ভাবিয়াছিলেন,—সরমা এ টাকা লইতে কতই ওজর-আপত্তি করিবে—হয় তো মোটেই লইবে না। কিন্তু সরমা যখন বিনা আপত্তিতে সমস্ত টাকা লইতে স্বীকার করিল, তখন মরা গাঙে বাণ ডাকার ন্যায় তাঁহার নীরস প্রাণে একটা সরল আনন্দের তুফান উঠিয়াছিল। সরমার একটি সন্তান গিয়াছিল—এখন তাহার স্থানে সে পাইয়াছে দশটি। এখন অনেকগুলি নিরাশ্রয় বালক-বালিকায় সরমার গৃহ পরিপূর্ণ। তাহাদের অবিশ্রান্ত কলকণ্ঠে বাড়িটি সর্ব্বদা মুখরিত। সরমা তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া মানুষ করিতেছে—তাহারা সকলেই তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করে।

সরমা অনেকগুলি লোককে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল। সে পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়া আসিতে লাগিল—কাহার সংসার কিরূপভাবে চলিতেছে। সে অনেকগুলি গরীব বিধবার অন্ন-সংস্থানের জন্য মাসিক বৃত্তির

বন্দোবস্ত করিয়া দিল। ডাক্তার-ঔষধ ও পথ্যের অভাবে যেসকল রোগী কষ্ট পাইতেছিল, তাহারা সরমার ব্যয়ে উপযুক্ত ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্য পাইয়া অচিরে রোগমুক্ত হইয়া উঠিল, এবং অন্তরের সহিত সরমাকে আশীর্ব্বাদ করিল। পাড়ার সকলের নিকট সরমা মাতৃরূপিণী দেবী হইয়া দাঁড়াইল। যাহার যে কোনো অভাব তাহার নিকট একবার নিবেদন করিলেই হইল। সরমা অনেক দরিদ্র বালকের শিক্ষার ভার লইল এবং সাধারণের সুবিধার জন্য পাড়ায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিল। জলকষ্ট নিবারণের জন্য সরমা একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিল। লোকে উহার নাম রাখিল "সরমা সরোবর"। একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া সরমার নিকট জানাইলেন যে, তাঁহাদের গঙ্গার ঘাটটি একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, সেখানে স্নান ও সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি করিবার বড়ই অসুবিধা। তাঁহাদের অভাব পূর্ণ হইল। অল্প দিনের মধ্যেই সেই ভাঙা ঘাটের পার্শ্বে একটি নূতন ঘাট নির্ম্মিত হইল। সে ঘাটটি লোকের নিকট "সরমা ঘাট" বলিয়া এখনো পরিচিত। সরমার দানশীলতা যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন অনেক দূর দেশ হইতেও কেহ কেহ প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল—কিন্তু সরমা কাহাকেও বিমুখ করে নাই।

মুকুন্দ বাবু এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পারা-ভস্ম আনিয়াছিলেন। উহা সেবন করিয়া প্রফুল্ল বেশ সুস্থ হইয়াছিল—ক্ষতস্থানগুলি শুখাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আজ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগ সমূলে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মুকুন্দ বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর সে সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া পাইলেন না। সেদিন মুকুন্দ বাবু প্রাতঃভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিলেন, রাস্তার উপর একটা বাড়ির গেটের পার্শ্বে প্রাচীর-গাত্রে একখানা কালো পাথরের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে Dr. Banerjee M. D. O. F. R. C. S. Specialist in Surgery" দেখিয়া ভাবিলেন—এই ডাক্তার বোনার্জ্জীর বাড়ি। লোকের মুখে এঁর সুনাম ধরে না, অথচ বাড়ির এত কাছে। মুকুন্দ বাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বারবানের নিকট অনুসন্ধানে জানিলেন যে, ডাক্তার সাহেব ভিতরে আছেন, শীঘ্রই বাহিরে আসিবেন। তখন তিনি Consulting room এ আসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। সে-ঘরে তখন আরো কয়েকটি রোগী ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মুকুন্দ বাবু চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিলেন তাঁহার হাতের গোড়ায় বিলাতের পাশকরা এত বড় ডাক্তার

থাকিতে, এত দিন তাঁহাকে না ডাকিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। ইহার জন্য বাস্তবিক তিনি অনুতপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সাহেবি পোষাক-পরা ডাক্তার বোনার্জ্জি আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুকুন্দ বাবু ডাক্তারকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—"মহাশয়, আমি আপনাকে একবার নিয়ে যেতে চাই, জানতে পারি কি আপনার ভিজিট কত ?"

ডাক্তার প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন,—"ওঃ আপনি আমাকে রোগী দেখতে নিয়ে যেতে চান—আচ্ছা যাব—অনুগ্রহ করে একটু বসুন।" মুকুন্দ বাবু টেবিল হইতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ডাক্তার পকেট হইতে তাঁহার সোনার চসমাখানা বাহির করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া চোখে লাগাইয়া একটি একটি করিয়া রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিলেন। যখন রোগীর পালা শেষ হইল, তখন মুকুন্দ বাবুর পানেচাহিয়া কহিলেন, "আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না, আমার ভিজিট কত ? আমার ভিজিট বলো টাকা, আপনি কি তা আমাকে দিতে পারবেন ?"

মুকুন্দ বাবু বিরক্তির সহিত কহিলেন,—আমি যে আপনাকে বলো টাকা দিতে পারবো না তা আপনি কিসে জানলেন ?"

মুকুন্দ বাবুর সাদাসিদা পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া ডাক্তার ভাবিয়াছিলেন তিনি পাড়ার কোনো ভদ্র গৃহস্থ হইবেন। পাড়ার লোকে যে সহসা বলো টাকা ভিজিট দিতে সম্মত হইবে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

মুকুন্দ বাবুর কথাতে ডাক্তার লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"কিছু মনে করবেন না—আপনি বুঝি এ পাড়ায় থাকেন না ?"

মুকুন্দ বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, —"না, তাতে হয়েছে কি ?"

ডাক্তার কহিলেন,—"একটা প্রবাদ আছে "গেঁও যোগীর ভিক্ মেলে না" আমারও ঠিক তাই হয়েছে। পাড়ার লোক আমার ভিজিটের কথা কখনো জিজ্ঞাসাও করে না, আর ভিজিটের জন্যে একটি পয়সাও দ্যায় না। আপনি বোধ হয় এ পাড়ায় নতুন এসেছেন—আমার ভিজিট বলো টাকা, আপনি কি তা দিতে পারবেন, ইহার মানে এই যে আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া যে, পাড়ার অপর লোকে যেমন ভিজিট দ্যায়—আপনিও তেমনি ভিজিট দিবেন।"

মুকুন্দ বাবু কহিলেন,—"আপনি পাড়ার লোকের কাছে ভিজিট না নিয়ে যে একটা মহত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছেন তার কোনো সন্দেহ নেই। আমি আপনার পাড়ার লোক নই, আমি আপনাকে বলো টাকা ভিজিটই দেবো, আপনি আসুন।"

ডাক্তার হাঁকিলেন "রামদীন।"

"হুজুর সাব" বলিয়া রামদীন আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

"গাড়ি তৈয়ারী হ্যায়।"

"সব ঠিক হ্যায় হুজুর।"

"আচ্ছা আসুন" বলিয়া ডাক্তার উঠিলেন।

মুকুন্দ বাবুও ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উভয়ে গাড়িতে বসিলেন। গাড়িখানি বন্ বন্ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

প্রায় দশ বার মিনিট পরে মুকুন্দ বাবুর আদেশে গাড়িখানি একটি বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল।

এইবার ডাক্তার হরিপদর চমক ভাঙিল। তিনি দেখিলেন বাড়িটি তাঁহার বাল্য-সহচর প্রফুল্লর। নিমেষের মধ্যে তাঁহার সমস্ত কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল সেই শেষ দিনের কথা—যে দিন রাত্রে তিনি প্রফুল্লকে মারিবার জন্য পিস্তল হস্তে এইখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল—তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যে এখানে আসিবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

মুকুন্দবাবু গাড়ি হইতে নামিয়াই, হরিপদর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "আসুন"।

দরজায় সুশীল দাঁড়াইয়াছিল—সে গাড়ির মধ্যে সাহেব-বেশী হরিপদকে দেখিয়া বাড়ির ভিতর ছুটিয়া গিয়া কহিল,—"মা, মা সাহেব ডাক্তার আসচেন।"

হরিপদ আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে গাড়ি হইতে নামিলেন এবং কম্পিত-কলেবরে মুকুন্দ বাবুর সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলের একটি বিস্তৃত কক্ষের দরজায় আসিয়া মুকুন্দ বাবু প্রফুল্লকে দেখাইয়া কহিলেন, "ওই দেখুন রোগী শুয়ে আছে। ওটি আমার জামাতা, একটু ভালো করে দেখবেন যদি কিছু করতে পারেন।"

সুশীল তাড়াতাড়ি তাহার পিতার নিকট আসিয়া কহিল,—"বাবা চেয়ে দেখুন, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

প্রফুল্লর সর্ব্বশরীরে একখানা সাদা চাদর ঢাকা ছিল, সে মুখ হইতে চাদর খানা সরাইয়া চাহিয়া দেখিল।

হরিপদ প্রফুল্লর অবস্থা দেখিয়া দরজার উপর কাট হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল—মুকুন্দ বাবু গৃহমধ্যে একখানা চেয়ারে আসিয়া বসিলেন এবং হরিপদর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"আসুন।"

হরিপদ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্লর পাশে আসিয়া বসিল। সরমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হরিপদ প্রফুল্লর গায়ের চাদরখানা একবার তুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল—তারপর আবার ঢাকা দিয়া রাখিল। হরিপদ দেখিল প্রফুল্লর হাত, পা, নাক, কান, মুখ প্রভৃতি বিকৃত হইয়া গিয়াছে; তাহার ক্ষতস্থান সকল হইতে রস নির্গত হইতেছে, শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে; সে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে। হরিপদ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্লর মুখের পানে চাহিল—সে চাহনি জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ, ফুলের ন্যায় কোমল, শিশুর ন্যায় সরল—মমতাপূর্ণ। তাহাতে যেন আশ্বাসবাণী ফুটিয়া রহিয়াছে (সে ভাবিল এই কি তাহার বাল্যবন্ধু জীবন-সহচর প্রফুল্ল! তাহার প্রাণটা তখন এক অব্যক্ত যাতনায় ফাটিয়া যাইতেছিল। সে ধীরে ধীরে প্রফুল্লর মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

প্রফুল্ল তখন স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। সে অনেক ডাক্তার দেখিয়াছে কিন্তু এমন ডাক্তার তো সে দেখে নাই। তাহাকে দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া সরিয়া না গিয়া, তাহার মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিল, এমন স্নেহ-মমতাপূর্ণ এমন আত্মীয় ডাক্তার সে তো কখনো দেখে নাই। মরা গাঙে বাণ ডাকার ন্যায় সহসা প্রফুল্লর শুষ্ক শীর্ণ চোখ দুটি হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে দুই হস্তে ডাক্তারের দুইখানি হস্ত ধরিয়া করুণ মর্ম্মান্তিক স্বরে কহিল,—"ডাক্তার বাবু আপনার পায়ের ধূলা দিন; এই শেষ সময়ে যে স্নেহের কণাটুকু দিয়েছেন, সেইটুকুই অমূল্য ওষুধ। আমি আপনার কাছে আর একটু ওষুধ চাই—এমন একটু কিছু দিন, যাতে আমি শীগ্‌গির যেতে পারি, এ যাতনা, এ শাস্তি আর ভোগ করতে পারি না। উঃ!"

যাতনাক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রফুল্লর এই মৃত্যু-কামনা হরিপদকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—তাহার প্রাণের ভিতর একটা রুদ্ধ বেদনা যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—সে মনে মনে বলিল—হে ভগবান এ-কে এমন শাস্তি কেন দিলে!"—মুকুন্দ বাবু কহিলেন—কি বলচ প্রফুল্ল, চুপ কর—অত হাবা হও কেন?"

প্রাণের আবেগটা জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়া হরিপদ মুকুন্দ বাবুর পানে চাহিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন,—রোগের historyটা একবার——"

হরিপদর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুকুন্দ বাবু কহিলেন—"রোগের history,"—কথাটা প্রফুল্লর কানে গিয়াছিল; সে কহিল—"রোগের history আমি বলছি।" এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া প্রফুল্ল ডাকিল,—"সুশীল।"

সুশীল নিকটে আসিলে প্রফুল্ল তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"তোমার দাদা মশাইকে একটু যেতে বল।

সুশীলের কথায় মুকুন্দ বাবু বাহিরে আসিয়া সরমাকে কহিলেন "মা আমি একটু বাহিরে গিয়ে তামাক খেয়ে আসি—ইতিমধ্যে যদি দরকার হয় তো সুশীলকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়ো।

সরমা কহিল "আচ্ছা।"

মুকুন্দ বাবু নীচে চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল আরম্ভ করিল,—"ডাক্তার বাবু শুনুন আমি মহাপাপী—আমার চেয়ে পাপী এ সংসারে আর কেউ আছে বলে বোধ হয় না—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমি বিশ্বাসঘাতক, আমি বন্ধুপত্নী হরণ করেছি, আমি আমার সতী সাধ্বী স্ত্রীর মাথায় পদাঘাত করে সগর্ব্বে চলে গেছি—তার চোখের জল, বন্ধুর অভিশাপ, এ সব যাবে কোথা, বলিয়া প্রফুল্ল গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কহিল,—যেদিন রাত্রে হরিপদ আমাকে মারবার জন্যে পিস্তল হাতে ছুটে এসেছিল—তার তিন চার দিন পূর্ব্বে আমার ছুটি বন্ধু এসে থিয়েটার দেখবার জন্যে আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়—খানিকটা থিয়েটার দেখে বেরিয়ে এসে আমরা এক বিলাসিনীর বাড়িতে গিয়ে উঠি—সেখানে ওরা মদের সঙ্গে কি যে একটা বিষাক্ত জিনিস খাইয়ে দিয়েছিল, তা আমি জানি না। তার পরদিন সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভব করতে লাগলুম—একটা যেন অনন্ত শিখা ভেতরটা পুড়িয়ে দিতে লাগলো। এ যন্ত্রণা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম, কাউকে জানাই নি। আমাকে এ রকম করবার তাদের যে কি উদ্দেশ্য ছিল, তা আমি ভালো বুঝতে পারি নি। হয় আমার মতন পাপীর উচ্ছেদ সাধন করাই তাদের উদ্দেশ্য, না হয় কমলার উপর তাদেরও দৃষ্টি পড়েছিল। তার পর আমার এই অবস্থা। হরিপদর অভিশাপ হাতে-হাতে ফলে গেছে—তার পিস্তলের গুলি যদি আমার বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে যেত, তাহলে আহা, সে মরণ কত মধুর হত! আমি মহাপাপী কিনা তা আমার হবে কেন? আমার পাপের সীমা নেই, এ জগতে আমার পাপের শাস্তি হল না বুঝি—পর জগতের জন্যেও কিছু তোলা আছে। এখন একবার

যদি সেই হরিপদকে দেখ্‌তে পাই তা হলে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে একবার বলি, ভাই তোর হাতের পিস্তল একবার আমার বুকে রেখে ছোড়্‌, আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যাক——”।

প্রফুল্ল আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ; সে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল।

হরিপদর প্রাণের নীচে এতক্ষণ কন্দর প্রবাহ বহিতেছিল, এখন একটা আঁচড়ে যেন সহসা বাহির হইয়া পড়িল ! তাহার সমস্ত হৃদয় ছাপাইয়া খরবেগে বহিতে লাগিল ; সে আর আপনাকে সংযত করিতে পারিল না—হৃদয়ের বেগ বাঁধ মানিল না—হরিপদ আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। সে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রফুল্লকে তাহার বুকের মধ্যে টানিয়া একবার আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—“ভাই প্রফুল্ল, তুমি আমাকে চিন্তে পারলে না—আমি তোমার সেই হরিপদ—সেই বাল্যসখা—মাত্র না হয় বিলেতে গিয়ে ডাক্তার হয়ে বোনার্জি সাহেব হয়েছি, কিন্তু তোমার কাছে আমি সেই হরিপদ সে-ই আছি।”

সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, হরিপদর স্নেহ-কোমল আলিঙ্গনের মধ্যে প্রফুল্ল তেমনি একবার শিহরিয়া উঠিল ! তারপর বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে হরিপদর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—“অ্যাঃ হরিপদ ! ভাই এসেছ ! বেশ হয়েছে। পায়ের ধুলো দাও, পায়ের ধুলো দাও” বলিয়া হাত বাড়াইল--তার পর ধীরে ধীরে কহিল,—“ভাই এইবার তোমার পিস্তলটা বার করে আমার বুকের ওপর ধর—মরণটাকে মধুর করে জীবনটাকে জুড়িয়ে দাও।”

সরমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল। তাহার দেহখান টলমল করিয়া উঠিল, তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া যেন একটা প্রবাহ ছুটিয়া গেল ! সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; ছুটিয়া আসিয়া হরিপদর পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিল—“দেবতা—দেবতা—দেবতা আপনি—পায়ের ধুলো দিন।”

“করেন কি, করেন কি” বলিয়া হরিপদ তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইল। সরমা উঠিয়া একটু তফাতে বসিল। বালক সুশীল এ ব্যাপার কিছুই বুঝিল না। কিন্তু যখন সে দেখিল যে তাহার পিতামাতা এই ডাক্তারের পদ-ধূলী লইবার জন্য ব্যস্ত, তখন নিশ্চয়ই এ ডাক্তার অহার প্রণম্য, এই ভাবিয়া সেও হরিপদর পায়ের উপর ঢিপ্‌ করিয়া এক নমস্কার করিল। হরিপদ এক হস্তে প্রফুল্লকে ধরিয়া অপর হস্তে সুশীলকে টানিয়া তাহার কোলে তুলিয়া লইল।

প্রফুল্ল একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—“সরমা, সরমা, এইবার

আমি সুখে মরতে পারবো ; ভগবান বুঝি এই জন্য আমায় এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন।" তারপর হরিপদর দিকে চাহিয়া কহিল,—"বল, ভাই বল আমাকে ক্ষমা করলে—ক্ষমা করলে—ক্ষমা করলে,—"তখন তাহার মুখের উপর দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

হরিপদ কহিল—"আমি তোমায় শতবার ক্ষমা করলুম, কিন্তু তুমি কাঁদচো কেন ভাই ? তুমি এমন কী করেছ—সামান্য একটা পদস্খলন যা মানুষের পদে পদে হয়। মানুষ কেন, ঋষি মহর্ষি এমন কি দেবতাদেরও পদস্খলন আছে। তুমি আমি কোন ছার।"

প্রফুল্লর সারা অঙ্গে কে যেন অমৃত সিঞ্চন করিল! শত বেদনার ভিতর আজ যেন সে একটু শান্তি লাভ করিল।

সরমা ইঙ্গিতে সুশীলকে ডাকিল। সুশীল উঠিয়া যাইতেছে এমন সময় হরিপদ কহিল,—"ভাই প্রফুল্ল, তোমার ছোট ছেলেটিকে একবার আনাও, তাকেও একবার কোলে করে নিই।"

প্রফুল্ল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আহা অনিল! তাকে আজ অনেক দিন যমের হাতে তুলে দিয়ে এখনো আমি বেঁচে আছি।" সরমা অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

হরিপদ ভাবিল, আহা প্রফুল্লকে ভগবান সকল রকমেই শাস্তি দিয়েছেন। প্রফুল্ল একটু প্রকৃতিস্থ হইলে হরিপদ কহিল,—"তোমরা কি জানতে না ভাই আমি এখানে এসেছি ?"

"কি করে জানবো বল ভাই ? তবে লোক-পরম্পরায় শুনেছিলুম যে, ডাক্তার বোনার্জ্জি বলে একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তার এসেছেন। তুমিই যে বোনার্জ্জি তা কি করে জানবো ?"

"কেন—অবিনাশ বাবুর সঙ্গে আমার মোকদ্দমার বিষয় শোন নি ? কেন কাগজে তো বেরিয়েছিল।"

প্রফুল্ল বিস্মিতভাবে কহিল,—"না ভাই কিছুই জানি নে—কেবা কাগজ আনে, আর কেবা পড়ে—আমার তো এই অবস্থা। কি হয়েছিল শুনি ?"

"সে আর একদিন বলবো, এখন উঠি—আমি এখুনি গিয়ে তোমার জন্য দুটো ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্চি,—একটা মলম, আর একটা আরক। ব্যবহার করে দেখ এতেই বোধ হয় ঘা-টা শীঘ্র শুকিয়ে যাবে"—বলিয়া হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রফুল্ল কহিল,—"আর কেন, ওষুধের দরকার কি ভাই ? এখন আমার মরণ সহজেই হবে।"

"তুমি অত অধীর হয়ো না—আবার আমি এসে দেখে যাব" বলিয়া হরিপদ ব্যথিত-হৃদয়ে ঘরের বাহিরে আসিল।

সুশীল কোমল-কণ্ঠে কহিল,—"জেঠামশাই, মা বলছেন এখন আপনার যাওয়া হবে না। এখানে খাওয়া দাওয়া করতে হবে।"

হরিপদ পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া সুশীলের হস্তে দিয়া কহিল—"এই নাও বাবা, তোমার জেঠামশাই তোমাকে সন্দেশ খেতে দিলেন, আর তোমার মাকে বোলো আমি তোমাদের বাড়ি অনেকবার খেয়েছি আবার এসে খেয়ে যাব ; এখন যাই তোমার বাবার ওষুধ পাঠাতে হবে" বলিয়া হরিপদ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল এবং তাঁহার চির-পরিচিত পথে একমনে কি ভাবিতে ভাবিতে গাড়িতে আসিয়া বসিল। কোচম্যান ঘোড়াকে একটা চাবুক মারিয়া তখনই গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ও-দিকের বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া মুকুন্দ বাবু তামাক খাইতে ছিলেন। হরিপদকে সটান চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সেই দিকে ছুটিলেন। তখন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র শ্লথ হইয়া নাভির নিম্নদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি এক হস্তে হুঁকা অপর হস্তে ডাক্তারের ফি ও বস্ত্র সংযত করিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"ডাক্তার বাবু. এ দিকে আসুন—এই নিন, আপনার ভিজিটের টাকা, প্রেস্কৃপসনটা কোথায় ? রোগীকে কেমন দেখলেন ?"

হরিপদর গাড়ি তখন রাস্তার ধূলা উড়াইয়া গড় গড় শব্দে ছুটিতেছে। সে কিছুই শুনিতে পাইল না। মুকুন্দ বাবু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

একোনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

চৌধুরী মহাশয়ের শরীর এখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন। আজ কয়েক দিন হইল ডাক্তার কবিরাজ তাঁহাকে একরূপ জবাবই দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এ অবস্থায় বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া কোনো একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে পারিলে আর কিছু দিন বাঁচিতে পারেন ; নচেৎ তাঁহার জীবনের আশা খুবই কম।

সরল কহিল,—"বাবা আমরা স্থির করেছি আপনাকে সিমুলতলায় নিয়ে যাব। ডাক্তার বলেন সেই স্থানটা আপনাকে খুব Suit করবে। আপনি—"

সরলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চৌধুরী মহাশয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—"থাম—থাম, তোমরা আর আমাকে যেখানে—সেখানে নিয়ে যেয়ো না। মিছে ডাক্তার ডাকাডাকি কোরো না ওষুধপত্রও আর খাইয়ো না। আমাকে এখন একটু শান্তিতে থাকতে দাও। যদি আমাকে নিতান্তই কোথাও নিয়ে যেতে হয় তা হলে কাশীতে নিয়ে যাও। জীবনের শেষ দিনকটা যেন গঙ্গাতীরে কাটিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের পায়ে মাথা রেখে মরতে পারি।"

সরল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আচ্ছা তাই হবে।"

সরল সেই দিনই কাশীর বিখ্যাত দালাল আমিরচাঁদকে টেলিগ্রাম করিল, সে যেন দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর একখানি ভালো বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখে।

যথাসময়ে আমিরচাঁদের নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল, বাড়ি ঠিক হইয়া গিয়াছে। সরল তাহার পিতাকে লইয়া সপরিবারে কাশীযাত্রা করিল। পিতার অসুখ শুনিয়া লীলা দেখিতে আসিয়াছিল—সেও পিতার শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইল। সরল ট্রেণের একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ করিয়া লইয়াছিল এবং কাশীর ষ্টেসনে লোক মোতায়েন ছিল ও তিনখানি ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুত ছিল, কাজেই নির্দ্দিষ্ট বাটীতে আসিতে তাহাদের কোনো কষ্ট হয় নাই। রাস্তার উপর বাটীখানি বেশ পরিস্কার ঝরঝরে—সামনে খোলা বারাণ্ডা—বারাণ্ডায় আসিলে ঘাটের সোপানগুলি হইতে গঙ্গার তরঙ্গ-লীলা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাটীখানি সকলেরই পছন্দ হইল।

পরদিন আন্দাজ দশটার সময় "জয় মহারাণী কী জয়' শব্দে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বিমলা, লীলা, সরল সকলে আসিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইল—দেখিল 'জয় মহারাণী কী জয়' শব্দে একটা জনতা তাহাদের বাটীর নিকট দিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া যাইতেছে—একজন বেহারা ভিক্ষুকদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। সেই জনতার মধ্যে কেহই কিন্তু মহারাণীকে ভালো করিয়া দেখিতে পাইল না। বিমলা কহিল,—"দেখ্‌লি সরল মহারাণী দেখ্‌লি ?"

সরল কহিল "এখানে অনেক রাজ—রাজড়া আসেন, কাজেই মহারাণীদের দর্শন এখানে তেমন দুর্লভ নয়!"

লীলা কহিল,—"ইনি কোথাকার মহারাণী দাদা ?"

সরল মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া কহিল,—"তাহলে তো আমাকে জানের বাড়ি যেতে হয়!"

বিমলা কহিল,—"হাঁ—মহারাণীর যোগ্য বটে, একটা লোক ক্রমাগত চাল আর পয়সা দিতে দিতে চলেছে।"

সরল কহিল,—"একজন মহারাণীর পক্ষে এটা কি আর একটা মস্ত দান হল? টাকা, মোহর দেওয়া উচিত।"

বিমলা কহিল,—টাকা মোহর এমনি করে ছড়িয়ে দিতে পারে ক'জন মহারাণী তা তো আমি জানি নে।"

এই সময় সরলের পিতা ডাকিলেন,—"সরল।"

সরল "আজ্ঞে" বলিয়া ছুটিয়া গেল।

"দেখ তো নীচেয় বুঝি কে ডাকচে!"

সরল নামিয়া আসিয়া দেখিল—আমিরচাঁদ।

আমিরচাঁদ কহিল,—"কেমন, বাড়িখান আপনাদের পছন্দ হয়েছে?"

সরল কহিল—"হ্যাঁ বাড়িটা আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে।"

"তবে আমার কমিশন দশটাকা আর বাড়িওলাকে আমি যে পঁচিশটাকা advance করেছি সেটা কি এখন পাওয়া যাবে?" "অবশ্য এখনি পাবেন" বলিয়া সরল উপরে গিয়া তিনখানি দশটাকার নোট ও পাঁচটি টাকা আনিয়া আমিরচাঁদের হাতে দিল। আমিরচাঁদ টাকা কয়টি হাতে লইয়া কহিল,—"আপনার father এসেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর শরীর বড়ই খারাপ—তিনি যে আর বেশি দিন বাঁচবেন বলে বোধ হয় না।"

"বটে তিনি এমনি অসুস্থ—তবে কালই আপনি মহারাণীর সঙ্গে দেখা করুন——"

সরল আগ্রহের সহিত কহিল,—"মহারাণী? যে মহারাণী আজ এইখান দিয়ে গেলেন?"

"হ্যাঁ সেই মহারাণী, তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা—তিনি একবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে সব রোগ ভালো হয়।"

সরল বিস্মিতভাবে কহিল,—"বটে?"

আমিরচাঁদ কহিল,—"কেন বিশ্বাস হয় না? শত শত লোক ভালো হয়ে গেল—তাঁর হাঁসপাতালে লোক ধরে না। আমরা তাঁকে রাণী মা বলি।"

"তিনি কোথাকার মহারাণী।"

"তা বলতে পারি নে—কিন্তু তিনি মহারাণী-হাঁসপাতালের মহারাণী—

আপনি কালই সেখানে যাবেন—আপনার father ভালো হয়ে যাবেন—আমি বললুম।”

“তিনি কি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন?”

“করবেন বৈকি। তিনি স্ত্রী-পুরুষ সকলের সঙ্গেই দেখা করেন—তাঁর কোনো দ্বিধা নাই। আপনি কালই যাবেন” বলিয়া আমিরচাঁদ তাহার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। সরল উপরে আসিয়া তাহার মাতাকে মহারাণী সংক্রান্ত সমস্ত কথা বলিল।

বিমলা কহিল,—“আমিরচাঁদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, যেন তাই হয়—কাল আমরা সকলে মিলে তাঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে পড়িগে চল—যদি তাঁর একটু কৃপা দৃষ্টি হয়।”

“একথা কিন্তু বাবাকে এখন জানিয়ে দরকার নেই—তিনি হয় তো তাহ'লে যেতেই দেবেন না—আমরা ঠাকুর দেখতে যাচ্চি বলে যাব; কি বল মা?”

বিমলা কহিল,—“সেই ভালো।”

পরদিন সাতটার সময় সরলের গাড়ি আসিয়া মহারাণী-হাঁসপাতালের দরজায় দাঁড়াইল। সরল গাড়ি হইতে নামিবামাত্র দ্বারবান অভিবাদন করিয়া গেট খুলিয়া দিল।

সরল জিজ্ঞাসা করিল,—“হিঁয়া কৈ বাঙালী বাবু হ্যায়?”

“হ্যায় বাবুজী, বোলায় দেগা?”

“আচ্ছা বোলায় লে আও।”

দ্বারবান ছুটিয়া গিয়া একটি বাঙালী যুবককে ডাকিয়া আনিল। সরল যুবককে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—“আপনি কি এই হাঁসপাতালের লোক?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ আমি এই হাঁসপাতালের একজন সামান্য Compounder আপনি কাকে চান—বলুন? আপনার কি কোনো রোগী আছে?”

“হ্যাঁ আমার একটি রোগী আছেন।”

“তবে আসুন, রাণীমার চিকিৎসার গুণে অল্প দিনেই ভালো হয়ে যাবেন। কোনো ভয় নেই।”

“রোগীকে এখানে আনবার পূর্ব্বে আমরা একবার রাণীমার পায়ের ধূলা নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে যেতে চাই।”

“আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন” বলিয়া যুবক ছুটিয়া গিয়া ম্যানেজারকে ডাকিয়া আনিল।

ম্যানেজার আসিয়া কহিল,—"আপনারা কি রাণীমার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"আমাদের সেইজন্যেই এখানে আসা।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সকলেরই সমান অধিকার ছিল—কিন্তু এখানকার অজস্র লোকে দিন রাত তাঁকে বিরক্ত করে তুলতে লাগলো। তাঁর কোনো কাজই হয় না—এমন কি হাঁসপাতালে পর্য্যন্ত আসবার সুবিধা পান না। তাই সম্প্রতি তিনি হুকুম দিয়েছেন;—যদি কোনো ভদ্রলোক দূর দেশ হ'তে আসেন, তা হলে তাঁকেই কেবল যেন আসতে দেওয়া হয়—সেইজন্যে জিজ্ঞাসা করচি কিছু মনে করবেন না, আপনি কোথা থেকে আসচেন? আর দয়া করে আপনার একটু পরিচয় দেবেন।"

বিলাসপুরের জমীদারের পুত্র সরল কলিকাতা হইতে আসিতেছে—শুনিয়া ম্যানেজার কহিল,—"আপনি স্বচ্ছন্দে গাড়ি নিয়ে বাগানের ভিতর চলে যান। কিন্তু একটা কথা বলে দিই এখন তিনি সমাধিতে আছেন। আপনারা গিয়ে একটু বসে থাকুন তাঁর সমাধি ভঙ্গ হলেই তিনি উঠে আপনাদের সঙ্গে কথা কইবেন।"

সরল গাড়ির উপর উঠিয়া বসিল—গাড়িখানি হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণ পার হইয়া এক প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানের ভিতর আসিয়া থামিল। এইবার সকলেই গাড়ি হইতে অবতরণ করিল। উদ্যানটি ঋষিদিগের তপোবনের ন্যায় নির্জ্জন পবিত্র শান্তিপ্রদ। সম্মুখেই একটি কৃত্রিম পাহাড়—পাহাড় হইতে অবিশ্রান্ত মধুর ঝর-ঝর শব্দে রজত-ধারার ন্যায় অনেকগুলি নির্ঝর নামিয়া আসিয়া পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া এক প্রাণে এক গান গাহিতে গাহিতে একটি ক্ষুদ্র হ্রদে আসিয়া পড়িতেছে। হ্রদে লাল, পীত, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙের বহুসংখ্যক মৎস্য খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমল কুঞ্জের মধ্যে মরাল খেলা করিতেছে, আর সেই মরাল-পৃষ্ঠে যেন যুগলপদ রাখিয়া কমল-কুঞ্জের মধ্যে এক অপূর্ব্ব বীণাপাণী মূর্ত্তি। সহসা দেখিলে মনে হয় যেন এই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি জল ভেদ করিয়া সবেমাত্র উত্তাসিত হইয়াছেন। পাহাড়ের উপর একদিকে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি, অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ। ফলে-ফুলে শোভিত তরুশ্রেণীর ডালে ডালে বিহঙ্গের কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার স্থানটিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। অনেকগুলি বানর তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া আনন্দ-কোলাহলে চারিদিকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে,

উহা যেন তাহাদের আপনার ঘর-বাড়ি। অদূরে শ্যামল তরুতল-শোভিত ছায়া-স্নিগ্ধ বিটপীদল-মাঝে রমণীর কুঞ্জ-কুটীর। ঘন পল্লবের ভিতর দিয়া চূর্ণ রৌদ্র তখন বাড়িটির স্থানে স্থানে সোনার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল!

রমণীর এই ক্ষুদ্র নিকেতনের নিকটে আসিয়া সকলে একবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল এক বিল্বমূলে প্রস্তরবেদীকার উপর অপূর্ব্ব এক নারীমূর্ত্তি যোগাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পিঠের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া ভূমি চুম্বন করিতেছে। তাঁহার প্রশান্ত মুখের উপর স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে! নিমীলিত-নয়নে কে জানে কাহার ধ্যানে তিনি নিমগ্ন! সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেইখানে উপবেশন করিল।

সরল এই ধ্যাননিরত মূর্ত্তিটির পানে, একবার—তুইবার—তিনবার চাহিল—চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিল—তার পর বিমলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"দেখ মা এঁকে ঠিক আমাদের দিদির মতো দেখতে—একটুও তফাৎ নেই—লীলা কি বলিস?"

লীলা কহিল,—"ঠিক বলেছ দাদা—একটুও তফাৎ নেই—অবিকল।"

বিমলা কহিল,—"থাম্ এক চেহারার কি তুটি মানুষ হয় না? মিছে গোলমাল করিসনে—মহারাণীর ধ্যানভঙ্গ হতে পারে।"

সরল আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রমণীর সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার উর্দ্ধদিকে চাহিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন, পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বিমলাকে লক্ষ্য করিয়া মধুরকণ্ঠে কহিলেন,—"আপনারা মাটিতে বসে কেন, আমার কুটীরের দালানে এসে বসুন।"

রমণীর কথায় সকলে দালানে আসিয়া বসিল। রমণী আবার কহিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসচেন? আমার নিকট আপনাদের প্রয়োজন কি?"

বিমলা কহিল,—"আপনার নিকট আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে; আমরা আপাতত কলকেতা থেকে আসচি—সরল আমাদের একটু পরিচয় দে!"

"সরল" কথাটা যেন ছিন্নরজ্জু গাভীর ন্যায় রমণীর প্রাণের ভিতর ছুটাছুটি করিতে লাগিল—তাহার সুপ্ত স্মৃতি তখন জাগিয়া উঠিল—তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

সরল কি বলিতে যাইতেছিল—বলিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—সে যেন সম্মোহিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লীলা কহিল "আমাদের বাড়ি বিলাসপুর——"

লীলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সরল আকুলস্বরে "দিদি" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

সে স্বর রমণীর প্রাণের তারে ঘা দিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সে তখন আবেগভরে "ভাইরে সরল কাছে আয়" বলিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া টানিল—সরল কিছু বলিতে পারিল না—তাহার দুটি চক্ষু হইতে আনন্দের অশ্রু তখন ঝরঝর করিয়া পড়িতেছিল।

লীলা কহিল,—"দিদি"।

"এস দিদি এস" বলিয়া তাহাকে আপনার নিকট টানিয়া আনিল।

বিমলা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এইবার সে কহিল,—"অ্যা তুমিই কি আমাদের সেই কমলা, সরলের দিদি, না কোথাকার মহারাণী?"

"মা আমি আপনাদের সেই কমলা—সরলের দিদি—পোড়া লোকগুলা মহারাণী মহারাণী করে আমাকে পাগল করে তুলেছে। মা আমার আজ কম সৌভাগ্য নয় যে আপনার চরণ দর্শন পেলুম।"

বিমলা কমলার মস্তক চুম্বন করিয়া কহিল,—"সৌভাগ্য আমার যে আজ তোমার মতো দেবীর দর্শন পেলুম।"

"অমন কথা বলবেন না—আমি যে আপনার মেয়ে। হ্যাঁ মা তফাতে ঐ যে ঘোমটা দিয়ে ফুটফুটে মেয়েটি বসে আছে উটি কি আপনাদের কেউ?"

বিমলা কহিল,—"হ্যাঁ। উটি সরলের বৌ। সরল ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছিল যে তার দিদিকে না পেলে কিছুতেই সে বিয়ে করবে না, ক্রমে কর্ত্তার শরীর ভেঙে পড়তে লাগলো—আর আমাদের নিতান্ত পীড়াপিড়ীতে আজ দুই বৎসর হল সরলের বিয়ে হয়েছে ——"

বিমলার সব কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কমলা পুলকচঞ্চল আবেগভরা হৃদয়ে "অ্যাঁ সরলের বৌ—সরলের বৌ" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া মেয়েটিকে বাহু-বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া তাহার বক্ষের নিকট টানিয়া আনিল। মেয়েটি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কমলার পায়ে ঢিপ করিয়া মাথা ঠুকিয়া দিল। কমলা তাহাকে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল এবং দুটি হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া, বিমলার পানে চাহিয়া "মা এটি আমার সাধের ধন আমাকে একটু আশীর্ব্বাদ করিতে দিন" বলিয়া মেয়েটিকে লইয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সরল

লজ্জিতভাবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল—তখনো তাহার নয়ন-প্রান্তে এক ফোঁটা অশ্রু দুলিতেছিল।

কমলার হৃদয়-মধ্যে তখন এক নব আনন্দের লহরী খেলিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি একটি সিন্দুক খুলিল—সিন্দুক হইতে রায়পুরের মহারাণী-প্রদত্ত বহুমূল্য বেনারসী শাড়ীখানি বাহির করিয়া স্বহস্তে বধূটিকে পরাইয়া দিল। মোতীর মালা তাহার গলায় দুলাইয়া দিল। হীরক-বলয় দুগাছি দুই করে সংলগ্ন করিয়া কর্ণে দুইটি বড় বড় হীরক-দুল পরাইয়া দিল (উহা সে মাড়োয়ারীর পত্নীর নিকট হইতে পাইয়াছিল) তার পর সিমন্তের সিন্দুর উজ্জ্বল করিয়া দিয়া তাহাকে বাহিরে আনিয়া আপনার ক্রোড়ে বসাইল।

বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে শোভিতা বধূটিকে দেখিয়া বিমলা অবাক হইয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"এ সব জিনিস যে রাজারাজড়ার ঘরের মা——"

বিমলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কমলা কহিল,—"ভগবান জিনিস ক'টা আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—এতদিন পরবার লোক ছিল না আজি তিনি লোকও পাঠিয়ে দিলেন।"

সরল ভাবিল—তাহার দিদি দেবী না মানবী।

বিমলা কহিল,—"মা আমি তোমার শক্তির পরিচয় পেয়ে এখানে এসেছি; মহারাণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমাদের এখানে আসা—কে জানে বাবা বিশ্বেশ্বর আমার মেয়েকেই মহারাণী সাজিয়ে রেখেছেন! মা তুমি দেবীই হও আর যেই হও তোমার পায়ে ধরে বলচি—"

বিমলার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল,সে কমলার পদ প্রান্তে পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিমলার দুই হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া কহিল,—"কি হয়েছে মা—শীগ্‌গির বল—এমন করে কেঁদে উঠলে কেন মা? আমি যে আপনার মেয়ে—আমার পা কি ছুঁতে আছে?—আমার যে পাপ হবে।"

বিমলা কথা কহিতে পারিল না। সে জলভরা নয়নে কমলার দিকে চাহিয়া রহিল।

লীলা কহিল,—"শোনো দিদি আমি বলচি, বাবা আজ তিন চার মাস শয্যাগত আছেন। কলকেতার ডাক্তার কবিরাজ এসে দেছে। বাবার নিতান্ত ইচ্ছে যেন কাশীতেই তাঁর মৃত্যু হয়—সেই জন্যে আমরা তাঁকে এখানে এনেছি।"

সরল কাতর-প্রাণে ব্যাকুলভাবে কহিল,—"দিদি তোমার পায়ে পড়ি তুমি বাবাকে বাঁচাও।" তাহার মুখখানা তখন ম্লান—বেদনাপূর্ণ!

কমলা অধীরভাবে কহিল,—"বাবা এসেছেন এতক্ষণ বলতে হয় তাঁর অসুখ—অসুখ কার না হয়—বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেরে যাবে ভয় কি মা ? সরল চুপ কর কাঁদিসনে ! তিনি এখন কোথায় ?"

কমলার কথা ক'টা যেন সকলের অঙ্গে পুষ্প বৃষ্টি করিল।

সরল কহিল—"তিনি এখন বাসাতে আছেন। চল দিদি একবার বাবাকে দেখে আসবে চল।"

"যাই সরল একটু বোস। তোমরা যখন এখানে এসেছ তখন তোমাদের অন্য বাসাতে কোনো রকমেই থাকা হবে না," বলিয়া কমলা তাহার কক্ষ-প্রাচীর-সংলগ্ন একটি হাতল ধরিয়া টানিল। তখনই ম্যানেজার ছুটিয়া আসিয়া কমলাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

কমলা কহিল—"দেখুন, নবৎখানার সামনে দোতালার যে ঘরগুলা আসবাব পত্রে বন্ধ আছে—এখুনি লোক লাগিয়ে সেগুলা খালি করে ধুয়ে মুছে ভদ্রলোকের থাকবার উপযুক্ত করে দিন। মেঝেতে কার্পেটগুলা পেতে দেবেন--চেয়ার, টেবিল, পালং সব যেন ঘরে ঘরে পাতা থাকে।"

ম্যানেজার "যে আজ্ঞে" বলিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইলে কমলা আবার কহিল—"শুনুন আজ আমাকে হাঁসপাতালে যেতে হবে কি ? কোনো শক্ত কেশ আছে ?"

"না আপনার যাবার বিশেষ কিছু দরকার নেই—সব রোগীই ভালো আছে" বলিয়া ম্যানেজার চলিয়া গেল।

কমলা কহিল,—'এইবার সরল একটা গাড়ি আনতে পাঠাই।"

সরল কহিল—"না দিদি গেটের কাছে আমাদের গাড়ি তৈরি আছে।"

"তবে চল" বলিয়া কমলা তাহার ঘর' কয়টিতে চাবি বন্ধ করিয়া বধুটির হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

গাড়ির ভিতর সরলের স্থান হইল না—সে কোচবাক্সে আসিয়া বসিল। গাড়ি হাসপাতালের গেট পার হইবামাত্র কতকগুলি ভিক্ষুক—"জয় মহারাণী কী জয়" বলিয়া উল্লাসভরে চীৎকার করিয়া উঠিল—এবং উপরে সরলকে দেখিয়া তাহারা গাড়ির সহিত দৌড়াইতে নিরস্ত হইল—ভাবিল মহারাণী এ গাড়িতে নাই। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বহু দিন নয়

—:•:—

সে তো সে দিনের কথা—বহু দিন নয়,
তখনো বসন্ত আছে
অশোক ফুটেছে গাছে ;
কুসুম-সুরভি ছুটে সারা বিশ্বময় !
তখনো চম্পক-বনে
বহে বায়ু স্বন্ স্বনে,—
তটিনী লহর তুলে ঢ়ু'ল ঢ়ুলে বয় !

তখনো আশার বনে বাজিছে বাঁশরী
শত সুখ-সাধ লয়ে
যমুনা উজান হয়ে
বহিতেছে ; উঠিতেছে কদম্ব শিহরী !
কোয়েলা গাহিছে গান
পুলক-বিহ্বল-প্রাণ,
যামিনী জ্যোছনা পরে সর্ব্বাঙ্গ আবরি।

সে তো সে দিনের কথা বহু দিন নয়,
সহসা ঝটিকা আসি
সব দিয়ে গেল নাশি ;
ফল-ফুলে-ভরা বন হল মরুময়,—
প্লাবন-প্রবাহে ঘোর
ছিঁড়ে গেল গাঁথা ডোর
এবে শুধু আঁখি-লোর ফুরাবার নয় ;

সে যে পুলকের খেলা ফুরালো পলকে,
হতাশায় বিদ্ধ প্রাণ,

কত যুগ অবসান
একি মহা ব্যবধান ইহ-পরলোকে ?
বহিছে সাগর-বারি
দি'গন্ত বিস্তার করি ;—
কে লবে এ করে ধরি পরপারে ডেকে ?

শ্রীসুকুমারী দেবী।

গোরুর রক্তামাশায়

—:০:—

গোরুর রক্তামাশায় রোগ একটি কষ্টদায়ক পীড়া। গোরুর এই রোগ হইলে গোবরের সহিত রক্ত আম নির্গত হয়। কারণ, গোরু যদি কদর্য্য ঘাস, ঘোলা জল, বিষাক্ত উদ্ভিদ আহার করে অথবা জলা জমিতে থাকে, তাহা হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ :—গোরুর রক্তামাশায় রোগ হইলে, তাহার কম্প দিয়া জ্বর হইবে, জলবৎ মলের সহিত আম ও রক্ত-মিশ্রিত থাকিবে এবং বার বার দাস্ত হইবে। যে আম মলের সহিত নির্গত হইবে, তাহা ডিম্বের ভিতরস্থিত লালার মত।

চিকিৎসা :—গরম জলে ফ্লানেল উত্তমরূপে ভিজাইয়া পেটে সেঁক দিবে, অথবা লৌহ অল্প গরম করিয়া পেটে আস্তে আস্তে চাপ দিবে। যাঁহাদের নিকট ফ্লানেল না থাকে তাঁহারা কম্বল গরম জলে ভিজাইয়া সেঁক দিতে পারেন। আর যাঁহাদের নিকট ফ্লানেল বা কম্বল নাই, তাঁহারা লৌহ গরম করিয়া পেটে সেঁক দিতে পারেন।

যদি মল নির্গমনের বেগ অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে গোরুর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া একগাছি দড়িদ্বারা বাঁধিয়া দিবে, মধ্যে মধ্যে ঈষদুষ্ণ জল মলদ্বারে পিচকারি করিয়া দিবে।

পথ্য :—ভাতের মাড়ের সহিত তিসির মাড় ও কলাই-সিদ্ধ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার গরম জল পান করিতে দিবে।

বাসস্থান :—গোরুর যদি এই রোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে শুষ্ক, ছায়াযুক্ত অথচ বাতাস যায়, এমন স্থানে রাখা উচিত। রাত্রিতে শীতবোধ হইলে গোরুর গাত্র কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

রোগ সারিয়া যাইবার পর চার পাঁচ দিন উত্তম পুষ্টিকর কাঁচা নরম ঘাস খাওয়াইবে।

আমাদের নর্শরীর নিকটস্থ কোনো কৃষকের নিকট উক্ত রোগের চিকিৎসার বিষয় জানিতে পারায় প্রবন্ধটি লিখিত হইল। যদি কাহারো গোরুর রক্তামাশার রোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যেন এই চিকিৎসাটি একবার পরীক্ষা করেন। চিকিৎসাটি অত্যন্ত সহজ। ফল কি হয় তাহা আমায় জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। (সম্মিলনী)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ আশ।

খাঁটুরা, কোহিনুর-নর্শরি।

বসন্তের প্রতিষেধক

—:০:—

সুপ্রসিদ্ধ ‘অমৃতবাজার পত্রিকা”য় কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রলাল রায় কবিভূষণ মহাশয় বসন্তের একটি পরীক্ষিত প্রতিষেধকের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই :—“আমি কোনো বহুদর্শী ব্যক্তির মুখে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অবগত হইয়াছিলাম,—উচ্ছে সর্ব্বপ্রকার বসন্ত রোগেরই প্রতিষেধক। এ কথার প্রমাণ জন্য আমি ক্রমাগত সাতদিন কাল উচ্ছে খাইলাম, তাহার পর বসন্তের টীকা লইলাম। টীকা লইবার পরও উচ্ছে খাইতে লাগিলাম; টীকা উঠিল না। আরো তিনবার আমি এইরূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনোবারই টীকা উঠে নাই। গত বৎসর অন্য সাত ব্যক্তিকে দিয়া আমি এই পরীক্ষা করিয়াছিলাম; এ বৎসরও কুড়ি জনকে দিয়া এই পরীক্ষা করিয়াছি। ফল—একইরূপ হইয়াছে। ইহাদের কোনো ব্যক্তিরই টীকা উঠে নাই। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে—উচ্ছে বসন্ত ব্যাধির প্রবল প্রতিষেধক। উচ্ছে সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়াছেন—উচ্ছে কুষ্ঠ, দুষ্ট ব্রণাদি রোগে রক্তশোধক। চক্রদত্ত লিখিয়াছেন—উচ্ছে হাম ও সকলপ্রকার বসন্ত ব্যাধির প্রশমনকারক। বাত, প্লীহা এবং যকৃৎ প্রভৃতি রোগও আরোগ্যকারক

এবং বলকারক রূপে ব্যবহার্য্য। কুষ্ঠ ও দুষ্ট ব্রণে ইহার চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।—চতুর্দ্দিকেই এখন বসন্তের ভীষণ প্রকোপ চলিয়াছে। হাটে বাজারেও উচ্ছের আমদানী হয়। সকলের এই সহজলভ্য বসন্তের প্রতিষেধটির পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

—:*:—

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

পল্লীগ্রামের চারিদিকে চুরি ডাকাতির সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গ্রামের যুবকদল গ্রাম চৌকি দিতেছেন। ইহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

গোবরডাঙ্গা-নিবাসী বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এক বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। শশী বাবুর বয়স পঞ্চাশের কম হইবে না।

পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে দেশে বহুবিবাহের স্রোত কিরূপ প্রবলভাবে বহিতে-ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। ভগবানের কৃপায় নব যুগের বাতাসে এখন তাহার গতি রুদ্ধপ্রায়। শিক্ষিতশ্রেণী একস্ত্রী সত্ত্বে পুনর্ব্বার বিবাহে ঘৃণা প্রকাশ করেন। কিন্তু কোথাও কোথাও অনুন্নত পরিবারের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটে; তাহার ফলে অনেক অনর্থপাতের কথাও শোনা যায়। সম্প্রতি কুশদহ তাম্বুলি সমাজে এইরূপ এক ঘটনার কথা শোনা গিয়াছে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, কুশদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ পাল মহাশয় বাৎসরিক আট শত টাকা আয়ের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়াছেন। ঐ আয় তাম্বুলি সমাজের দুস্থ পরিবারদিগের সাহায্যে ব্যয় হইবে।

যেখানে বালকদিগের উচ্চশিক্ষার আদর নাই; বালিকাদিগের লেখাপড়া শেখার আবশ্যকতা আছে এ কথা অভিভাবকগণ মনেই করেন না, সেখানে ভালোরূপে উচ্চ শ্রেণীর ইস্কুল অথবা বালিকাইস্কুল চলা কঠিন। কিন্তু ভদ্র গ্রাম মাত্রেই বালক-বালিকা ইস্কুলের আবশ্যকতা কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। যতটুকু অভাব পূরণ হয় ততটুকুই ভালো।

ইতিপূর্ব্বে খাঁটুরায় যে বালিকাইস্কুল ছিল তাহা স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পূর্ণ সাহায্যে চালিত। এই নব পর্য্যায়ের ইস্কুল গ্রামবাসিগণের অথবা তাম্বুলী-সমাজের। গ্রামবাসিগণ অথবা তাম্বুলী সমাজ এই সামান্য ইস্কুলটি কি ভালোরূপে চালাইতে পারেন না? আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম স্কুলের জন্য এবার জনৈক উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গিয়াছে।

খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের বিস্তৃত উদ্যান ও গৃহাদি পড়িয়া আছে, লোকাভাবে কোনো কাজ ভালো চলিতেছে না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক কোনো ব্রাহ্ম-পরিবার ওখানে বসবাস করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি চালাইতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছে।

গত ৪ঠা ফাল্গুন গোবরডাঙ্গার অন্যতম জমিদার পরলোকগত প্রমদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ প্রচলিত ধুমধাম-প্রথামতো সমারোহ পূর্ব্বক মাণিকতলার বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

সম্পাদকের নিবেদন

—:o:—

ঈশ্বর কৃপায় "কুশদহ" সচিত্র সুলভ মাসিকপত্র অধিকাংশের—বিশেষত কুশদহবাসীর আগ্রহের বস্তু হইয়াছে। এখন যদি কোনো কারণে কাগজখানি বন্ধ হয়, তাহা কেহই ইচ্ছা করেন না। আমি যখন প্রতি বৎসর ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিয়া এবংছবি, ছাপা, কাগজ সম্বন্ধে ব্যয়াধিক্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার দুই একটি সাহিত্যিক বন্ধু বলেন, "আকার বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।" তাঁহাদের কথা সফল হইয়াছে। তথাপি আমার বিশ্বাস, সুলভ মূল্যে একখানি উল্লেখযোগ্য মাসিকপত্র প্রচারের, বিলক্ষণ আবশ্যক আছে। ধরিয়া থাকিতে পারিলে যথাসময়ে সেই মূল সত্যের জয় হইবেই। কিন্তু এখন আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে; এতদিন কায়িক শ্রমে যাহা করিয়াছি এখন তাহাতে অশক্ত। এ অবস্থায় কেহ কেহ মূল্য বৃদ্ধি করিতে বলেন, কিন্তু তাহা সকলের মত কিনা সন্দেহ। আবার কেহ কেহ বলেন আর এক ফর্ম্মা আকার বৃদ্ধি করিয়া মূল্য ১॥০ টাকা করা হউক। কিন্তু তাহাতেও তেমন কোনো লাভ নাই। 'কুশদহ'র বর্ত্তমান অবস্থার কথা কুশদহবাসীর নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম, যদি তাহাতে কোনো উপকার হয়। অন্যথা সত্য কথার মার নাই।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়

("সরমা" উপন্যাসের লেখক)

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"বড় সাধ মনে হেরি তোমা ধনে,
গাইব তোমারি জয়।"
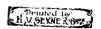
ষষ্ঠ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২১ | একাদশ সংখ্যা

জন্মভূমির জন্য

—:০:—

প্রভু, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশের পতন আরম্ভ হইয়াছিল, তুমি তেমন দেশে তেমন এক গ্রামে আমার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাকে তথায় পাঠাইলে। এখন তাহার সম্পূর্ণ দুরবস্থা। ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য নীতি ও ধন এ তিনেরই হীনতা উপস্থিত। এখন বোধ হয় এই দুরবস্থা দেখিতে দেখিতেই আমাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

তুমি আমাকে ডাকিয়া সত্য বাণী শুনাইয়া যে কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলে, তাহা যথাসাধ্য করিলাম। নরনারীর প্রাণে সদ্ভাব প্রদান করা, তোমাতে প্রকৃত বিশ্বাস-নির্ভর-যোগে জীবনে শান্তি লাভ করা, তাহার সাধন ও প্রচারে যতটুকু করিতে পারিয়াছি, তাহার ফল কি হইল জানি না। ফল তোমার হাতে রহিল। কিন্তু প্রভু, দেশের উপস্থিত দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণ বড়ই সন্তপ্ত হইতেছে। এখন তোমার চরণে নিবেদন ভিন্ন এই গমনোন্মুখ জীবনে আর কোনো উপায় দেখি না।

দাস—

প্রভু ও দাস

যদি কেহ কাহারো আদেশানুক্রমে কোনো কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তবে সেই কার্য্যের ফলাফলে তাহার কোনো দায়িত্ব থাকে না। তাহার কর্ম্মের ফল যাহাই হউক না কেন, তাহার সে বিষয়ে বিচার করিবার কোনো অধিকার নাই। তাহার কর্ত্তব্য, আদেশ পালন করা—কর্ত্তার মনস্তুষ্টি করা। যিনি কর্ত্তা, তিনিই তাহার কার্য্যোৎপন্ন ফলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব বড়ই ঝুঁকির ও মুস্কিলের ব্যাপার। তবু এই কর্ত্তৃত্বের জন্য লোকসমাজ ব্যাপৃত—কর্ত্তৃত্বের কলসী গলায় বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘূর্ণায়মান। এই কর্ত্তৃত্ব উইপোকার পাখা উঠার ন্যায় মনে হয় না কি? এই পোকার পাখা যেরূপ তাহার মরণের জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানও সেইরূপ তাহার বিনাশের নিমিত্ত হয়। কর্ত্তৃত্ব-প্রবৃত্তিই সংসারের ভোগ-বাসনায় প্রলুব্ধ করে। বিষম মায়াজালে একবার কোনোরূপে আবদ্ধ হইলে, বহু তপস্যা ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই। মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাভিমান দমন করিবার জন্য সেবা-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতিপালন করিতে বলিয়াছেন—"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্ত মা ফলেষু কদাচন।" ভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম-ফলে আসক্তি থাকে না। তদবস্থায় কার্য্য করা তাহার স্বাধীন ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে। তাহাকে ঈশ্বরাধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়।

"তুমি প্রভু আমি দাস"—এইভাবে কার্য্য করিলে, কার্য্যের ভালো মন্দ ফলে দাসের কোনো লাভালাভ নাই। সেই লাভালাভ কর্ত্তারই। কর্ত্তা দাসের কার্য্য কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করিয়া বুঝিয়া লইবেন। তবে ভৃত্য প্রভুর নিকট রীতিমত কাজ পাইবেন। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া হৃষ্টমনে কার্য্য করিবার অধিকার একমাত্র দাসেরই আছে, অভিমানীর নাই।

জীবনকে যদি এইভাবে প্রস্তুত করা যায় যে, "আমি দাস" আমি সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে দাসবৎ থাকিয়া কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে প্রভুর কার্য্যই প্রতিপালন করিব, তবে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিয়াও বন্ধন হইবার কোনো ভয় থাকে না। তখন কেবল প্রভুর প্রীতিসাধনই জীবনের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। তখন দাস জগতের সমক্ষে সেবাধর্ম্মে তৎপরতা দেখাইয়া ভাগ্যবান ভক্তরূপে পরিগণিত হন। প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন। জীবনধারণ

সফল ও সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হয়। কারণ যাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা শীঘ্র হউক আর দু'দশ বৎসর পরে হউক; ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক অবশ্যই একদিন তিনি তাহা পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

আর যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা হয় তবে পদে পদে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মস্তকে করিয়া চলিতেই হইবে। কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি নাই। কার্য্যের হিতাহিতের ফল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হইবে। কর্তৃত্বাভিমানে কার্য্যারব্ধ হইলে পদে পদে ভীষণ পরীক্ষা। তাহাতে উদ্যমের হ্রাস হইয়া যায়। কার্য্যে সফল না হইলে দারুণ মনস্তাপ ও নিরাশা উপস্থিত হয়। কিন্তু দাসের এইরূপ কোনো বাধা বা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয় না, কেননা কর্ত্তার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তাহাকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হয়। কোনো বিপদ আসিলেই কর্ত্তা সম্মুখে বিদ্যমান। প্রভুর সম্মুখে কোনো বিপদ বা বিপত্তি থাকিতে পারে না। যদি কোনো কারণে প্রভু অন্তরালে পড়েন তখন তাঁহার নামের নিশান ও প্রেমের ডঙ্কাধ্বনিতে সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন দূরে—শতদূরে পলায়ন করে। দাস বিপদ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেবল প্রভুর মহিমা ও যশ কীর্ত্তন করেন।

মান, অভিমান, লজ্জা, ভয় এ সকল জলাঞ্জলি দিতে না পারিলে কেহ কোনো দিন দাসত্ব করিতে পারিবে না। পার্থিব মনিবের চাকুরি করিয়া একটু স্বাধীনতা ও গর্ব্ব দেখাইতে চাহিলেই ভ্রূকুটি ও কশাঘাতে চমক ভাঙিয়া যায়, আর বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের দাস হইতে হইলে, আত্মসম্মান, পদমর্য্যাদা, ধনাভিমান যথাসর্ব্বস্ব যে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রেমিক কবি Shelley তাঁহার কাব্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The spirit of the worn beneath the sad by love and worship blinds itself with God."

"আমি প্রাণোৎসর্গ করিব, আমার প্রেমাস্পদের জন্য আমার আশা উদ্যম ভালোবাসা সবই তাঁহাতে অর্পণ করিব, যাহা হয় হউক।" প্রভুর জন্য এইরূপ আত্মোৎসর্গ চাই—আত্মবলিদান করা চাই। এমন কি লজ্জা ও শীতাতপ নিবারণের নিমিত্ত জীর্ণ কন্থা ব্যতীত সমস্তই দূরে নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে প্রভুর শরণাপন্ন হইতে হইবে।

দাস সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকে, তাই প্রভুর প্রকৃত স্বরূপ সে যেমন জানিতে ও বুঝিতে পারে এরূপ আর কেহ পারে কি? তাহার জ্ঞান, ভক্তি ক্রমেই

নির্ম্মল হইয়া অতি স্পষ্টরূপে সে আপনার প্রভুকে বুঝিতে ও জানিতে পারে। জ্ঞানযোগীর নিকট যিনি ধ্যানের বস্তু, দাসের নিকট তিনি পরম সুন্দর নিকটতম প্রভু। ভক্ত তাই অতি শীঘ্র প্রভুকে প্রাপ্ত হয় তাঁহাকে দেখিয়া ও জানিয়া-শুনিয়া, পদে পদে তাঁহার অনুকরণ করিয়া, তাঁহার অতি প্রিয় আজ্ঞাকারী ভৃত্যে পরিণত হইতে পারে। প্রভুকে তখন দাসের আবদার রক্ষা করিতে হয়। ক্রমে ভগবান দাসরূপী ভক্তের ভিতর আপনার প্রতিকৃতি দেখিতে পান। ভক্তও আপনাকে প্রভুর মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়; ক্রমে পার্থক্য কমিয়া আসে, তাই সেবা-ধর্ম্মের জয় ও দাসের মাহাত্ম্য প্রত্যেক ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

পথ্য

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩। মাংস একটি বলকর পথ্য। সাধারণত মাংসের উপাদান এইরূপ * —

জল—প্রতি শতভাগে	...	...	...	৭২
প্রোটিড (ছানা জাতীয় উপাদান)		...	...	১৮
স্নেহ পদার্থ	...	...	...	৫
লবণ	...	...	...	৫

রোগীর পক্ষে ছাগ, কুক্কুট অথবা কপোত মাংসই প্রশস্ত। পশুমাংস অপেক্ষা পক্ষিমাংস সহজপাচ্য †। ঐ মাংসের মধ্যে যেগুলি আবার রক্তাভ, সেই গুলিই অধিক বলকর; উহাতে লৌহের ভাগ কিছু বেশী থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে মাংসের গুণ—

---

* সকল মাংসের উপাদান সমান নহে। পক্ষিমাংসে শতকরা ৭০৮ অংশ জল আছে। উহাতে প্রোটীডের ভাগও কিছু অধিক।

† এতদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। **Dr. Beaumont** বলেন, হরিণমাংস পরিপাক করিতে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লাগে। মেষমাংস ৩ ঘণ্টায় পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কুক্কুটমাংস জীর্ণ হইতে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। বৈদ্যশাস্ত্রে ছাগমাংসকে লঘু এবং কুক্কুট ও কপোতমাংসকে গুরু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (লেখক)

ছাগ মাংস—"ছাগং মাংস লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীত মদাহিস্যাৎ স্বাদুপীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।"

লঘু, স্নিগ্ধ, স্বাদুপাক, ত্রিদোষনাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, পীনস রোগ নাশক, বলকর, রুচিকর ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

কচি ছাগ মাংস—"অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্॥"

ইহা অতি লঘু, হৃদ্য, জ্বরহর ও বলকর।

কুক্কুট মাংস—"কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধোবীর্য্যোষ্ণোনিলহৃদ্‌গুরুঃ।
চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃদ্ বল্যোরুক্ষঃ কষায়কঃ॥"

পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, চক্ষুর হিতকর শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, বলকর ও কষায়রস।

কপোত মাংস—"পারাবতোগুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ।
সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জ্ঞৈ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥"

গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, মল-সংগ্রাহক ও বলকর। দুর্ব্বল রোগীকে সচরাচর মাংসের যুষ ব্যবস্থা করা হয়। উহার পাক-প্রণালী সকলে অবগত নহেন। ছাগ, কুক্কুট অথবা কপোত মাংস চর্ব্বি রহিত করিয়া সুসিদ্ধ করিবে। অল্প লবণ, মরিচ, হরিদ্রা ও অকুট্টিত ধনে ব্যতীত উহাতে আর কোনো মসলা দিবে না। ক্বাথ বাহির হইলে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খাইতে দিবে। এই যুষ ৫।৬ ঘণ্টা কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। প্রত্যেক বার উষ্ণ করিয়া দেওয়া উচিত। কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান, প্লীহা, যকৃতের পীড়া, অর্শ, বাত প্রভৃতিতে মাংস কুপথ্য। হাঁপকাসগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ইহা বিষতুল্য; কারণ উহার মধ্যে "ইউরিক এসিড" যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় ধমনী অধিকতর সঙ্কুচিত হয়। তাহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শ্বাসকষ্টও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। মূত্রের সহিত য়্যালবুমেন্ বাহির হইলে মাংস অপথ্য। রক্তপিত্ত, হৃদ্‌রোগ, রাজ যক্ষা, পক্ষাঘাতাদি বায়ু রোগ, বহু মূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা প্রভৃতি রোগে মাংসের যুষ সুপথ্য। প্যারিসের সুবিখ্যাত ডাক্তার গুরোঁ বলেন—"যে সকল ব্যক্তি কোনো কঠিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে পীড়িত আছেন কিংবা যাঁহাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে মাংসের যুষ বিশেষ উপকারী।"

১৭। সদা মাংস ব্যবহার করিবে। পর্য্যুষিত মাংস কখনই রোগীকে দেওয়া উচিত নহে। দূষিত মাংস ভক্ষণে সুস্থ ব্যক্তিও অসুস্থ হয়। দূষিত মাংসে "টোমেন" নামক একপ্রকার বিষ পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই বিষ দ্বারা (Potomaine poisoning) কখনো কখনো ভোক্তার মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে—

"সদো হতস্য মাংসং স্যাদ্ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্।
বয়সাং বৃংহণং সাত্ম্য মন্যথা তদ্বিবর্জয়েৎ" ॥

১৮। অধুনা গোমাংস ও অন্যান্য মাংস হইতে অনেক প্রকার বিলাতী খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। রোগীর পথ্যরূপে ঐ সকল খাদ্য সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে উহাদের দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। উহারা সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত শরীরের ক্ষয় পূরণের কোনো সাহায্যই করিতে পারে না * আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এই জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্যানুসন্ধান করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, রোগীর খাদ্য হিসাবে উহাদের মূল্য কিছুই নাই বলিলেই হয়।

১৯। আজ কাল বড় বড় সহরে "Raw meat juice" বা কাঁচা মাংসের রস পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। রক্তাল্পতা,, রিকেটস্, ক্ষয় ও দৌর্ব্বল্য রোগে মাংসরস উপকারী। মাংস সুপরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অপরীক্ষিত মাংসের রস পান করিলে নানাবিধ রোগ জন্মাইতে পারে। যক্ষ্মাদি রোগগ্রস্ত পশুর মাংস-রস পান করিলে রোগীরও সেই পীড়া হওয়া অসম্ভব নহে। একদা জার্ম্মাণী দেশে টাইফয়েড রোগগ্রস্ত গো-বৎসের মাংস ভক্ষণ করিয়া অনেকগুলি লোক ঐ রোগাক্রান্ত হয়।

২০। মসূরীর যুষ মাংসের যুষের ন্যায় বলকর ও উত্তেজক। ডাক্তারেরা আজকাল মাংসের ঝোলের পরিবর্ত্তে ইহার যুষ পথ্যরূপে ব্যবহার করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ-মতে মসূরীর গুণ—

"মসূরো মধুরং পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কফপিত্তাস্রজিদ্রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ ॥"

---

* "Extract of meat or beef tea is not considered any longer a food, though as a stimulant it has few equals"——
Every one's own physician
By J. Ernst. M. D.

কেহ কেহ বলেন মাংস অপেক্ষা ইহা শীঘ্র হজম হয়। কিন্তু তাহা এখনো পরীক্ষাধীন।

অবসন্ন রোগীর বলরক্ষা করিবার জন্য মসূরীর যুষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রেমিটেণ্ট জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ইহা সুপথ্য। সূতিকা রোগে কবিরাজ মহাশয়েরা ইহার যুষ ব্যবস্থা করেন। মূত্রের সহিত য়্যালবুমেন্ বাহির হইলে মাংস পরিত্যাগ করিয়া ইহার যুষ খাওয়াই সুব্যবস্থা।

২১। দুগ্ধ প্রকৃতির আদর্শ খাদ্য। দেহের পুষ্টির নিমিত্ত যে সকল পদার্থের আবশ্যক, দুগ্ধে তৎসমুদয় বিদ্যমান। ইহা স্নিগ্ধকর ও পোষক। আমাদের দেশে গো-দুগ্ধই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। উহার উপাদান এইরূপ—

জল প্রতিশত ভাগে	...	...	...	৮৭.৫
প্রোটীড	...	...	...	৪.২১
স্নেহ পদার্থ	...	...	...	৩.৮২
শর্করা	...	...	...	৩.৬৭
লবণ	...	...	...	০.৭১

আয়ুর্ব্বেদে গো-দুগ্ধের গুণ—

"গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রস-পাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃত স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্ ॥"

মধুর, শীতল, স্তন্যকারক এবং স্নিগ্ধ। ইহা বাত ও রক্তপিত্তাদি পীড়ার শান্তিকর। প্রায় সকল রোগের সকল অবস্থায় দুগ্ধ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর উদরাময় থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে। শোথ, রক্তহীনতা, পাকাশয়ে ক্ষত, হিষ্টিরিয়া, বাত, ব্রাইটাময় (Bright's disease) প্রভৃতি রোগে দুগ্ধ আহার এবং পথ্য। বহুমূত্র এবং পাকাশয় ও অন্ত্রের বিবিধ পীড়ায় দুগ্ধই সমধিক উপযোগী। যকৃতের পীড়ায় মথিত দুগ্ধই সমধিক উপযোগী। যকৃতের পীড়ায় মাখন-তোলা দুগ্ধ সুপথ্য। ধাতুদৌর্ব্বল্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃত তুল্য। শাস্ত্রে আছে,—"ধারোষ্ণং গোপয়োবলং লঘুশীতং সুধাসমং"।

দুগ্ধ ৩ ঘণ্টায় পরিপাক হয়। এজন্য ঐ সময়ের মধ্যে দুইবার দুগ্ধ পান করা অনুচিত। কাঁচা অপেক্ষা সিদ্ধ দুগ্ধ সহজে হজম হয়। দ্বিতীয়তঃ দুগ্ধ সুসিদ্ধ হইলে তন্মধ্যস্থ বীজাণু সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। রোগীর শারীরিক অবস্থা ও অভ্যাস-ভেদে দুগ্ধের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। কোনো কোনো রোগী সমস্ত দিনে দেড় হইতে দুই সের দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে। দীর্ঘকাল

এই পথ্যের উপর নির্ভর করিলে রোগীর অরুচি জন্মিয়া থাকে। দুগ্ধে লৌহঘটিত উপাদানের ভাগ অল্প আছে; এজন্য দীর্ঘকাল কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিলে কখনো কখনো রোগী রক্তহীন হইয়া পড়ে। অনেক দিন ধরিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিতে করিতে শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা ও পাকাশয় প্রদেশে শূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে অবিলম্বে উহা বন্ধ করাই সমীচীন। দুগ্ধ পরিপাক না হইলে অল্প সোডা অথবা চূণের জল সহ পান করা উচিত। দুগ্ধের সহিত চিনি, ভাত, রুটী প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া খাইলে উহা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র হজম হয়। কাহারো কাহারো সংস্কার আছে, শরীরে ক্ষত থাকিলে দুগ্ধ খাওয়া উচিত নহে। উহা দ্বারা ক্ষতে পূঁয উৎপন্ন হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অনেক "গণোরিয়া"-রোগী পূঁয বৃদ্ধি হইবে বলিয়া ভয়ে দুগ্ধ পান করেন না। তাঁহাদের এ দুগ্ধ-ভীতির কোনো যুক্তি নাই। শাস্ত্রকর্ত্তরা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

"বাল-বৃদ্ধ-ক্ষতৎক্ষীণা ক্ষুদ্ব্যবায় কৃশাশ্চসে।
তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেতদুদাহৃতম্॥"

সর্দ্দি হইলে কেহ কেহ দুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করেন। ইহারও বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রোগী ও শিশুকে কখনো শীতল দুগ্ধ পান করাইবে না। দুগ্ধের উপরিভাগে ভাসমান সর থাকিলে তাহা তুলিয়া ফেলিবে; কারণ সরের অংশ উদরস্থ হইলে তাহাদের পেট কামড়াইতে পারে।

২২। আমাদের দেশে আজকাল বিলাতী দুগ্ধের বড়ই প্রচলন দেখা যাইতেছে। এই সকল গাঢ় দুগ্ধ নানা "মার্কা" ধারণ করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। বাবুরা চায়ের সঙ্গে ইহা ব্যবহার করেন। কখনো কখনো শিশু ও রোগীকেও ইহা দেওয়া হইয়া থাকে। আমার ডিস্পেন্সারিতে দুই এক দিন অন্তর প্রায়ই এক এক জন এই দুগ্ধের খরিদ্দার আসিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই শিশুর জন্য গোপগৃহে দৌড়াদৌড়ির ভয়ে এই দুগ্ধ ক্রয় করিতেছেন— এই কথা বলিয়া থাকেন। খাঁটি দুগ্ধের পুষ্টিকারিতা যে বাসী দুগ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা সকলেই জানেন। অথচ একটু যোগাড় করিয়া লইবার ভয়ে সকলেই এই দোষবহুল সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাঢ় দুগ্ধ সুসিদ্ধ নহে। অতি সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া উহাকে গাঢ় করা হয়। এজন্য অনেক রোগ-বীজাণু ঐ দুগ্ধে থাকিতে পারে। একখানি মাসিক পত্রে পড়িয়াছিলাম এক বিন্দু গাঢ় দুগ্ধে কুড়ি সহস্র বীজাণু পাওয়া গিয়াছিল।

"Streptococcas", "Bacillus Coli" প্রভৃতি রোগ-বীজাণু সচরাচর গাঢ় দুগ্ধে অবস্থিতি করে। অধিক দিন টিনের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া কোনো কোনো স্থলে খুলিবার পূর্ব্বে এবং কোথায়ও বা খুলিবার পরই উহা পচিয়া উঠে। সুতরাং এই দুগ্ধ রোগী ও শিশুর পক্ষে কখনই হিতকর নহে।

২৩। গো দুগ্ধ অপেক্ষা মাতৃস্তন্য লঘুপাক। নারী-দুগ্ধের প্রতি শতভাগে ৮৮·৯০ অংশ জল, ৩·৩১ অংশ প্রোটীড, ৩·১৩ অংশ স্নেহ পদার্থ, ৪·৫৫ অংশ শর্করা এবং ০·২১ অংশ লবণ আছে। ইহাতে প্রোটীডাংশ অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু শর্করার ভাগ কিছু অধিক। স্নেহ-উপাদান উভয় দুগ্ধেই প্রায় সমান। মাতৃ-স্তন্যের অভাবে শিশুকে গো-দুগ্ধ দিতে হইলে কৌশলে উহাকে লঘু করিয়া লইবে। গো-দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া লইলে অনেকটা লঘু হয়; কিন্তু সেই জলমিশ্রিত দুগ্ধে নারী-দুগ্ধের ন্যায় স্নেহ-উপাদান বা শর্করার ভাগ থাকে না। সুতরাং তদ্দ্বারা শিশুর পুষ্টির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নলিখিত ভাবে দুগ্ধ প্রস্তুত করিলে উহা মাতৃস্তন্যের ন্যায় লঘু ও গুণবিশিষ্ট হয়। একটি সরু লম্বা গেলাসে আবশ্যক পরিমাণে ও কিছু বেশী খাঁটি গো-দুগ্ধ রাখিয়া দিবে। কিছু সময় পরে যখন দুগ্ধের উপর নবনীত (স্নেহ-উপাদান) ভাসমান হইবে, তখন ধীরে ধীরে উপর হইতে বারো আনা অংশ দুগ্ধ পাত্রান্তরে ঢালিয়া লইবে। এই বারো আনা অংশ দুগ্ধের সহিত সিকি অংশ জল ও কিছু সুগার অব্ মিল্ক, অভাবে পরিষ্কার দেশী চিনি, মিশ্রিত করিলে মাতৃ-দুগ্ধের অনুরূপ দুগ্ধ প্রস্তুত হইবে। ডাক্তারেরা ইহাকে "Artificial human milk" বলেন। এই "কৃত্রিম মাতৃ দুগ্ধ" জ্বাল দিয়া ব্যবহার করিবে। "কৃত্রিম মাতৃ দুগ্ধ" প্রস্তুত-প্রণালী অন্য প্রকার—আজ কাল বড় বড় ঔষধের দোকানে য়্যালবুল্যাক্‌টিন্ (Albulactin) নামে এক প্রকার পদার্থ বিক্রয় হয়। ৫ ছটাক গো-দুগ্ধ, ৩ ছটাক বার্লির জল ও দুই আনা ওজনের য়্যালবুল্যাক্‌টিন্ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইলেও মাতৃস্তন্যের ন্যায় লঘু অথচ পুষ্টিকর পানীয় প্রস্তুত হয়।

(ক্রমশ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সরমা

—:০:—

গাড়ি আসিয়া যখন সরলের বাসার দরজায় থামিল তখন লীলা তাড়াতাড়ি নামিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার পিতাকে কহিল,—"বাবা, দিদি এসেছে, বৌকে কত গহনা দিয়েছে।"

চৌধুরী মহাশয় এ-কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া লীলার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময় সরলা আসিয়া কহিল,—"বাবা, দিদিকে পাওয়া গেছে।"

চৌধুরী মহাশয় তখনো নির্ব্বাক!

এক মুহূর্ত্ত পরে বিমলা যখন কমলার ও তাঁহার বধূমাতার হস্ত ধরিয়া চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে আসিল, তখন তাঁহার হৃদয়টা সহসা আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

কমলা চৌধুরী মহাশয়ের পদধূলী গ্রহণ করিল।

চৌধুরী মহাশয় ক্ষীনকণ্ঠে কহিলেন,—"মা এসেছ—যে ক'টা দিন বাঁচি একবার একবার দেখে যেয়ো; আমি এখন মরণের অপেক্ষায় বসে আছি।"

কমলা নম্রস্বরে কহিল,—"আপনি অত কাতর হচ্চেন কেন? কৈ আপনার শরীরে তো কোনো রোগ নেই।"

চৌধুরী মহাশয় শুষ্ক ম্লানমুখে এক বিন্দু হাসি ফুটাইয়া কহিলেন,—"বেশ বলেছ মা, আমার শরীরে রোগ নেই? আপাদ মস্তক রোগে ভরা, রোগ নেই?"

কমলা কহিল,—"আপনি একটু ঘুমোন দেখি·—আপনার গায়ে আমি হাত বুলিয়ে দিই।"

"ঘুম যে হয় না মা" বলিতে বলিতেই চৌধুরী মহাশয়ের চক্ষু জড়াইয়া আসিল। তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এই সময় কমলা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কয়েক বার হস্ত সঞ্চালন করিল; তার পর বিমলার পানে চাহিয়া কহিল,—"মা, বাবাকে একটু ঘুমুতে দিন আমি গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি।"

এ সময় কমলাকে ছাড়িয়া দিতে বিমলার ভয় হইতে লাগিল, সে কহিল,—"তবে মা আমিও যাই চল।"

লীলা ও সরল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট বসিয়া রহিল। যখন কমলা ও বিমলা ফিরিয়া আসিল তখন একটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি আছে। এই বেলা পর্য্যন্ত কাহারো খাওয়া হয় নাই; পাচক অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছে। সরল ধরিয়া বসিল, "আজ দিদি না খাইলে কাহারো খাওয়া হইবে না।"

কমলা অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিল যে, তাহার দিদি কোনো দিন এক সন্ধ্যা স্বপাক খায়, কোনো দিন বা সামান্য ফল খাইয়া কাটাইয়া দ্যায়; এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে তাহার হানি হইবার সম্ভাবনা। সকলের আহারাদি সমাধা হইলে বিমলা ও সরলের একান্ত পীড়াপীড়িতে কমলা কিছু ফল আহার করিল। ঘড়িতে তখন টং টং করিয়া তিনটা বাজিল; কমলা আর একবার চৌধুরী মহাশয়ের অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিল। এইবার তাঁহার নিদ্রালস চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে উন্মিলীত হইল। তিনি সহসা উঠিয়া বসিলেন। বিমলা তাঁহার মুখের নিকট এক বাটি গরম দুধ ধরিল, তিনি উহা পান করিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন—আঃ! কমলার কথায় তিনি আপনি উঠিলেন, স্বচ্ছন্দে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বোধ হইল কে যেন দেহাভ্যন্তরে সিঁদ কাটিয়া তাঁহার রোগের পুঁটুলী চুরি করিয়া পলাইয়া গিয়াছে—তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। গত বারো তেরো বৎসরের মধ্যে তাঁহার শরীর যে কখনো এমন নীরোগ ছিল, তাহা তাঁহার মনেই হইল না। তিনি ভাবিলেন কমলার এ কী দৈব শক্তি! এ শক্তি মানবে সম্ভব হয় না, কমলা নিশ্চয়ই দেবী। তখন তিনি ভক্তিবিগলিতহৃদয়ে কমলার চরণতলে পড়িয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে কহিলেন,—"মা, একটু পায়ের ধূলো দাও মা, তুমি দেবী—আমরা তোমাকে চিন্তে পারি নি তুমি—"

চৌধুরী মহাশয়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কমলা তিন হাত সরিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি কহিল,—"করেন কি, করেন কি, আমার যে পাপ হবে, আমি যে আপনাদের সেই মেয়ে কমলা।"

চৌধুরী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার দু'নয়ন ছাপাইয়া তখন কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কমলা চৌধুরী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনাদের আর এখানে থাকা হবে না—আমার কুটীরে পায়ের ধূলো দিতে হবে।" "চল মা তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেইখানেই যেতে প্রস্তুত।" বিমলা চৌধুরী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"সে কুটীর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, মস্ত বাগান—

এই যে মহারাণী-হাঁসপাতাল নাম শুনেছ—সেই হাঁসপাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইনি; লোকে আমার মেয়েকে মহারাণী বলে ডাকে, এ কি কম গৌরবের কথা? আর মহারাণী না হলে তোমার বৌমাকে এই সব হীরে জহরত দিতে পারে? বৌমাকে কি সাজে সাজিয়েছে একবার দেখ দেখি।" বলিয়া বিমলা তাঁহার বধূমাতাকে চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইল।

চৌধুরী মহাশয় খানিকক্ষণ তাঁহার বধূমাতার পানে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, পরে কমলার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"মা এ সব দামী গহনা গুলো তোমার মাণিকের বিয়ের সময় যৌতুক দিলেই ভালো হত।"

"মাণিক—মাণিক আমার বেঁচে আছে?" বলিয়া কমলা অধীরভাবে বিমলার মুখের পানে চাহিল।

বিমলা মৃদু হাসিয়া কহিল,—"ও মা, তা বুঝি জানো না! মাণিক যে এখন রাজরাজেশ্বর—রাজা বিধুশেখর তাকে আপনার ছেলের মতো জ্ঞান করে। রাণীর ছেলে হয় না, বাবা বিশ্বেশ্বরের কাছে ধন্না দিতে এসেছিলেন, মাণিককে কাশীর পথে ভিড়ের মাঝে কুড়িয়ে পেয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রাজা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিলেন—আমরা তাই দেখে মাণিককে নিতে এলুম, কিন্তু রাণী আমাদের হাতে-পায়ে ধরে মাণিককে ভিক্ষে করে চেয়ে নিলেন। তিনি বলেন 'ওটি বিশ্বেশ্বরের দান, তোমরা আমার কোল শূন্য করে বাছাকে কেড়ে নিয়ে যেয়ো না।' রাণী কেঁদে ফেল্লেন। আমরা আর কিছু বলতে পারলুম না, মাণিককে রাণীর কোলে দিয়ে এলুম। সে আজ অনেক দিনের কথা, তবে মাঝে মাঝে সরল তাকে দেখে আসে।"

কমলা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"ভগবান তাকে সুখে রাখুন।"

সরল কহিল,—"এইবার একদিন গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসবো।"

কমলা কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন তাহার হৃদয়-মাঝে ভাঙাচোরা পুরাণো স্মৃতিগুলা একটা একটা করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যেন তন্ময় হইয়া কি একটা ভাবিতেছিল, পরে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল,—"সরল, এইবার গাড়ি ডাকতে পাঠাও।"

সরলের আদেশে একজন ভৃত্য যাইয়া দুইখানি গাড়ি ডাকিয়া আনিল। একখানিতে সরল ও তাহার পিতা উঠিলেন, অপর খানিতে বিমলা, তাহার বধূমাতা, কমলা ও লীলা উঠিল। পাচক, ভৃত্য প্রভৃতি অপর লোকেরা জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া পরে আসিবে কথা রহিল।

গাড়ি দুইখানি হাঁসপাতাল-বাড়ি পার হইয়া বাগানের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সকলে নামিয়া আসিয়া কমলার কুটীর-সংলগ্ন শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত দালানের উপর বসিল। এই সময় অর্দ্ধবয়স্ক একটি রমণী সেইখানে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—"মা, রাণী মা একবার আমার মাথায় আপনার পাদপদ্ম ঠেকিয়ে দিন, তাহলেই আমি ভালো হয়ে যাব। আমি আজ ক'দিন থেকে আপনার কাছে আসবার চেষ্টা করছি, কিন্তু হাঁসপাতালের দরোয়ানগুলো আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দ্যায়, বলে মহারাণীর সঙ্গে দেখা হবে না; হাঁসপাতালে গিয়ে শুয়ে থাক ডাক্তারে চিকিচ্ছে করবে। আমি ডাক্তারের চিকিচ্ছে চাই নে—আমি চাই মহারাণীর পায়ের ধূলো। আজ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা বাড়িতে আপনাকে ঢুকতে দেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে করলুম আপনি বেরুলে আপনার দুটো পা জড়িয়ে ধরবো, কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লেন। আমিও সেই গাড়িখানার পিছনে উঠে বসলুম। গাড়ি হাঁসপাতালের ভেতরে ঢুকলো, দরোয়ানগুলো ভাবলে আমি বুঝি বাবুদের ঝি, আমাকে কিছু বল্লে না; আমি আজ অনেক কষ্টে আপনার কাছে এসেছি রাণী মা, এই অধমের ওপর একবার দয়া করুন, একটু পায়ের ধূলো দিন।" বলিয়া রমণী যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণীর মস্তকের সম্মুখভাগের চুল অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। তাহার নয়ন দীপ্তিহীন, মুখের উপর দারুণ বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট। তাহার সর্ব্বাঙ্গে পারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে চাকা চাকা ভাবে ক্ষত হইয়াছে।

কমলা কহিল—"কে তুমি?"

"আমার পরিচয় দেবার কিছু নেই রাণী মা, আমি সংসারের অতি ঘৃণিত জীব।"

কমলা একবার তাহার মুখের পানে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিল; তারপর এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—"তোমার নাম কি মোক্ষদা?"

রমণী শিহরিয়া উঠিল; পরে যুক্তকরে কহিল,—"হাঁ মা এই অভাগীর নাম মোক্ষদা।"

কমলা গম্ভীরস্বরে কহিল—"মনে পড়ে সেই অর্দ্ধোদয় যোগের দিনে তুমি একটি নিঃসহায় স্ত্রীলোককে তোমার ভাড়াটে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে তোমার বসত-বাড়ির তেতালা ঘরে থাকতে দিয়েছিলে, সঙ্গে তার একটি শিশু ছিল?"

রমণীর বুকের ভিতর তখন ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল! সে চঞ্চলভাবে বলিল—"হ্যাঁ মা মনে পড়ে।"

কমলা তীব্রস্বরে কহিল,—"যখন সে তোমার কথায় স্বীকার হয় নি, তখন তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে বসে তার সমস্ত গহনা-পত্র খুলে নিয়ে, তার চুল কেটে দিয়ে, তার মুখে চুণ-কালি লাগিয়ে, একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে দরোয়ান দিয়ে পাগল বলে রাস্তায় বার করে দিয়েছিলে; এ সব কি তোমার মনে পড়ে? তারপর যখন সে ভিড়ের মাঝে শিশু-হারা হয়ে "মাণিক মাণিক" বলে কেঁদে উঠেছিল তখন কী বলেছিলে সে কথা কি স্মরণ হয়?"

"স্মরণ হয় মা, স্মরণ হয়; সব মনে আছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, সেই পাপের ফলে আজ আমার এই দশা। ভগবান আমাকে ঠিক শাস্তি দিয়েছেন।" রমণীর মাথা তখন ঘুরিতেছিল, সে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া কম্পিতহৃদয়ে দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া বসিয়া পড়িল।

সরল উত্তেজিত হইয়া তীব্রস্বরে কহিল,—"দিদি এই মাগী তোমার এমন অবস্থা করেছিল—তুমি বল আমি ওর মুখে একটা লাথি মেরে আসি।"

"না সরল থাক, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন; মোক্ষদা আমার যা করেছিল তাতে আমার ভালো বই মন্দ হয় নি। আমার দেহ মনের উপর দিয়ে আগুনের হল্কা বয়ে গিয়েছিল। আমি সেই আগুনে পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে এখান থেকে চলে গেছলুম—যেখানে মানুষের কোলাহল নেই কিন্তু শান্তির উৎস আছে। ভগবান আবার আমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে এখানে পাঠিয়েছেন। কে জানে তাঁর মনে কি আছে।"

চৌধুরী মহাশয় ও বিমলার একান্ত অনুরোধে কমলা কি করিয়া কাশীতে আসিল, তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত একে-একে বলিয়া গেল, সকলে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

কমলা মোক্ষদার নিকটে যাইয়া কহিল,—"মোক্ষদা ওঠ।"

মোক্ষদা নির্ব্বাক স্পন্দহীনভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলা আবার কহিল,—"তুমি এই বেলতলায় রোজ একবার করে এসে গড়াগড়ি দিয়ে যেয়ো। আমি দরোয়ানদের বলে দেবো, কেউ তোমায় আটকাবে না।"

"আঃ বাঁচলুম" বলিয়া মোক্ষদা বেলতলায় পড়িয়া খানিকটা গড়াগড়ি খাইল।

তাহাতে যেন তাহার অনেক যন্ত্রণা কমিয়া গেল! সে একটু শান্তি পাইল। তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া কমলাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন কমলা একটি শিকড় আনিয়া উহা গঙ্গা জলে বাটিয়া মোক্ষদাকে মাখিতে দিল। তিন দিন মাখিবার পর মোক্ষদা দেখিল যে সে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছে। তখন তাহার মনের কি পরিবর্ত্তন হইল কে জানে—সে তাহার বাড়ি ও অলঙ্কারাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া যাহা পাইল, তাহা সে গরীবদিগকে নিঃসংকোচে দান করিয়া ফেলিল এবং মহারাণী-হাঁসপাতালে আসিয়া রোগীদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। সে শত কার্য্যের ভিতর প্রত্যহ কমলার উঠান ঝাঁট দিয়া বেলতলায় মাথা ঠুকিতে ভুলিত না। তাহার প্রসাদ-কণিকা মাথায় তুলিয়া লইত। মোক্ষদা তাহার জীবনটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, সে এতদিন যাহাকে সুখ বলিয়া ধরিয়াছিল তাহা তাহাকে কেবল গরলই দিয়াছে; আজ তাহার চোখ ফুটিল। সে দেখিল এই সেবা-ব্রতের ভিতর আসিয়া সে এক নব জীবন লাভ করিয়াছে। সমস্ত জীবনের ভিতর এমন নির্ম্মল সুখ ও আনন্দ কখনো পায় নাই, তাই আজ সে তাহার সমস্ত হৃদয়টা লইয়া ভগবানের চরণে নিঃশেষে দান করিতে চলিয়াছে।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শারদীয় পূজার ছুটি-উপলক্ষ্যে প্রফুল্লর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমূল্য সস্ত্রীক বাটীতে আসিয়াছে। মিঃ রে তাহার পরিজনবর্গ লইয়া দার্জ্জিলিঙে বেড়াইতে গিয়াছেন। সেখান হইতে হরিপদর নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিল,—"সরোজিনী পীড়িতা,—তুমি শীঘ্র আসিবে।" হরিপদ টেলিগ্রাম পাইয়া সেইদিনই দার্জ্জিলিং যাত্রা করিল।

হরিপদর সুচিকিৎসার ফলে প্রথমে প্রফুল্ল বেশ উপকার পাইয়াছিল, কিন্তু উহা স্থায়ীভাবে রহিল না। আজ কয়েক দিন হইল রোগটা আবার বাড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দেখা দিয়াছে। আজ বেলা তিনটা হইতে প্রফুল্লর জ্বর বাড়িতে লাগিল। যাতনায় সে অস্থির হইয়া পড়িল, পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বেদনা-পীড়িত ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—"সরমা, বড় তেষ্টা, একটু জল, উঃ প্রাণ যায়!"

সরমা জলের গ্লাসটি প্রফুল্লর মুখের নিকট ধরিল, সে জল পান করিয়া

একটু সুস্থ হইল। পরে এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"সরমা একবার দাদাকে ডেকে দিতে বল।"

"সুশীল, তোমার জেঠামশাইকে একবার ডেকে আন"—বলিয়া সরমা কক্ষের বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তখন তাহার বুকের ভিতরটা একবার ধড়ফড় করিয়া উঠিল! নিশ্বাস ফেলিতেও একটু কষ্টবোধ হইল। অমূল্য কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কহিল,—"আজ কেমন আছ প্রফুল্ল?"

প্রফুল্ল কাতরভাবে কহিল,—"দাদা, তুমি আমাকে বরাবর স্নেহের চক্ষে দেখ, আপনার মতো ভালোবাস, তাই একবার ডেকেছি, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, একবার পায়ের ধুলো দাও। আমার বুঝি ডাক এসেছে—এতদিন পরে এ যন্ত্রণার অবসান হবে।" বলিয়া প্রফুল্ল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। অমূল্য নিকটে আসিয়া বসিল, প্রফুল্ল তাহার পদধূলি লইল।

অমূল্য কহিল,—"ভাই সেই অনাথের নাথ ভগবানকে ডাকো; তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন, এই ব্যাধিই যে তোমার কোনো মঙ্গল সাধন করবে না, তা কে বলতে পারে! মূর্খ আমরা তাঁর এ বিচিত্র লীলার কিছুই বুঝতে পারি নে। লাহোরে থাক্‌তে এক সাধুর মুখে শুনেছিলুম এই বিশ্ব সংসারটা একটা নাট্য-মন্দির, এই নাট্য-মন্দিরের অধিকারীও একজন আছেন। তিনি যাকে যে পোষাকে সাজিয়ে দিয়ে রঙ্গমঞ্চে বার করেছেন, তাকে সেই পোসাকের অনুযায়ী অংশটুকু অভিনয় করতে হবে। যে রাজা সেজে বেরিয়েছে, সে কিছু আর রাখালের অংশ অভিনয় করতে পারে না; আর যে কানা খোঁড়া দরিদ্র সেজে বেরিয়েছে, সে সেই পোষাকে কিছু রাজার অংশ অভিনয় করতে পারে না। তিনি বলেন যারা আতুর-খঞ্জ পঙ্গুর অংশ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নেমেছে, অধিকারী তাদেরই সব চেয়ে অধিক ভালোবাসেন; তারাই তাঁর আপনার লোক! চক্‌চকে ঝকঝকে রাজার পোষাক পরে, রাজার অংশ অভিনয় করতে সকলেরই সাধ। কিন্তু কানা খোঁড়া কিম্বা একটা হনুমান সেজে অভিনয় করতে কেউ সহজে রাজি হয় না। তবে রাজি হয়, যে অধিকারীর সব চেয়ে আপনার। অধিকারীও তেমনি ঝিকে মেরে বৌকে শিক্ষা দেবার মতো কানা খোঁড়া রোগী পঙ্গু প্রভৃতির অংশগুলি তাঁর নিজের লোক দিয়ে অভিনয় করান। বৌকে কিছু শিক্ষা দিতে হলে, মা মেয়েকে মারেন কেন? কারণ সে যে তাঁর সবচেয়ে আপনার—তাঁর স্নেহের আদরের ধন। আর তাঁর

বৌমা সে যে পরের মেয়ে তার গায়ে হাত তোল্‌বার তাঁর কোনো অধিকার নেই। আর মেয়েটি মাতার আঘাত আশীর্ব্বাদের মতো মনে করে, তখুনি ভুলে যায়, কেন না সে যে তার মাকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তার পর অভিনয় শেষ হয়ে গেলে যখন সকলে অধিকারীর কাছে গিয়ে আপনার আপনার পোষাক খুলে দ্যায়, তখন যে রাজা সেজেছিল, আর যে আতুর খঞ্জ সেজেছিল—উভয়ে কোনো প্রভেদ থাকে না; অধিকন্তু যে আতুরের কুৎসিত অংশ অভিনয় করেছিল অধিকারী তাকেই সব চেয়ে বেশি বাহবা দেন। তাই বল্‌চি তুমি সেই অধিকারীর আপনার লোক, তুমি যে অংশ অভিনয় করচ, সেই অংশের অভিনয় শেষ করে যখন তাঁর কাছে যাবে, তখন তিনি স্নেহভরে তোমার পিঠ চাপ্‌ড়ে বলবেন, সাবাস প্রফুল্ল!" প্রফুল্ল নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিল, তাহার প্রাণটা তখন কোন্ দূর জগতের আঁধার পথে কাহার চরণ ছায়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল! সে বিস্মিতভাবে অমূল্যর মুখের পানে চাহিয়া কহিল—"দাদা আজ তুমি আমাকে নতুন কথা শুনালে; আশীর্ব্বাদ কর যেন সেই অধিকারীর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে এই পোষাকটা খুলে দিতে পারি।"

অমূল্য জোরের সহিত কহিল,—"ভগবান নিশ্চয়ই তোমার দয়া করবেন; তোমার কামনা পূর্ণ হবে।"

প্রফুল্ল উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া যুক্তকরে কোন্ দেবতার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছিল কে জানে! তখন তাহার দু'নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। প্রফুল্ল ক্ষীণকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিল,—"দাদা, তুমি আমাকে ঘৃণা কর না কেন? অনেকে তো তফাৎ থেকে আমাকে দেখে মুখ শিঁট্‌কে চলে যায়!" অমূল্য প্রফুল্লর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"তোমাদের মতো লোককে যে ঘৃণা করে, সে ভগবানকে ঘৃণা করে; তোমাতে কি ভগবান নাই?" প্রফুল্ল আর কোনো কথা কহিল না, সে ভাবিতে লাগিল ভগবানের কি এমনি দয়া, তাহার মতো পাপীর দেহেও কি তাঁহার সত্তা আছে? তিনি সত্যই কি এমন ঘৃণিত জীবকে দয়া করেন?" প্রফুল্ল তখন নয়ন মুদিত করিয়া রহিল। তাহার হৃদয়-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া কে যেন কি খুঁজিতে লাগিল! তখন সে মানস-চক্ষে দেখিল, কাহার একখানি স্নেহকোমল হস্ত তাহাকে অভয় দান করিতেছে? অমূল্য কহিল,—"প্রফুল্ল চুপ করে' রইলে যে ভাই।"

প্রফুল্ল কিন্তু এ কথার কোনো জবাবই দিল না। মুদিতনয়নে স্থিরভাবে

পড়িয়া রহিল। কে জানে তখন সে কাহার ধ্যানে মগ্ন ছিল! অমূল্যর কথা তাহার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল কি না তাহা কে বলিতে পারে!"

প্রফুল্ল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া অমূল্য ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর হইতে প্রফুল্লর জ্বর বাড়িতে লাগিল। রাত্রি একটার সময় তাহার বিকার উপস্থিত হইল। তাহার চোখ দুটি করমচার ন্যায় লাল হইয়া উঠিল; মাথায় আইস্-ব্যাগ চলিতে লাগিল। কিন্তু কোনোই উপকার হইল না। সে অনেক অসঙ্গত অর্থহীন প্রলাপ বকিতে লাগিল। সে কখনো উঠিতে চায়, কখনো চলিতে চায়; সরমা তাহাকে ধরিয়া রাখে। কিন্তু এমন করিয়া সে আর তাহাকে কতক্ষণ ধরিয়া রাখিবে! সরমা একা একশো জন হইয়া সে রাত্রে প্রফুল্লকে ধরিয়া রাখিল।

নবমীর রজনী প্রভাত হইল। সরমার পিতা আসিলেন, প্রফুল্লর পিতা আসিলেন, অমূল্য আসিল, আরো পাড়ার অনেকে প্রফুল্লকে দেখিতে আসিয়াছিল। প্রফুল্লর অবস্থা দেখিয়া সকলেই মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। সুশীল তাহার পিতার পার্শ্বে বসিয়াছিল। প্রফুল্ল তখন অজ্ঞান অচৈতন্য; তাহার ঘোলা চক্ষু দুটি কপালের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

বেলা নয়টার সময় প্রফুল্লর গায়ে অল্প অল্প ঘাম দেখা দিল। তারপর জ্বর ত্যাগ হইয়া ক্রমে পদদ্বয় হইতে দেহ শীতল হইয়া আসিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। পিতার যন্ত্রণা দেখিয়া সুশীল আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল,—"মা—মা, শীঘ্র এসো, বাবা কেমন কচ্চেন?"

সরমা ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যাহারা ভিতরে ছিল সকলেই বাহিরে আসিল। সুশীল কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার দাদা মহাশয়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমা দরজাটা ঠেলিয়া দিয়া প্রফুল্লর গায়ে হাত দিয়া দেখিল দেহ প্রায় অর্দ্ধেকটা শীতল হইয়া আসিয়াছে। সরমা তখন গলায় অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রফুল্লর বক্ষের উপর আপনার মুখ রাখিয়া তাহার শীতল দেহখানা দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিল। প্রফুল্ল সরমার এই কোমল আলিঙ্গনের মধ্যে থাকিয়া নীরবে জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেলিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল সরমা বাহিরে আসিল না। এই সময়

অমূল্য মুকুন্দবাবুকে কহিল,—"আপনার কন্যাকে একবার বাহিরে আসতে বলুন, আমরা ওকে ধরাধরি করে তুলসী তলায় নামাই।"

সরমার পিতা দরজা খুলিলেন, সকলেই দেখিল সরমা প্রফুল্লর বক্ষের উপর মুখ রাখিয়া তাহাকে দুই হস্তে আবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে !

মুকুন্দবাবু ডাকিলেন,—"সরমা ?" সরমা নীরব।

প্রফুল্লর পিতা ডাকিলেন,—"বৌমা ?" প্রতিধ্বনি সাড়া দিল—বৌমা !

সুশীল কাঁদিয়া ডাকিল,—"মা—মা ?"

সে শব্দ শূন্যে মিশাইয়া গেল ! সরমা স্তব্ধ মৌন নীরব !

সরমার পিতা চঞ্চলপদে আসিয়া সরমার হাত ধরিলেন ; দেখিলেন সরমা নাই ! তাহার শীতল দেহখানা শুধু পড়িয়া আছে !

এই আকস্মিক ব্যাপারে সকলেই নির্ব্বাক—নিস্পন্দ, যেন ভোজবাজীর ন্যায় সকলের চক্ষের সম্মুখে সরমা অদৃশ্য হইয়া গেল !

সতীর ইচ্ছামৃত্যু দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিল।

সুশীল তখন ধূলায় পড়িয়া আকুলস্বরে মা-মা রবে কাঁদিতেছিল।

মুকুন্দবাবু সুশীলকে তুলিয়া লইয়া একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া কহিলেন,— "মা আমার প্রফুল্লকে তরাতে এসেছিল, তাই সে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সতীর এতই তেজ ! ভগবানের এমনই কৃপা !" তাঁহার দুনয়ন হইতে তখন অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

অমূল্য কহিল,—"কাল আমি প্রফুলকে বলছিলুম, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। এই ব্যাধিই হয় তো তার কোনো মঙ্গলের কারণ হবে। প্রত্যক্ষ দেখলুম প্রফুল্লর ব্যাধির কারণ তার উদ্ধার ! ভগবান বুঝি একজনকে এমনি করেই আর একজনের দ্বারা উদ্ধার সাধন করেন ! ধন্য তাঁর কৃপা।"

সরমা ও প্রফুল্লর স্থূল দেহ পড়িয়া রহিল ! তাহাদের সূক্ষ্ম দেহ দুটি বুঝি এক হইয়া স্বর্গের পথে চলিয়া গেল ! তাহারা যেন পরিচ্ছদ বদলাইয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া নব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া জীব কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; ইহার ফলাফলের বিচার আর একজন করিতেছেন।

যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা অবাক হইয়া গেল। এমন অলৌকিক ঘটনা তাহারা আর কখনো দেখে নাই। নিমিষের মধ্যে এ-ঘটনা চারিদিকে

প্রচার হইয়া পড়িল। তখন দলে দলে লোক আসিয়া সতী-দেহ দেখিতে লাগিল; নারিগণ গলায় অঞ্চল দিয়া সতীর পদতলে প্রণাম করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিল।

একজনের মৃত্যুতে তাহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিই অশ্রুপাত করিয়া থাকে, কিন্তু সরমার দেহত্যাগে দেশশুদ্ধ কাঁদিয়া উঠিল। সে দেবী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাল কে তাহাদের ঘরে-ঘরে গিয়া দুঃখ-দৈন্যের সংবাদ লইয়া মুক্ত হস্ত প্রসারণ করিবে? কাহার নিকট তাহারা অভাব জানাইবে? কে তাহাদের মুখের দিকে চাহিবে? যে বালক-বালিকাগণ সরমার নিকট প্রতিপালিত হইতেছিল তাহারাও সুশীলের ন্যায় মা-মা বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখগুলিকে ফুলাইয়া তুলিল। তাহারা সকলেই বুঝিল আজ তাহারা যথার্থই মাতৃহীন হইয়াছে। সেদিন আর কেহ জলস্পর্শ করিল না।

মুখে মুখে এ সংবাদ সুবার্দ্ধন পুলিশের কানে আসিয়া উঠিল। থানার দারোগা (Inspector) বহুদিনের পুরাতন লোক। অনেক দেখিয়া শুনিয়া পাকিয়া উঠিয়াছেন। এরূপ মৃত্যু তাঁহার নিকট ঘোর সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইল। তখনই তিনি স্বদল-বলে ঘটনা-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মুকুন্দবাবু দারোগাকে দেখিয়া বলিলেন,—"অনুচরবর্গের সহিত মহাশয়ের এখানে শুভাগমনের কারণ কি? এখানে তো কোনো চুরি ডাকাতি হয় নি।"

"এখানে একটা সন্দেহজনক মৃত্যু হয়েছে শুনে আমাদের আসা।"

"আপনার কি সন্দেহ উপস্থিত একবার বলুন।"

"লাসটা একবার দেখতে চাই।"

"আচ্ছা দেখুন"—বলিয়া মুকুন্দবাবু দারোগাকে গৃহমধ্যে আনিলেন।

দারোগা মৃত দেহ দেখিয়া কহিল,—"এই কুষ্ঠ রোগী ব্যক্তিটাই বা কে? আর এই স্ত্রীলোকটাই বা কে?"

"পুরুষটি আমার জামাতা, আর স্ত্রীলোকটি আমার কন্যা।"

"আপনার কন্যার কী অসুখে মৃত্যু হয়েছে? ডাক্তারের কোনো সার্টিফিকেট আছে?"

"কি অসুখে মৃত্যু হয়েছে তা আমরা জানি না—ডাক্তার দেখে নি, ডাক্তারের কোনো সার্টিফিকেটও নেই। এটা হচ্চে সতীর ইচ্ছা-মৃত্যু।"

"দেখুন আমাদের কাছে ও-সব বুজরুকি খাটবে না। আমরা পুলিসের

লোক। অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। এই মৃত্যুটা ভয়ানক সন্দেহজনক বলে মনে হচ্চে। নিশ্চয় এর ভিতর কোনো গুপ্ত রহস্য আছে।"

"বেশ তো রহস্যটা ভেদ করুন।"

"আপনার কি কারুর উপর সন্দেহ হয়?"

"কিছু না—সন্দেহের কোনো কারণই দেখি না।"

"কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ দেখচি; যে সময় আপনার কন্যার মৃত্যু হয়, সে সময় তাঁর কাছে কে কে ছিল?"

"আমার ঐ মৃত জামাতা ছাড়া আর কেউ ছিল না।"

"ওঃ বুঝেছি, আপনারা পুলিশের চক্ষে ধূলী দিতে চান—এ কেস্ আপনারা নিশ্চয়ই সাজিয়েছেন। একটা লোক মরে গেল, তা কেউ জান্‌তে পারলে না! অদ্ভুত রহস্য! আপনার কন্যা এই কুষ্ঠ রোগীর নিকট কি করতে গেছলো?"

"সাধ্বী স্ত্রী তার স্বামীর সেবার জন্য গিয়েছিল—আপনি হিন্দু নন!"

দারোগা রোষভরে কহিল—"আপনি জানেন আমরা পুলিশের লোক! যা জিজ্ঞেস করবো কেবল সেই কথার উত্তর দেবেন। আমি আপনার কন্যার দেহ পরীক্ষা করতে চাই।"

মুকুন্দবাবু তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন,—"আপনি ডাক্তার নন—কী দেখবেন?"

"দেখবো কোনো আঘাতের চিহ্ন (mark of violance) আছে কি না।"

মুকুন্দবাবু সতীদেহ দেখাইলেন। দারোগা দেখিয়া শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,—"গলাটা কিছু ফুলো ফুলো দেখ্‌চি—একটা দাগ রয়েচে না? বোধ হয় কেউ গলাটিপে মেরেছে—আপনার কী মনে হয়?"

মুকুন্দবাবু ঘৃণার সহিত কহিলেন,—"আমার কিছুই মনে হয় না। আমি আর আপনার কোনো কথার জবাব-দিহি করতে বাধ্য নই। আপনার ক্ষমতায় যা থাকে তাই করুন।"

"আপনি রাগবেন না, এ কেসের ওপর আমার ঘোর সন্দেহ। আমি এ লাস জালাবার হুকুম দিতে পারি নে। এর শবচ্ছেদ পরীক্ষা (Port morton examination) হওয়া চাই। আমি এই রিপোর্ট লিখে দিলুম," বলিয়া দারোগা আবদুলের নিকট হইতে দোয়াত কমল ও কাগজ লইয়া, চড় চড় করিয়া একখানি রিপোর্ট লিখিয়া দিয়া দলবল সহ বিদায় হইল।

যথাসময়ে দারোগার কৃপায় সতীর শবচ্ছেদ পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। শবচ্ছেদ-পরীক্ষক ডাক্তার মন্‌রো এইরূপ রিপোর্ট দিলেন—

It appears that the deceased woman had been suffering from heart-disease since last few months. Her death is caused by the sudden failure of heart owing violent emotion of mind which rendered a terrible shock on the action of the heart. There is nothing seem to be suspecious. Her funeral ceremony may accordingly be performed in the usual manner.

অর্থাৎ এই মৃত স্ত্রীলোকটি কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। সহসা একটা দুর্ব্বিসহ মনের আবেগ হৃদয়-যন্ত্রে ভয়ানকরূপে আঘাত করায় হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাতে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। স্বাভাবিক নিয়মে এখন ইঁহার সৎকার করা হউক।

সরমার হৃদয়ের ভিতর কী ঐশ্বরিক শক্তি কার্য্য করিতেছিল! কি মাহেন্দ্র ক্ষণে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি বন্ধ হইয়া গেল! তখন চারিদিকে বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজিয়া উঠিয়াছে! দুই একখানি প্রতিমাও বাহির হইয়াছে। বিজয়া দশমীর এই শুভ অপরাহ্ণে মহা সঙ্কীর্ত্তনের সহিত সরমা ও প্রফুল্লর মৃত দেহ শ্মশানে আনীত হইল। সঙ্গে প্রায় শতাধিক লোক আসিয়াছিল।

চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাজানো হইল; এক চিতায় প্রফুল্ল ও সরমাকে শায়িত করা হইল। সুশীল মুখাগ্নি করিল। গব্য ঘৃতের আহুতি প্রদানে চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল। যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা সতীর চিতাভস্ম লইয়া বিষণ্ণবদনে গৃহে ফিরিল। মাতার অদর্শনে শিশু যেমন কাঁদিয়া উঠে, গ্রামের লোক আজ তেমনি ভাবে আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া উঠিল। তাহারা যেন সত্যই আজ মাতৃহারা হইয়াছে। সরমার জন্য অশৌচ গ্রহণ করে নাই গ্রামে এমন লোক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রফুল্ল ও সরমা সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কে জানে কোথায় চলিয়া গেল! সব ফুরাইয়া গেল—রহিল শুধু অতীতের সুপ্ত স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙের মেলবোর্ণ ক্লাবে বসিয়া হরিপদ সেদিন কাগজ পড়িতেছিল।

পায়োনিয়ারের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শেষে বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে তাহার নজর পড়িল। অনেকগুলি বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটিতে এইরূপ লেখা ছিল :—"কাশীর মহারাণী-হাঁসপাতালের জন্য একজন সুদক্ষ হিন্দু অস্ত্রচিকিৎসকের প্রয়োজন। বেতন ছয় শত টাকা। প্রত্যহ প্রাতে সাতটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত হাঁসপাতালের কার্য্য করিতে হইবে। বাকি সময় বাহিরের রোগী দেখিতে পারিবেন।" ম্যানেজার মহারাণী-হাঁসপাতাল কাশী।

বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া হরিপদ ভাবিল, একমাসের মধ্যে কাশীতে যাইয়া তাহার মাতার চক্ষের ছানি তুলিয়া দিবার কথা ছিল, কিন্তু এখন প্রায় দুই মাস হইতে চলিল; ছানিও এতদিনে বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে আর বিলম্ব করা চলে না। এখন যদি সে এই চাকরিটি পায় তাহা হইলে কাশীতে যে-কয়দিন থাকিতে হইবে, সে কয়দিন বেকার বসিয়া থাকিতে হইবে না। তা ছাড়া এই মহারাণী-হাঁসপাতালের বিষয় হরিপদ অনেকবার কাগজে পড়িয়াছে। একজন বঙ্গমহিলার দ্বারা এত বড় একটা হাঁসপাতাল পরিচালিত হইতেছে, ইহা দেখিবার ইচ্ছাও তাহার বিলক্ষণ ছিল। সে আর সময় নষ্ট না করিয়া সেইখানেই বসিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই মহারাণী-হাঁসপাতাল হইতে হরিপদর নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিল উহাতে লেখা ছিল—"আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। শীঘ্র রওনা হউন।"

দার্জ্জিলিং সেনিটেরিয়মে থাকিয়া সরোজিনীর রোগটা যে কি হইয়াছিল, হরিপদ পরীক্ষা করিয়া তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সরোজিনী যাহা বলিল এবং তাহার মাতা যাহা বুঝাইলেন তাহা তাহার ডাক্তারি বিদ্যার গণ্ডির ভিতর মোটেই আসিল না। তবে একটা ঔষধ না দিলে নয় তাই দেওয়া। সেই ঔষধের গুণেই হোক কিম্বা অন্য কোনো অজানা কারণেই হোক সরোজিনী অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল।

তখন সান্ধ্যভোজন চলিতেছিল, নানা কথাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ সরোজিনীর পিতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"এখানে চুপ করে বসে থেকে আমার অনেক ক্ষতি হচ্ছে, কাল আমাকে বেরুতেই হবে।"

হরিপদর যাইবার কথায় সরোজিনীর মুখখানা যেন বর্ষার আকাশের ন্যায় ম্লান হইয়া আসিল। সে একবার হরিপদর মুখের দিকে চাহিল—তাহার কাতর চাহনি যেন বলিয়া দিতেছে—ওগো যেয়ো না, আর দু'টো দিন থাক!

সরোজিনীর পিতা গম্ভীরভাবে কহিলেন—"তা বটে, তবে আমি বলি আর এক সপ্তাহ থাক—এই সময়ের মধ্যে সরোজিনী গায়ে একটু বল পাবে। তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে যাবো, কি বল?" সরোজিনীর কাতর চাহনি হরিপদর প্রাণে আঘাত করিয়াছিল কি না, তা কে জানে, হরিপদ কিন্তু জোরের সহিত কহিল,—"না আমি আর এক দিনও থাকতে পারবো না—বিশেষ দরকার।"

মিঃ রে তখন টেবিলে ঘুসি মারিয়া কহিল—"কিছুতেই যেতে পারবে না "by no means."

হরিপদ অগত্যা টেলিগ্রামখানি দেখাইতে বাধ্য হইল।

মিঃ রে টেলিগ্রাম দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে একটু বিদ্রূপস্বরে কহিল—"কত টাকা মাহিনা হে?"

হরিপদ গম্ভীরস্বরে কহিল—"ছশো টাকা।"

মিঃ রে হাসিয়া কহিল—"মোটে ছশো টাকা।"

"হ্যাঁ তিন ঘণ্টায় ছশো টাকা আর বাইরের রুগীও তো পাব, তবে এ চাকরি খুব অল্পদিনের জন্যে আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।"

সরোজিনীর পিতা কহিল,—"না আর আমরা বাধা দিতে পারি না, কাল স্বচ্ছন্দে যেতে পার।"

পর দিন সকলে আসিয়া হরিপদকে ট্রেনে তুলিয়া দিল। যথাসময়ে হুইস্‌ল দিয়া ট্রেন ষ্টেসন ছাড়িয়া গেল, সরোজিনীর জল-ভরা নয়ন দুটি হরিপদর প্রাণটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—হরিপদ আর একবার ট্রেনের মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, তখনো সরোজিনী সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সরোজিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, যাহারা মায়া-মমতা-হীন হইয়া অনবরত মানুষের অঙ্গে ছুরিকাঘাত করিতে থাকে তাহাদের হৃদয়টাও বুঝি এমনি কঠোর হইয়া যায়!

হরিপদ যে দিন বাটীতে পৌঁছিল, সেই দিনই পঞ্জাব-মেলে কতকগুলি ডাক্তারি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া কাশী যাত্রা করিল। কাশীতে আসিয়া সে প্রথমেই হাঁসপাতালে না গিয়া বরাবর তাহার বন্ধু ভবেশের বাটীতে আসিয়া উঠিল। ভবেশ তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানি চিঠি লিখিতেছিল, সহসা হরিপদকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে কহিল,—"এই যে মেঘ না চাইতেই জল! এস, এস, বস—তোমাকেই এই চিঠি লিখছিলুম; আমার অনেকটা খাটুনি কমে গেল" বলিয়া অর্দ্ধ-সমাপ্ত চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

হরিপদ ভবেশের পার্শ্বে একখানা চেয়ারে বসিয়া অধৈর্য্য ভাবে কহিল,—"ব্যাপার কি ? কিসের চিঠি ?"

কুলিটা হরিপদর বেডিং ও ট্রাঙ্কটা ঘরের একধারে রাখিয়া চলিয়া গেল।

ভবেশ কহিল—"তুমি যে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে এখানে রেখে গিছিলে—কাল রাণীমা এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন ; তিনিও তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

"কি বলচ ভবেশ, রাণীমা কে ? কোথায় তিনি থাকেন ? আর কেনইবা আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা তাঁকে ছেড়ে দিলে ?" বলিয়া হরিপদ ভবেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ভবেশ কহিল—"রাণীমা কে তা জানো না ? তিনি মহারাণী হাঁসপাতালের মহারাণী, সকলে তাঁকে রাণীমা বলে। তা তোমার সেই স্ত্রীলোকটির বরাত ভালো তাই রাণীমা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, তিনি বলেন ডাক্তার আমার কেউ নয়—আমি এখানে আর একদণ্ডও থাকবো না।"

"আমি যে তাঁর চোখের ছানি তুলে দেবার জন্যে এলুম।"

"তা হাঁসপাতালে গিয়ে সচ্ছন্দে সে কাজ করতে পার—কিন্তু আমার বোধ হয় রাণীমা যখন তাঁকে নিয়ে গেছেন তখন তোমাকে কষ্ট করে আর সে কাজ করতে হবে না। তিনিই সে কাজের ভার নেবেন।"

হরিপদ বিস্মিত ভাবে কহিল, "কিছু বুঝলুম না, তিনি কি ডাক্তার ?"

"তিনি ডাক্তার কিনা" তা আমরা জানি না, তবে বলতে পারি তোমার মতো অনেক ডাক্তারকে তিনি ঘোল খাওয়াতে পারেন।"

"কি রকম ?"

"তবে একটা ঘটনা শোন, রাণীমা তোমার সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির কাছে প্রায়ই আসতেন—তিনি অনেকের অনেক কঠিন রোগ ভালো করেছেন তা আমরা শুনেছিলুম। তাই এক দিন সকলে মিলে তাঁকে ধরে বসলুম ; বাবার রোগটা ভালো করে দিতে হবে। বাবা আজ তিন বৎসর বাতে শয্যাশায়ী ছিলেন—তা বোধ হয় তুমি জান—তিনি একবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে ছিলেন—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না। রাণীমা একবার তাঁর মুখের পানে চাহিলেন—সেই চাহনিতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কী সম্মোহন শক্তি তাঁর চোখের ! তখন তিনি তাঁর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। আর পর যখন ঘুম ভেঙে গেল, তখন তিনি একেবারে দাঁড়িয়ে উঠলেন, যেন তাঁর

কোনোও রোগ ছিল না। তিনি এখন প্রত্যহ দু'মাইল বেড়াতে পারেন। কাল তিনি এলাহাবাদ গেছেন। বুঝ্‌লে রাণীমার ক্ষমতা ?"

"তবে আমার মতো ডাক্তারকে তিনি ডাকচেন কেন" বলিয়া ভবেশকে টেলিগ্রামখানি দেখাইল। ভবেশ কহিল "এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই— হাঁসপাতালটি তিনি প্রথমে যাত্রীদের জন্যেই খুলেছিলেন; তারপর ক্রমে ক্রমে যাত্রী ছাড়া স্থানীয় লোকের ভিড় হতে লাগল। এখন এমনি হয়েছে যে লোকের একটু কিছু অসুখ হলেই মহারাণী হাঁসপাতালে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে, কাজেই হাঁসপাতালটিকে যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনি বেশী ডাক্তারেরও দরকার—মহারাণী কিছু আর সকল রোগীকে একলা দেখতে পারেন না।"

"বুঝেছি, তোমাদের রাণী মা বুঝি কোনো মন্ত্রবলে বলীয়ান, সব রোগীকেই যদি তিনি তাঁর মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করেন, তা'হলে তাঁর সমস্ত শক্তি দু'দিনে ক্ষয় হয়ে যাবে, তাই তিনি বাছা বাছা রোগী দেখে তাঁর শক্তির পরিচয় দেন ?"

"তাই যদি হয় তা হলেও তিনি তোমাদের মতো ডাক্তারের চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ। এইত বাবা এতকাল শয্যাশায়ী ছিলেন—ডাক্তার কবিরাজ তো হদ্দমুদ্দ দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছিল—রাণীমা বিনা ওষুধে তাঁকে, দু'মিনিটে ভালো করে দিলেন—আর কি চাও—কী অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর !"

হরিপদ বুঝিল সত্যই এই রাণীমার ক্ষমতা অসীম—তাহা না হইলে কি এত বড় একটা হাঁসপাতাল পরিচালনা করিতে পারেন।

* * * *

পরদিন সাতটার সময় হরিপদ মহারাণীর হাঁসপাতালে আসিয়া ম্যানেজারের সহিত দেখা করিল। ম্যানেজার হরিপদকে সঙ্গে করিয়া রোগীদের প্রত্যেক কক্ষে লইয়া গেল—এবং কে কি রোগে ভুগিতেছে, তাহাও একরকম মোটামুটি বলিয়া দিল। তারপর হরিপদ অপর একটি ডাক্তারের নিকট হইতে কার্য্যভার বুঝিয়া লইল। সেদিন সে দুইটি কেশ করিয়াছিল। হাঁসপাতাল হইতে ফিরিবার সময় হরিপদ কয়েকটি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিল তোমরা এখানে কেমন আছ ? সকলে একবাক্যে বলিল আমরা এখানে বেশ আছি রাণীমা এসে মাঝে মাঝে দেখে যান।

হাঁসপাতালের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও রোগীদের উৎসাহ দেখিয়া হরিপদ প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দ লাভ করিল। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই একজন বঙ্গমহিলার

যারা এত বড় একটি হাঁসপাতাল এমন সুচারুভাবে পরিচালিত হইতে পারে।

হরিপদ ম্যানেজারকে কহিল—"আমি একবার মহারাণীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করি।"

"আপনি দেখা করবেন—আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন "বলিয়া ম্যানেজার ভিতরে চলিয়া গেল এবং দুই মিনিট পরে আসিয়া কহিল' আসুন।"

হরিপদ ম্যানেজারের সহিত বাগানের লাল রাস্তা দিয়া খানিক দূর আসিয়া দেখিতে পাইল যেন তপোবনের মধ্যে এক ঋষিকন্যা বিল্বমূলে একটি প্রস্তর বেদিকার উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের উপর যেন স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দুই হস্তে দুই গাছি শাঁখা, বামকরে লোহ ও সিমন্তে সিন্দুরবিন্দু ঝিকিমিকি করিতেছে—একখানি লালপাড় পট্টবস্ত্রে তাঁহার দেহ আবৃত। হরিপদ একবার, দুইবার, তিনবার চাহিল—অনিমেষ নয়নে, পলকশূন্য নেত্রে আবার চাহিল—তাহার প্রাণের ভিতরটা কেমন হইয়া গেল। সে ভাবিল এই কি তাহার সেই কমলা, যাহাকে সে এখনোও হৃদয় মাঝে দেখতে পায়! না না তাহা হইতেই পারে না—ইনি কোথাকার মহারাণী—দুটি চেহারা কি এক হতে নেই। হরিপদ একটু প্রকৃতিস্থ হইল।

ম্যানেজার নিকটে আসিয়া সাহেবি পোষাক পরা হরিপদকে দেখাইয়া কহিল,—"ইনিই ডাক্তার ব্যানার্জ্জি, বিলেতের এম-ডি পাশ করা—এখন আমাদের হাঁসপাতালের অস্ত্রচিকিৎসক।"

রমণী ধীরভাবে কহিল—"আপনার মতো সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসক পেয়ে আজ আমাদের হাঁসপাতালের অনেক উপকার সাধন হলো। আপনি এখন কোথায় আছেন? আপনার বাসা ঠিক হয়েছে কি?"

হরিপদ নম্রস্বরে কহিল—"আপনি বাঙালির মেয়ে হয়ে যা করেছেন তাতে আমাদের বাংলার গৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। কাল আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এসে উঠেছি। আজ তিনি আমার জন্যে বাঁড়ি দেখে দেবেন।"

"আজ হাঁসপাতালটা একবার দেখেছেন কি?"

"হ্যাঁ দেখেছি বৈকি—আজ দুটা কেস করেছি।"

"কি করলেন—"

"একটা লোকের বুকের উপর দিয়ে গাড়ীর চাকা চলে যায়—তাতে তার পাঁজরার একখানা হাড় ভেঙে গিছিল—সেই ভাঙা হাড়খানা বারকরে এনে একটা ফল্‌স্ হাড় বসিয়ে দিচি। আর একটা লোকের পেটের ভিতর

ফোড়া হয়েছিল, সেটা কেটে দিয়েছি।” রমণী আগ্রহের সহিত কহিল—“রোগী দুটি বাঁচবে তো ?”

“আপনার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই বাঁচবে।”

ডাক্তারের উদ্যম, উৎসাহ শক্তি ও তাহার কার্য্যপটুতার পরিচয় পাইয়া রমণী ভাবিল, এমন একটি ডাক্তার হাঁসপাতালের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। রমণীকে একটু স্তব্ধ দেখিয়া হরিপদ কহিল,—“আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।”

রমণী বিনীত ভাবে কহিল—“বলুন।”

হরিপদ কহিল—“দেখুন ভবেশ বাবুর বাড়িতে আমি একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে রেখে গিছিলুম। শুনলুম আপনি তাঁকে নিয়ে এসেছেন। আমি কি একবার তাঁকে দেখ্‌তে পাইনা? কথা ছিল আমি এসে তাঁর চোখের ছানি তুলে দেবো।”

“আহা আপনি সেই হৃদয়বান ডাক্তার, আপনার দয়ার পরিচয় আমি পূর্ব্বেই পেয়েছি—আপনি সচ্ছন্দে তাঁকে দেখে আসুন কিন্তু তাঁর চখের ব্যাণ্ডেজটা খুলবেন না। তিনি ঐ ঘরে শুয়ে আছেন,” বলিয়া রমণী অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটি ঘর দেখাইয়া দিল।

হরিপদ একটি অপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—বৃদ্ধা একখানি পালঙ্কের উপর শায়িতা—তাঁহার চোখ্‌দুটি বাঁধা রহিয়াছে—মানুষের পদশব্দ পাইয়া বৃদ্ধা কহিল “কে গা তুমি ?”

“আমি সেই ডাক্তার—আপনার চোখের ছানি তুলে দেবো বলে এসেছিলুম, আপনি এখানে এলেন কেন ?”

“ওঃ, তুমি সেই ডাক্তার—কেন বাছা এখানে এলে, আমার চোখের ছানি আর তোমাকে তুল্‌তে হবে না—যা কর্‌বার তা ঐ মেয়েটিই করে দিয়েছে—মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে তাই আমি এখানে এসেছি।”

“আমার আস্‌তে দেরি হয়েছে বলে আপনি রাগ করলেন !”

“তোমার ওপর রাগ কি বাছা—তুমি তো পর, পরে তো দাগা. দেয়ই।”

“আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন কেন ? আমি কি এমন অন্যায় করেছি ?”

“কিছু করনি বাছা—হরিপদ এসেছে বলে একটা মিথ্যে স্তোক বাক্যে আমার প্রাণটাকে জালিয়ে দিয়ে চলে গেছ—যাও বাছা তুমি এখান থেকে যাও,” বলিয়া বৃদ্ধা পাশ ফিরিয়া শুইল। হরিপদর প্রাণের মধ্যে-কে যেন ছুরিকা

বসাইয়া দিল—তাহার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল, সে একবার ভাবিল এখনি সে তাহার মাতার দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলে এই যে মা আমি তোমার সেই হরিপদ এসেছি—কিন্তু আবার ভাবিল, না না উহা এখন হইতেই পারে না—যখন তিনি একবার তাহার কথা অবিশ্বাস করিয়াছেন, তখন হাজার বলিলেও তিনি কখনো বিশ্বাস করিবেন না—লাভে হতে অপদস্থ হইতে হইবে। তাঁহার চোখ ভালো হইলে, তখন সে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিবে, হরিপদ ম্লান মুখে গৃহ হইতে বাহিরে আসিল।

হরিপদ বাহিরে আসিলে রমণী কহিল,—"দেখ্‌লেন?"

"হ্যাঁ দেখ্‌লুম—বেশ আছেন, আহা বুড় মানুষ!"

"আপনার যখন ইচ্ছে হবে দেখে যাবেন। আর দেখুন, এখানে থাকতে যদি আপনার কোনো বিষয়ে কিছু অসুবিধা হয়, তা হলে আমাকে জানাবেন, আমি তার ব্যবস্থা করে দেবো।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া হরিপদ যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে একাই চলিয়া গেল—কারণ ম্যানেজার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। হরিপদ যাইতে যাইতে কেবলি ভাবিতে লাগিল এই সর্ব্বত্যাগী কুটীর-বাসিনী মহারাণী কোন মহারাজার পত্নী—কোথায় এঁদের বাড়ি, এমন দয়াবতী মহারাণীত কখনো দেখিনি।

বাঙালীটোলায় বড় রাস্তার উপর ভবেশ হরিপদর জন্য একখানি ছোট অথচ সজ্জিত গৃহ ভাড়া করিল। দ্বারের পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে হরিপদর নামাঙ্কিত একখানি সাইনবোর্ড আঁটিয়া দেওয়া হইল। হাঁসপাতালের কার্য্য হরিপদ সুচারুরূপে করিতে লাগিল। হরিপদ দেখিল রমণীটি যখন হাঁসপাতাল পরিদর্শনে আসেন, তখন রোগীদের কক্ষে কক্ষে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়—সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, তিনিও সকলের কক্ষে কক্ষে যাইয়া সকল রোগীর গায় হাত বুলাইয়া দিয়া মধুর বচনে তাহাদের অভয় দান করেন। রোগীরাও যেন তাঁহার করস্পর্শে রোগের যাতনা সব ভুলিয়া গিয়া শান্তি লাভ করে। হরিপদর কিন্তু সেই সময় সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়—তাহার আর হাত উঠে না। সে কেবলি ভাবিতে থাকে তাহার কমলার সঙ্গে একছাঁচে গড়া কে এ রমণী?—তাহার বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ যাতনা ঠেলিয়া উঠিতে থাকে।

সেদিন হরিপদ হাঁসপাতালে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এমন সময় "জয় মহারাণী কী জয়" শব্দে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি

বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল একটা বিরাট জনতা উল্লাসস্বরে "জয় মহারাণী কী জয়" শব্দে চারিদিক ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—সেই জনতার মধ্যে হাঁসপাতালের রমণী গরিব দুঃখীদের পয়সা বিতরণ করিতে করিতে গঙ্গার পথে চলিয়াছেন—কত লোক আসিয়া তাঁহার পদধূলী লইয়া মস্তকে দিতেছে—তখন রমণীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানা রবিকরস্পর্শে ঝলমল করিতেছিল। হরিপদ নির্নিমেষ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। রমণী চলিয়া গেলে সে ভাবিতে লাগিল ইনি মহারাণী না দেবী! কত মহারাণী তো এখানে আসেন—কিন্তু কেহ তো তাঁহাদের পদধূলী লইবার জন্য ছুটিয়া আসে না—এমন করিয়া মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করিতে কয়জন মহারাণী সক্ষম হইয়াছেন জানি না; কিন্তু হে ভগবান, কেন তুমি এই মহারাণীকে কমলার ছাঁচে গড়েছলে—মহারাণীকে দেখিলেই যে আমি কমলাকে দেখিতে পাই, মরার উপর খাঁড়ার ঘা আর কেন প্রভু!

হরিপদ হাঁসপাতালে আসিয়াই সেদিন প্রথমে ম্যানেজারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের রাণীমার বাড়ি কোথায় বলিতে পারেন?"

ম্যানেজার কহিল—"না মশাই আমি রাণীমা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি আজ তিন মাস এখানে কাজ করছি—পুরাতন ম্যানেজার"—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হরিপদ বিস্মিতভাবে কহিল—"তিন মাস কাজ করচেন কিছুই জানেন না?"

"না মশাই আমার জানবার দরকারও হয়নি। আপনি কেন রাণীমাকে জিজ্ঞাসা করুন না।"

হরিপদ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া কহিল—"আচ্ছা আপনি বলতে পারেন নবদখানার সামনে ঐ দোতালার উপর যে ভদ্র লোকটি থাকেন উনি কে?"

"উনি বিলাসপুরের জমিদার—রাণীমা ওঁদের এখানে রেখেছেন।"

"ওঁরা তো প্রায়ই তোমাদের রাণীমার কাছে যান-টান দেখতে পাই, আর তিনি ওঁদের কাছে আসেন—তবে কি তিনি ওঁদের পরিবার ভুক্ত?"

"সে কথা আমি কিছুই জানি না।"

"আচ্ছা আপনি যান।"

ম্যানেজার চলিয়া গেলে হরিপদ গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর তাহার জন্য কোনো শক্ত কেশ আছে কিনা জানিবার নিমিত্ত হাউস্-সার্জ্জনকে ডাকিয়া পাঠাইল। হাউস্সার্জ্জন আসিয়া হরিপদকে একটা

অপারেশনের জন্য লইয়া গেল। অপারেশন শেষ করিয়া ও হাঁসপাতলের অন্যান্য কার্য্য সারিয়া হরিপদ যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিল, তখন গেটের সামনে সরল একটা কুকুর লইয়া খেলা করিতেছিল। হরিপদ দ্বারবানকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিয়া সরলকে কহিল,"—আপনারা এখানে আছেন কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি।"

সরল কহিল—"আমি শুনেছি আপনি বিলেতের পাশকরা একজন বড় ডাক্তার, কাটাকুটিতে হাত খুব, সেইজন্যে—"

"সেইজন্যে কি?"

"সেইজন্যে আপনার কাছে ঘেঁসতে ভয় হয়।"

"কেন আমি বাঘ না ভাল্লুক।"

"তার চেয়েও বাড়া—আপনি জীয়ান্ত মানুষের গায়ে ছুরি বসিয়ে দেন।"

"হ্যাঁ, দিই বটে, যেখানে দরকার হয়, কিন্তু আপনার তো সে ভয় নেই।"

"আপনার আশ্বাস বাক্যে আমার ভয় ভাঙল—এখন রোজ দেখা করব?"

"বেশ তো—আপনার নাম?"

"আমার নাম সরলকুমার রায়চৌধুরী—বাড়ী কোথায় বলব কি?"

"না সেটা আমি হাত গুণে বলে দিচ্চি।"

"বলুন তো দেখি।"

"আপনার বাড়ি বিলাসপুর,—আপনারা সেখানকার জমিদার।"

"আপনি এই যে জ্যোতিষ বিদ্যাও জানেন।"

"হ্যাঁ, এই ম্যানেজারের কাছে একটু আধটু শিখেছি।"

সরল হো, হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—"ওঃ বুঝেছি আপনার দৌড়।"

হরিপদ হাসিয়া কহিল,—"তা ঠিক, আচ্ছা এই হাঁসপাতালের মহারাণী আপনাদের কি কেউ হন?"

সরল, সরলপ্রাণে কহিল—"উনি আমার দিদি।"

তখন হরিপদর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—সে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া কহিল,—"কাল আসব দেখা হবে।"

গাড়ী চলিতে লাগিল, হরিপদ ভাবিল, ইনি বিলাসপুরের জমিদার কন্যা; হয়ত ইহার পতি কোনো মহারাজ উপাধিধারী বড় জমিদার হইবেন; তাই লোকে ইহাকে মহারাণী বলে—হরিপদর প্রাণের মধ্যে যে আশার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা হঠাৎ এক নির্ম্মম ফুৎকারে নিভিয়া গেল।

(ক্রমশ)

সম্পাদকীয় মন্তব্য

—:•:—

"নারায়ণ" মাসিক পত্র

সম্প্রতি "নারায়ণ" নামে একখানি উচ্চ ধরণের মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস। প্রধান লেখক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, প্রভৃতি কিন্তু পোষ মাসের নারায়ণে "ডালিম" গল্প পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। গল্পটি অত্যন্ত কুরুচি পূর্ণ—সুতরাং অপাঠ্য। আজ কাল যুবক এবং বয়স্কা কন্যারা মাসিক পত্রের গল্পগুলি আগে পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদের হাতে এমন গল্প কি দিতে আছে? বিজ্ঞ বিচক্ষণ সম্পাদকের সম্পাদিত মাসিকে এমন জঘন্য গল্প স্থান পাইল কিরূপে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয় উক্ত গল্পের দ্বারা কাগজের পবিত্র "নারায়ণ" নাম কলঙ্কিত করা হইয়াছে।

অনধিকার চর্চ্চা

জন্মভূমি মাসিক পত্রের এখন আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইল। সে যাহা হউক, আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী লিখিত "শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের তত্ত্বকথা" প্রবন্ধের শেষে লেখক এইরূপ একটি অন্যায় কথা লিখিয়াছেন, "আজকাল স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়, হিন্দুর দেব দেবী পূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা জানেন না যে হিন্দুজাতি যে প্রতিমা গড়াইয়া দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে, উহা হিন্দুগণের পুতুল পূজা নহে, উহা বাস্তবিকই চৈতন্যের উপাসনা" ইত্যাদি, লেখক স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায় বলিয়া বুঝিয়াছেন কাহাদিগকে? লেখক, অজ্ঞ মুর্খ পাড়াগেঁয়ে নহেন, সহরে থাকেন—কিঞ্চিৎ ইংরাজি বিদ্যাও লাভ করিয়াছেন, তিনি কি অপৌত্তলিক মহাত্মাদিগকে কিছু মাত্র অবগত নহেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার মণ্ডলীর বহু সাধক; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও বহু অপৌত্তলিক সাধক ভক্তগণ কি তাঁহার বিশেষণের বহির্ভূত বুঝায়? লেখক দেব দেবীর পূজায় "বাস্তবিকই কি চৈতন্যের উপাসনা করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন?

অন্তে

—:•:—

যাঁহার নামে আরম্ভ, মধ্যে যিনি সঙ্কটহারী লজ্জা নিবারণকারী, তাঁহারই করুণায় সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ অন্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সত্য রক্ষা হইল—সম্বৎসরের ব্রত পূর্ণ হইল। কত ভ্রম ক্রটী হইয়াছে, সরল ভাবে তাহা স্বীকার করিতেছি। যাঁহারা নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যাহা বিশ্বাস করি—যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়াছি; যাঁহারা গ্রহণ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা আনন্দ পাইয়াছেন। যাঁহারা তাহা না পারিয়া প্রতিবাদী হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

আগামী বৎসরের জন্য সেই চিরকৃপা ভিক্ষা করিতেছি। চালাইবার কর্ত্তা আমি নই,—বন্ধ করিবার কর্ত্তাও আমি নই, ঘটনার ইঙ্গিতে তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি, সেই বিশ্বাস নূতন বৎসরের জন্য আবার আমাকে প্রস্তুত করিতেছে। প্রভুর মহিমা জয়যুক্ত হউক।

———

সরমা

——:•:——

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

আরো কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু হরিপদ একদিনও সরলের সহিত দেখা করিল না। হাঁসপাতালে চাকরি করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মহারাণীকে দেখিলেই তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে—সে কেমন এক রকম হইয়া যায়! কাতর প্রাণে সে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার হৃদয় মন যেন চীৎকার করিয়া বলিতে চাহে—ওগো তুমিই কি আমার সেই কমলা। হরিপদ ভাবিল এখানে আর বেশী দিন থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। কোন্ দিন হয় তো সে প্রাণের আবেগে সরলের দিদিকে কমলা বলিয়া ডাকিয়া ফেলিবে। ছিঃ। ছিঃ!

এখন যদি তাহার মাতার চক্ষু ভালো হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সেদিন হরিপদ হাঁসপাতালের কাজ শেষ করিয়া বেলা আন্দাজ দশটার সময় রমণীর কুটীর-প্রাঙ্গণে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কহিল,—"আমার সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কেমন আছেন ?"

"তিনি এখন বেশ দেখতে পান, যান না গিয়ে দেখা করে আসুন।"

হরিপদ তাহার মাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—"মা আপনি এখন কেমন আছেন ?"

হরিপদর পানে না চাহিয়াই বৃদ্ধা কহিল—"আমি এখন বেশ আছি, চোখেও বেশ দেখতে পাই।"

"আমি কে বলুন দেখি ?"

বৃদ্ধা হরিপদর নিকটে আসিয়া ভালো করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"তুমি সাহেব ?"

"না আমি সাহেব হব কেন, ভালো করে দেখুন দেখি ?"

বৃদ্ধা হরিপদর পানে আর একবার চাহিয়া কহিল—"বুঝেছি তুমি সেই ডাক্তার—তোমার গলা আমার বেশ মনে আছে।"

হরিপদ কাতরভাবে কহিল,—"না মা আমিই তোমার সেই হরিপদ।"

বৃদ্ধার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—তিনি একবার বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে হরিপদর পানে চাহিলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"না তুমি হরিপদ নও—হরিপদকে আমি একবার দেখলেই চিনতে পারতুম। সে কি আমায় না দেখে এতদিন থাকতে পারতো ? তোমার গলা আমার বেশ মনে আছে, তুমি সেই কপট ডাক্তার; হরিপদর নাম করে আর আমার প্রাণে দাগা দিয়ো না—তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

হরিপদর প্রাণটা ফাটিয়া যাইতেছিল, সে অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল—"আমি আপনাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই।"

"সেটা আর আমার বাড়ি নয়—তোমাকে বেচে ফেলেচি; এখন তোমার সেখানে আমি যাব না, আমি এইখানেই থাকবো। তুমি আর আমাকে জ্বালিয়ো না। যাও।"

হরিপদর প্রাণটা তখন ভাঙিয়া চুরিয়া শতখান হইয়া গেল। হায়! আজ

অদৃষ্টের ফেরে তাহার মাতাও তাহাকে চিনিতে পারিলেন না! সে আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মস্ত একটা যাতনার বোঝা লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন হরিপদ হাঁসপাতালে আসিল না। বেলা আটটার সময় ম্যানেজার আসিয়া কহিল—"আপনি আজ হাঁসপাতালে আসেন নি শুনে' রাণী-মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি জানতে চান আপনার কোনো অসুখ করেনি তো?"

"তাঁকে বলুনগে আমি আর হাঁসপাতালে চাকরি কোরবো না। আজই এখান থেকে চলে যাব। কেন, আপনি কি আমার রেজিগ্‌নেশন লেটার পান নি? দেখুনগে আমার টেবিলের ওপর চাপা আছে।"

ম্যানেজার বিনীতভাবে কহিল—"আপনি চাকরি করবেন না কেন?"

হরিপদ ক্রুদ্ধভাবে কহিল—"আমার ইচ্ছে।"

ম্যানেজার আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনরায় আসিয়া কহিল—"রাণী-মা একবার আপনাকে ডাকচেন, বিশেষ দরকার, দয়া করে একবার আসুন; তিনি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বলুন গিয়ে আমি এখন তাঁর হুকুমের চাকর নই।"

"তিনি সেভাবে আপনাকে দেখেন না, আপনি না গেলে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।"

"আচ্ছা চলুন" বলিয়া হরিপদ যে বেশে ছিল সেই বেশেই নামিয়া আসিল। তাহার পায়ে একজোড়া চটি জুতা, পরিধানে একখানি আধময়লা মোটা কাপড়; গায়ে একটা পাঞ্জাবী। চুলগুলি তাহার উস্কোখুস্কো—সারারাত অনিদ্রায় চোখদুটি লালাভ। মুখখানা শুষ্ক! ম্লান!

হরিপদ যখন রমণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সে তাহার চেহারা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, এ কি সেই মানুষ! ভাবিল নিশ্চয়ই ভিতরে একটা কিছু কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। রমণী হরিপদকে বসিতে বলিল। হরিপদ দালানের উপর উঠিয়া একটা জানালায় ঠেস দিয়া বসিল। রমণী নিকটে আসিয়া নম্রস্বরে কহিল—"আপনার শরীর কি আজ অসুস্থ?"

"না।"

"তবে এমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখচি যে—রাত্রে কি ভালো ঘুম হয় নি?"

"হয়েছিল বোধ হয়—তবে এখনো স্নান আহার হয় নি, সেই জন্যে হ'তে পারে।"

"আজ এমন ভাবে কাপড় পরে এসেছেন যে ?"

"আজ তো হাঁসপাতালে চাকরি করতে আসিনি—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"আপনি সত্যিই কি হাঁসপাতালে আর থাকবেন না ?"

"না।"

"কেন ?"

"আমার ভালো লাগে না।"

"ওঃ আপনাকে যা দেওয়া হচ্চে তাতে আপনার পোশাচ্চে না বোধ হয়, আপনি কি বাহিরের কল্ পান না ?"

"আজ পর্য্যন্ত একটিও পাইনি—কাছে এমন হাঁসপাতাল থাকতে কে টাকা দিয়ে ডাক্তার ডাকবে ?"

"আপনার যদি মাহিনা বাড়িয়ে দেওয়া হয় ?"

"না, সে জন্যে নয়, দু'হাজার টাকা দিলেও থাকবো না।"

"কেন থাকবেন না বলুন—আপনার মতো উপযুক্ত লোককে ছাড়তে আমাদের বড় কষ্ট হয়।"

"বলেছি তো আমার ভালো লাগে না—আমার চেয়ে অনেক ভালো ডাক্তার পাবেন।"

আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে' থাকেন যে এই হাঁসপাতালে আর কাজ করবেন না—তাহলে আর আমি আপনাকে জোর করতে পারি না—আপনি যাবার সময় ম্যানেজারের কাছে আপনার পনেরো দিনের মাহিনাটা চেয়ে নিয়ে যাবেন।"

হরিপদ একটু হাসিয়া বলিল—"মাহিনা—মাহিনা কিসের ? এই হাঁসপাতালে কত লোকে কত টাকা দান করেছেন, আমি না হয় পনেরো দিনের মাহিনাই দান করলুম।"

রমণী ভাবিল এ ডাক্তারটি সাধারণ ডাক্তারের মত নয়; এঁর মন অনেক উচ্চ, হৃদয় অনেক প্রশস্ত। ইনি কেনই বা চাকরি করতে এলেন, আর কেনই বা চলে যাচ্চেন কিছুইতো বুঝা গেল না—নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু রহস্য আছে—কিন্তু জানিবার উপায় কি ?

রমণীকে স্তব্ধ দেখিয়া হরিপদ কহিল,—"তবে আমি আসি ?"

"আর একটু বসুন, একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না, আপনি কি পরিবার আছেন কি ?"

হরিপদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল পরিবার—সেত আজ অনেক দিন ভাসিয়ে দিয়েছি—কেউ তো আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে না, তবে আপনি কেন——”

“আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকিতো মাপ করবেন, কিন্তু সমদুঃখি না হলে জিজ্ঞাসা করবে কেন ?”

“তবে আপনি কি আমার সমদুঃখি—সরলের দিদি নয় ?”

“হাঁ। সরলের দিদি বটে কিন্তু—”

“কিন্তু কি আপনি হাঁপাচ্চেন কেন, কি হয়েছে ?”

“না কিছু নয়।”

“তবে, বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলেন কেন বলুন !”

সহসা রমণীর চখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে একটা ঢোক্ গিলিয়া কহিল,—“আমাকেও একজন ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায়—আমিও ভাস্‌তে ভাস্‌তে গিয়ে সরলের দিদি হই।” রমণী অঞ্চলে অশ্রু মুছিল।

হরিপদর প্রাণের মধ্যে তখন একটা উত্তেজনা আসিয়াছিল—সে হটাৎ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল—এত দিন যাহা বলিবে বলিবে মনে করিয়াও বলিতে পারে নাই আজ তাহা বলিবার সুযোগ পাইল। সে আবেগ ভরা হৃদয়ে চঞ্চলকণ্ঠে কহিল আজ আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করে প্রাণের বোঝা নামিয়ে নেব—যদি ভুল হয়ে যায় দয়া করে ক্ষমা করবেন ! এ মুখ আর আপনাকে দেখতে হবে না।

রমণী ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল “বলুন ?”

হরিপদ অধৈর্য্য ভাবে কহিল,—“তবে তুমি, তুমিই কি আমার সেই কমলা, যাকে এখনও আমি হৃদয় মাঝে দেখতে পাই—তুমি কি মহারাণী নয়ো ?” হরিপদর প্রাণটা তখন টলমল করিতে ছিল।

“না আমি মহারাণী নই—আমিই তোমার সেই কমলা—যাকে তুমি অন্ধকার রাত্রে; নিঃসহায় অবস্থায় ভাসিয়ে দিয়ে চলেগিছিলে—আমিই তোমার সেই অভাগিনী কমলা, আবার তোমার পায়ের তলায় এসে পড়েছি, একটু পায়ের ধূল দেবে কি ?” বলিয়া কমলা হরিপদর চরণতলে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল—তখন তাহার নয়ন যুগল হইতে আনন্দের অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে ছিল।

হরিপদর শুষ্ক নীরস হৃদয়টা তখন মরা গাঙে বান ডাকার ন্যায়—কানায়

কান্নায় পূর্ণ হইয়া উঠিল—তাহার প্রাণের তারে তখন যে সুর বাজিতে ছিল—ভাষায় তাহা বলা যায় না—কল্পনায় তাহা আসে না, সে উদ্বেলিত হৃদয়ে কমলার হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইল, কমলা স্থির, নীরব, অচঞ্চল—সে ভাবিতে ছিল তাহার স্বামী এত বড় ডাক্তার হইয়াও তাহাকে এখনও ভুলিতে পারে নাই—এখনও বিবাহ করে নাই—এখনও তাহার জন্য ব্যাকুল, তবে কি তিনি দেবতা ?

হরিপদ ভাবিল তাহার স্ত্রী আজ মহারাণী—দেশ শুদ্ধ লোকের রাণীমা, এ আনন্দ কি আর রাখিবার স্থান আছে! কমলাকে নীরব দেখিয়া হরিপদ কহিল,—"তুমি প্রথমে আমাকে চিন্‌তে পারনি ?"

"না, কিছুতেই নয়, একে তুমি বিলেতের পাশ করা এত বড় ডাক্তার, তার ওপর হ্যাট, কোট পরা, গালে এত বড় একটা কাটা দাগ ছাঁটাদাড়ী গলার স্বরটাও কেমন টানা টানা—কেমন করে চিন্‌তে পারব। কিন্তু আজ তোমার কাপড় জামা পরবার ধরণ ধারণ দেখে একটু সন্দেহ হয়েছিল, তাই এত কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম।"

"আমি কিন্তু যে দিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম—সেই দিনই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু ভরসাকরে বলতে পারিনি—তুমি মহারাণী কিনা—সরলকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম তুমি তার দিদি—আমার সকল আশা সেইখানে ফুরিয়ে গেল। তার পর কা'ল মাকে নিয়ে যাইবার জন্যে মার কাছে এসে আত্ম-পরিচয়-দিলুম—কিন্তু মা আমাকে চিন্‌তে পারলেন না, কতকগুলা বকে ঝকে তাড়িয়ে দিলেন—মনে বড় কষ্ট হ'ল—হাঁসপাতালের কাজে ইস্তফা দিয়ে বাসায় চলে গেলুম—সে রাত্রে আর ঘুম হল না।"

"যখন আমিই তোমায় চিন্‌তে পারিনি, তখন মা বুড় মানুষ তিনি যে হটাৎ চিন্‌তে পারবেন এ কথা তোমার ভাবাই অন্যায়। তা ছাড়া তুমি তাঁকে বরাবর ডাক্তার বলে পরিচয় দিয়ে এসেছ। তুমি বো'স এইবার আমি তাঁকে একবার ডেকে দিই" বলিয়া কমলা উঠিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিপদর মাতা সিথিল দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া সম্মুখে হরিপদকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"ওরে বাবা হরিপদরে আজ তোরে চিনেছি বাছা, এত দিন তুই কোথাছিলিরে ?"

মাতার ক্রন্দনে হরিপদ অস্থির হইয়া উঠিল সে তাড়াতাড়ী তাঁহার পদধূলী

লইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল "মা কেঁদনা আমি তো অনেক দিন থেকে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি ?"

হরিপদর মাতা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—"এখন তা বুঝেছি বাবা—পরে কি আর এত যত্ন করে। কা'ল আমি তোকে চিন্‌তে না পেরে কত কটু কথা বলেছি কিছু মনে করিসনে বাবা! আমার এখন বাহাত্তুরে ধরেছে।"

"মা তোমার কটুকথা আমার আশীর্ব্বাদ—তুমি সেজন্যে কিছু মনে ভেবো না।"

হরিপদর মাতা আবেগভরা হৃদয়ে কহিল—"বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় বৌমাকে পেয়েছি—আজ তোমাকে পেলুম—বৌমা আমার মহারাণী, আর তুমি বড় ডাক্তার—এ আনন্দ কি আর রাখবার স্থান আছে! আর কোথায় যাস্‌নে বাবা—প্রাণে বড় দাগা পেয়েছি, মরবার আগে যেন তোদের দেখে যেতে পারি।"

"না মা আর কোথাও যাব না—তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

"তোর কথা শুনে প্রাণটা আজ জুড়ুল বাবা। তোর মুখখানা অমন শুকিয়ে গেছে কেন? এই বেলা হলো কিছু বুঝি খাওয়া হয় নি? বৌমা বৌমা ঘরে কি কিছু নেই?"

কমলা তাড়াতাড়ি এক গ্লাস সরবৎ আনিল।

হরিপদর মাতা কহিল—"বৌমা ওকি এনেছ।"

"সরবৎ"

"দাও বলিয়া হরিপদর মাতা কমলার হস্ত হইতে সরবতের গ্লাসটি লইয়া হরিপদর হাতে তুলিয়া দিলেন।"

হরিপদ এক নিঃশ্বাসে সরবৎটা পান করিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল,—আঃ!

"হরিপদর মাতা কহিলেন—"আর একটু দিতে বলব?"

"না মা আর চাই না।"

"তবে একটু বোস্ বাবা আমি আহ্নিকটা সেরে নিই—বৌমা তুমি না হয় দু'ট ভাত চড়িয়ে দাও আমি এসে কুটনটা কুটে দিচ্চি"—বলিয়া হরিপদর মাতা তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কমলা এইবার নিকটে আসিয়া কহিল—দু'খানা লুচি ভেজে দেব কি?

হরিপদ বিস্মিতভাবে কহিল—"কেন? তোমরা কি ভাত খাও না?"

"এক সন্ধ্যা আমরা খাই বই কি—না খেলে বেঁচে আছি কি করে।"

"তবে লুচি কেন?"

"তুমি কি আমার হা——"

কমলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হরিপদ কহিল—"কি বলছ কমলা।"

কমলা আর কিছু বলিতে পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

হরিপদ আবার কহিল—"তোমার হাতের খাবনা তো কার হাতের খাব। আমি বুঝেছি এখনও তোমার প্রাণের ভিতর একটু ব্যথা আছে—সেই ব্যথাটাই তোমার মুখ দিয়ে বলিয়েছে যে আমি তোমাকে অসহায় অবস্থায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে এসেছি—কিন্তু কমলা আমি তোমাকে শপথ করে বলচি তোমার থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি হরদেবপুরে নেমে পড়েছিলুম কেবল মনটাকে ঠিক করবার জন্যে। সেখানে সমস্ত দিন অনাহারে একটা গাছতলায় পড়ে মনের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে লড়াই ক'রে শেষে মনটাকে বেঁধে ফেলেছিলুম। যখন আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল যে, আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক আমি তোমাদের নিয়ে বর্ম্মায় যাব—কিছুতেই ফেলতে পারব না। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে ঘাটে নৌকা পেলুম না—পরদিন সকাল বেলা হাঁটা পথে তোমার মামার বাড়ি এসে শুনলুম—তিনি তাঁর বাড়ি একজনকে বেচে কোথায় চলে গেছেন, তা কেউ জানে না। যিনি বাড়ি কিনেছেন তাঁর কাছে শুনলুম—তোমার লোক এসেছিল, কিন্তু ফিরে গেছে। কোন্ দিকে ফিরে গেছে তা কেউ বলতে পারলে না—তবে একজন বললে মাঝি যেখান থেকে এনেছিল বোধ হয় সেইখানেই রেখে এসেছে—আমারও সেই বিশ্বাস হলো। আমি লোক পাঠিয়ে বাড়িতে খোঁজ নিলুম, তোমার বাপের বাড়ি খুঁজলুম, কিন্তু কোথাও তোমার সন্ধান পেলুম না—আমার মনে হলো হয়তো তোমার নৌকা ডুবি হয়েছে—এই কথাটাই যেন আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল—আমি তখন পাগলের মত একদিকে উধাও হয়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর—বলিয়া হরিপদ থামিল—

কমলা আগ্রহের সহিত কহিল—"তারপর, তারপর কি হল?"

"তারপর বলব কমলা—সকল কথা বলব,—কিন্তু আগে তোমার কথাগুলি শুনি,—তারপর তোমার কি হল, তুমি কোথায় গেলে?"

কমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একে একে সমস্ত বলিয়া গেল, কেমন করিয়া সে সরলকে পাইয়াছিল—কিরূপে সে চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে

আসিয়াছিল—কিরূপেই বা সে কাশীতে আসিয়াছিল—কাশীতে আসিয়া সে মোক্ষদা দ্বারা কিরূপ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল—কেমন করিয়া সে গুরু প্রাপ্ত হইল এবং কিরূপেই বা হাঁসপাতাল খুলিল।

হরিপদ স্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুনিল—পরে ধীরে ধীরে কহিল,—"ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন—আমরা সহসা সেটা বুঝতে পারি না—তোমাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি করে তুলেছেন—তারপর তোমার গুরু পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি তোমাকে দীক্ষা দিয়ে সাধনার পথে তুলে দিয়েছেন—এখন তুমি দেবী !"

কমলা হাসিয়া কহিল,—"থাক আর কাজ নেই, এখন দেবতার—কাণ্ডটা শুনি ?"

হরিপদ কেমন করিয়া টাকা পাইল—কিরূপে বিলাত যাত্রা করিল, কিরূপে তাহার গালে অতবড় কাটা দাগ হইল—ফিরিয়া আসিয়া অবিনাশ বাবুর সহিত তাহার মোকর্দ্দমার বিবরণ প্রভৃতি একে একে সমস্ত বলিয়া গেল।

কমলা শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিল—"বেশ মজার খেলা খেল্‌লে যাহোক !"

হরিপদ কহিল—"কপালে যা লেখা আছে তা যাবে কোথা। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আর কি সংসারি হবে না, সেখানে কি আর যাবে না ?"

সংসার—আমি কি সংসারি নই ? হাঁসপাতালে এত লোক যখন আমায় মা মা বলে ডাকে তখন আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা মাতৃত্বের ভাব জেগে ওঠে। আমি তখন মনে করি আমি তো ঘোর সংসারি এর চেয়ে আর কি সংসারি হতে বল, এখান থেকে আমি কোথাও যাব না জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এইখানে থাকবো। তবে যদি গুরুর আজ্ঞা হয় বলতে পারি না।"

কমলার মনের দৃঢ়তা দেখিয়া হরিপদ মনে মনে আনন্দ লাভ করিল ভাবিল, এখন আর সে কমলা নাই, এখন তাহার স্থান অনেক উর্দ্ধে। এখন সে সংযমের ভিতর আসিয়াছে। হরিপদ আবেশ ভরা প্রাণে কহিল, "কমলা তোমাকে আজ এই ভাবে পেয়ে, তোমার মুখের কথা শুনে, আমার প্রাণের মধ্যে যে আনন্দ ফুটে উঠেছে, তাতে আমার অন্ধকার জীবনের প্রত্যেক কোণ গুলি পর্য্যন্ত হেসে উঠ্‌চে। আমার মুখ দেখে কিতা বুঝতে পারচ না।"

আর আমার ! গুরুদেব আমায় এইখানে পাঠিয়ে বলে দিয়েছিলেন

'যা কাশীতে গিয়ে ব'সে থাক আর কোথাও যাস্‌নে, একদিন না একদিন তুই তাকে পাবি।' তাই আমি তোমার আশায় এখানে এসে ব'সে আছি— এই দেখ বাঁ হাতের লোহাগাছটি আজও ফেল্‌তে পারিনি" বলিয়া কমলা বাম হস্ত বাড়াইয়া দিল, তখন তাহার ভাসা ভাসা চোখ দুটি হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

হরিপদ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আজ তোমার গুরুর আশির্ব্বাদ বাণী সফল হ'ল, কিন্তু কমলা কোথায় কি করে তাঁর দেখা পাব, তাঁর পায়ের তলায় পড়ে আমাকেও যে দীক্ষা নিতে হবে।"

কমলা গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিল "তাঁর দয়া হলে কিছুই বাকি থাকবে না, কিন্তু আমি এক কথা বলি—তুমি ফের বিবাহ করে সুখী হও।"

হরিপদ একটু হাসিয়া কহিল—"আমার বিবাহ তো একরকম ঠিক হয়েছে।"

কমলা আগ্রহের সহিত কহিল "কোথায়—কার সঙ্গে?"

"এই কাশীতেই, মেয়েটীর নাম চিতাদেবী—তুমি কি তাকে দেখনি?"

"না কোথায় তার ঠিকানা বল, আমি আজই গিয়ে দেখে আসব।"

এই যে মণিকর্ণিকার ঘাট আছে জান—সেই খানেই গেলেই দেখা হবে সেখানে সে প্রত্যহ দাউ দাউ করে জ্বলে, তারি সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!"

"যাও—অমন কর তো আমি চললুম" বলিয়া কমলা উঠিবার উপক্রম করিল।

হরিপদ কহিল "আর একটু বসো—অনেক কথা আছে।" কমলা বসিলে হরিপদ বলিল "আমি অর্থের লোভে তোমার হাঁসপাতালে চাকরি করতে এসেছিলুন—কিন্তু আজ থেকে বিনা মাহিনায় নিযুক্ত হলুম। এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার পথে চলতে পারি, তাহলেই আপনাকে সার্থক জ্ঞান করব।"

কমলা কোনো কথা কহিতে পারিল না—সে নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার প্রাণের হাসি তখন চোখের কোণে ফুটিয়া উঠিতেছিল—সে ভাবিল গুরুদেব এত দিন পরে আমার দক্ষিণ হস্ত মিলাইয়া দিলেন, কে জানিত আমার স্বামী ডাক্তার হইয়া আসিয়া আমার কার্য্যের সহায় হইবেন।

কমলাকে নীরব দেখিয়া হরিপদ আবার কহিল, "দেখ তোমারই যত্নে মা

এতদিন বেঁচে আছেন আমি যে কাজ করবার জন্যে এসেছিলুম সে কাজ তুমিই করে দিলে তুমি মাকে আশ্রয়—"

"কথায় বাধা দিয়া কমলা কহিল "তুমি কি পাগল হলে নাকি তোমার মা কি আমার মা নয়, আমি আর তোমার কোনো কথা শুনব না, এখন একটু তেল এনে দিই মেখে স্নান কর; মাথাটা ঠাণ্ডা হোক, আমি ততক্ষণ দুট' ভাত চড়িয়ে দিই।" বলিয়া কমলা সত্বর উঠিয়া গেল, এবং এক পরিচারিকাকে আড়ালে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিয়া দিল—সে তখনই চলিয়া গেল, হরিপদ তাহা জানিতে পারিল না। পরিচারিকাটি কিন্তু একটু গুপ্তভাবে থাকিয়া হরিপদ ও কমলার সকল কথা শুনিয়াছিল এবং দুই পক্ষ হইতে যে দুইটা বকসিস পাইবে ইহা সে ধ্রুব সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল।

প্রায় দশমিনিট পরে হাসি হাসি মুখে হেলিতে দুলিতে সরল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দালানের উপর হরিপদকে দেখিয়া তফাৎ হইতেই কহিল "Good morning Dr Banerje আজ চুড়া ধড়া ছেড়ে গৌরবেশে দিদির এখানে এসে হত্যে দিচ্চেন যে—চাকরিটা গিয়েছে নাকি?"

সরলের কথাটা হরিপদর গায় খোঁচার মত বিঁধিল সে কোনও উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল ভাবিল ছেলেটা বড় বকা।

হরিপদকে নীরব দেখিয়া সরল কহিল "কি আমার সঙ্গে আর কথা কইবেন না, আপনি জানেন you are no more Dr. Banerji but my দাদা আর এতেই বল্‌তে ইচ্ছা করে দাদার কি বুদ্ধি বাবা। এইবার হরিপদ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সে হাসি ভরা মুখে কহিল "কিসে জানলে?"

সরল মুখ খানা ফুলাইয়া চোক দুটি উপরে তুলিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল will force. সরলের মুখ ভঙ্গি দেখিয়া হরিপদ হাসিতে হাসিতে কহিল "ভারি ঠাট্টা কচ্ছ যে।"

"করবো না আপনি তো দিদিকে ফেলে মজা করে চলে গেলেন, আর আমরা কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে চোর ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—কিন্তু চোর বড় পাকা কিনা, এক ডুবে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার—ধরে কে!"

হরিপদ মনে মনে লজ্জিত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল—"যতদুর ভাবচ ততদুর নয়, যেখানে তাঁর থাকবার কথা ছিল সেখানে তাঁকে না পেলে

খোঁজবার কসুর করিনি—এখন তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করলে সব জান্‌তে পারবে। আমি হারিয়ে ছিলুম কেবল অদৃষ্টের ফেরে।"

"সে কথা যাক কিন্তু ভগবানের কেমন অদ্ভুত কল দেখুন আবার ফিরে ঘুরে দিদির কাছে এসেই চাকরি নিতে হল এখন চাকরিটা যদি গিয়ে থাকে তো বলুন আপনার জন্যে একটু সুপারিস করি।"

"না তুমি আর আমায় তিষ্ঠুতে দিলে না—উঠি!"

"যাবেন কোথা, মা আসচেন—বাবা আসচেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে, উঠি বল্‌লেই কি ওঠা হয়!"

"সরল সত্যি নাকি তাঁরা আসচেন?"

"সত্যি না ত কি মিথ্যা দাদা।"

"তবে আমি পালাই।"

"পালাবেন কোথা—বাগানের যে গেট বন্ধ।"

হরিপদ একটা হতাসের নিশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া রহিল।

চৌধুরী মহাশয়, বিমলা, লীলা সকলে আসিয়া হরিপদকে লইয়া একটা আনন্দের তুফান তুলিয়া দিল, সেই আনন্দ কোলাহলে সমস্ত হাঁসপাতালটি মুখরিত হইয়া উঠিল। সেদিন হরিপদ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সান্ধ-ভোজন করিতে বাধ্য হইল। সেখানে সে বিলাতের নানা গল্প করিয়া সকলকে খুসী করিল।

পরদিন ম্যানজার যখন বারপুরের মহারাজের নিকট হাঁসপাতালের সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাইতেছিলেন, সেই সময় চৌধুরী মহাশয়, ও সরলের অনুরোধে হরিপদর বিষয়ও কিঞ্চিৎ লিখিয়া পাঠাইলেন। দুই দিন পরে মহারাজের Private Secretaryর নিকট হইতে একখান টেলিগ্রাম আসিল তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল, ডাক্তার বেনার্জ্জি তাঁহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যে আপনাকে হাঁসপাতালের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহাতে মহারাজ পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। এবং ডাক্তারকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। মহারাজ অনেকবার হাঁসপাতাল দেখিতে যাইবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে এত দিন ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি মনস্থ করিয়াছেন আগামী শনিবার হাঁসপাতাল পরিদর্শনে সপরিবারে রওনা হইবেন। অতএব তাঁহার জন্য একটা বাড়ি ঠিক করিয়া রাখিবেন।

টেলিগ্রাম পাইয়া হরিপদ কমলার সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল ও হাঁসপাতাল বাটী সুচারুরূপে সজ্জিত করিবার জন্য একজনকে Contract দেওয়া হইল, এবং মহারাজের জন্য সিকরোলে একটা ভালো বাড়ি ঠিক করিয়া রাখা হইল। যথাসময়ে Special ট্রেণে মহারাজ রায়পুর আসিয়া নামিলেন। হরিপদ সরল ও চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনে নামিয়া মহারাজ কিয়ৎক্ষণ সকলের সহিত সদালাপ করিয়া হরিপদকে আপনার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। মহারাণী অবশ্য পৃথক গাড়ীতে ছিলেন। সঙ্গে লোকজন পারিসদবর্গ অনেক আসিয়াছিল।

পরদিন মহারাজ সস্ত্রীক হাঁসপাতাল দর্শন করিতে আসিলেন। ফটকের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, নবসাজে সজ্জিত হাঁসপাতালটি এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে এ যেন হাঁসপাতাল নয়! নন্দন কানন! উপর হইতে তখন মহারাজ ও মহারাণীর অঙ্গে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। "জয় মহারাজের জয়! জয় মহারাণীর জয়" শব্দে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। হরিপদ মহারাজকে এবং কমলা মহারাণীকে আহ্বান করিয়া ভিতরে আনিল। রাজমুকুট খুলিয়া অবনত মস্তকে মহারাজ কমলাকে কহিলেন "মা তোমার আশির্ব্বাদেই আজ তোমাকেও তোমার হাঁসপাতাল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আবার আশীর্ব্বাদ কর, যেন বৎসর বৎসর এমনি করে এসে দেখে যেতে পারি।"

কমলা ধীরভাবে কহিল "আমার হাঁসপাতাল বলেন কেন? এযে মহারাণীর হাঁসপাতাল আপনার বাড়ি—আপনার শুভ ইচ্ছার ফলে ইহা যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। আর আশীর্ব্বাদ চেয়ে আমাকে লজ্জা দেন কেন? আমি যে আপনার কন্যার সমান—আমায় আশীর্ব্বাদ করুন?"

কমলার সাদর আহ্বানে মহারণীর প্রাণটা তখন আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না—কমলার চরণ তলে আপনার মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া দিলেন। কমলা বাহু বেষ্টনে তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন, তখন তাঁহার দু'নয়ন বহিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মহারাজ হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় হরিপদকে ডাকিয়া কহিলেন "আগামী রবিবার অপরাহ্নে আমি এই হাঁসপাতালে একটি সভার অধিবেশন করিতে ইচ্ছা করি তুমি তার বন্দবস্ত কর।"

হরিপদ স্বীকার হইল। চারিদিকে মহারাজের স্বাক্ষরিত চিঠি বিলি হইল। রাজা বিধুশেখরের নিকটও একখানি পাঠান হইল! এই সঙ্গে চৌধুরী মহাশয় কমলা ও হরিপদর বিষয় সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া আর একখানি চিঠি পাঠাইলেন, উহাতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন যেন তিনি সস্ত্রীক মাণিককে লইয়া আসেন।

রবিবার প্রভাত। ধ্বজপতাকা, পত্র পল্লব শোভিত, পুষ্পমাল্যে ভূষিত হাঁসপাতাল বাড়ি হাসিয়া উঠিল। বহু দিনের পরিত্যক্ত নহবতখানায় আজ আবার নবরাগে নহবত বাজিয়া উঠিল। বাগানের মধ্যে কারুকার্য্য খচিত এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতাপের তলে সভার স্থান নির্দ্দেশ হইল! মহিলাদের জন্য পৃথক আসনের বন্দবস্ত রহিল।

লোকজনের অবিশ্রান্ত কোলাহলে সেদিন হাঁসপাতাল পরিপূর্ণ। নয়টা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত কাঙালী ভোজন হইয়া গেল। বেলা তিনটার সময় খবর আসিল জগদীশপুরের রাজা আসিয়াছেন। সরল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গাড়ি বাগানের ভিতর আনিল। বিধুশেখর গাড়ি হইতে নামিয়া চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কমলা আসিয়া ইন্দুবালার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া আপনার কুটীরের দালানে বসাইল। সরল বিস্মিতভাবে কহিল "কৈ—মাণিক কোথা?"

ঐ পিছনে আস্‌চে বলিয়া ইন্দুবালা আঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল।

কমলা চাহিয়া দেখিল এক সুসজ্জিত হস্তি পৃষ্ঠে চৌদ্দ পোনের বৎসরের একটি সুন্দর রাজকুমার বহুমূল্য রাজ পরিচ্ছদ ভূষিত হইয়া সেই দিকে আসিতেছে। সরল ছুটিয়া গিয়া হস্তি হইতে তাহাকে নামাইয়া লইল। মাণিক সরলকে প্রণাম করিয়া কহিল "কাকা বাবু আমরা দাদা মহাশয়ের চিঠি পেয়ে ছিলুম—তিনি কোথায়?"

"তিনি এদিকে কোথায় আছেন এখন আমার সঙ্গে এস' বলিয়া সরল মাণিকের হস্ত ধরিয়া কমলার সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইল। কমলা চঞ্চল হইল না, স্থির প্রশান্ত চিত্তে মাণিককে একবার দেখিয়া লইল, সরল হরিপদর মাতাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল "ইহাকে প্রণাম কর ইনি তোমার ঠাকুর মা।"

মাণিক প্রণাম করিল।

বৃদ্ধা শিথিল হস্তে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ বচন বলিয়া গেলেন।

তারপর সরল কমলাকে দেখাইয়া কহিল "ইনি তোমার মা প্রণাম কর।"

তিনবৎসর হইতে পোনের বৎসর পর্য্যন্ত মাণিক যাহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছে যাহাকে সে একমাত্র মা বলিয়া জানিয়াছে, আজ কোথা হইতে তাহার নূতন মা আসিল—সে কিছু ভাবিয়া পাইল না তাই কমলাকে মা বলিয়া প্রণাম করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

মাণিককে ইতস্ততঃ দেখিয়া ইন্দুবালা কহিল "আমি বলছি ইনি তোমার মা প্রণাম কর।"

মাণিক কিছুই না বুঝিয়াই প্রণাম করিল।

কমলা তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

ইন্দুবালা কমলার হাত ধরিয়া "দিদি কিছু মনে করোনা ও তোমাকে ভুলে গেছে ওকে যখন পেয়েছিলুম ও তখন বড় শিশু। উটি দিদি বিশ্বেশ্বরের দান আমার হৃদয়ের রক্ত আমার ভিক্ষে পুত্তর। ইন্দুবালা কাঁদিয়া ফেলিল। কমলা বুঝিল ইন্দুবালার ব্যথা কোথায়—সে শান্তনা বাক্যে কহিল "এই আনন্দের দিনে চখের জল ফেলোনা ভাই! তোমার কাছে মাণিককে দেখে আমার প্রাণটা আজ স্থির হ'ল হৃদয়ে একটা শান্তি পেলুম। তুমি যথার্থই মাণিকের মা তুমি আমার মাণিককে বাঁচিয়ে রেখেছ—এতটুকুটি থেকে এত বড়টি করেছ।"

মাণিক স্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুনিতে লাগিল কিন্তু কিছু বুঝিল না। এই সময় রাজা বিধুশেখর ও চৌধুরী মহাশয়ের আদেশে সরল হরিপদকে ডাকিয়া আনিবার জন্য ছুটিয়া গেল কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া কহিল "দাদা এখন ভারি ব্যস্ত। তিনি মহারাজের সামনে বসে, সভায় পড়বার জন্যে হাঁসপাতালের রিপোর্ট লিখচেন। আজ এই গোলমালে না হয়—কাল নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

মাণিক আসিয়াছে শুনিয়া বিমলা ও লীলা দেখিতে আসিল এবং তাহাকে লইয়া একটা আনন্দ কোলাহল তুলিয়া দিল।

বেলা চারিটার সময় সভামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সভাস্থলে অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার অনেক গণ্যমান্য ইংরাজ স্থানীয় ভদ্রলোক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা নিজে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। মহারাজের অনুমতিক্রমে হরিপদ হাঁসপাতালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিল। পরে এক বৎসরে হাঁসপাতালে কত লোক আসিরাছিল কত লোক সুস্থ শরীরে ফিরিয়া গিয়াছে আর কত লোকেরইবা মৃত্যু হইয়াছে এই বিষয় আলোচনা

করিতে করিতে হরিপদ বিলাতের ও ভারতের বড় বড় হাঁসপাতালের Statics লইয়া দেখাইয়া দিল মহারাণী হাঁসপাতাল যেরূপ সুফল প্রসব করিয়াছে বিলাত ও ভারতের কোনো হাঁসপাতাল এ পর্য্যন্ত তাহা পারে নাই। ইহা যে কেবল বিচক্ষণ ডাক্তারের গুণে, তাহা নহে এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠাত্রি দেবীর এক অসাধারণ শক্তির বলে।

কাশীর Civil Surgeon ডাক্তার উইলসন হরিপদর কথা সমর্থন করিয়া কহিলেন—"আমি নিজে মহারাণী হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি।"

এইবার মহারাজ উঠিয়া বলিলেন, "Dr. Bonerjee তাঁহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একযোগে একপ্রাণে, নিঃসার্থভাবে যে আপনাকে হাঁসপাতালের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।"

এইবার অনেকেই কমলাকে একবার দেখিবার জন্য মহারাজের নিকট অনুযোগ করিলেন।

মহারাজের আদেশে কমলা ধীরে ধীরে আসিয়া একটি অনুচ্চ সজ্জিত মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সভাস্থ সকলের মনে ভক্তির উদয় হইল। এই সময় মহারাণী উঠিয়া একছড়া বহুমূল্য হীরকহার সর্ব্বসমক্ষে কমলার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন।

মহারাজ এইবার হরিপদকে তাহার নামাঙ্কিত একটি হীরকখচিত ঘড়ি ও চেন উপহার দিয়া সকলের সম্মুখে তাহার সন্মান রক্ষা করিলেন।

হরিপদ বিনয় নম্র বচনে মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

তখন কাশীর মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গলআরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। অসংখ্য আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়া হাঁসপাতাল বাড়িটি ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। হাঁসপাতাল প্রাঙ্গনে স্থানীয় থিয়েটার পার্টি কর্ত্তৃক মহা সমারোহে প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয় হইয়া গেল। সে দিন হাঁসপাতালে রোগীর কাতর ক্রন্দন ছিল না—ব্যথিতের বেদনা ছিল না। হাঁসপাতাল সে দিন স্বর্গপুরী হইয়াছিল।

হরিপদ তাহার বাটিখানি বিক্রয় করিবার মানসে দালাল নিযুক্ত করিল। খরিদ্দার ঠিক হইলে একদিন সে যাইয়া বিক্রয় করিয়া রেজেষ্টারী করিয়া

দিল। বাটি বিক্রয় করিয়া যাহা পাইল, এবং কলিকাতার ব্যাঙ্কে যাহা কিছু ছিল সমস্ত উঠাইয়া লইয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিল। হাঁসপাতালের লাগোয়া ত্রিপুরাসুন্দরের ভূতল বাটীখানা হরিপদ কিনিয়া লইল এবং উহার কটকের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দেওয়া হইল "কমলালয়।" হরিপদ এই থানে সদাব্রত খুলিয়া দিল। দীন দুঃখী আতুর এখানে আসিলে সাহায্য পাইবে। কমলালয়ে আসিলে অভুক্ত কেহ থাকিবে না। যাত্রিরা এখানে আসিলে বিনা ব্যয়ে থাকিতে পারিবে। বিপন্ন যাত্রিরা সাহায্যপ্রার্থি হইয়া আসিলে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে, আরও অনেক সদনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়া হরিপদ কমলালয় প্রতিষ্ঠা করিল। মহারাজা, চৌধুরী মহাশয় ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বইচ্ছায় কমলালয়ে সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

হরিপদ কমলাকে আদর্শ করিয়া যে সেবাব্রত গ্রহণ করিল তাহা তাহার সমস্ত জীবনটাকে পবিত্র করিয়া তুলিল। যেখানে যে টুকু সংকীর্ণতা দীনতা ও মলিনতা ছিল, তাহা যেন আজ পবিত্রতার বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। হরিপদ এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিল এবং নূতন জীবনে, নবীন উৎসাহে জগতের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চতুঃষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

সরমার দেহত্যাগের পর মুকুন্দ বাবু একদিন সরমা ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। ঘাটের কঠিন পাথরগুলা যেন সে দিন সজীব হইয়া তাঁহার কানে কানে সরমার কথা শুনাইতে লাগিল। মুকুন্দ বাবু স্নান ভুলিয়া সানের উপর অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় দেখিলেন ঘাটের সম্মুখে প্রায় দুই তিন বিঘা খালি জমি পড়িয়া রহিয়াছে। মুকুন্দ বাবু উচিৎ মূল্যে সেই জমিটা কিনিয়া লইলেন এবং উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত করাইয়া উহার মধ্যস্থলে কারুকার্য্য খচিত একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। মন্দির মধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সরমার এক সুচারু মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে সুবর্ণ অক্ষরে লেখা রহিল, "সরমা মন্দির।" প্রতি বৎসর বিজয়ার দিনে এই মন্দির প্রাঙ্গনে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিতে লাগিল। অপরাহ্নে পুরুষদিগের নিষেধ ছিল, সেই সময় গ্রামের চারিদিক হইতে সধবা স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সিন্দুরের আদান

প্রদান করিত। সরমার সীমন্তে সিন্দুর লেপিয়া সেই সিন্দুর পরস্পরে পরস্পরের সীমন্তে লাগাইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে সরমা-মন্দির লোকের নিকট এতই পরিচিত হইয়া পড়িল যে দেশ দেশান্তর হইতে ভদ্র মহিলারা সরমার সীমন্তের একবিন্দু সিন্দুরের আশায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সরমা-মন্দির ক্রমে এক পবিত্র তীর্থে পরিণত হইল। যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিতে আসেন তাঁহারা সরমা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সরমার পদে প্রণাম করিয়া চলিয়া যান। কেহ কেহ সরমার পদে পুষ্প-গঙ্গাজল ঢালিয়া দিয়া পূজা করেন। সরমা তো অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে কিন্তু সরমা-মন্দির আজও তাহার পবিত্র স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মুকুন্দ বাবু তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সুশীলের নামে উইল করিয়া দিলেন এবং অমূল্যকে একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া সচ্ছন্দ মনে কাশী বাসী হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়

"কুশদহে" ধারাবাহিক প্রকাশিত সরমা উপন্যাস ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সালের চৈত্রে শেষ হইল। এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া অধিকাংশ পাঠক পাঠিকা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ আমাদিগকে লেখকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এ জন্য আমরা আজ গ্রন্থ শেষ মাননীয় লেখক মহাশয়ের একখানি চিত্রসহ তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় "কুশদহ"তে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, লেখক দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া যে প্রকার পরিশ্রম সহকারে নিস্বার্থভাবে এই হৃদয়-গ্রাহী উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে কুশদহ পত্রিকারও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি সরমা উপন্যাস শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিব। অন্তত অনেকেই এইরূপ আকাঙ্খা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের সন্নিকট গোবিন্দপুর গ্রামে। এক্ষণে তিনি এক প্রকার ভবানীপুর প্রবাসী। ৮নং মাধব চাটুজ্যের লেনে তাঁহার একখানি বাড়ি আছে। তথায় সপরিবারে বসবাস করিয়া, মেলেটারি একাউন্টেন্ট্ ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করেন।

যখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর, তখন হইতে তাঁহার মনে সাহিত্যানুরাগ সূচিত হয়। প্রথমাবস্থায় তিনি যদৃচ্ছভাবে কতকগুলি রচনা লিপিবদ্ধ করেন। একদা তাঁহার কোনো বন্ধু তাহা দেখিয়া বলেন, "তোমার লেখবার ক্ষমতা বেশ আছে, ভাষাও পরিস্কার, অতএব এরূপ লেখা অনায়াসে মাসিক পত্রে প্রকাশযোগ্য হইতে পারে।" তখন তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশনরী স্কুলে পড়েন। এক সময় তাঁহার অন্য আর এক বন্ধুর উদ্‌যোগে তাঁহার ২।১টি ছোট গল্প "ভারতী" মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়া প্রসংশনীয় হয়। তাহাতে তিনি অনেকটা উৎসাহ প্রাপ্ত হন। তারপর তিনি মধ্যে মধ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে "ভারতী" "দেবালয়" "গল্প-লহরী" "সুপ্রভাত", "যমুনা", "ভারত মহিলা" প্রভৃতি মাসিক ও "সম্মিলনী" পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁহার গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার রচিত "বিচিত্রা" * একখানি গল্পপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাস লেখা এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। তাঁহার এই প্রথম সরমা উপন্যাসখানি যে প্রকার আদরনীয় হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তিনি বিখ্যাত সুলেখকের উপযুক্ত স্থান লাভ করিবেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছে।

---

* বিচিত্রায় ১২টী গল্প ও কয়েকখানি সুন্দর বহুবর্ণের ছবি আছে। ১নং রামকিষণ দাসের লেন নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ বারো আনা। ভবানীপুর গ্রন্থকারের নিকট এবং উক্ত প্রেসে ও গুরুদাস বাবুর পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

দাসের আত্মকথা

ব্রহ্মমন্দিরে ৭বৎসর

১২৯৪ সালের প্রথমাংশ হইতে ১৩০০ সালের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত প্রায় ৭বৎসর কাল আমি খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের সংস্রবে যাপন করি। প্রথমে কেবল নির্জ্জন বাসের আকর্ষণে তথায় আসি। এ ছাড়া আর কোনো সঙ্কল্প মনে হয় নাই। পরিবর্ত্তনের প্রথমাবস্থায় একান্তে থাকিতে ভাল লাগিত, লোকালয়ে জন কোলাহল, গ্রাম্যকথা, পরচর্চ্চায় একেবারেই বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়িতে নির্জ্জনে থাকার নিতান্ত অসুবিধা ছিল না, কিন্তু সে অবস্থায় মন তেমন স্থির হইত না। তারপর ঘটনা ক্রমে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া একেবারে মুক্তভাবের মধ্যে পড়িলাম। মনে হয়, এই মুক্তভাব প্রাণের মধ্যে একবার স্থান পাইলে আর বদ্ধভাবে থাকিতে পারা যায় না। প্রথম অবস্থায় এই ভাব যেন চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে হয়,—আর যেন বন্ধনে না পড়ি,—আর যেন মায়ার ঘোরে জড়িত না হই,—এ রকম একটা সতর্কতা সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিতে হয়। যে সাধক তাহা না রাখিয়া স্রোতের বসে চলেন, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা কঠিন হয়; দেখা গিয়াছে আবার তিনি কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার প্রাণের ভাব ম্লান হইয়া গিয়াছে। এই মুক্তভাব কিছু কাল পরিপক্ক হইলে, এবং ভগবানের কৃপা-স্পর্শে প্রাণে বস্তু-তত্ত্ব লাভ হইলে তখন আর সাধন-গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে আত্ম-সাবধানতার ততটা প্রয়োজন হয় না; যখন সংযম স্বভাবসিদ্ধ হয় তখন আবার সংসারে মায়ার মধ্যে আসিয়াও অবিকৃত থাকা যায়। ভগবানের ইঙ্গিতে বা গুরু আদেশে যখন সংসারে আসিতে হয়, তখন সে কৃপা সংসারধর্ম্ম পালনের সূক্ষ্ম পথ দেখাইয়া দেন। ত্যাগী হইয়াও দাসের ভাবে সংসারে থাকিতে বাধ্য হয় না।

আমি যে সময় খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে নির্জ্জন বাসে কাটাইতে ছিলাম তখন এই রূপ একটি জীবনের দৃষ্টান্ত আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

খাঁটুরা নিবাসি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র প্রামাণিক, কলিকাতায় জোড়াসাকোর বাজারে চাউলের দোকানে কর্ম্ম করিতেন। প্রথম হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস ছিল। শেষে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি বিষয়

ও পরিবারবর্গের মায়া ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। কিছু কাল তথায় থাকিয়া সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হন। তাঁহার দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া (ভেক লইয়া) সাধন ভজন করেন। অবশেষে গুরু-আদেশে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

বিজয়চন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব্বে আমার ধর্ম্মবন্ধুতা ছিল। তারপর তাঁহার এই পরিবর্ত্তিত জীবন আমার নিকট (মতভেদ সত্ত্বেও) বড়ই আদরের হইয়াছিল। তিনি ভিতরে কৌপীন ধারী হইয়া বাহিরে সাংসারিক পরিচ্ছদে দীনবেশে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধান করিতেন। সাধন ভজন বৈরাগ্যানুরাগ, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঠিক ছিল।

ব্রহ্মমন্দিরে নির্জ্জনবাসই কেবল আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বিধাতা আনিয়া ফেলিলেন তাঁহার যুগধর্ম্ম-বিধানের মধ্যে। মঙ্গলগঞ্জের সাধকমণ্ডলীসহ সাধন ভজন এবং উপাসনায়, ও কলিকাতায় প্রচারাশ্রমে প্রচারক ও উন্নত সাধক শ্রেণীর সহিত মিলিত উপাসনা এবং সামাজিক উপাসনায় যোগ দিয়া বুঝিলাম, সাধন অঙ্গে নির্জ্জন ও সজন এই দুই ভাবেই সাধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যখন নির্জ্জনে নিগূঢ় ভাবে ভগবানের স্বরূপ-সত্বা প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রাণের পরম ধন জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া প্রাণের সমস্ত বেদনা কামনা একান্তে নিবেদন করিতে পারা যায়, তখন প্রকৃত শান্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। মানসিক শক্তি লাভের জন্য বুঝি ভগবান এই নির্জ্জনপ্রিয়তা আনিয়া দেন। নতুবা এক অবস্থায় যে মানুষ দুই দণ্ড একাকী থাকিতে হইলে হাঁপাইয়া উঠে। আবার সেই মানুষ কেমন করিয়া নির্জ্জন চিন্তায় আনন্দানুভব করে। সাধকের পক্ষে এই স্বভাবটি চিরদিন থাকে বটে কিন্তু এ অবস্থা তো চিরকাল থাকে না। কেবল একা একা প্রাণের সকল ভাব ফুটাইয়া তোলা কঠিন, সম-বিশ্বাসী ভক্ত সঙ্গে সাধন ভজনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্যের বিশ্বাস ভক্তির উচ্ছাস আমাতে সংক্রমিত হয়। তদ্ভিন্ন সাধক যেমন ভগবানের সঙ্গে মিলিতে চান তেমন নরনারী ভাই ভগিনীর সহিতও মিলিতে হইবে। আত্মায় পরমাত্মায় মিলনের একদিক বটে অপর দিক আত্মায় আত্মায় মিলিয়া পরমাত্মায় মিলন। এক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিতর দিয়া যদি পরিবারিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম গড়িয়া না উঠে তবে কেবল সন্ন্যাসধর্ম্মে পূর্ণাঙ্গ সাধন হয় কি? সংসার কেবলই মায়ার বন্ধন ইহা তো সত্য নয়, ভগবানের ভিতর সংসার, এই তো খাঁটি সত্য! এই জ্ঞানে ভগবানকে

ভালোবাসিতে পারিলে আর কি মায়ামোহ থাকে? সংসার এবং সমাজকে যদি ধর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ ও শান্তির স্থান করিতে না পারা যায়, তবে ধর্ম্ম নিতান্ত পঙ্গু হইয়া থাকে। ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া এই সকল সত্যে আমার বিশ্বাস হইতে লাগিল। প্রথমে আমার মধ্যে যে একটি প্রশ্ন ছিল "সংসারে ধর্ম্ম সাধন হইবে না কেন?" তাহার উত্তর এই প্রত্যক্ষ সাধন ভজনের ভিতর দিয়া পাইতে লাগিলাম। জ্ঞান এবং প্রেম, বৈরাগ্য এবং সংসারের মিলনে যে ধর্ম্ম, তাহাই ঠিক। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, লক্ষ্মণচন্দ্রের কোমল ভাবের সঙ্গে আমার কঠোর ভাবের যেন বিনিময় হইতে লাগিল; লক্ষ্মণচন্দ্রের কোমল ভাব অর্থে এখানে প্রেম এবং সেবাধর্ম্ম আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

যখন ত্যাগের সঙ্গে সমাজিক ও পরিবারিক ধর্ম্মের আবশ্যকতা বুঝিলাম, তখন ধর্ম্ম প্রচারের যে ভাব আমার মধ্যে ছিল, তাহারও শক্তি যেন আরো পরিস্ফুট হইতে লাগিল। এই সময় আমার অন্তরে একটি বাণী ফুটিয়া উঠিল। সেটি কোন্ দিন কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু জীবনের মধ্যে এই সময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বেশ অনুভব করিলাম। ভগবান সে বাণী আমারই ভাষায় বলিলেন অথচ তাহা যে আমার ভাব আমার ভাষা নয় তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

ভগবান বলিলেন, "তোকে আমি বিষয় কর্ম্ম ছাড়াইয়া আর একটি কাজের জন্য ডাকিয়াছি। তুই ভাবিস্ না—তোর শ্রেণীর নিরেনব্বই নম্বর হইলে (অর্থাৎ আমার অভাবে এক শতের মধ্যে এক কম হইলে) কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু তোকে আমার অভিপ্রায় সাধন করিতে হইবে, তার জন্য যাহা প্রয়োজন সকলই আমি দিব। তুই জন্মভূমি দেশের নিকট আমার এই নব-যুগের ধর্ম্ম-বার্ত্তা ঘোষণা করিবি, ইহার মধ্যে তোর পরিত্রাণ ফুটিয়া উঠিবে।"

আমি যখন বাড়ি হইতে ব্রহ্মমন্দিরে আসি, তখন শূন্য হস্তে একবস্ত্রে আসিয়াছিলাম। এক বস্ত্র ছিন্ন করিয়া দুখখানি করা হয়। এই ঘটনায় অভাব সঙ্কোচ করিতে একটি ঈঙ্গিত পাইলাম, তাহাতে আনন্দ হইল। তারপর কোথা হইতে প্রয়োজনানুরূপ অন্ন বস্ত্র আসিয়াছে; কোনো দিন বিশেষ অভাব হয় নাই;—কে দিবে এ দুশ্চিন্তা কোনো দিন হয় নাই। ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষের দ্বারাই হউক বা অন্যান্য বন্ধুর দ্বারাই হউক অভাব পূর্ণ হইয়াছে।

নিজের উপার্জ্জিত অর্থ যাহা সংসারের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া আসিয়া-

ছিলাম তাহা কিছুদিন পরে চিনির কারখানায় অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া যায় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন ভ্রাতৃগণ আপনাপন উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া সংসারে আপনাপন দায়িত্ব গ্রহণ করিল। এই অবস্থায় পুত্র বিনয়ভূষণকে ভ্রাতৃগণের হস্তে রাখা অনুচিত ও অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাহারা যখন আমার ধর্ম্ম মতের বিরোধী হইয়া উঠিতেছে তখন তাহাদের নিকট থাকিয়া বিনয়ও সেই ভাবে গঠিত হইবে। এই চিন্তা মনে হওয়ার অল্পদিন পরেই সুযোগ হইল আমাকে আর বেশী কিছু চেষ্টা করিতে হইল না ; দশ বৎসরের বালক স্বইচ্ছায় আমার নিকট আসিল ;—আমি তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে ভগিনীর ভার শশিপদ বাবুর বরাহনগর—বিধবাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন পুত্রের ভার প্রচারাশ্রমের ছাত্রাবাস গ্রহণ করিলেন ; বুঝিলাম, ভগবান এইরূপেই আশ্রিত দাসের সকল ভার গ্রহণ করেন।

কোনো মানুষ ঈশ্বর অবতার স্বয়ং ঈশ্বর বা অভ্রান্ত গুরু, এরূপ বিশ্বাস আমার ছিল না, এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। হৃদিস্থিত পরমাত্মা একমাত্র সদ্‌গুরু ; তিনি অন্তরে থাকিয়া উপদেশ দান করেন, বিবেককর্ণে তাহা শোনা যায়। আবার আমার কল্যাণের জন্য কোনো মানুষকেও আমার গুরুরূপে তিনি পাঠাইতে পারেন ; তিনি অভ্রান্ত ঈশ্বর নহেন, কিন্তু তাহার আদর্শ আমার নিকট পরিত্রাণের সমাচার লইয়া আসে। তাঁহাকে মহাপুরুষ, বিশেষ-মনুষ্য, আচার্য্য উপচেষ্টা যাহাই বলি, ভাবার্থে একই কথা। একদিন যে অন্তর্গুরু দ্বারা পরিচালিত হইয়া চিরবৈরাগ্যব্রত ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহারই বিধানে এখন বুঝিলাম ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করাও আবশ্যক ; * আমি অন্তরে যে ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছি,

* ইতিপূর্ব্বে আমি আমাদের কুল গুরুর নিকট—মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু আমার মনে তাহার কোনো কাজ হয় নাই। আমার জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছিল, এ কথা গুরু ঠাকুর রাসবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি বলিয়াছিলাম, তিনি তাহাতে বলেন "আমরা যে মন্ত্র দিয়া থাকি তাহা সাংসারিক লোকের জন্য। তুমি যে জ্ঞানের পথ ধরিয়াছ সেরূপ জ্ঞান আমাদের আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রদত্ত মন্ত্র তোমার জন্য নয়। তোমার ভালোই হইবে। "তিনি অত্যন্ত সরলভাবে এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার তাহা চিরদিন স্মরণ আছে। (দাস)

বাহিরে সেই বিশ্বাসঅনুরূপ যে মণ্ডলী দেখিতেছি, অধিকাংশ বিশ্বাসসূত্রে আমি যে মণ্ডলীর বলিয়া নিজেকে বুঝিতেছি সে মণ্ডলীতে প্রকাশ্যে যোগদান করিয়া আপন বিশ্বাস স্বীকার করা উচিত। ইহার একটা বিশেষ আবশ্যকতা আছে। তাহাকে যদি ধর্ম্ম-দীক্ষা গ্রহণ বা মণ্ডলীপ্রবেশ বলা যায় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরং সঙ্গত। এই সত্য যখন বুঝিলাম তখন একটি বিশেষ দিনে (শারদীয় উৎসবের সময়) ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ বা নববিধান মণ্ডলীপ্রবেশ করিলাম।

এখন আমি কোথায় আসিয়া পড়িলাম। এখন আমি আমার বিশ্বাসের একটি রূপ দেখিতে লাগিলাম। যাহা কেবল চিন্তায় নয়—সিদ্ধান্তে নয়, অথবা কেবল মত নয়, কিন্তু জীবন্ত চরিত্রে সে রূপ প্রকাশিত। সে চরিত্র ব্যক্তিগত ভাবে কেবল একজন সাধু গুরু মহাপুরুষে প্রকাশ নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মণ্ডলীগত। তাহার সাধন আছে সাধন প্রণালী আছে—সিদ্ধিও আছে। অধিকন্তু এই ধর্ম্ম সাধন ও প্রচারের জন্যই আমি আহুত বা আদিষ্ট ইহা পরিষ্কার বুঝিলাম।

এখন আর কেবল নির্জ্জন চিন্তায় জীবন আবদ্ধ রহিল না। কেবল দরজা বন্ধ করিয়া অন্ধকারে থাকা নয়, মধ্যে মধ্যে বাহিরের আলোকেরেও আবশ্যকতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কর্ম্মের ভাব আবার ফুটিতে লাগিল। কর্ম্মের মধ্যে প্রধান কর্ম্ম বা এক মাত্র উদ্দেশ্য দাঁড়াইল ধর্ম্ম প্রচার করা।

আমার এই ধর্ম্ম প্রচারের ভাব দেশ প্রচলিত সংস্কারের অনুকূল হইল বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্ম যে একটা প্রচারের বিষয় এ কথা যেন প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী;—অবশ্য আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহা হইতে এখন সমাজের অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। এখন সকল সম্প্রদায় অথবা সকল বিষয়েরই প্রচার আবশ্যক বোধ হইয়াছে। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা পল্লিগ্রামে যখন আমি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করি তখন দেশ ঐ সকল নবভাব ও মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমাবস্থায় আমার অনেক দিনের পরিশ্রম এক প্রকার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। যদিও গ্রামের যুবকবৃন্দ আমার নিকট আসিত— আমার গান শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত, কিন্তু কাহারো মনের কোনো পরিবর্ত্তন হইতে দেখি নাই। কেবল একজনের মনে এক সময় কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কিছু

যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি মন্দিরাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা বাবু যোগীন্দ্রনাথ দত্ত।

ক্রমে যখন কলিকাতা হইতে প্রচারক ও বন্ধুবান্ধবগণ খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন, তখন তথায় স্থানাভাব বোধ হইতে লাগিল। লক্ষ্মণচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধে, সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া একটি বাটী নির্ম্মাণের জন্য দুই হাজার টাকা দান করেন। এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু কাজ হয় নাই। এখন কথা উঠিল ব্রহ্মমন্দিরের সংলগ্নভাবে ঐ বাটী প্রস্তুত হউক। দেশের হিতার্থে সাধারণ হিতকর কাজে ব্যবহৃত হইবে, ব্রাহ্মসমাজের কাজের সাহায্য হইবে—আমি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষেত্র বাবু ও লক্ষ্মণ বাবুর অনুরোধে "মঙ্গলালয়" নামক বাটী নির্ম্মাণের ভারগ্রহণ করিয়া বৎসরাধিক কাল ঐ কার্য্যে পরিশ্রম করি। এ কার্য্যে লক্ষ্মণ বাবু সাত হাজার টাকা ব্যয় করেন।

তৎপরে ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিতের বাটী নির্ম্মাণ হয়—ওখানে এক ঘর ব্রাহ্মপরিবার বসবাস করিলে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গপুষ্ট হইবে, ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য হইবে, এই বলিয়া সে বাটী তৈরীরও ভার গ্রহণ করি।

ইতিমধ্যে আমার বিকলাঙ্গিনী পত্নী একান্ত আগ্রহ সহকারে বাটী পরিত্যাগ করিয়া এই প্রান্তরে কুটীর-বাসিনী হইলেন। তাঁহার জন্য এক সতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, এই কুটীর নির্ম্মাণের অর্থ কোথা হইতে আসিল? তখনও পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর গায়ে সামান্য কিছু গহনা ছিল। তিনি নিজে জিদ্ করিয়া তাহা খুলিয়া দিয়া আমাকে বলিলেন, "ইহা বিক্রয় করিয়া ঘর প্রস্তুত হইবে।" তিনিও নিঃস্বম্বলে ভগবানের পথে আসিলেন। আমার অনেক দিনের বাসনা ছিল, নিজহাতে তাঁহার সেবা করিব, এইবার ভগবান সে বাসনা পূর্ণ করিবার দিন আনিয়া দিলেন। তবে এই হইতে শেষ তিনবৎসরের জন্য আবার আমার পদে শৃঙ্খল পড়িল, আর আমি ইচ্ছামত এখানে ওখানে যাইতে পারিতাম না। যাহা হউক তাঁহার সেবায় আমি যেমন আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম, তেমন তাঁহারও শরীর মনের অনেক পরিমাণে উপকার হইয়াছিল। প্রমুক্ত স্থানে শান্ত-চিত্তে কালযাপন করিয়া স্বভাবত তাঁহার শরীরের জড়তা একপ্রকার দূর হইয়াছিল। কেবল পায়ের শিরা আবদ্ধ হইয়া যাওয়ায় চলচ্ছক্তি আর হয় নাই। তাঁহাকে লইয়া মন্দিরে উপাসনায় বসাইয়া দিতাম। একবার কলিকাতায় মাঘোৎসবে আনা

হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ছুটীতে ভগিনী ও বিনয়ভূষণ কলিকাতা হইতে এখানে আসিলে কয়েক দিনের জন্ম আমাদের নির্জ্জন-কুটীর একটু উদ্দীপ্ত হইত।

প্রথম অধ্যায়ে শেষ পরীক্ষা

এইবার ব্রহ্মমন্দিরে শেষ পরীক্ষা উপস্থিত হইল। বিধাতা সকল ঘটনার মধ্যেই আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করেন সত্য বটে কিন্তু মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস স্থির থাকিলে, তাহা দেখিয়া পরমানন্দ লাভ হয়।

ক্রমে ক্রমে ১২৯৯ সাল উপস্থিত হইল। ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় নবগৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের কাজও যেন কতকটা জমিয়া আসিতে লাগিল। এক দিকে মঙ্গলালয় প্রতিষ্ঠা হইয়া এক সুন্দর পুস্তকালয় ও পাঠাগার হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে তথায় বক্তৃতা ও সাহিত্য চর্চ্চার আয়োজন চলিয়াছে,—ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হইতেছে, সর্ব্বদাই বিশ্বাসী ভক্তগণের সমাগমে ব্রহ্মমন্দির একটি সাধন ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। অপরদিকে একটি ব্রাহ্ম-গৃহস্থ বাস করিতেছেন, মন্দিরের বহিরঙ্গ উদ্যানাদি ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়াছে, যিনি আসেন, স্থানটির শান্তিময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া যান। কিন্তু ওদিকে মঙ্গলগঞ্জ ও লক্ষ্মণচন্দ্রের মধ্যে কিছু গোলযোগ ঘটিয়া আসিতেছিল।

এই সময় ১২৯৯, ফাল্গুন মাসে আমার পিতাঠাকুর পরলোক গমণ করেন। ব্রহ্মমন্দিরে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধান মতে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আমার ন্যায় দীন ভিখারীর সাধ্য, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ও কয়েকটি ধর্ম্মবন্ধু ও মহিলা খাঁটুরায় আগমন করিয়া ছিলেন।

নানা কারণে লক্ষ্মণচন্দ্রের হাতের নগত অর্থ অনেক কমিয়া যায়, সেই সঙ্গে বোধ হয় পারিবারিক অশান্তি তাঁহাকে কিছু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হউক এই অবস্থায় তিনি সহসা এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে, মঙ্গলগঞ্জ মিশনের ব্যয় সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাতে খাঁটুরার ব্যয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের জন্ম একটা ব্যয় নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। প্রথমে কথাটা আমি ভালো বুঝিতে পারি নাই; শেষে বুঝিলাম লক্ষ্মণবাবু আমাকে একটা নির্দ্দিষ্টহারে মাসিক সাহায্য করিতে চান। প্রস্তাবটা হয় তো তিনি ভালো ভাবেই মনস্থ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার কোনো আবশ্যকতা বুঝিলাম না। বরং আমার ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অনৈক্য বোধ হইল।

প্রথমতঃ আমি যখন ব্রহ্মমন্দিরে আসি, তখন কোনো বন্দোবস্তের ভাবে আসি নাই; বিধাতার উপর নির্ভর করিয়াই আসিয়াছিলাম। তারপর আগাগোড়া আমার বিশ্বাস, এই ব্রহ্মমন্দির ভগবানের স্থান, ইহা কাহারো বাড়ী বা বাগান কিম্বা দেবালয় নয়। এখানে সকলের সমান অধিকার।

কেহ অর্থে কেহ সামর্থে ইহার সেবা করেন এবং চিরদিন করিবেন। আজ যিনি করিতেছেন ভবিষ্যতে তিনি নাও করিতে পারেন অন্য ব্যক্তি আসিবে। ক্ষেত্র বাবু যাহা করিতেছেন লক্ষ্মণ বাবু যাহা করেন, করিয়া যান; ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে কোনো বন্দোবস্তের কি আবশ্যকতা আছে? তবে যদি প্রকারান্তরে এই হয় যে, এখন ইহার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রভুত্ব কার্য্য করিতে চাহিতেছে; আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস তাহাতে সায় দেয় না। আমি সেরূপ ভাবে এখানে থাকিতে কষ্টবোধ করি। আর এটি যদি সত্য সত্যই ব্যক্তি বিশেষের স্থান হয়—আর আমি এতদিন ভুল বুঝিয়া আসিয়াছি, তবে আমার সঙ্গে এ স্থানের সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত।

লক্ষ্মণ বাবুর নিকট নির্দ্দিষ্টহারে মাসিক সাহায্য লইয়া এখানে থাকা আর তাঁহার বেতনভুক্ত হইয়া থাকা একই কথা আমার মনে হইতে লাগিল। ক্ষেত্র বাবু আমাদের এই মত-ভেদের কথায় প্রথমতঃ আমার পক্ষে অনেকটা সহানুভূতি করিয়া লক্ষ্মণ বাবুকে নিরস্ত হইতে বলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ লক্ষ্মণ বাবুর কর্ত্তৃত্বই ব্রহ্মমন্দিরে স্থান পাইল। যাহা হউক বিস্তৃত ভাবে আর সে কথা লিখিবার স্থান ও সময় নাই, প্রায় ৬ মাসকাল আমরা এই পরীক্ষার মধ্যে তথায় থাকিয়া অনেক চিন্তা—আত্মানুসন্ধান করিয়া শেষ ব্রহ্মমন্দিরের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিঃস্বম্বলে বিকলাঙ্গিনী পত্নীসহ কলিকাতায় আসিলাম—জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। *

ইতিমধ্যে ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে লক্ষ্মণচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তৎপরে মঙ্গলগঞ্জ ও খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক ঘটনা হয়। শেষে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির লইয়া এতদূর দুর্ঘটনা ঘটে যে, তজ্জন্য ক্ষেত্র বাবুকে

---

* দাসের আত্ম-কথা "কুশদহ"তে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বাহির হইল। যতদূর বলিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে একপ্রকার বলা হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া জীবনের যে আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল, তাহা বিচিত্র ঘটনা পূর্ণ দীর্ঘকাহিনী বিশেষ। তাহা বলিয়া আরো "কুশদহ"র কলেবর আবদ্ধ করা উচিত মনে করি না। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ হইলে একত্রে পাঠ করিয়া বিষয়টি বরং যেমন স্মরণীয় হইতে পারে, মাসাগুর একটু একটু পাঠ করিয়া তেমন হয় না। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আমার দ্বারা হইবে কি না তাহার কোনো স্থিরতা নাই।

আমি যতদূর বলিয়াছি তাহা যমগুই সরল ও সত্যভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে যদি কোথাও আমার আমিত্ব অহং ভাবের কথা প্রকাশ হইয়া থাকে—পাঠক পাঠিকাগণ যদি এমন মনে করিয়া থাকেন, তবে তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার কিন্তু তাহা উদ্দেশ্য নয়। আমার জীবনে ভগবান তাঁহার যে টুকু মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি এ যাবৎ অনুভব করিয়া কিছুতেই গোপন রাখিতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস উহা কেবল আমার জন্য নয়, কিন্তু আমার দেশবাসীরও মঙ্গলের জন্য। আমার আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্য এই যে, আমার স্বদেশবাসী উহা পাঠ করিয়া জীবনে উপকার প্রাপ্ত হউন,—তাহা আমার জন্য নয় কিন্তু ভগবানের মহিমাগুণে　দাস—

আদালতের আশ্রয় গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। আমি বিশ্বাস করি, তাহা তাঁহার অসাবধানতার ফল মাত্র। তিনি লক্ষ্মণচন্দ্রের সকল প্রকার অবস্থার কথা ভালো রকম জানিতেন,—ব্রহ্মমন্দিরের সহিত মঙ্গলালয় ও মঙ্গলগঞ্জ মিশন সংক্রান্ত সম্বন্ধ পরিষ্কার করিতে না পারিয়াও তিনি ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বের সহিত ব্রহ্মমন্দির জড়িত রাখিয়াই পরিণামে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মঙ্গলালয় ও ব্রহ্মমন্দিরের সীমানা পৃথক করিয়া না লওয়া বড় ভুল করা হইয়াছিল।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ধানকুড়িয়ার সুবিখ্যাত জমিদার রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুর গত ১৪ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমরা বাস্তবিক বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। সে আজ ত্রিশ বৎসরের অধিক দিনের কথা—যখন তাঁহার স্বদেশ হিতৈষণার কথা প্রথমে শুনি তখন আমাদের মনে তাঁহার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব সমোপস্থিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কতরকমে তাঁহার সেই ভাবের বিকাশ ও স্বদেশের হিতসাধনে তাঁহাকে নিরন্ত নিযুক্ত দেখিয়া আসিতে ছিলাম। জগদীশ্বর তাঁহাকে একদিকে যেমন ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া ছিলেন তিনি তেমনি সেই অর্থের সর্ব্বদা সদ্‌ব্যবহার করিয়াছিলেন। জন সমাজে এবং তাঁহার স্বজাতির নিকট তিনি যে অক্ষয় আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা অক্ষয় হইয়াই রহিবে। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ দেখিলেও আমরা সুখী হইব। ভগবান্ তাঁহার অমর আত্মার শান্তি বিধান করুন।

আমরা ক্ষুব্ধচিত্তে আর একটি মৃত্যু সংবাদ পত্রস্থ করিতেছি যদিও ইনি যথা সময়ে পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন, তবুও মনে হয় আমাদের দেশের এমন ব্যক্তি আরো কিছুকাল বিদ্যমান থাকিলে ভালো ছিল। ইনি গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২১শে মাঘ সজ্ঞানে ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বড় নির্ব্বিরোধী ক্ষমাশীল ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘকাল পোষ্টাল বিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ছিলেন। সাধ্য পক্ষে তিনি সর্ব্বদা পরোপকারে ব্রতী ছিলেন। নিজের ক্ষতিস্বীকার করিয়াও অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের ত্রুটী অনেক সময় ক্ষমা করিতেন। তাঁহার অন্তঃকরণ দয়া ও ক্ষমাগুণের আধার স্বরূপ ছিল। এই জন্য তাঁহার অভাবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।